পল্লীবাংলার
ইতিহাস
ডব্লিউ হান্টার

পল্লীবাংলার ইতিহাস

পল্লীবাংলার ইতিহাস

ডব্লিউ হান্টার

ওসমান গনি

অনূদিত

প্রকাশকের কথা

ডব্লিউ (ডব্লিউ) হান্টারের লেখা *The Annals of Rural Bengal* বইটির বাংলা অনুবাদ *পল্লীবাংলার ইতিহাস* প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৬৯ সালে। অনুবাদক ছিলেন ওসমান গনি। এই বৃহৎ আকারের বইটি অনুবাদ করতে ওসমান গনি প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। অনুবাদক হিসাবে তাঁর সততা ও নিষ্ঠার পরিচয়ও আমরা এ বইয়ে পাই।

হান্টারের এ বইটি নানা কারণে মূল্যবান। আঠার ও উনিশ শতকের পল্লীবাংলার ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ বোঝার জন্য হান্টারের বইটি আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। সরকারী কর্মকর্তা হবার সুবাদে হান্টার সরকারী নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ সহজে দেখতে পেরেছিলেন, ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করাও তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। অসাধারণ ধৈর্য, পরিশ্রমের পরিচয় দেন তিনি, এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা। এর ফলে *The Annals of Rural Bengal* হয়ে ওঠে এমন এক গ্রন্থ, যা ভবিষ্যতে এ-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ রচনা করার ভিত তৈরি করে দেয়। এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। ৩৩ বছর পর বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

মঈনুল আহসান সাবের
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় / ১৩-১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় / ২০-৬৭

ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার সময়কার অবস্থা

পঞ্চম অধ্যায় / ১৭৫-২৩০

পল্লী প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রচেষ্টা : ১৭৬৫—১৭৯০

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

পলাশীর মাঠ থেকে পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে নিম্ন বাংলার সীমান্তে দুটি প্রাচীন রাজ্যের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এই রাজ্য দুটি মধ্য ভারতের উচ্চ মালভূমি ও গঙ্গা নদীর উপত্যকার মধ্যবর্তী এলাকার বরাবর অবস্থিত। এখানকার সমতলভূমি উঁচু, তবে ছোটোখাটো পাহাড়-পর্বত ও উঁচু-নিচু জায়গায়ও আছে। পশ্চিমে একটি বড়ো পাহাড় আছে এবং তার চূড়া পর্যন্ত লতাগুলো ঢাকা। ফুলে-পাতায় পরিপূর্ণ লতাগুলো এমন ঘন ও জমাট হয়ে জন্মায় যে, তাদের চাপে মূল লতাগুলো পর্যন্ত মরে যায়। তারপর এই শুকনো ও সতেজ লতাগুলো পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে, তখন আর তার মধ্য দিয়ে কিছুই ঢুকতে পারে না। এখানে সেখানে যে দু'একটি পাহাড় আছে, সেগুলোকে অনেকটা দুর্গের মতো মনে হয়। কারণ পাহাড়গুলোর চূড়া সরু নয়, সমতল। নদীর উপকূলে লতাগুলো আচ্ছাদিত ছোটো ছোটো খাল থেকে ঘোলাপানির স্রোত নদীতে এসে পড়ে। এখানকার নদীগুলোতে এক মৌসুমে আধ মাইল চওড়া ও কুড়ি ফুট গভীর স্রোত বয়ে যায়, আবার অন্য মৌসুমে বিস্তৃত বালুচরের মাঝখানে পানির ধারা সুতোর মতো সরু হয়ে যায়। সমতল ভূমিতে ঘন জঙ্গল আছে। সেখানে নানা প্রকার বন্যজন্তু বাস করে। জঙ্গলের পাশে কচি ঘাসে পরিপূর্ণ মনোরম চারণভূমিতে ছাগল-গরুর সমাবেশ ঘটে। সমতল ভূমির যতোই পূর্বদিকে যাওয়া যায় ততোই ফলের বাগান, উজ্জ্বল সবুজ ধানের ক্ষেত এবং সমৃদ্ধিশালী গ্রাম চোখে পড়ে। পূর্ব বাংলার জলাভূমির তুলনায় এখানকার মাটি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর হলেও নিচু জমিতে এখানে বছরে দুইবার ফসল ফলে। তাছাড়া পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় অতিরিক্ত পরিশ্রম চাষীর গায়ে লাগে না। জঙ্গল থেকে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণ কাঠ, আঠা ও লাক্ষা। উপত্যকায় উৎপন্ন হয় উৎকৃষ্ট নীল। তুলা, পাট, আখ, সরিষা ও রবিশস্য প্রচুর জন্মে। তুঁতের চাষ থেকে আসে রেশম; এই রেশম একসময় শাহী হারেমের সুন্দরী রমণীদের শোভা বৃদ্ধি করতো। পাহাড়ে রূপার খনি এবং পাহাড়ের ঢালু জমিতে তামার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া নদীর বালিতে ছোটোখাটো সোনার টুকরোও আবিষ্কৃত হয়েছে। আর লোহা ও কয়লার জন্য এ দেশটি তো অনেকদিন থেকেই বিখ্যাত।

এই সুজলা সুফলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে[১] সমৃদ্ধ এলাকায় বছরের পাঁচ মাস কাল আবহাওয়া খুবই মনোরম থাকে। এখানে একসময় ভারতীয় ইতিহাসের একটি অন্যতম প্রাচীন সংঘর্ষ ঘটেছিলো। নিম্ন বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত এই স্থানটি সংস্কৃত সম্প্রদায়ের সীমান্তঘাঁটি হিসেবে পরিগণিত হতো। হিংস্র আদিবাসীদের সঙ্গে আর্য সভ্যতার যে সংঘর্ষ ঘটেছিলো, তারও মূল কেন্দ্র ছিলো এই এলাকাটি। তিন হাজার বছর যাবৎ এই এলাকার অধিবাসীদের সমতল ভূমি ও গঙ্গা উপত্যকার মধ্যবর্তী প্রবেশপথ পাহারা দিতে হয়েছে। এখনো পর্যন্ত তারা সমতল ভূমির বাসিন্দাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সম্ভবত এই কারণেই ইতিহাসের গোড়া থেকে এই রাজ্য দুটির একটি মালভূমি অর্থাৎ কুস্তিগীরদের দেশ এবং অপরটি বীরভূমি অর্থাৎ বীরদের দেশ নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

জাতিগত ইতিহাস

এই এলাকার জাতিগত ইতিহাস মানব সমাজে নিঃসন্দেহে আদরনীয় হতে পারতো; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতীত সম্পর্কে কোনো দলিলই বিদ্যমান নেই। ইংল্যান্ডে প্রত্যেকটি কাউন্টি, এমন কি প্রত্যেকটি প্যারিসেরও নিজস্ব ইতিহাস আছে। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চেয়ে বড়ো আকারের প্রদেশগুলোরও কোনো নিজস্ব ইতিহাস নেই। যে সকল জেলায় বিখ্যাত বিখ্যাত যুদ্ধ হয়েছে, অথবা যে সকল স্থান রাজকীয় অভিযানের পথে পড়েছে, দেশের সাধারণ ইতিহাসে সেই সকল স্থানের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই জগাখিচুড়ি নামগুলো চোখে পরিচিত হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট বর্ণনা ফুরিয়ে যায়। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ভুলে যেতে হয়। স্থানীয় অধিবাসীরাও তাদের নিজের দেশ সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নয়। প্রত্যেক খণ্ড জমির অবশ্য ইতিহাস আছে। গত শতাব্দীতে জমিতে কত ফসল হয়েছে, কতো খাজনা দিতে হয়েছে, কখন জমিটি অন্যের দখলে চলে গিয়েছে, সীমারেখা বা পানি সরবরাহ নিয়ে কবে কোথায় গোলযোগ হয়েছে, প্রভৃতি সমস্ত কিছুই নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সাধারণভাবে জেলার অতীত দিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, বিশিষ্ট লোকজন, পুরোনো শিল্পের পতন ও নতুন শিল্পের প্রসার—অর্থাৎ পল্লীর ইতিহাসে যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তার একটিরও কোনো নাম-নিশানা নেই। ইংল্যান্ডে বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, এখানে তা একেবারেই নেই। উঁচু শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা প্রায় নেই বললেই চলে। ধর্ম ও বর্ণগত পার্থক্যের ফলে সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না এবং ভাবেচ্ছার আদান-প্রদানও সীমাবদ্ধ হয়ে

১. 'পাহাড় ও উপত্যকা, জঙ্গল ও নদী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই দেশটি ভূতত্ত্ববিদ ও সৌন্দর্যবিলাসী উভয়ের কাছেই আকর্ষণীয়। আবহাওয়াও পরিবর্তিত হয় : রাত্রিকাল শীতল ও পরিষ্কার; কলিকাতার স্যাঁতস্যাঁতে জ্বর ও কুয়াশা এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'—দি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, ইন্টস লোকালিটিজ, পৃষ্ঠা ১৮, পুস্তিকা ৮ কলিকাতা। এই একই পর্যটক অতি উৎসাহবশত বীরভূমকে 'বাংলার সুইজারল্যান্ড' বলে অভিহিত করেছেন। এই পুস্তিকার লেখক রেভারেন্ড জেমস লং। পরে তাঁর অন্যান্য পুস্তিকা থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এগুলো প্রথমে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো।

আসে। মেয়েদের এখানে সম্পূর্ণরূপে পর্দার আড়ালে রাখা হয়; ফলে সমাজ বলতে ইউরোপে যা বুঝায়, এখানে তা গড়ে উঠার কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। ইংল্যান্ডের যে কোনো শায়ারের বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে একটি গভীর এলাকাগত ঐক্যবোধ আছে; কিন্তু ভারতের জমিদারদের মধ্যে তেমন কোনো অনুভূতি গড়ে ওঠেনি। এখানে প্রত্যেকটি বিশিষ্ট পরিবার তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ সংরক্ষণ করে থাকে বটে, কিন্তু অন্য কাউকে তা জানতে দেয় না। অদূরদর্শী ধনীদের হয়তো একবারও মনে হয় না যে, তাদের কাছে যা নিতান্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার, একদিন তা ইতিহাসের মর্যাদা পেতে পারে। আত্মম্ভরিতা বা স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে দু'-একজন ছোটোখাটো কোনো দলিল-দস্তাবেজ তৈরি করে থাকলেও, সেগুলো সংগ্রহ করে একত্রিত করার মতো কোনো লোক নেই। ইংল্যান্ডের ইতিহাসের বহু মাল-মসলা বিশিষ্ট লোকদের ব্যক্তিগত দলিল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু ভারতের পল্লী অঞ্চলে বংশের পর বংশ অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং তারপরই স্মৃতির পাতা থেকে সবকিছু মুছে যাচ্ছে।

পল্লী ইতিহাসের বিষয়বস্তু

আমি কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের দলিল-দস্তাবেজ হাতে পেয়েছি। কয়েকজন রাজা আমাকে কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করেছেন; অপর কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারও কিছু কাগজপত্র দিয়েছেন। প্রত্যেকটি জেলার ইতিহাস প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত নিয়োগ করা হয় এবং পল্লী অঞ্চল সফর করে তাদের তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়। কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক লোকগীতি সংগ্রহের ব্যাপারে আমার সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এই অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টার ফলে যে মাল-মসলা সংগ্রহ হয়েছিলো, তা পরিমাণে ছিলো যেমন কম, তেমনি তার উপর নির্ভরও খুব বেশি করা চলতো না; ফলে শেষপর্যন্ত তা আর প্রকাশ করা হয়নি। বছর চারেক আগে জেলা ট্রেজারির দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি একটি পুরোনো ছাপাখানার সন্ধান পাই। তালাগুলোর অবস্থা দেখে আমার মনে হয় বহু বছর যাবৎ সেগুলো খোলা হয়নি। ভিতরে যে কি আছে, সে সম্পর্কে স্থানীয় কর্মচারীরা কেউ কিছু বলতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত তালা ভেঙে দেখা গেল, ভিতরে জেলার পুরানো দলিল-দস্তাবেজ রয়েছে এবং দলিলে বর্ণিত সময় সরাসরি ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার এক বছরের মধ্যে রয়েছে। দলিলগুলো খুবই পুরোনো হওয়ায় প্রায় নষ্ট হয়ে হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছে। হলুদ রঙের পাতাগুলোর চারিদিকে পোকায় খেয়ে ফেলেছে; হাতে নিতে গেলে মলাটের পাতাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। কয়েকটি দলিল পোকায় একেবারেই খেয়ে ফেলেছে; কেবলমাত্র গুঁড়ো মাটির মধ্যে টুকরো কাগজ থাকায় সেগুলোর অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

পূর্বের গবেষণা ও অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, এই কাগজগুলোতে এমন অনেক তথ্য আছে, যা সংরক্ষণ করার উপযোগী। ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার সময়ের অথবা ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকের কোনো নির্ভরযোগ্য

ইতিহাসই আমাদের নেই। প্রাচ্যদেশে ব্রিটিশ জাতির ক্ষমতারোহণ সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু এই সকল বিবরণ ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্র অথবা ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ গভর্নরদের জীবনচরিত-মাত্র—ভারতীয় জনসাধারণের ইতিহাস নয়। যে লক্ষ লক্ষ মূক ভারতবাসী আমাদের জোয়াল বহন করে থাকে, তাদের কথা কোনো ইতিহাসেই[২] লিপিবদ্ধ হয়নি।

একমাত্র জরিপ দফতরের তরফ থেকেই ভারতের পল্লী অঞ্চল সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়েছে এবং এই একটিমাত্র প্রমাণই আমরা আমাদের স্বপক্ষে খাড়া করতে পারি। তবে এই প্রমাণ থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে আমাদের অজ্ঞানতা। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, মূল বাংলাদেশ বলতে প্রধানত তিনটি শহরের চারপাশের এলাকাগুলোকে বুঝায়। তিনটি জাতি পর পর এই তিনটি শহরকে তাদের শাসনের সদর দফতর হিসেবে ব্যবহার করেছে। কলকাতা যে জেলাটির রাজধানী, তার উৎপত্তি ও ইতিহাস মাত্র এক পৃষ্ঠার কিছু বেশি জায়গায় শেষ করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণেরও একটি বিরাট অংশ ব্যয় করা হয়েছে অন্ধকূপ ও তার পরবর্তীকালে হাঙ্গামার দুর্বল বর্ণনায়। মুসলিম গৌরবের প্রাচীন লীলাভূমি মুর্শিদাবাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র আধ পৃষ্ঠায়। মালদহ হিন্দু গৌরবের প্রাণকেন্দ্র; পর পর বহু রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন। এখনো এখানে বিরাট বিরাট প্রাচীর ও তোরণ রয়েছে। এককালের জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ এখন শৃগালের বাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। বিরাট শহরটি এখন জনমানবহীন পরিত্যক্ত প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। অথচ এই স্থানটির এমন একটি বিবরণ দেয়া হয়েছে যে তা পড়লে মনে হবে, এলাকাটি যেন একটি বালুচর মাত্র এবং এই বালুচরও অতি সম্প্রতি নদীতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। মালদার ইতিহাস বর্ণনার জন্য একটিমাত্র পৃষ্ঠাও ব্যয় করা হয়নি।

পল্লী ইতিহাসের অভাব

অথচ এই দলিল এমন এক সময় প্রস্তুত করা হয়েছে, যখন পল্লীর ইতিহাসের প্রচুর নির্ভরযোগ্য মাল-মসলা আমাদের হাতে ছিলো। মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিলো না বটে, কিন্তু অসংখ্য সরকারি নথিপত্রের কোনো অভাব অন্তত ছিলো না। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার প্রধান সরকারি অফিসে ছাপাখানা রয়েছে এবং এই সকল ছাপাখানায় প্রচুর পরিমাণ দলিল-দস্তাবেজ রয়েছে। এই দলিলের মধ্যে চিঠিপত্র, রিপোর্ট, সভা-সমিতির কার্যবিবরণী ও মামলা-মোকদ্দমার নথি রয়েছে। ফলে এই সকল কাগজ থেকে ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে এদেশের একটি দৈনন্দিন ইতিহাস পাওয়া

২ 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এন্ড ইটস লোকালিটিজ' পুস্তিকার লেখক বলেছেন (পৃষ্ঠা ১৬) যে, বীরভূমি 'প্রায় অজানা রয়ে গিয়েছে।' মাত্র দশ বছর আগে এই মন্তব্য এমন একটি জেলা সম্পর্কে করা হয়েছে, কলকাতা থেকে যার দূরত্ব মাত্র একশো মাইল এবং রেলগাড়িতে যেতে মাত্র পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে। দূরবর্তী এলাকাগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে।

যেতে পারে। ঘটনাগুলো যারা স্বচক্ষে দেখেছে, তারা নিজেরাই তার বর্ণনা দিয়েছে এবং এই বিবরণ সরকারি নির্ভুলতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অধিকাংশ দলিলই স্পষ্ট ও শক্তিশালী ভাষায় লেখা, কারণ উত্তেজনা বা বিপদের সময় মানুষ এই ধরনের ভাষাই ব্যবহার করে। নকলনবিশদের ভুল এবং জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা সত্ত্বেও দলিলগুলোতে এমন একটি বাস্তবতার ছাপ আছে, যা সাহিত্যিক ক্ষমতায় সৃষ্টি করা যায় না; লেখকের মন যখন বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে; কেবলমাত্র তখনই এই বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এই পোকায় খাওয়া দলিল-দস্তাবেজ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এতোদিন যাবৎ ভারতীয় ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝে আসছি, তা এমন কতকগুলো ঘটনার সমাবেশ, যার সঙ্গে সমসাময়িক ভারতীয় জনসাধারণের কোনো সম্পর্ক নেই; এমন কি এই সকল ঘটনা সম্পর্কে তারা অবহিতও নয়। এই ইতিহাসের পাতায় গত শতাব্দীর উত্থান-পতন বা ক্রমবিবর্তনের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। এক রাজবংশের পর আর এক রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটেছে, কিন্তু জনসাধারণ তাতে সহানুভূতিও প্রকাশ করেনি, বিস্মিতও হয়নি। বাইরের কোনো বিপদ বা ত্রাসের ফলে পল্লীবাংলার জীবনের স্পন্দন কখনো এতোটুকুও বৃদ্ধি পায়নি। আমরা যা জানি, এই ইতিহাস সে সম্পর্কে নীরব, তবে পাশ্চাত্য জগৎ যে বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ এই ইতিহাসে তার দীর্ঘ ও নিখুঁত বর্ণনা আছে। রাজদণ্ড যখন মুসলমানদের হাত থেকে চলে যায়, সেই সময়কার ভারতের পল্লী অঞ্চলের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনায় দেখা যায়, আমাদের ক্ষমতা গ্রহণের সময় কতিপয় জটিল পরিস্থিতি কিছুদিনের জন্য জনসাধারণের দুর্দশা না কমিয়ে বরং বাড়িয়েই দিয়েছিলো। তাছাড়া যে অনিশ্চয়তা ও ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে আমাদের প্রথম নিশ্চিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিলো, তাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইতর মনোভাব ও সরকারি অযোগ্যতার পাশাপাশি প্রশাসনিক একাগ্রতা ও দক্ষতার কথাও নিরপেক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে এই ইতিহাসে প্রাচ্যদেশে ইংল্যান্ডের মাহাত্ম্যের গোপন কথাই প্রকাশিত হয়েছে। কারণ এখানে দেখানো হয়েছে, অল্প কয়েকজন ইংরেজের একটি দল একটি আধা বিজিত অজানা এলাকা শাসন করতে যাচ্ছে। তাদের সাহসিকতা ও চরিত্রবলের সামনে স্থানীয় জনসাধারণ নতি স্বীকার করেছে। আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের জন্য মারাঠা জাতির ন্যায় শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করেছে বটে, কিন্তু পল্লী অঞ্চলের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, সামরিক সফলতা নয়, বরং বেসামরিক সাহসিকতা ও দৃঢ়সংকল্পই বাংলাদেশে ব্রিটিশ উত্থানের স্থায়ী উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

সরকারি নথিপত্র

একটি নিখুঁত অথচ এযাবৎ অলিখিত ইতিহাসের ভিত্তিভূমি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া ছাড়াও এই দলিলগুলো বর্তমান ভারতের শাসনকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের কাছে কৌতূহলের বিষয় বলে পরিগণিত হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শাসনভার হাতে নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের রীতি-রেওয়াজ অনুসারে শাসন শুরু করেছিলেন এবং

ওয়াদা পূরণের জন্য প্রথম যে কাজটি করেছিলেন, তা হচ্ছে এই রীতি-রেওয়াজ নির্ধারণ করা। এই উদ্দেশ্যে তদন্ত চালানোর জন্য তিরিশ বছর যাবৎ একাধিকবার স্থানীয় অফিসারদের ওপর নির্দেশ জারি করা হয়েছে এবং নির্দেশনামা বন্ধ হওয়ার পর নিছক অভ্যাসবশেই ১৮২০ সাল পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চালু থেকেছে।

পল্লী অঞ্চলের দলিল-দস্তাবেজ থেকে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর যে আমলের ইতিহাস পাওয়া যায়, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই আমলটি ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। পরবর্তীকালে যে স্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হয়েছিলো, তখন তার কাঠামো তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিলো; ফলে অর্থ বিষয়ক কোনো আইন অথবা কোনো জেলার কৃষি-অর্থনীতি বিষয়ক কোনো তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ থেকে বাদ যায়নি। এই সময় যে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়, তাতে জমিদারদের মেয়াদ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক; চাষীদের জোত, তাদের আয়, জীবনযাত্রা, পোশাক ও অবসর সময়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের কাজ; দেশের সকল প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য, বিভিন্ন শ্রেণীর জমির খাজনা; জেলার খনিজ দ্রব্য; কারিগর ও পণ্য প্রস্তুতকারীদের অবস্থা, তাদের মুনাফা ও শুল্ক; দেশীয় মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা; দেশীয় পুলিশ ব্যবস্থা; জেলার জেলখানার অবস্থা এবং শেষত সেস, শুল্ক, পাওনা ও অন্য সকল প্রকার স্বীকৃত বা অস্বীকৃত কর প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়। মোটকথা এই রিপোর্টে সুখ-দুঃখ ও অসংখ্য অনাচার অত্যাচারসহ পল্লীবাংলার সমগ্র জীবনব্যবস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের শেষভাগে রাজস্ব ব্যবস্থায় সর্বাত্মক সংস্কার চালু করা হয়; এবং তারপর থেকে প্রতিবছর নিখুঁত শাসন ব্যবস্থার দাবি চলে আসছে। ফলে এই ধরনের ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের অবকাশ বা আগ্রহ আর সৃষ্টি হয়নি। পূর্ববর্তী অফিসারদের পরিশ্রম পরবর্তীকালের অফিসারদের কাছে উপেক্ষার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ার নিতান্ত কম ক্ষতি করেনি। ফলে আমাদের শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বছরে সুযোগ্য অফিসারগণ যে সকল মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে তার অধিকাংশই পোকার খোরাকে পরিণত হয়েছে। অথচ এই সকল তথ্য ভারতের পল্লী অঞ্চলের জন্য একটি সুষ্ঠু আইন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলেই তারা আশা করেছিলেন।

এই পুস্তকের উপাদান

কি পরিমাণ তথ্য যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তা বোধ হয় আর কোনোদিনই নির্ণয় করা যাবে না। যেগুলোর অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে, একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাতেই তা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। উচ্চতর শিক্ষা-সংস্কৃতিবান জাতির জাতীয় ইতিহাস লেখার দায়িত্ব সম্ভবত বেসরকারি প্রচেষ্টার ওপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে; কিন্তু আধুনিক ভারতে এই ধরনের দায়িত্ব বহণের উপযুক্ত কোনো শিক্ষিত ও অবকাশপ্রাপ্ত শ্রেণী এখনও গড়ে ওঠেনি।[৩] যে সমাজ পুরোপুরিভাবে সভ্য হয়ে ওঠেনি, সেখানে এখন

---

৩ ডা. বুকানন হ্যামিলটনকে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর সংখ্যাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক জরিপকার্যে নিযুক্ত ছিলেন (১৮০৭-১৮১৪), কিন্তু তিনি সব বিষয়ে এদেশের কোনও একক ঐতিহাসিক

অনেক কাজই সরকারকে করতে হয়, যে সকল কাজ সভ্য সমাজে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর সহজেই ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। ভারতে চাকরি করার দৈনন্দিন পরিশ্রমের মধ্যে ইউরোপের পাঠাগারসমূহ থেকে আট হাজার মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে বসে লেখা এই পুস্তকের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে লেখক সম্পূর্ণরূপে সচেতন রয়েছেন। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে বহু দোষ-ত্রুটির আবির্ভাব হয়েছে বটে, তবে লেখক এমন কয়েকটি বিষয়ে হাত দিতে সক্ষম হয়েছেন, ইতিপূর্বে যা কখনও স্পর্শমাত্রও করা হয়নি। লন্ডন, কলকাতা ও বাংলাদেশের প্রাদেশিক অফিসসমূহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলো এইবারই সর্বপ্রথম মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং এ সকল দলিলের তথ্য একটি সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলার ইতিহাস সংগ্রহের জন্য এদেশের শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ করা হয়েছে এবং ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাসে এইবারই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের প্রাচীন বংশের প্রধান ব্যক্তিদের তাদের দলিল-দস্তাবেজের ঘর খুলে দিতে রাজি করানো হয়েছে। এপিসকোপাল ব্যাপটিস্ট ও আমেরিকান ডিসেন্টার মিশনারিগণ বহু দূরবর্তী এলাকার উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণের ভাষা ও রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমি যাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাদের মধ্যে একটিমাত্র শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা অশোভন না হলে আমি এই সকল সম্মানিত ও শিক্ষিত লোকদেরই বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতাম।

এই প্রাথমিক পুস্তকের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, লেখক বিশ্বাস করেন যে, এই পুস্তকখানি অসংখ্য মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের পথ প্রশস্ত করে দেবে এবং তার ভিত্তিতে একখানি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচিত হতে পারবে। তাছাড়া এই সকল তথ্য ভারত সরকারকে এতদিন যাবৎ অবহেলিত দুটি উল্লেখযোগ্য কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করবে। প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের নিজস্ব জাতির প্রতি বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের স্মৃতি রক্ষা করা এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য জাতির প্রতি—পাশ্চাত্য জগতের নিকট ভারতের পল্লী অঞ্চলের অবস্থা বিশ্লেষণ করা।[৪]

দলিল বা প্রাচীন দ্রব্যের সংগ্রহ খুঁজে পাননি।—ইস্ট ইন্ডিয়া হাউসে আর. মন্টগোমারি মার্টিন কর্তৃক ডা. বুকাননের পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত 'দি হিস্ট্রি, এন্টিকুইটিস এটসেটরা অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' ৩ খণ্ড, ১৮৩৮, ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা। মাত্র কয়েকটি জেলার ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকলে এই পুস্তক থেকে পল্লীবাংলার ইতিহাস রচনার জন্য প্রচুর মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেত।

৪. পল্লীবাংলার অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলা সরকার কিছুদিনের জন্য আমাকে অন্যান্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এই সময়েই আমি এই পুস্তক রচনার অধিকাংশ তথ্য-রসদ সংগ্রহ করি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গবেষণার আয়োজন শেষ হওয়ার আগেই ১৮৬৫-৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায় এবং সকল অফিসারকেই দুর্ভিক্ষ নিবারণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার সময়কার অবস্থা

বংশানুক্রমিক দলপতি

১৭৮৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্রিটিশ সরকার নিম্ন বাংলার দুটি বৃহৎ সীমান্ত রাজ্যের সরাসরি শাসনভার গ্রহণ করেন। এই রাজ্য দুটির কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিলো না। তাছাড়া নদী, খাল-বিল ও দুর্ভেদ্য জঙ্গল রাজ্য দুটিকে সদর দফতর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলো। প্রাচীনকাল থেকে রাজ্য দুটি বংশানুক্রমিক রাজাদের শাসনাধীন ছিলো। ব্রিটিশ সরকার এই সময় পর্যন্ত এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে বংশানুক্রমিক রাজাদের[১] শাসনকার্য চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই সকল রাজাদের অবস্থা বহুলাংশে সামন্তবাদী আমলের ওয়ার্ডেনদের অনুরূপ ছিলো। তারা অংশত আধা স্বাধীন রাজা হিসেবে এবং অংশত বাংলার ভাইসরয়ের সঙ্গে সম্পাদিত সামরিক চুক্তি অনুসারে রাজ্যশাসন করতেন। ভাইসরয়কে তারা সামান্য কিছু নজরানা দিতেন এবং পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার জন্য দায়ী থাকতেন। কিন্তু ১৭৮৭ সালের পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছরে তাদের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়। উত্তরাঞ্চলের বীরভূমে একটি ব্যর্থ বিদ্রোহের ফলে জনসাধারণের দুর্দশা দ্বিগুণ বেড়ে যায় এবং একটি মারাত্মক রোগের ফলে পর পর কয়েকজন রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করতে অক্ষম হন। দক্ষিণাঞ্চলের মালভূমির (বর্তমানে বিষ্ণুপুর নামে অভিহিত) অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে।[২] পারিবারিক কলহের ফলে সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পক্ক কেশ দুর্বল চরিত্র ক্ষমতাসীন রাজা দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হন। দুটি জেলার কোনোটির রাজাই আর জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম ছিলেন না। সীমান্ত এলাকার যেখান থেকে পাহাড়গুলো ঢালু হয়ে গঙ্গা উপত্যকায় নেমে এসেছে, সেখানে দস্যুদলের ব্যাপক সমাবেশ হতে লাগল এবং ১৭৮৪ সালে অবস্থা এমন গুরুতর আকার ধারণ করলো যে ব্রিটিশ শক্তির হস্তক্ষেপ প্রায়

১. ১৭৬৯ সালে বীরভূমকে সামগ্রিকভাবে তত্ত্বাবধানের অধীনে আনা হয়। ১৭৭২ সালে সার্কিট কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যটি সফর করেন, তবে স্থানীয় শাসনকার্য আমিল হিসেবে রাজার উপরই ন্যস্ত থাকে।—কনসালটেশনস অব দি রেভিনিউ কাউন্সিল অব মুর্শিদাবাদ, ২৩শে অক্টোবর, ১৭৭০, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৭৭১, ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস; ক্যাম্বিজ বুক অব দি প্রিন্সেস অব বীরভূম, বীরভূম ডোমেস্টিক আর্টিক্স।

২. বিষ্ণুপুর বর্তমানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।

অপরিহার্য হয়ে পড়লো।[৩] ১৭৮৫ সালের মে মাসে বীরভূমের সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলার কালেক্টর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র দস্যুবাহিনীর মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। তিনি চার শ' দস্যুর একটি দলকে পরাভূত করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণের আবেদন জানান।[৪] এক মাস পরে দস্যুদের সংখ্যা প্রায় এক হাজারে পরিণত হয় এবং তারা সংঘবদ্ধভাবে নিম্নভূমিতে হামলা করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।[৫] পরের বছর দস্যুদল বীরভূমে পাকাপাকিভাবে আস্তানা গেড়ে বসে এবং কয়েকটি জায়গায় তারা স্থায়ী ছাউনি স্থাপন করে। রাজার পক্ষে এই সময় যুদ্ধে অবতরণ করা তো দূরের কথা, সিংহাসনে বসে থাকাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। সরকারি রাজস্ব মালখানায় নিয়ে যাওয়ার পথে লুঠ হয়ে যেতো।[৬] কোম্পানির সওদাগরী কার্যকলাপ এই সময় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। পুরোনো ব্যবস্থা যে আর বেশি দিন চলতে পারে না, তা এই সময় বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে দস্যুদলের বিরুদ্ধে রাজাকে সমর্থন করার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে একজন বেসামরিক ব্রিটিশ অফিসারকে বীরভূমে পাঠানো হয়। তিনি কৃষকদের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করবেন বলেও নির্দেশ দেয়া হয়। সামরিক ব্যয়ভার থেকে রেহাই দিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীনে আনা হলে বীরভূম থেকে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতে পারে, তা নির্ধারণ করার জন্যও তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়।[৭]

পুরোনো ব্যবস্থার ভাঙন

এই ভদ্রলোকের কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো দলিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি সরকারি কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয় না। তিনি যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন বলেও মনে হয় না। ১৭৮৭ সালে বাংলাদেশের বিভাগগুলোর পুনর্গঠনের সময় লর্ড কর্নওয়ালিশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোনো সাময়িক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না; মুর্শিদাবাদের আশ্রিত জেলা হিসেবে পরিচালনা করা হলে বীরভূমকে কখনোই পাহাড়ি দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।[৮] দক্ষিণাঞ্চলের বিষ্ণুপুর জেলার অবস্থা আগেই এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো যে, সেখানে একজন দায়িত্বশীল সরকারি প্রতিনিধির উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো। ফলে লর্ড কর্নওয়ালিশ সীমান্ত এলাকার এই দুটি জেলাকে একত্রিত করে

---

৩. মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট এডওয়ার্ড অটো আইভ্স এক্তোয়ার কর্তৃক গভর্নর ও রেভিনিউ কাউন্সিলের সদস্যদের নিকট লিখিত পত্র, ১৫ই আগস্ট, ১৭৮৪; বীরভূম জুডিসিয়াল রেকর্ডস।
৪. মুর্শিদাবাদ কালেক্টরের চিঠি, ২৬শে মে, ১৭৮৫।
৫. মুর্শিদাবাদ কালেক্টরের চিঠি, ৩০শে জুন, ১৭৮৫।
৬. বহু কারখানা এই সময় একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।
৭. বিবিধ প্রসঙ্গ : কমিটি অব রেভিনিউ, কোর্ট উইলিয়াম। মি. জি.আ. ফোলে-কে বীরভূম পাঠানোর বিষয়টি ১৭৮৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি অনুমোদন লাভ করে। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।
৮. রেভিনিউ বোর্ড রেকর্ডস। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

ব্রিটিশ শাসনাধীন একটিমাত্র জেলায় পরিণত করার বিষয় স্থির করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৭৮৭ সালের ২৯শে মার্চের ক্যালকাটা গেজেটে নিম্নলিখিত নিয়োগ ঘোষণা করা হয় : 'ডব্লু. পাই এস্কোয়ারকে বীরভূম ছাড়াও বিষ্ণুপুর জেলার কালেক্টর হিসাবে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হইল; জি. আর. ফোলে এতদিন বীরভূম জেলার শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।'[৯] যে সকল দস্যু বিষ্ণুপুরের কয়েকটি শহরে হামলা করেছিলো তাদের তাড়িয়ে দেয়ার সময় ছাড়া মি. পাই আর কখনও বীরভূম সফরে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। তাঁর নিয়োগের বিষয় প্রকাশিত হওয়ার তিন সপ্তাহ পরই তিনি তাঁর জেলা ছেড়ে বাংলাদেশের একটি দূরবর্তী অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন।[১০] তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন মি. শেরবার্ন। মি. শেরবার্নের ইতিহাস ও দুর্ভাগ্যের কথা আমরা পরে বর্ণনা করবো।[১১] তাঁর এক বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনকালে সংযুক্ত জেলার রাজধানী অজয় নদীর দক্ষিণে অবস্থিত বিষ্ণুপুর থেকে নদীর উত্তরে বীরভূমের বর্তমান সদর দফতর সুরীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, দস্যুদের সবচেয়ে বড়ো দলটিকে কাবু করে ফেলা হয় এবং রাজা দু'জনকে ক্রমে ক্রমে সাধারণ নাগরিকে পরিণত করা হয়। সম্প্রতি দখল করা একটি সীমান্ত এলাকার গভর্নরের পক্ষে যেমন করা উচিত, মি. শেরবার্ন ঠিক তেমনি কঠোরভাবে শাসন পরিচালনা করতেন এবং প্রাচীন লোকদের মুখে এখনও তাঁর নাম শুনা যায়। তখনকার দিনে অবশ্য একজন উৎসাহী লোককে জেলার প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করার একমাত্র সুফল ছিলো এই যে, দস্যুদলকে দূরবর্তী এলাকায় তাড়িয়ে দেয়া সহজ হতো। ১৭৮৮ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, দস্যুদল অজয় নদীর দক্ষিণে বীরভূম ট্রেজারির একটি দলের ওপর হামলা করে সশস্ত্র প্রহরীদের কাবু করে ফেলে, পাঁচজনকে খুন করে এবং তিন হাজার পাউন্ডেরও বেশি মূল্যের রূপা লুণ্ঠন করে পালিয়ে যায়।[১২]

---

৯. দি ক্যালকাটা গেজেট অর ওরিয়েন্টাল এডভার্টাইজার; সাপ্তাহিক পত্রিকা, সরকারের বিশেষ নির্দেশ সংবলিত এক্সট্রাঅর্ডিনারি গেজেট ও অন্যান্য সংবাদসহ প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতো। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এর একটি মোটামুটিভাবে পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ আছে; ১৮০২ হতে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত সময়ের সংখ্যাগুলো বাদে ১৭৮৪ থেকে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত সময়ের পত্রিকাগুলো পাওয়া গিয়েছে। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য ও বেঙ্গল সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মি. ডব্লু. এস. সিটনকার ভারতে এই পত্রিকার একটি অসম্পূর্ণ সংগ্রহ থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে দুই খণ্ড পুস্তক সংকলন করেন। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

১০. ১৭৮৬ সালের ২৫শে এপ্রিল বিষ্ণুপুরকে মি. পাইয়ের পরিচালনাধীন করা হয় এবং ১৭৮৭ সালের ১৯শে এপ্রিল তিনি সংযুক্ত জেলা ত্যাগ করেন। পদোন্নতির খবর পাওয়ায় তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির আগমনের অপেক্ষা না করে তাঁর সহকারীর কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান। অফিস মেমো বুক, বোর্ড অব রেভিনিউ, ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

১১. মি. শেরবার্ন ১৭৮৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল নিযুক্ত হন, ২১শে এপ্রিল দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ সালের ওরা মভেম্বর দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। বোর্ড অব রেভিনিউ রেকর্ডস, ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

১২. ৩০,০০০ টাকা। ১৭৮৮ সালের ১৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারের ক্যালকাটা গেজেট। বর্ধমান জেলার যনিরামপুর থানার অন্তর্গত এলাকায় এই হামলা করা হয়।

নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন

১৭৮৮ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে দুর্নীতির সন্দেহে মি. শেরবার্নকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং কিছুদিন পর মি. ক্রিস্টোফার কিটিং সংযুক্ত জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১০] মি. কিটিং জেলার শাসনব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে বলে দেখতে পান। লর্ড কর্নওয়ালিশ তাঁর শাসনের প্রথম চার বছর যাবৎ যে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন, সুচারুরূপে কাজ সম্পন্ন হওয়াই ছিল তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মি. শেরবার্নের শাসনের আঠারো মাস সময়ের মধ্যে এই সীমান্ত রাজ্য দুটি করদ রাজ্য থেকে ব্রিটিশ শাসনাধীন নিয়মিত জেলায় পরিণত হয়। একজন কালেক্টর কয়েকজন সহকারীর সহায়তায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং কোম্পানির সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সেনাবাহিনীর তখন সুসজ্জিত অস্ত্রাগার ছিল; ফলে দস্যুদলকে পরাভূত করা তাদের পক্ষে অনেক সহজ ছিলো। ইতিমধ্যে একটি সামরিক রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিলো এবং সরকারের সদর দফতর কলকাতার সঙ্গে দৈনন্দিন সংযোগ বজায় রাখা সম্ভব হয়ে উঠেছিলো। এই সময় থেকে স্থানীয় নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ১৭৮৬ সালে জেলাটি যখন রাজার শাসনাধীনে ছিলো, তখন থেকে শুরু করে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য কোনো বিধিবদ্ধ দলিল না পাওয়া গেলেও একটি বিষয় সঠিকভাবে জানা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে রাজাদের অবস্থা ও শাসনব্যবস্থার প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধিত হলেও জনসাধারণের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। বীরভূম ও বিষ্ণুপুর জেলার অধিবাসীদের সংখ্যা, আচরণ, দুর্দশা ও সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৭৮৭ সালের নভেম্বর মাসেও ঠিক সেই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। যে সুযোগ-সুবিধে বা দুঃখ-দুর্দশা তারা ভোগ করতো, তা স্থানীয় রাজারাই সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজদের এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা ছিলো না। ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার সময় অন্যান্য আধা-স্বাধীন রাজ্যের জনসাধারণের অবস্থাও ঠিক একই রকমের ছিলো বলে অনায়াসে ধরে নেয়া যেতে পারে। পুরোনো জিনিসের প্রতি সাধারণত সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় বলে এবং দীর্ঘদিন পর বিশ্বের অপর প্রান্ত থেকে বিচার করা হয়েছে বলে জনসাধারণের এই অবস্থাকে ব্রিটিশ গভর্নরদের শাসনাধীন অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সুখী ও আনন্দময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কথা চিন্তা করে প্রত্যক্ষদর্শিগণ পল্লী অঞ্চলের যে সকল নথিপত্র লিখে গিয়েছেন, তা ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখা হলে এই বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা সহজ হবে।

১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষ

১৭৬৯ সালের শীতকালে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এই দুর্ভিক্ষে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, পরবর্তী দুই পুরুষকালেও তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়নি। যে সকল

---

১০. মি. কিটিং ১৭৮৮ সালের ২৯শে অক্টোবর নিযুক্ত হন, ১৪ই নভেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ শাসন পরিচালনার পর ১৭৯৩ সালের ৬ই আগস্ট তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করে জেলা ত্যাগ করেন। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ভারতের ইতিহাস লিখেছেন, তারা প্রধানত কোম্পানির উত্থান-পতন ও সামরিক বিজয়ের মধ্যেই তাদের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যে বিষয়বস্তুর মধ্যে যুদ্ধ বা পার্লামেন্টের বিতর্কের কথা নেই, সে সম্পর্কে তারা খুব কম উৎসাহ দেখিয়েছেন। নিখুঁত ও বিস্তারিত বর্ণনার জন্য সুপরিচিত হলেও মিল দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে মাত্র পাঁচ লাইন ব্যয় করেছেন,[১৪] এবং সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষ কমিশনারগণ এ ব্যাপারে কোনো বিস্তারিত বিবরণ দিতে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন।[১৫] এই দূরত্ব থেকে আমাদের শাসনের প্রান্তসীমার এই বিপর্যয়কে অস্পষ্ট বলে মনে হলেও সমসাময়িক স্থানীয় দলিল-দস্তাবেজে তার আশ্চর্যজনক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বাংলাদেশের পরবর্তী চল্লিশ বছরের ইতিহাসের মর্মকথা এখানেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইংরেজ বিজেতাগণ নিম্ন অববাহিকার সর্বত্র যে পরিত্যক্ত ভূমি দেখেছিলেন, এখানে তা নতুন আলোকে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। পুরোনো রীতিনীতি সহসা অচল হয়ে পড়ায় একটি প্রাচীন পল্লীসমাজে যে দুর্দশা দেখা দিয়েছিলো, এই দলিল-দস্তাবেজে তার বিবরণ রয়েছে; তাছাড়া একটি খণ্ড-ছিন্ন ব্যবস্থার মধ্য থেকে কেমনভাবে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো, তার ব্যাখ্যাও এখানে পাওয়া যায়।[১৬]

১৭৬৯ সালের ফসল

নিম্নবঙ্গে বছরে তিনবার ফসল কাটা হয়; বসন্তকালে রবিশস্যের অপেক্ষাকৃত কম ফসল; শরৎকালে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ধানের ফসল; এবং ডিসেম্বরে বছরের সেরা ফসল ধান। ১৭৬৮ সালে আংশিকভাবে ফসল বিনষ্ট হওয়ায় ১৭৬৯ সালের প্রথম দিকে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়।[১৭] তবে এই অভাব-অনটনের ফলে সরকারের আদায়কৃত

---

১৪. তৃতীয় খণ্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা, ১৮৬০।

১৫. '১৭৭০ সালের ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আমরা এখনও কোনো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি।'—মহারানীর নির্দেশক্রমে পার্লামেন্টে দাখিলকৃত বাংলা ও উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত দলিলপত্র (১৮৬৬)। প্রথম খণ্ড ২২৮ পৃষ্ঠা; পরে অবশ্য (৩৪৫ পৃষ্ঠা) কিছু তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

১৬. এই অধ্যায় লেখার জন্য পরে উদ্ধৃত সরকারি নথিপত্র ছাড়াও আমি নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলির সাহায্য নিয়েছি; এইগুলির মধ্যে কয়েকখানিকে আমি অপূর্ব বলে মনে করি : 'এ ন্যারেটিভ অব হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন বেঙ্গল ইন ১৭৬০', টাইটেল-পেজ নাই। 'মেমোয়ারস অব দি রিভলিউশনস ইন বেঙ্গল,' ১৭৬০। 'লর্ড ক্লাইভ'স লেটার টু দি প্রোপ্রাইটর্স অব দি ইস্ট ইন্ডিয়া স্টক,' ১৭৬৪। 'চেঞ্জার্স এটসেট্রা ফ্রম দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'স বিল্ডিং সেয়ারওনারশিপস', ১৭৬৮। 'অরিজিনাল পেপার্স রিলেটিভ টু দি ডিস্টারবেন্সেস ইন বেঙ্গল ফ্রম ১৭৫৯ টু ১৭৬৪' (একটি অতিশয় মূল্যবান সংগ্রহ), ১৭৭৬। 'লেটার ফ্রম জি ডডওয়েল, এস্কোয়ার টু দি প্রোপ্রাইটর্স', ১৭৭৭। 'টু চীটস আপন দি কোম্পানি'স বিল্ডিং সেয়ার ওনারশিপিং, ১৭৭৮। 'কনসিডারেশন অন দি ইস্ট ইন্ডিয়া বিল নাউ ডিপেনডিং ইন পার্লামেন্ট', ১৭৭৯। ১৭৮০ সালের পর বাংলা সম্পর্কিত পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা এমনভাবে বেড়ে গিয়েছে যে, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুষ্কর। ১৩০ খানিরও বেশি পুস্তিকা ও প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উত্তর পাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জির সংগ্রহ এবং ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

১৭. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, তারিখ, ফোর্ট উইলিয়াম, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯। সিলেক্ট কমিটির কার্যবিবরণ; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৯, প্রভৃতি, ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

খাজনার পরিমাণ তেমন হ্রাস পায়নি। স্থানীয় অফিসারদের অভিযোগ-আপত্তি সত্ত্বেও সদর দফতরের কর্তৃপক্ষ জানান যে, কড়াকড়িভাবে খাজনা আদায় করা হয়েছে,[১৮] এবং ১৭৬৯ সালে যে বৃষ্টি হয়, তা উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে খুব কম হলেও মোটামুটিভাবে শুভসূচনা এনে দেয়।[১৯] বদ্বীপ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত এতো বেশি হয় যে, প্লাবনের ফলে কিছু ক্ষয়ক্ষতিও হয়; এবং পরের বছর সাধারণ দুর্ভিক্ষের সময় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা থেকে কোনো অভিযোগ শুনা যায়নি।[১৯ক] দাম বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর মাসে যে ফসল কাটা হয়েছিলো তার পরিমাণ এতো বেশি ছিলো যে, বেঙ্গল কাউন্সিল মাদ্রাজে[২০] খাদ্যশস্য সরবরাহ করার ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু এই মাসে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো বলে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়েছিলো। বিষ্ণুপুরে দেশীয় সুপারিনটেনডেন্ট পরে এ সম্পর্কে লিখেছিলেন : ধানের ক্ষেত শুকনো খড়ের ক্ষেতে পরিণত হয়েছিলো। স্থানীয় কর্মচারিগণ তাদের চিঠিপত্র ও রিপোর্টে আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, কিন্তু গভর্নর এই বিপদাশংকার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাননি। ১৭৬৯ সালে একবার মাত্র কোর্ট অব ডিরেক্টরকে আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা জানানো হয়; কিন্তু এই চিঠিখানাও প্রেসিডেন্ট মি. ভেরেস্ট সই করেননি। সই করেছিলেন কাউন্সিলের দ্বিতীয় ব্যক্তি মি. জন কার্টিয়ার। পরে মি. কার্টিয়ার মি. ভেরেস্টের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।[২১] ফসল ভালোই হোক আর মন্দই হোক, সৈন্যদের জন্য রসদ সংগ্রহ করে রাখা সরকার প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় ছিলো; কিন্তু মি. কার্টিয়ার এইবার এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বছরের সর্বশেষ ফসল কাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মি. ভেরেস্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত না করেই ২৪শে ডিসেম্বর কার্যভার ত্যাগ করেন।[২২]

---

১৮. 'ইতিপূর্বে আর কখনও এতো বেশি খাজনা আদায় করা হয়নি'—রেসিডেন্ট এট দি দরবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৯; ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

১৯. ১৭৬৯ সালের ১৬ই আগস্টের আলোচনায় চীফ অব বাহার মিঃ রামবোল্ডের উক্তি।

১৯ক. ১৭৭০ সালের ৩০শে মার্চ রেসিডেন্ট এট দি দরবার মি. বেচারের অভিমত; ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

২০. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯। পাবলিক কনসালটেশন, ৭ই আগস্ট, ১৭৬৯।

২১. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র; ২৩শে নভেম্বর, ১৭৬৮; ৮, ৯ ও ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ। মি. ভেরেস্ট সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই দস্তখত করেননি; কারণ তিনি সভায় যোগদান করেছিলেন, এবং একই তারিখের আর একখানি চিঠিতে দস্তখত করেছিলেন। ২৫শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বরের দুইখানি পত্রে রাজস্ব কমে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিলো, বাংলাদেশে সম্ভাব্য সাধারণ দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়নি।

২২. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট লিখিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র; ২৬শে ডিসেম্বর, ১৭৬৮। ধ-তফসিলে মূল দলিল থেকে গৃহীত ১৭৭০ সালের মহা দুর্ভিক্ষের সরকারি বিবরণ পাওয়া যাবে। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে স্থানীয় অফিসারদের আশঙ্কা এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও গৃহীত তথ্যাবলীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মি. কাটিয়ার ঐ দিনই প্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; কিন্তু ১৭৭০ সালের জানুয়ারি মাসের আগে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আর কিছু জানিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। এই মাসের চতুর্থ সপ্তাহে তিনি লেখেন যে, একটি জেলার অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে, সেখানকার খাজনা কিছু পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।[২৩] কিন্তু দশ দিন পরই তিনি আবার কোর্ট অব ডিরেক্টরকে জানান যে, অবস্থা শোচনীয় হলেও কাউন্সিল 'এখনও রাজস্ব বা নির্ধারিত পরিমাণ আদায় কম হয়েছে বলে দেখতে পাননি।'[২৪]

১৭৭০ সালের বসন্ত

বসন্তকালীন ফসল অপেক্ষাকৃত ভালো হওয়ায় এই সময় নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিলো; কারণ এই ফসলের সাহায্যে স্বল্পাকারে হলেও দ্রুত দুর্দশা মোচনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিলো। তাছাড়া আরও খবর পাওয়া গিয়েছিলো যে, প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে গঙ্গা নদীর উভয় তীরে প্রচুর পরিমাণে যব ও গম উৎপন্ন হয়েছে।[২৫] জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত ছিলো না। কিন্তু এই দুর্দশার প্রকৃতি যে কিরূপ ভয়াবহ ছিলো, কেন্দ্রীয় সরকার তা এখনকার মতো তখনও যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। পরে অবশ্য তারা উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকে আশঙ্কাজনক রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কাউন্সিল বিষয়টিকে প্রধানত রাজস্ব সম্পর্কিত বলে মনে করতেন। কাউন্সিল এই সময় এমন কথাও বলেছিলেন যে, সরকারের কাছ থেকে সর্বাধিক আশা করা যেতে পারে যে, ফসল খারাপ হওয়ার ফলে যে-সকল কৃষক প্রচলিত হারে খাজনা দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, সরকার তাদের সম্পর্কে একটি উদার নীতি অনুসরণ করেন।[২৬] ফসল খারাপ হওয়ার ফলে সাময়িকভাবে খাজনা হ্রাস করা তখন একটি সাধারণ ব্যাপার ছিলো; কিন্তু ১৭৬৯-৭০ সালে খাজনা হ্রাস ও মওকুফ করার প্রস্তাব ক্রমাগত করা হলেও অতি অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই তা মঞ্জুর করা হয়েছিলো। জনসাধারণকে সাহায্যদানের জন্য নানাবিধ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিলো বটে, কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশই কার্যকরী করা হয়নি। স্থানীয়ভাবে এ ব্যাপার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিলো, তা দুঃখজনকভাবে

---

২৩. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট লিখিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ২৫শে জানুয়ারি, ১৭৭০, ৫৮ নম্বর অনুচ্ছেদ। খাজনার প্রস্তাবিত হ্রাসের পরিমাণ ছিলো ৩০ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং; ১৭৮৭ সালে মোট খাজনার পরিমাণ ছিলো ৪ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং। (এক পাউন্ড স্টার্লিং বর্তমানে ১৩ টাকার কিছু বেশি) কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত গভর্নর জেনারেলের পত্র, ৩১শে জুলাই, ১৭৮৭। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

২৪. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট লিখিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০। ৪, ৫ ও ৬-এর অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

২৫. ১৭৭০ সালের ৯ই জুনের আলোচনা। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

২৬. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০, ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

অপর্যাপ্ত ছিলো। এপ্রিল মাসে যে বসন্তকালীন ফসল কাটা হয়েছিলো, তার পরিমাণ ছিলো খুবই কম এবং মুসলমান অর্থ-উজিরের পরামর্শক্রমে কাউন্সিল পরবর্তী বছরের জন্য শতকরা দশভাগ খাজনা বাড়িয়ে দেন।[২৭]

জনসাধারণের দুর্দশা এতো দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিলো যে, তার ফলে সরকারের সমস্ত হিসেব ও অনুমান ভণ্ডুল হয়ে যায়।[২৮] দুঃখ-দুর্দশায় নীরবতা অবলম্বন করা বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই নীরবতাও একদিন ভেঙে গেল এবং মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের নিদ্রা যখন ভঙ্গ হলো, তখন তারা চারদিকে ব্যাপক ও প্রতিকারের অযোগ্য দুর্ভিক্ষ ও অনশন দেখতে পেলেন। সরকারিভাবে এই সময় উল্লেখ করা হয়, 'মৃত্যুর হার ও ভিক্ষুকের সংখ্যা সকল বর্ণনার ঊর্ধ্বে; এককালে সমৃদ্ধ পূর্ণিয়া প্রদেশে তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশি লোক মারা গিয়েছে এবং অন্যান্য স্থানেও একই ধরনের মর্মান্তিক অবস্থা বিরাজ করছে।'[২৯]

বাঙালির মৌনতা

এই ব্যাপক বিপর্যয়ের প্রকৃত প্রকৃতি উপলব্ধি করার ব্যাপারে সরকারি অক্ষমতার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে এই যে, স্থানীয় শাসনভার[৩০] তখনও পূর্ববর্তী দেশীয় কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত ছিলো। একজন মুসলমান উজির[৩১] সমগ্র অভ্যন্তরীণ শাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন; পল্লী অঞ্চলে দেশী বিচারকরাই বিচার করতেন; এবং দেশী কর্মচারীরাই পুলিশের কার্য সম্পাদন করতেন। রাজস্ব আদায়কারীরা স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলেন বলে জমি দেখেই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বলে দিতে পারতেন। এই সকল কর্মচারী প্রায় সকলেই দেশের অবস্থা ও শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে অবহিত ছিলেন বলে উৎপন্ন ফসল ও চাহিদার গড়পড়তা পরিমাণ এমন নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারতেন, যা কোনো কঠোর পরিশ্রমী ইংরেজ কর্মচারীর পক্ষেও সম্ভব হতো না। তাদের মধ্যে অবশ্য দুরবস্থার কথা বাড়িয়ে বলার প্রবণতা ছিলো; কারণ দুরবস্থা বেড়ে গেলে খাজনা আদায়ের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যাবে। প্রত্যেকটি আলোচনাই জনসাধারণের দুরবস্থা সম্পর্কে তাদের আশঙ্কা ও অতিরঞ্জিত বিবরণে পরিপূর্ণ; কিন্তু পরবর্তী শীতকালে কাউন্সিলের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো বলে মনে হয় না যে, বিষয়টি রাজস্বের চেয়ে মহামারীর দিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ভুল ধারণা অভাবিত হলেও এর পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিলো। ইতিহাসের গুরু

---

২৭. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭০। ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ। ১০ই এপ্রিল থেকে আর্থিক বছর শুরু হতো। দুর্ভিক্ষের বছরে রাজস্বের পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার ২ শত ৬৯ পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৫ শত ৬৭ পাউন্ড করা হয়। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

২৮. বসন্তকালীন ফসলে ঘাটতি দেখা দিয়েছিলো। কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ৯ই মে, ১৭৭০। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

২৯. উক্ত পত্রের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ।

৩০. ১৭৭২ সালের আগে কোম্পানি বাংলাদেশের বেসামরিক শাসনভার গ্রহণ করেনি।

৩১. সুবিখ্যাত মোহাম্মদ রেজা খান।

থেকেই নিম্নবঙ্গের অধিবাসিগণ এমন সংযত বাক্‌, আত্মতুষ্ট ও বিদেশী পর্যবেক্ষণের প্রতি সন্দেহপরায়ণ যে, একই ধরনের অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। তাদের এই আচরণের কারণ পরে ব্যাখ্যা করা হবে; তবে যারা জনসাধারণের অতীত অভিজ্ঞতা বা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত আছেন, তাদের কাছে এই আচরণের প্রতিক্রিয়া অজ্ঞাত নয়। স্থানীয় কর্মচারিগণ আশঙ্কাপূর্ণ রিপোর্ট লিখেছেন বটে, কিন্তু সর্বত্র যে দৃশ্যমান নীরবতা বিরাজ করেছে তা রিপোর্টগুলোর বিরুদ্ধেই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। দুঃখ-দুর্দশার বাহ্যিক ও অনুভবযোগ্য প্রমাণ প্রায়ই পাওয়া যায়নি; এবং এমন কি ১৭৭০ সালের মতো এই ধরনের প্রমাণ যখন অসংখ্য পাওয়া গিয়েছে, তখনও বিপরীত প্রমাণের অভাব ঘটেনি। বাঙালি এমন ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের মধ্যে জীবনযাপন করে যে, দুর্ঘটনা বা সুযোগ-সুবিধা তাতে কাঁপন সৃষ্টি করতে পারে না। সে নীরবে ধনবান হয়, অথবা বিনা অভিযোগে দরিদ্র হয়ে যায়। তার প্রকৃতির ভাবপ্রবণ দিকটি কঠোর বিধিনিষেধে আবদ্ধ; তার ক্ষোভ অসীম, কিন্তু অকথিত; তার কৃতজ্ঞতা বংশ-পরম্পরায় বিরাজমান। গার্হস্থ্যজীবনের ক্ষেত্রেই বাঙালি সবচেয়ে বেশি গোপনীয়তার পক্ষপাতী। যত দরিদ্রই সে হোক না কেন, তার বাড়িতে একখানা বাইরের ঘর আছে, এই ঘরে অপরিচিত লোকদের বসতে দেয়া হয় এবং বৈষয়িক আদান-প্রদান করা হয়; তবে এই ঘরের পিছনে যা আছে, বাইরের লোকদের কাছে তা রহস্যময়। ইউরোপের সৌজন্যতায় প্রতিবেশীর স্ত্রী বা কন্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা স্বল্প-পরিচিত লোকের পক্ষেও প্রায় অপরিহার্য; কিন্তু বাংলাদেশে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরাও এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করতে সাহস করে না। যেকোনো মূল্যে এই পারিবারিক গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেয়াও অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো এবং পল্লী অঞ্চলের অনেক বাড়িতেই বহু লোক বিনা অভিযোগে নিঃশব্দে দিনের পর দিন না খেয়ে মারা গিয়েছে।

১৭৭০ সালের গ্রীষ্মকাল

১৭৭০ সালের সারা গ্রীষ্মকালব্যাপী লোক মারা গিয়েছে। গৃহস্থরা তাদের গরুবাছুর, লাঙল-জোয়াল বেচে ফেলেছে এবং বীজধান খেয়ে ফেলেছে; অবশেষে তারা ছেলেমেয়ে বেচতে শুরু করেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত একসময় আর ক্রেতাও পাওয়া গেল না।[৩২] তারপর তারা গাছের পাতা[৩৩] এবং মাঠের ঘাস খেতে শুরু করে; এবং ১৭৭০ সালের জুন মাসে দরবারের রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, জীবিত মানুষ মরা মানুষের গোস্ত খেতে শুরু করেছে।[৩৪] অনশনে শীর্ণ, রোগে ক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষ দিনরাত সারি বেঁধে বড় বড় শহরে এসে জমা হতো। বছরের গোড়াতেই সংক্রামক রোগ শুরু হয়েছিলো।

---

৩২. পূর্ণিয়ার ফৌজদার মোহাম্মদ আলী খানের দরখাস্ত—১৭৭০ সালের ২৮শে এপ্রিলের আলোচনা। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৩৩. যশোরের আমিল উজাগর মালের দরখাস্ত—১৭৭০ সালের ২৮শে এপ্রিলের আলোচনা। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৩৪. ২রা জুনের পত্র; ১৭৭০ সালের ৯ই জুনের আলোচনা। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

মার্চ মাসে মুর্শিদাবাদে পানি-বসন্ত দেখা দেয় এবং বহুলোক এই রোগে মারা যায়। শাহজাদা সাইফুতও এই রোগে মারা যান।[৩৫] মৃত ও মরণাপন্ন লোক স্তূপাকারে পড়ে থাকায় রাস্তাঘাটে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাশের সংখ্যা এতো বেশি ছিলো যে, তা পুঁতে ফেলার কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলো না। প্রাচ্যের মেথর, কুকুর, শৃগাল ও শকুনের পক্ষেও এত বেশি লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিলো না। ফলে দুর্গন্ধযুক্ত গলিত লাশ মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিলো।

দুর্ভিক্ষের গোড়ার দিকে একজন তরুণ সিভিলিয়ান কলকাতায় আসেন। একজন ব্রিটিশ নাগরিক প্রাচ্যের যে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আশা করতে পারেন, তিনি সেই পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল জন শোর, পরে লর্ড টেইনমাউথ। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি সৎ মানুষ। রঙ চড়ানো বা অতিরঞ্জন তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। ১৭৭০ সালের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলি তাঁর মনের ওপর এমন একটি ছাপ ফেলেছিলো, যা তাঁর ঘটনাবহুল জীবন বা অস্বাভাবিক দীর্ঘ কর্মময়জীবন কখনই মুছে ফেলতে পারেনি। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় অভাব অনটনের সামান্যতম আভাস সম্পর্কেও তিনি আশ্চর্যরকমের অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন এবং এমন একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতেন, যার সাহায্যে তিনি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের আশা করতেন। যে বিপর্যয়ের বিবরণ আমরা দিচ্ছি, তার ফলে দেশ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল এবং এই জনমানবহীনতার প্রতিক্রিয়াই তাঁকে তাঁর সর্বাধিক ঐতিহাসিক কাজ[৩৬] করতে প্রণোদিত করেছিলো। প্রায় চল্লিশ বছর পর প্রাচ্যদেশের চাকরি জীবনের বহু স্মৃতিই যখন তাঁর মন থেকে মুছে গিয়েছিলো, তখনও ১৭৭০ সালের ভয়াবহ ঘটনাবলির স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেননি; তাই এই স্মৃতিকথা তাঁর লেখনী থেকে কবিতার আকারে বেরিয়ে এসেছিলো। এই প্রসঙ্গে আমাদের দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর যে একটিমাত্র বেসরকারি বিবরণ আমরা পেয়েছি, তা কবিতার আকারে রয়েছে; তবে মনে রাখা দরকার যে, কবিতায় হলেও বাস্তব ঘটনাবলি সম্পর্কে জন শোর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা অনেকের গদ্যের চেয়ে কোনোক্রমেই নিকৃষ্ট নয় :

যে দৃশ্য আমি দেখেছি তা আমার স্মৃতির চোখে
এখনও সজীব হয়ে রয়েছে,
সেই কৃশ দেহ, গর্তে বসে যাওয়া চোখ,
আর প্রাণহীন মর্মান্তিক ক্রন্দন;
মায়ের আর্তনাদ, শিশুর শোকাকুল কান্না,
হতাশা আর যন্ত্রণার চিৎকার
আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি।

---

৩৫. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১৮ই মার্চ, ১৭৭০। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৩৬. ১৭৮৯ সালের ভূমিসংক্রান্ত বন্দোবস্তকে সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী করার ব্যাপারে লর্ড কর্নওয়ালিশের সহিত তাঁহার মতবিরোধ। শোরের অভিমত ছিলো এই যে, যে দেশের লোকসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র অর্ধেক, এবং যেখানকার তিন ভাগের এক ভাগ জমিই পতিত রয়েছে, সেই দেশ এই ব্যবস্থার উপযোগী নয়।

এই বর্বর দুর্যোগে
মৃতের পাশে পড়ে আছে মৃতপ্রায়;
ঐ শোনো শিয়াল ডাকছে,
শকুনি চিৎকার করছে,
কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে;
দিন-দুপুরেই তারা মরা আর
মৃতপ্রায় মানুষ নিয়ে
টানা-হেঁচড়া আর কাড়াকাড়ি করছে;
তাদের বাধা দেয়ার মতো
কেউ আর নেই,
মৃতের সঙ্গে মৃতপ্রায় মানুষও
আজ তাদের শিকার!
এই ভয়াবহ ভীতিপ্রদ দৃশ্য
কোনো লেখনীই
বর্ণনা করতে পারে না;
বছরের পর বছর
অতিবাহিত হয়ে গেলেও
স্মৃতির পাতা থেকে
মুছে যায় না।[৩৭]

গৌড়ের জনশূন্যতা

মহামারী ও দুর্ভিক্ষ বলতে প্রাচীনকালে প্রকৃতপক্ষে যা বুঝা যেতো, খ্রিস্টান ধর্মের মানবসেবা ও কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার ফলে আধুনিক রাষ্ট্রবিদগণ সে সম্পর্কে কিছুই অবহিত নন। দুর্ভিক্ষ বলতে সত্যি সত্যিই যে কি বুঝায়, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বিপর্যয় থেকে আমরা তার আভাস পেয়েছি; কিন্তু যে সকল স্থানীয় অফিসার স্বচক্ষে এই দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, তারাও সম্ভবত আর পুরোনো শাসকদের অধীনে তার প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন না। কেউ যাতে পোরের কবিতাকে অতিরঞ্জন, বা আমার নিজের রচনাকে অতিবর্ণনা বলে মনে না করেন, সেজন্য আমি মুসলমান লেখকদের রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। কয়েক শতাব্দী পূর্বে গৌড়ে যে বিপর্যয় ঘটেছিলো, এই রচনায় তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।[৩৮] ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার সময় ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ যেমন ভয়াবহ ডানা বিস্তার করেছে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ যখন মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সেই বছর এমন একটি বিপর্যয় ঘটে, যার মারাত্মক আঘাত থেকে হিন্দুপ্রধান গৌড় নগরী কখনই আর সম্পূর্ণরূপে সামলে উঠতে পারেনি। বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ লিখেছেন, 'প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছে।

---

৩৭. জন লর্ড টেইনমাউথের জীবন ও চিঠিপত্রের স্মৃতিকাহিনী তাঁহার পুত্র কর্তৃক লিখিত। প্রথম খণ্ড, ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠা। লন্ডন, ১৮৪৩।

৩৮. এই বিপর্যয়ের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, সম্ভবত প্রথমে মহামারী ও পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো।

জীবিত মানুষ মৃতদের কবর দিতে হয়রান হয়ে অবশেষে অসংখ্য লাশ নদীতে ফেলে দিয়েছে। এর ফলে যে পূতিগন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রোগ আরও বেড়ে যায়। গভর্নরও প্লেগ রোগে মারা যান এবং তারপর শহরের অধিবাসীদের দ্রুত অন্যত্র অপসারণ করা হয়। এই ঘটনার পর থেকে এখনও পর্যন্ত শহরটি পরিত্যক্ত রয়েছে। দুই হাজার বছর যাবৎ এই শহরটির অস্তিত্ব ছিলো এবং তারপর তা ধ্বংস হয়ে যায়। সারা ভারতের মধ্যে এই শহরটি ছিলো সবচেয়ে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। বিরাট বিরাট সুদৃশ্য ইমারতে শহরটি পরিপূর্ণ ছিলো। এক শত রাজার রাজধানী এই শহর সম্পদ ও বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল ছিলো। কিন্তু মাত্র এক বছরের মধ্যেই সমস্ত সম্পদ ও গৌরব ভূলুণ্ঠিত হয় এবং এখন শহরটি বাঘ ও বানরের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।'[৩৯]

১৭৭০ সালের বর্ষাকালে শুভসূচনা দেখা যায় এবং সেপ্টেম্বর মাসের আগেই সারা প্রদেশে উৎকৃষ্ট ফসল কাটা হয়।[৪০] কিন্তু ফসল ভালো হলেও দেশ জনশূন্য হয়ে পড়ার আগে এই ফসল মানুষের ঘরে পৌঁছায়নি। ক্ষুধার্ত ও আশ্রয়হীন মানুষ খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে চরম হতাশার মধ্যে একটি পরিত্যক্ত গ্রাম থেকে অন্য একটি পরিত্যক্ত গ্রামে ঘুরে ফিরেছে। ফলে সারা দেশেই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। বছরের শেষের দিকে রোগের আক্রমণ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে বাংলা সরকার শেষপর্যন্ত বিষয়টি কোর্ট অব ডিরেক্টরের গোচরীভূত করতে বাধ্য হন।[৪১] বেঁচে থাকার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করতে করতে ফসল কাটা শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই লক্ষ লক্ষ কঙ্কালসার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাদের কাতর চোখের শেষ চাহনি সম্ভবত ঘন সন্নিবিষ্ট সবুজ ফসলে ঢাকা ক্ষেতের ওপরই নিবদ্ধ ছিলো। আর মাত্র কিছুদিন পরেই ফসল পেকে সোনালী রঙ ধারণ করবে; কিন্তু হায়, তখন তারা এই দুনিয়ায় থাকবে না। সেপ্টেম্বর মাসে ফসল কাটা শুরু হওয়ার সময় কাউন্সিল লেখেন, 'কোন বর্ণনাই অতিরঞ্জিত বলে পরিগণিত হতে পারে না।'[৪২]

প্রাচুর্যের পুনরাবির্ভাব

বছরের প্রধান ফসলও খুব ভালো হয় এবং তিন মাস পর এই ফসল কাটা হয়। দুর্ভিক্ষ যেমন আকস্মিকভাবে এসেছিলো, সারা বাংলাদেশে সমৃদ্ধিও তেমনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। ফলে ডিসেম্বর মাসের কোনো পাণ্ডুলিপি দলিল পড়লে গত দশ মাসের ঘটনাবলি যে কল্পনা বা দুঃস্বপ্নমাত্র ছিলো না, তা বিশ্বাস করা রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে। বড়দিনের সময় কলকাতার কাউন্সিল লন্ডনে কোর্ট অব ডিরেক্টরকে জানান যে, অভাব অনটনের পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, অভাবিত সমৃদ্ধি ফিরে

---

৩৯. হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, লেখক জে. সি. মার্শম্যান; তৃতীয় সংস্করণ; শ্রীরামপুর।

৪০. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ২৪শে ডিসেম্বর ১৭৭০, ২২ নম্বর অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৪১. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১২ই ডিসেম্বর, ১৭৭০, ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৪২. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, তারিখ, কোর্ট উইলিয়াম, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭০, ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

এসেছে। তারা আরও জানান, 'এখানে প্রচুর পরিমাণ ফসল জন্মেছে এবং শীঘ্রই আরও বেশি পরিমাণ ফসল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।'[৪৩] সত্য সত্যই ফসল এতো বেশি হয়েছিলো যে, সরকার সামরিক গুদামে ফসল জমা করে রাখবেন বলে স্থির করেছিলেন এবং 'খুব সস্তায়' এই ফসল সংগ্রহ করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন।

অভাব অনটনের দিন সত্যি-সত্যিই শেষ হয়ে গিয়েছিলো।[৪৪] ১৭৭১ সালেও ফসল খুব ভালো হয়েছিলো।[৪৫] ১৭৭২ সালে এতো বেশি ফসল ফলেছিলো যে, তার দাম অবিশ্বাস্যরূপে কমে যাওয়ার ফলে খাজনা আদায় করাই সম্ভব হয়ে ওঠেনি।[৪৬] তারপর ১৭৭৩ সালে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে[৪৭] সাময়িকভাবে শস্যহানির আশঙ্কা দেখা দিলেও শেষপর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ ফসল হয় এবং যে সকল প্রদেশে কম ফসল হয়েছিলো, সেই সকল প্রদেশে বস্তা বস্তা ধান চালান দেয়া হয়।[৪৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ এক বছরের দুর্ভিক্ষ ছিলো। ১৭৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসের সাধারণ শস্যহানি এবং আগের বছরের আংশিক শস্যহানিই এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। ১৭৬৮-৬৯ সালে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ছিলো না; এমন কি ফসলও এতো কম হয়েছিলো না, যার ফলে খাজনা কমিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হতে পারতো।[৪৯] পক্ষান্তরে এক বছর অনটনের পরে পর পর তিন বছর বিপুল সমৃদ্ধি এসেছিলো; এবং প্রকৃতি যে ক্ষতিসাধন করেছিলো, তা পূরণ করার জন্য প্রকৃতিই প্রাচুর্য এনে দিয়েছিলো।

---

৪৩. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৭৭০, ২২ নম্বর অনুচ্ছেদ। ১৭৭০ সালের ১২ই ডিসেম্বরের পত্রের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৪৪. ১৭৭০ সালের ১৪ই নভেম্বরের পাবলিক কনসালটেশন। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৪৫. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১০ই জানুয়ারি, ১৭৭২, ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ।

৪৬. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১০ই নভেম্বর, ১৭৭৩, ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদ। ৩০শে ডিসেম্বরের পত্রও দ্রষ্টব্য। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৪৭. ১৭৭৩ সালের ১০ই নভেম্বরের পত্র, ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৪৮. ১৭৭৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বরের পত্র, ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৪৯. ১৭৬৮-৬৯ সালের রাজস্ব সংক্রান্ত বিবরণ থেকে আমি এই তথ্য সংগ্রহ করেছি। স্থানীয় অফিসারগণ অবশ্য বেশ জোরেশোরেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, কিন্তু খাজনা প্রায় পুরোপুরিই আদায় করা হয়েছিলো। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৬৮-৬৯ সালের খাজনা আদায়কে সাধারণ বলে উল্লেখ করেন; এবং তিনটি সমৃদ্ধির বছরের পর তিনি (তাঁর স্বীকৃতি অনুসারেই) নির্মম কঠোরতার সঙ্গে আদায় করে একই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করেন। ১৭৭০ সালে অর্থ ও স্বরাষ্ট্র উজির মোহাম্মদ রেজা খান খাজনা বাড়ানোর সুপারিশ করেন। তিনি মোট ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৫ শ' ৬৭ পাউন্ড আদায় করার প্রস্তাব করেন। ১৭৬৮-৬৯ সালে প্রকৃতপক্ষে ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৪ শ' ৮৫ পাউন্ড আদায় হয়। ১৭৬৮ সালে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়ে থাকলে ১৭৬৯-৭০ সালের মতো খাজনা আদায়ও কম হতো, এবং ১৭৬৮ সালের আদায়কে সাধারণ বলে গণ্য করা হতো না। ১৭৬৮ সালের অনটনের ফলে ১৭৬৯ সালে দেশে যদি তীব্র দারিদ্র্য দেখা দিতো, তা'হলে ১৭৬৯-৭০ সালে এতো বেশি পরিমাণ খাজনা আদায় হতে পারতো না। দুর্ভিক্ষের বছরে মোট ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার ২ শ' ৬৯ পাউন্ডের মধ্যে মাত্র ৬৫ হাজার ৩ শ' ৫৫ পাউন্ড মওকুফ করা হয়েছিলো।—কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭০, ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ; ১৭৭২ সালের ৩রা নভেম্বরের পত্র, ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ; এবং অন্যান্য দলিল। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

জনশূন্যতা

কিন্তু এই ক্ষতি যে পুরোপুরিভাবে পূরণ হয়নি, পরবর্তী ত্রিশ বছরের দলিল-দস্তাবেজেই তার প্রমাণ রয়েছে। প্রাচুর্য এসেছিলো বটে, কিন্তু প্রদেশ তখন নীরব, জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে। ১৭৭০ সালের মে মাস শেষ হওয়ার আগেই মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বলে সরকারিভাবে হিসেব করা হয়েছিলো; জুন মাসে প্রতি ষোল জনের মধ্যে ছয় জন মারা গিয়েছে বলে ধরা হয়েছিলো; এবং অনুমান করা হয়েছিলো যে, 'ক্ষুধার তাড়নায় কৃষক ও খাজনাদাতাদের অর্ধেক মারা যাবে।' বর্ষাকালে (জুলাই থেকে অক্টোবর) জনশূন্যতা এমন প্রকট হয়ে পড়েছিলো যে, সরকার আশঙ্কার সঙ্গে 'দুর্ভিক্ষে নিহত পরিশ্রমী কৃষক ও পণ্য প্রস্তুতকারীদের সংখ্যা' সম্পর্কে কোর্ট অব ডিরেক্টরের কাছে চিঠি লিখেছিলেন।[৫০] পরের বছর (১৭৭১) যখন চাষাবাদ শুরু হয়, তখনই জনশূন্যতার বাস্তব প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই সময় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কৃষকদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, সমস্ত জমিতে আবাদ করার জন্য তাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। এই ব্যাপক বিপর্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে অসংখ্য চিঠিপত্র লেখা হয়। এই সকল চিঠিপত্র অন্য যে কোনো বিষয় দিয়েই শুরু হোক না কেন, প্রত্যেকটিতে অবশ্যম্ভাবীরূপে দুর্ভিক্ষের বিবরণ থাকতো। কাউন্সিল কর্তৃক একই তারিখে লিখিত দু'খানি চিঠির মধ্যে একখানিতে জনশূন্যতা সম্পর্কে সরাসরিভাবে বলা হয় যে, 'এতো বেশি রায়ত মারা গিয়েছে এবং জমি পরিত্যাগ করেছে যে ভূস্বামী কৃষকদের পক্ষে বকেয়া খাজনা আদায় করার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে।'[৫১] ১৭৭১ সালে প্রচুর পরিমাণ ফসল হওয়া সত্ত্বেও দেশে আবাদ কমে যেতে লাগলো; এবং বিভিন্ন জেলায় সফরের জন্য ১৭৭২ সালে নিযুক্ত কমিশনারগণ প্রদেশের উৎকৃষ্ট এলাকাগুলোকে 'দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত, জমি পরিত্যক্ত ও রাজস্ব হ্রাস' অবস্থায় দেখতে পান।[৫২] দুর্ভিক্ষের দুই বছর পর ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। তিনি দেশের একটি বিরাট এলাকা সফর করেন এবং সর্বত্র নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেন যে, 'মোট অধিবাসীদের তিন ভাগের অন্তত পক্ষে একভাগ' মারা গিয়েছে।[৫৩] সমস্ত সরকারি এবং

---

৫০. মি. জেমস আলেকজান্ডার, বাহারের সুপারভাইজার; ১৭৭০ সালের ৯ই জুনের আলোচনা; এবং পূর্ণিয়ার মি. ডুকারেল, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৫১. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১, ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ। একই তারিখের অপর একখানি পত্রে তাঁরা 'জনসংখ্যার বিপুল হ্রাস'-এর কথা বলেছেন। কয়েক মাস আগের একখানি চিঠিতে 'দুর্ভিক্ষে নিহত পরিশ্রমী কৃষক ও পণ্য প্রস্তুতকারীদের সংখ্যা' সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৫২. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭২, ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৫৩. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ৩রা নভেম্বর, ১৭৭২, ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ। এই পত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনের প্রারম্ভে সমগ্র দেশের অবস্থা ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নিখুঁত ও বিস্তারিত বিবরণ আছে। 'ক' পরিশিষ্টে বাংলার চিত্র শিরোনামায় পত্রখানি সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছে।

সর্বাধিক নিখুঁত বেসরকারি লেখকগণ এই হিসেবকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।[৫৪] এই রিপোর্টে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার যে বিবরণ আছে, ইউরোপের কোনো জাতি কখনো তা কল্পনাও করতে পারেনি। দুর্ভিক্ষের কুড়ি বছর পরে অবশিষ্ট লোকের সংখ্যা আড়াই থেকে তিন কোটি বলে অনুমান করা হয়েছিলো; এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারি না যে, এক বছর অনটনের পর একটি ফসল বিনষ্ট হওয়ার ফলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো, তাতে মাত্র নয় মাস সময়ের মধ্যেই এক কোটি লোক মারা গিয়েছিল।

দোষ কার?

বর্তমান যুগের যে কোনো ইংরেজের মনে এ সম্পর্কে যে প্রশ্নটি প্রথম উদিত হবে, তা হচ্ছে এই যে, এই ব্যাপক মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? কিন্তু যে সময়ের কথা আমি লিখছি সেই সময়ের কোনো ইংরাজ বা এদেশীয় লোকের মনে এই প্রশ্নটি সকলের শেষে উদিত হতো। ১৭৭২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ জনসাধারণ বাংলাদেশকে এমন একটি গুদামঘর বলে মনে করতো, যেখানে একদল ভাগ্যান্বেষী ইংরাজ বিরাট আকারে বিপুল লাভজনক ব্যবসা করতো।[৫৫] সেখানে যে বহুসংখ্যক লোক বাস করে, তা তারা জানতো বটে, তবে এটাকে তারা একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করতো। আজকাল আমরা নাটাল বা সিয়েরা লিওনের উপজাতিদের সম্পর্কে যে আগ্রহ বোধ করে থাকি, তখনকার দিনের ইংরেজরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে তার চেয়ে অনেক কম আগ্রহশীল ছিলো। যে বক্তা ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে তাদের দুঃখ-দুর্দশাসহ জীবন্ত আকারে ব্রিটিশ জনসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তিনি দুর্ভিক্ষের মাত্র চার বছর আগে ওয়েন্ডোভার থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তখনও আয়ারল্যান্ডের একজন সাহিত্যসেবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন; তিনি একজন লর্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছিলেন। ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছাড়া এদেশের অন্য কারো মনেই সম্ভবত বর্তমানকালেও এই ঘটনা সম্পর্কে দায়িত্বের প্রশ্ন উদিত হবে না। প্রাণহানিকে শস্যহানির স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত প্রতিক্রিয়া বলে মেনে নেয়া হয়েছিলো। জমিতে ফসল হয়নি, অতএব মানুষকে অতি স্বাভাবিক নিয়মেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

সাহায্যদানে সরকারি অনাগ্রহ

কিন্তু বর্তমানে একজন ইংরেজ এই মর্মান্তিক কাহিনীর বিবরণ পড়ে এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হবেন না। কলকাতার তৎকালীন ইংরেজ কাউন্সিলও সন্তুষ্ট হননি। তারা পূর্বাহ্নেই

---

৫৪ উদাহরণ স্বরূপ মিল (তৃতীয় খণ্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা, ১৮৪০ সংস্করণ) এবং অবার-এর (রাইজ এণ্ড প্রগ্রেস, প্রথম খণ্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা, ১৮০৭ সংস্করণ) কথা বলা যেতে পারে।

৫৫. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা যে অনিশ্চিত পদ্ধতিতে ইংরেজদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছিলো, পরে 'পল্লী অঞ্চলের শাসনকার্যে কোম্পানির প্রথম প্রচেষ্টা' নামক অধ্যায়ে তা বর্ণিত করা হবে।

খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখা বা একচেটিয়াভাবে জমা করে রাখার বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রচার করেছিলেন এবং এই ঘোষণা কার্যকরী করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করেছিলেন।[৫৬] এই ব্যবস্থার বাস্তব ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করবো; তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ব্যবস্থা থেকে একটি জিনিস সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধক হিসেবেই কর্তাব্যক্তিগণ সজ্ঞানে এই ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। তারা খাদ্যশস্য অন্যত্র চালান দেয়াও বন্ধ করে দিয়েছিলেন; অতএব দেখা যায় যে, নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে তারা প্রদেশের স্বল্প পরিমাণ খাদ্যশস্য সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সঙ্গতিপন্ন লোকদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ এবং চাল আমদানির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা খুবই অপর্যাপ্ত আকারে চালানো হয়। যে সকল জেলায় প্রতি মাসে কুড়ি হাজার লোক মারা যাচ্ছিলো, সেই সকল জেলার জন্য মাত্র দেড়শ' টাকা হারে সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। প্রাদেশিক কাউন্সিল সাহায্য দানের বিষয়টি গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করেন এবং উদারতার সঙ্গে চার লক্ষ ক্ষুধার্ত লোকের জন্য প্রতিদিন দশ শিলিং মূল্যের চাউল মঞ্জুর করেন।[৫৭] তাছাড়া 'খাদ্যাভাবে কৃষক ও রাজস্ব দাতাদের অর্ধেক মারা যেতে পারে বলে সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়ার পর তিন কোটি লোককে ছয় মাসকাল বাঁচিয়ে রাখার খরচ বাবদ কাউন্সিল কোম্পানির দেয়া অর্থের পরিমাণ চার হাজার পাউন্ড নির্ধারণ করেন।[৫৮] তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, এর চেয়ে বেশি খরচ হলে তা দেশীয় সঙ্গতিপন্ন লোকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। দেশীয় লোকেরা অবশ্য এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন।[৫৯] কোম্পানির চার হাজার পাউন্ডের সঙ্গে তারা ৪ হাজার ৭ শ' পাউন্ড যোগ করেছিলেন এবং অতিরিক্ত খরচ হলে তাও তারা বহন করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মোট টাকা শেষ পর্যন্ত খুবই অপ্রতুল হয়ে দাঁড়ায় এবং সাহায্য তহবিলের কর্মকর্তাগণ উপলব্ধি করার আগেই বীরভূম ও সীমান্তের অন্যান্য জেলায় সাহায্য বাবদ ৩ হাজার ১ শ' পাউন্ড ছাড়াও খাদ্যশস্য আমদানির জন্য ১৫ হাজার পাউন্ড খরচ হয়ে যায়।[৬০] এই অতিরিক্ত খরচের ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ হতে থাকে; ফলে রাষ্ট্রীয়

---

৫৬. ঠিক কোন্ সময়ে এই সকল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, দলিল-দস্তাবেজে তার তারিখ উল্লেখ করা হয়নি; তবে এ সম্পর্কে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট লিখিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ৯ই মার্চ, ১৭৭২, ৪৬ ও ৪৭ অনুচ্ছেদ; ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭২, ৫ অনুচ্ছেদ। ব্রিটিশ সরকার বঙ্গীয় কাউন্সিলের মতোই এই ঘোষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, এবং কয়েকটি জেলায় এই নিয়ম লংঘনের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের আদেশ দিয়েছিলেন। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৫৭. রংপুরের সুপারভাইজারের চিঠি, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭০। প্রাদেশিক কাউন্সিলের আলোচনা, মুর্শিদাবাদ, ৪ঠা অক্টোবর। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৫৮. দরবারের রেসিডেন্ট বি. বেচেরের চিঠি, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৭৭০। নায়েব দেওয়ানের দরখাস্ত, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১।

৫৯. গোপন কমিটির নোট, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১। মোহাম্মদ রেজা খানের মামলার রিপোর্ট, ১৭৭২।

৬০. নায়েব দেওয়ানের দরখাস্ত।

তহবিল থেকে যে ঠিক কতো টাকা খরচ করা হয়েছে, তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। দেশীয় রাজাগণ সমস্ত অতিরিক্ত খরচ বহন করতে রাজি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করায় গোপন কমিটি স্থির করেন যে, তাদের কাছে আর টাকার জন্য অনুরোধ জানানো হবে না। শেষ পর্যন্ত যাহোক নির্ধারণ করা হয় যে, কোম্পানির তহবিল থেকে মোট ৬ হাজার পাউন্ড খরচ করা হয়েছে।[৬১] পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোতে আরও ৩ হাজার পাউন্ড খরচ হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে, যদিও এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সাহায্যদানের জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কোর্ট অব ডিরেক্টর যখন রিপোর্ট দাবি করেন, কাউন্সিল সর্বাধিক যা বলতে পেরেছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, তাঁরা ৩ কোটি লোকের জন্য ৯ হাজার পাউন্ড খরচ করেছেন।[৬২] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মোট ৩ কোটি লোকের প্রতি ১৬ জনের মধ্যে ৬ জন মারা গিয়েছে বলে সরকারিভাবে স্বীকার করা হয়।

অন্য কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি

এই নয় হাজার পাউন্ড খয়রাতি সাহায্য বাবদ ও খাদ্যশস্য আমদানি করার জন্য ব্যয় করা হয়েছিলো। কিন্তু খাদ্য আমদানির প্রশ্নে যে দুর্নীতি ও হৃদয়হীনতার চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাতে সরকার কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত এই সামান্য পরিমাণ সাহায্য শেষ পর্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের কাছে পৌঁছেছিল কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সকলের বিরুদ্ধেই ব্যক্তিগত স্বার্থে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা চালানোর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিলো। ফলে কোর্ট অব ডিরেক্টর বৃথাই বারবার অপরাধীদের নাম প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এ সম্পর্কে কখনোই কোনো সন্তোষজনক তদন্ত করা হয়নি। পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের দেশীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো কম দাম দিয়ে কৃষকদের ঘর থেকে স্বল্প পরিমাণ মওজুদ ধানও একরকম জোর করে নিয়ে গিয়েছে; অন্যান্য প্রদেশ থেকে যারা ধান আমদানি করতো মাঝপথে তাদের নৌকা থামিয়ে সমস্ত ধান হস্তগত করেছে; এবং এমনকি 'গরিব রায়তদেরও তাদের বীজধান বেচতে বাধ্য করেছে।'[৬৩] অতএব অপরাধীরা 'সরকারি চাকরিরত পদস্থ লোক ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না' বলে কোর্ট অব ডিরেক্টর যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, তা একেবারে ভিত্তিহীন ছিলো না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-একজন মাত্র পদস্থ

---

৬১. গোপন কমিটির নোট, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৬২. এই অর্থের সঙ্গে দেশীয় রাজাদের দান ৪ হাজার ৭ শ' পাউন্ড যোগ করা হলে মোট পরিমাণ ১৩ হাজার ৭ শ' পাউন্ড হয়। আমদানি করা চাউল বিক্রয় করে ৬ হাজার ৭ শ' ৫১ পাউন্ড লাভ হয়; অতএব মোট পরিমাণ থেকে এই অর্থ বাদ দিতে হবে।—চাউল বিক্রয়ের স্মারকলিপি, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১। এই হিসেবটি খুবই গোলমেলে, তাই কাউন্সিলকে আমি সন্দেহের অবকাশের সুবিধা দেয়ার পক্ষপাতী।

৬৩. বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত কোর্ট অব ডিরেক্টরের পত্র। ১০ই এপ্রিল ও ২৮শে আগস্ট, ১৭৭১। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

লোকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে মামলা করা হয়েছিলো, তিনি ছিলেন একজন দেশীয় অর্থ উজির এবং আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কথা ফাঁস করে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলেই তাঁকে এই বিপদে পড়তে হয়েছিলো। তবে সুখের বিষয়, তিনি খালাস পেয়েছিলেন।[৬৪] দুর্গতদের সাহায্যের জন্য আর যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছিলো, তা হচ্ছে খাজনা মওকুফ করে দেয়া এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকা থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু বিলাতের আদেশের অজুহাত দেখিয়ে সেনাবাহিনী আর শেষ পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি; অথচ কর্মকর্তাগণ দৃঢ়তাসম্পন্ন হলে এই চরম বিপর্যয়ের সময় আদেশটি নিশ্চয়ই মুলতুবি করে রাখতেন। কিন্তু আদেশটি তো স্থগিত রাখা হয়ই-নি, অধিকন্তু সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়া হলে রাজনৈতিক বিপদ দেখা দিতে পারে বলে কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সেনাবাহিনী অবশ্য সরানো হয়েছিলো, কিন্তু তা এক দুর্গত এলাকা থেকে আর এক দুর্গত এলাকায় এবং বিলেতের কর্তাদের এ সম্পর্কে জানানো হয়েছিলো যে, ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে সেনাবাহিনীর জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে মওজুদ রাখা হয়েছিলো; ফলে দেশীয় লোকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছিলো যে, সেনাবাহিনী তাদের বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনও কেড়ে নিয়েছে।[৬৫]

স্থানীয় অফিসারগণ মৌখিক তৎপরতা দেখালেও খাজনা ও অন্যান্য দেনা মওকুফ করার ব্যাপারে বিশেষ কোনো কাজ হয়নি। যে বছর মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ এবং কৃষকদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মারা যায়, সেই বছর এমন কি শতকরা পাঁচ ভাগ খাজনাও হ্রাস করা হয়নি এবং পরের বছরই (১৭৭০-৭১) শতকরা দশ ভাগ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।[৬৬]

অপর্যাপ্ত সাহায্য

উড়িষ্যার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গীয় সরকারের সাহায্য প্রচেষ্টার কথা যারা অবহিত আছেন, তাদের কাছে ১৭৭০ সালের এই সাহায্যদানের হিসেব অমানুষিকরূপে

---

৬৪. মোহাম্মদ রেজা খান। রাজা সেতাব রায়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোনো বিচার হয়নি; একটি তদন্তের প্রহসন হয়েছিলো মাত্র।

৬৫. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ৯ই মে, ১৭৭০, ৩ অনুচ্ছেদ। পাটনার সুপারভাইজার মি. আলেকজান্ডার, জেনারেল স্যার রবার্ট বার্কার, কর্নেল গালিয়েজ ও ক্যাপ্টেন হার্বারের পত্র; এবং ১৭৭০ সালের মে ও জুন মাসের আলোচনা। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য আমদানির ব্যাপারে কয়েকবার ব্যর্থতাও পরিলক্ষিত হয়। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৬৬. যে সকল নির্মমতার আশ্রয় নেয়া হয়েছিলো, 'ক' পরিশিষ্টে 'বাংলাদেশের চিত্র' শিরোনামায় তা বর্ণনা করা হয়েছে। কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র; ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭০; ৩রা নভেম্বর, ১৭৭২ প্রভৃতি। বিভিন্ন পত্রে বিভিন্ন পরিমাণ খাজনা মওকুফ করার কথা বলা হয়েছে। ১৭৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগে এই পরিমাণ ছিলো ৮০ হাজার ৩ শ' ৩২ পাউন্ড; পরে হ্রাস করে ৬৫ হাজার ৩ শ' ৫৫ পাউন্ড করা হয়। মোট আদায়ের পরিমাণ ছিলো ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার ২ শ' ৬৯ পাউন্ড।

অপর্যাপ্ত বলে মনে হবে। কিন্তু তাই বলে এই জাতীয় ব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার, অথবা আদৌ ব্যবস্থা না করা হলে তার খারাপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বর্তমান উড়িষ্যার মতো তৎকালীন বাংলাদেশে রাস্তাঘাট বা যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। ফলে দুর্ভিক্ষের সময় ঘরে ঘরে সাহায্য পৌঁছে দেয়া খুব সহজ ছিলো না। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ একবার শুরু হয়ে গেলে মানবীয় প্রচেষ্টায় কতোটুকুই-বা আর করা যেতে পারে। বাংলা প্রবাদবাক্যে এই জাতীয় প্রচেষ্টাকে শিকড় কাটা গাছের মাথায় পানি ঢালার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৬৭] এই জাতীয় সকল প্রচেষ্টাই অতীতে অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তাছাড়া জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে যতো বেশি আকৃষ্ট হবে, এই অপর্যাপ্ততা ততো বেশি ভয়াবহ বলে প্রতীয়মান হবে। গত একশ বছরের মধ্যে উত্তর প্রেসিডেন্সিতে তিনবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ১৭৭০ সালে ব্রিটিশ সরকার এদেশের অবস্থা সম্পর্কে খুব কমই অবহিত ছিলেন, ফলে জনসাধারণকে সাহায্য করেছিলেন আরও কম। অতিরঞ্জিত[৬৮] করার প্রচেষ্টার কথা বাদ দিলেও স্থিরমস্তিষ্কে যাকে শোকাবহ বলে গণ্য করা যেতে পারে, সেই অবস্থা প্রতিরোধের জন্য স্বল্পতম সাহায্য দিলেও কলকাতার কাউন্সিলকে কোনো নিন্দাবাদ শুনতে হয়নি।[৬৯] ১৮৩৭-৩৮ সালে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা আরও বাড়ানো হয়েছিলো বটে, কিন্তু তখন তা ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের কড়া নজরে ছিলো এবং সংবাদপত্রগুলো সরকারকে খুব খাতির করেনি।[৭০] তখনকার দিনে বাংলাদেশে ব্রিটিশ জনমত বলতে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় ও তাদের মুখপত্রগুলোর অভিমত বুঝাতো; কিন্তু দেশটি সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে চলে যাওয়ার পর ইংল্যান্ডের জনমতের প্রতিক্রিয়া ভারতের উপর সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হতো। বাংলাদেশে তখন ইংরেজদের সম্পর্কে কোনো প্রশংসা বা নিন্দাবাদ শোনা গেলে তা ভারতে বসবাসকারী মুষ্টিমেয় ইংরেজের সম্পর্কে করা হতো না; এই প্রশংসা বা নিন্দাবাদের লক্ষ্য ছিলো সমগ্র ব্রিটিশ জাতি। ফলে ১৮৬৬ সালের সরকারি প্রচেষ্টা আগের চেয়ে ব্যাপকভিত্তিক ও উৎসাহপূর্ণ হলেও তার অপর্যাপ্ততা কেবলমাত্র ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের কাছেই নয়, সমগ্র ব্রিটিশ জাতির চোখেই প্রকট হয়ে উঠেছিলো।

এই সমালোচনা মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভারতীয় শাসকদের প্রতি অবিচারমূলক হলেও সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে তার উপকারিতা খুবই প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সমালোচনায় ১৭৭০ সালের বিপর্যয়ের সঙ্গে যে তুলনামূলক চিত্র

---

৬৭. Gora Katiya Agaya Jal dhala : গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা।

৬৮. ১৭৭২ সালের নভেম্বর মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস এইরূপ অতিরঞ্জনের প্রচেষ্টার অভিযোগ করেছিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত পত্র।

৬৯. কাউন্সিল যে সাহায্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, কোর্ট অব ডিরেক্টর তাতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলেই মনে হয়, তবে তারা খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য কাউন্সিলকে ভর্ৎসনা করেছিলেন।

৭০ তৎকালীন কলকাতা ও আগ্রার সংবাদপত্র। বিখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক জে. ও'বি সন্ডার্স লিখিত 'ডায়রি অব এন ইনভ্যালিড অন হিজ জার্নি ডাউন দি গ্যাঞ্জেস' দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য ও বিবরণে পরিপূর্ণ।

তুলে ধরা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে তার সাদৃশ্য বিস্ময়কর। উভয় ক্ষেত্রেই দুর্ভিক্ষের আশু কারণ হচ্ছে সম্ভাব্য সময়ের পূর্বেই শরৎকালীন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং তার ফলে ডিসেম্বরের ফসল সাধারণভাবে এবং বসন্তকালীন ফসল আংশিকভাবে মারা যাওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের দুর্দশা অনশনে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার বিপর্যয়ের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে বা সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। উভয় ক্ষেত্রেই দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে প্রদেশে মওজুদ খাদ্যশস্যের পরিমাণ কম ছিলো। উভয় ক্ষেত্রেই সেপ্টেম্বরের ফসল জনসাধারণের দুর্দশা হ্রাস করেছিলো এবং ডিসেম্বরের ফসল দুর্ভিক্ষের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলো। মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য পাওয়া যায়, উভয় ক্ষেত্রেই পাউন্ডে দুই পেন্স এবং ক্ষেত্রবিশেষে চার পেন্স করে মূল্য বেড়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকটি এলাকায় খাদ্যশস্যের যে দাম উল্লেখ করা হয়, তা মামুলিমাত্র ছিলো, কারণ বাজারে তখন কোনো খাদ্যশস্য পাওয়া যেতো না এবং টাকার দামও অনেক কমে গিয়েছিলো।[৭১] উভয়ক্ষেত্রেই জনসাধারণ নীরবে সকল দুর্দশা মাথা পেতে নিয়েছিলো। অন্য কোনো দেশ বা সম্প্রদায়ের লোক এই নীরবতাকে হয়তো উদাসীনতা বলে ভুল করতে পারেন; কিন্তু এদেশের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যারা বাস করেছেন, তারা জানেন এই নীরবতা অসীম ধৈর্যেরই নামান্তর মাত্র এবং এই গুণ সর্বক্ষেত্রে প্রশংসনীয়।[৭২]

বণিকদের ভূমিকা

কিন্তু এখানেই সাদৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ১৭৭০ সালে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে একচেটিয়া কারবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করেছিলেন। প্রদেশে তখন কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য মওজুদ ছিলো এবং তার সাহায্যে নয় মাস সময় চালানোর প্রয়োজনীয়তা ছিলো। বেসরকারি কারবার নিয়ন্ত্রণ করা না হলে, ফসল-কাটার সময় সস্তা দামে তা কিনে নিয়ে মওজুদ করে রাখা হতো, পরে অনটনের সময় তা চড়া দামে বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করা হতো। ফলে দ্রুত দাম বেড়ে যেতো এবং দুর্ভিক্ষের গোড়াতেই জনসাধারণ বাধ্য হয়ে খাদ্যশস্য কেনা কমিয়ে দিতো। এইভাবে সমস্ত মওজুদ খাদ্যশস্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো, যার ফলে পুরো নয় মাস সময়ই সমান অনটন থাকতো। খাদ্যশস্যের দাম ১৮৬৫-৬৬ সালের মতো দ্রুতবেগে পাউন্ড প্রতি সাড়ে তিন পেন্স হিসেবে না বেড়ে দুর্ভিক্ষের গোড়ার দিকে

---

৭১. মহারানীর আদেশে পার্লামেন্টে পেশকৃত ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত কাগজপত্র, প্রথম খণ্ড ৩৪৫ পৃষ্ঠা। দরবারের রেসিডেন্ট মি. বেচারের পত্র, ১৮ই জুন, ১৭৭০। নায়েব দেওয়ানের আবেদনপত্র, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১। 'দি কুক'স ক্রনিকেল অব বীরভূম' (খ পরিশিষ্ট)।

৭২. ১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষ যখন তীব্রতম ছিলো, তখন আমি উড়িষ্যাসহ নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের সর্বত্র জনশিক্ষার তদারক করতাম। প্রায় ৮ শ' দেশীয় অধঃস্তন অফিসার দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং প্রয়োজনের সময় প্রশংসার অতীত ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফলে অনেকের স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিলো, এবং একজন কর্তব্যরত অবস্থায় প্রায় পালকিতেই মারা গিয়েছিলেন। সকলের সময় আমি গরিব গ্রামবাসীদের মধ্যে মর্মস্পর্শী আত্মত্যাগ ও নীরব সাহসিকতার দৃশ্য দেখেছি, তা মৃত্যু পর্যন্ত আমার মনে থাকবে।

তিন কাদিং হিসেবে বেড়েছিলো।[৭৩] শেষের দিকে দুই পেন্স এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার পেন্স পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিলো। ১৮৬৬ সালে সরকার এটা ধরতে পারেন। ফলে বেসরকারি ব্যবসায়ে যদৃচ্ছা হস্তক্ষেপ তথা নিরুৎসাহ না করে সরকার বুঝতে পারেন যে, বেসরকারি ব্যবসায়কে সুযোগ-সুবিধে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ১৭৭০ সালে সম্মানিত লোকেরা ধান-চালের কারবার থেকে দূরে সরে থাকেন। কারণ, মাল মওজুদ না থাকলে কারবার করা যায় না এবং আইন লঙ্ঘন না করে মাল সংগ্রহ করা যায় না। ১৮৬৬ সালে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক ধান-চালের কারবারে নেমেছিলেন; কারণ সরকার প্রত্যেকটি জেলার বাজার দর সম্পর্কে সাপ্তাহিক রিপোর্ট প্রকাশ করে এই কারবার অনেক সহজ ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। কোথায় সস্তায় কেনা যাবে এবং কোথায় চড়া দামে বেচা যাবে, তা সকলেই জানতো; ফলে যে সকল জেলায় প্রচুর ধান-চাল পাওয়া যেতো, সেখান থেকে তা ঘাটতি এলাকার দিকে চালান হয়ে যেতো। দুর্গত এলাকার সর্বত্র কেবলমাত্র দামের ক্ষেত্রেই সমতা বিধান করা হয়নি, বরং নিম্নবঙ্গের চড়া দামের কথা প্রচার করে করে দেয়ার ফলে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলো থেকে নদীপথে এতো বেশি পরিমাণ ধান-চাল আসতে থাকে যে, প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে তার জন্য স্থান সংকুলান করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এইভাবে দুর্গত এলাকায় চারদিক থেকে ধান-চাল আসতে থাকে—রেলপথ, খাল ও নদীপথে ধান-চালের চালানে সর্বদা কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে।

১৮৬৬ সালের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ

ভারতের ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলোর সাহায্য ও পরামর্শ ছাড়া সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন কিনা তা বলা যায় না; তবে একথা ঠিক যে, সংবাদপত্রগুলো গোড়া থেকেই এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছিলো। আরও একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে, নিম্নবঙ্গের যে সকল জেলায় বেসরকারি ইংরেজগণ বসবাস করতেন এবং যে সকল জেলায় ব্রিটিশ জনমত প্রাধান্যলাভ করতো, সেই সকল জেলায় এই ব্যবস্থা বিপুল সফলতা লাভ করেছিলো। ইংরেজ চা-আবাদকারী বা ব্যবসায়ীরা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই রাস্তা, রেলপথ ও নদীপথ গড়ে উঠেছে; এবং যোগাযোগের এই সকল সুযোগ-সুবিধে যেখানে আছে, সেখানে ধান-চালের লেনদেন এমন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে যে, অনটন কখনো দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত গড়ায়নি।[৭৪] কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে এমন একটি নিভৃত কোণ রয়েছে, যেখানে কোনো বেসরকারি ইংরেজ প্রায় পদার্পণই করেনি। উড়িষ্যা নামে সাধারণভাবে অভিহিত দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে কোনো ইংরেজ ব্যবসায়ী নেই এবং এখানকার অধিবাসীরা কখনও রাস্তাঘাট বা যানবাহনের

৭৩. নায়েব দেওয়ানের আবেদনপত্র। কনসালটেশনস, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১, (ৰ পরিশিষ্ট)।

৭৪. অনটন ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে যে বাস্তব পার্থক্য আছে, এবং একটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে এসে যে অনটন দুর্ভিক্ষে পরিণত হয়, তা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষীয় মহলও স্বীকার করেছেন।—পার্লামেন্টে পেশকৃত বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ, প্রথম খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা, ফোলিও।

দাবিও জানায়নি; অথচ এইরূপ জায়গার অধিবাসীদের কাছ থেকে এই ধরনের দাবি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক। উড়িষ্যার অধিবাসিগণ ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক দিক থেকে প্রদেশের অবশিষ্টাংশের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং মূল প্রদেশের সঙ্গে তাদের একত্রিত করার চেষ্টাও কখনো করা হয়নি।[৭৫] দলিল-দস্তাবেজ থেকে যতোদূর জানা যায়, তাতে দেখা যায় যে, উড়িষ্যা সব সময় তার নিজস্ব চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি ফসল উৎপন্ন করেছে।[৭৬] এই প্রদেশটি সর্বদা রফতানি করেছে, আমদানি করেনি; বাড়তি ফসল সমুদ্রপথে বাইরে চালান দিয়েছে; ফলে স্থলপথে নিম্নবঙ্গের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়নি। অনটনের গোড়ার দিকে উড়িষ্যাতেও প্রদেশের অন্যান্য জায়গার মতো দুর্দশা দেখা দিয়েছিলো বলে জানা যায়; কিন্তু সরকার বা জনসাধারণ জানতো না যে, অন্যান্য জেলার তুলনায় উড়িষ্যায় অনেক বেশি ফসল নষ্ট হয়েছে।[৭৭] স্থানীয় ব্যবসায়িগণ ধরে নিয়েছিলেন যে, অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিপুল পরিমাণ ফসল হবে; ফলে শেষপর্যন্ত তাদের রফতানি কমাতে হলেও আমদানি করার কোনো প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেননি।[৭৮] ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি অবশ্য বুঝা গিয়েছিলো যে, উড়িষ্যার পরিস্থিতিতে গুরুতর একটা পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, প্রদেশের অন্যান্য স্থানে ফসল নষ্ট হওয়ার ক্ষতিপূরণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ ধান-চাল আমদানি ও বণ্টন করা হয়েছিলো, তা কখনো উড়িষ্যা পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কারণ, কেউ আশা করতে পারেনি যে, সবসময়ই যে সকল জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণ ধান-চাল বাইরে চালান দেয়া হয়ে থাকে, দীর্ঘ সমুদ্রপথে সেখানে ধান-চাল নিয়ে যাওয়া হলে আদৌ কোনো মুনাফা হতে পারে। তাছাড়া প্রদেশের অবশিষ্ট অংশে যখন দুর্ভিক্ষের সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনা যাচ্ছিলো, ঠিক সেই সময় উড়িষ্যা থেকে পনেরো লক্ষ পাউন্ড ধান-চাল বাইরে চালান দেয়া হয়েছিলো। অতএব উড়িষ্যায় ধান-চাল চালান দিয়ে মুনাফা করার কথা চিন্তা করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। অবশেষে মার্চ মাসে যখন সাধারণভাবে বুঝা গেলো যে, উড়িষ্যায় ধান-চালের অভাব দেখা দিয়েছে, তখন আর আমদানি বা রফতানি কোনোটিই সম্ভব ছিলো না। কারণ ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাসে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। উড়িষ্যার বন্দরগুলো বছরে মাত্র কিছুদিনের জন্য খোলা থাকে এবং এখন সেখানে কাজ করা অসম্ভব হয়ে

৭৫. দুর্ভিক্ষ কমিশনারদের রিপোর্ট (১৮৬৬), প্রথম খণ্ড, ৩২, ৫৬, ৪১২ প্রভৃতি ধারা।

৭৬. দুর্ভিক্ষ কমিশনারদের রিপোর্ট (১৮৬৬), প্রথম খণ্ড, ৫৭ প্রভৃতি ধারা।

৭৭. কমিশনারগণ যথার্থই বলেছেন যে, জানুয়ারি মাসে ধান ঝাড়া না হওয়া পর্যন্ত পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব নয়। বিচালির পরিমাণ দেখে ধান সম্পর্কে কোনো অনুমানই করা যায় না। রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড, ১১২ ধারা।

৭৮. সরকারি ও বেসরকারি মহলের ধারণা, বেসরকারি বড় গুদামগুলো ফটকাবাজারিদের হাতে ছিলো। 'জনসাধারণও তাই বিশ্বাস করতো', ফলে কমিশনার মনে করেন যে, 'কয়েক বছর বাজারে সরবরাহ করার জন্য পর্যাপ্ত মাল মওজুদ রয়েছে।' পল্লী অঞ্চল সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকায় এ অভিমতের বিরোধিতা করা কঠিন।—রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬ প্রভৃতি ধারা।

পড়েছে। স্থলপথে যে একটিমাত্র রাস্তা ছিলো, তা ধান-চাল বোঝাই গাড়ি চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ফলে হতভাগ্য জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তারা 'খাদ্যহীন জাহাজের যাত্রীদের মতো অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতে থাকে।'[৭৯]

১৭৭০ সালের বিচ্ছিন্ন বাংলা

১৭৭০ সালে সমগ্র নিম্নবঙ্গেও ঠিক একই অবস্থা বিদ্যমান ছিলো। সরকার ব্যবসায়ীদের বাধা না দিলেও রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অভাবের ফলে খাদ্যদ্রব্য বণ্টন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাইরে থেকে আমদানি করাও একই কারণে অসম্ভব ছিলো। প্রত্যেকটি জেলা যে কিরূপ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ছিলো, সে সম্পর্কে একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করলেই সম্ভবত যথেষ্ট হবে। অনেকে মনে করেন যে, খারাপ ফসলের মতো বেশি ফসল হওয়াও বিপজ্জনক; কারণ বিপুল পরিমাণ ধান-চাল বাজারে নিয়ে যেতে হলে যে খরচ পড়ে, তা দিয়ে ঠিক সেই পরিমাণ ধান-চাল কেনা যেতে পারে।[৮০] কিন্তু রাস্তাঘাট ও যানবাহন থাকলেও আমদানি করা তখন সম্ভব ছিলো না, কারণ ধান-চাল কেনার মতো পয়সা তখন প্রদেশে ছিলো না। একে তো তখন বিভিন্ন বিভাগে পৃথক পৃথক ধরনের মুদ্রা চালু ছিলো এবং এক বিভাগের মুদ্রা অন্য বিভাগে নামমাত্র দামে কেনা হতো, তদুপরি সেই দুর্ভাগ্যের বছরে বাংলাদেশে টাকা-পয়সার প্রায় অস্তিত্বই ছিলো না।[৮১] পাণ্ডুলিপি দলিলে মুদ্রা ঘাটতির অভিযোগ এতো অধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার ফলে জনসাধারণ যে অপরিসীম দুর্দশায় পতিত হয়েছিলো, পাঠকের পক্ষে তা অনুমান করাও কঠিন। ১৭৬৯-৭০ সালে পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি ঘটে। ১৭৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ট্রেজারির মোট টাকার পরিমাণ ছিলো মাত্র ৩৪৮২ পাউন্ড এবং কোম্পানির সিন্দুকে ছিলো মাত্র ৪৬৭৯ পাউন্ড।[৮২] কোম্পানির বাণিজ্যিক এজেন্টরা মূলধন নিয়োগের প্রচলিত দাদন দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ রূপা সংগ্রহ করতে পারেননি। সাধারণ লোকেরাও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আগ্রহশীল ছিলো না, কারণ তারা জানতো যে,

---

৭৯. দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট : 'উড়িষ্যার উপকূলে সাধারণ আকারের জাহাজ কোনোমতে বাইরে দাঁড়াতে পারতো এবং ঝড়বৃষ্টি যখন না থাকতো তখন সামুদ্রিক ঢেউয়ের ঝুঁকি নিয়ে ধীরে ধীরে অতিকষ্টে মাল নামাতো।' প্রথম খণ্ড, ২৯০ ধারা। মাল নামানোর সময় কয়েকখানি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছিলো, অথবা সমস্ত মাল নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

৮০. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১০ই নভেম্বর, ১৭৭৩, ৩০ অনুচ্ছেদ। লর্ড লিন্ডসে লিখিত 'লাইভস অব দি লিন্ডসেস' পুস্তকে ১৭৭৮-৮৮ সালে সিলেটের কালেক্টর অনারেবল রবার্ট লিন্ডসের আত্মকাহিনী। তৃতীয় খণ্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, লন্ডন ১৮৪৯।

৮১. উদাহরণস্বরূপ বাহারের নারায়ণী টাকা ও সিলেটের কড়ি মুদ্রার কথা বলা যেতে পারে। কড়ি মুদ্রার ক্ষেত্রে ২৫০০ কড়িতে এক শিলিং হতো। বেঙ্গল লেটার, ১০ই নভেম্বর, ১৭৭৩; ৪ অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস। প্রসিডিংস ইন দি পাবলিক ডিপার্টমেন্ট, কোর্ট উইলিয়াম, ২৪শে অক্টোবর, ১৭৯২। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস। লাইভস অব দি লিন্ডসেস, তৃতীয় খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা।

৮২. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯; ১২৫ অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

বাজারে টাকা ছাড়লে মুদ্রার অভাবে তা আর আদায় হবে না; এমন কি দাইকের দেনা পরিশোধ করার সদিচ্ছা থাকলেও মুদ্রার অভাব সে তা পরিশোধ করতে পারবে না। এই অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।[৮৩] দুর্ভিক্ষের শুরুতে এই অবস্থা বিদ্যমান ছিলো; এবং শেষের দিকে সম্ভবত আরও অবনতি ঘটেছিলো। ১৭৭০ সালের আগস্ট মাসে মাদ্রাজের পাওনা পরিশোধ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাউন্সিলকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, মুদ্রার অভাবে তারা এই দেনা পরিশোধ করতে পারছেন না।[৮৪]

দুর্ভিক্ষের প্রাচীন প্রতিক্রিয়া

আমদানি করার উপায় না থাকার বিষয়টি খুবই দুঃখজনক, কারণ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো তখন অতি সহজেই প্রচুর পরিমাণ ধান-চাল সরবরাহ করতে পারতো। কয়েকটি মাত্র জায়গা ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বেশ ভালো ফসল হয়েছিলো; এবং আমরা জানতে পারি যে, বাংলাদেশের এই অঞ্চল থেকে ধান-চাল বাইরে চালান দেয়া হয়; তবে এই এলাকাটিকে এজন্য ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়নি।[৮৪ক] উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলোতেও বেশ ভালো ফসল হয়েছিলো এবং বাহারের সুপারভাইজারের বিলাপের জবাবে কেন্দ্রীয় কমিটি তীক্ষ্ণভাবে বলেন : 'আপনার প্রতিবেশীরা যখন ভালো ফসল হওয়ায় সমৃদ্ধি ভোগ করছে, তখন আপনারা অনটন ও দুর্ভিক্ষ জর্জরিত হয়ে পড়েছেন, এই অবস্থা একটি অপ্রীতিকর বৈপরীত্য এবং ব্রিটিশ নীতির পক্ষে ক্ষতিকর।'[৮৫] গত শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ যতো স্থানীয় প্রকৃতিরই হোক না কেন, তার প্রতিক্রিয়া সামান্যভাবেই বিপজ্জনক হতো। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিলেট জেলায় ১৭৮০ ও ১৭৮১ সালে প্রচুর ফসল হয়েছিলো, কিন্তু পরের বছর স্থানীয় বন্যায় ফসল মারা গিয়েছিলো; ফলে নদীপথে আমদানির সুযোগ-সুবিধে থাকা সত্ত্বেও এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিলো। ১৭৮৪ সালেও একই অবস্থা হয়েছিলো; ফলে দুই-তৃতীয়াংশ গবাদিপশু মারা গিয়েছিলো।[৮৬]

১৮৬৬ সালে ইউরোপের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক থাকার ফলে বাংলাদেশের (উড়িষ্যা বাদে) পক্ষে অন্যান্য প্রদেশ থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য কেনা সম্ভব হয়েছিলো। মূলধন নিয়োগের জন্য খাদ্য আমদানি একটা লাভজনক ব্যবসা ছিলো; ফলে এই ব্যবসায়ে প্রচুর পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা হয়েছিলো। উত্তর ভারতের সমস্ত ফসল একটিমাত্র প্রদেশের ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিলো। এই ব্যবস্থার

---

৮৩. একই পত্রের ৩৯ অনুচ্ছেদ।

৮৪. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ২৫শে আগস্ট, ১৭৭০; ২৬ অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৮৪ক. কনস্যালটেশনস, ২৮শে এপ্রিল, ১৭৭০।

৮৫ কনস্যালটেশনস, ৩রা মে, ১৭৭০। পরে উত্তরাঞ্চল থেকে আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, এবং সেখানেও দাম বেড়ে যায়।

৮৬. সিলেটের কালেক্টর অনারেবল রবার্ট লিন্ডসের রিপোর্ট, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৭৮৪। দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট, ১৮৬৬। লর্ড লিন্ডসে প্রণীত 'লাইভস অব দি লিন্ডসেস', তৃতীয় খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা (১৮৪৯)।

ফলে জনসাধারণের দুর্দশা বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং প্রাণহানি প্রতিরোধ করাও সম্ভবপর হয়। কোনো কোনো জায়গায় অবশ্য যথেষ্ট প্রাণহানি ঘটেছিলো এবং কি দুই-একটি জায়গা জনশূন্যও হয়ে পড়েছিলো।

অনটন সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে আমি দুটো বিষয় ব্যাখ্যা করতে চাই। এই দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি অনটনের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অপরটি হচ্ছে অনটনের মোকাবিলা করার পদ্ধতি। ভারতে ফসলের ঘাটতির ফলে স্বাভাবিক অনটন থেকেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; এবং ফসল পুরোপুরি মারা গেলে দুর্ভিক্ষের তীব্রতাও বেড়ে যায়। প্লাবনের ফলে সাময়িকভাবে অভাব ঘটতে পারে; তবে নিচু এলাকার ঘাটতি সাধারণত উঁচু এলাকার পরবর্তী প্রাচুর্যে পূরণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অনাবৃষ্টির ফলে ডিসেম্বরের ফসল মারা গেলেও দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে। দুর্ভিক্ষের বাস্তব প্রতিক্রিয়া অবশ্য মূল্যবৃদ্ধিজাত প্রকৃত চাপের উপর নির্ভর করে। দেশীয় শাসনব্যবস্থায় এবং ১৭৭০ সালে শাসন বিষয়ে কোম্পানির প্রথম প্রচেষ্টার সময় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত চাপ স্বাভাবিক অনটনের আনুপাতিক হারে হয়। ফসল মারা গেলে লোকও মারা যেতো : প্রকৃত চাপ স্বাভাবিক অনটন এবং স্বাভাবিক অনটন প্রকৃত চাপের অনুপাতে দেখা দিতো। যে সকল মধ্যবর্তী প্রভাব প্রকৃত চাপ ও স্বাভাবিক অনটনের সম্পর্ককে অনিশ্চিত ও অপ্রত্যক্ষ করে তুলে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য আধুনিক সভ্যতার একটা প্রবণতা রয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে ভারতে এই ঘটনাই ঘটেছে এবং নিচের দুটো উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যাবে।

১৮৩৭ ও ১৮৬১ সালের দুর্ভিক্ষ

পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলোতে দু'বার তীব্র অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে। দু'বারই প্রায় সমপরিমাণ ফসল নষ্ট হয়েছে এবং সরকারি হিসেবে স্বাভাবিক অনটনও প্রায় সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৭] প্রথম অনাবৃষ্টি হয় ১৮৩৭ সালে এবং দ্বিতীয়বার হয় ১৮৬০-৬১ সালে। ১৮৩৭ সালে ভারত প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ইউরোপীয় প্রচেষ্টার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু প্রকৃত পরিবর্তন তখনো ঘটেনি। তখন রেলপথ ছিলো না; রাস্তা ও নদীপথের সংখ্যা আওরঙ্গজেবের আমলের চেয়ে বেশি ছিলো না; বেসরকারি ব্রিটিশ প্রভাব এবং তার ফলে সর্বত্র যে যানবাহনের সুবিধা সৃষ্টি হয়, তা বড়ো বড়ো শহরগুলোর আশেপাশেই সীমাবদ্ধ ছিলো; বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য উন্মুখ যে অতিরিক্ত মূলধন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, তখন তারও অস্তিত্ব ছিলো না। মোটকথা, আধুনিক সভ্যতায় স্বাভাবিক অনটন ও তার প্রকৃত চাপের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়, তখন তা গড়ে ওঠেনি; এবং অনশনের সেই প্রাচীন একঘেঁয়ে কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি ঘটতো। একজন সদাশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুটো বড়ো

---

৮৭. কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথের রিপোর্ট,—বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে পার্লামেন্টে পেশকৃত দলিল-দস্তাবেজ (১৮৬৮)। [illegible]। প্রথম খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

শহরে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা বারো শ' পর্যন্ত উঠেছিলো; এবং পল্লী অঞ্চলের মানুষ গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিলো।[৮৮] দুর্ভিক্ষের নয় মাস সময়ের মধ্যে সমগ্র পল্লী সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তী পঁচিশ বছরে তারও একরকম জবরদস্তিভাবেই সভ্যতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো এবং ১৮৩৭ সালে অজ্ঞাত বহু প্রতিরোধমূলক শক্তি ১৮৬০ সালের অনাবৃষ্টির প্রতিক্রিয়াকে প্রতিহত করেছিলো। স্বাভাবিক অনটন সমানই ছিলো, তবে অন্যান্য প্রদেশ থেকে খাদ্যশস্য কেনার জন্য টাকার অভাব ছিলো না। তাছাড়া নবনির্মিত রেলপথ এবং বহুসংখ্যক রাস্তা খাদ্যশস্যের আমদানি এবং বণ্টন দ্রুত ও সস্তা করে তুলেছিলো। এমন কি দৃঢ়তা ও কঠোরতার জন্য বিখ্যাত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডও মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে ক্ষয়ে উঠেছিলো বলে সরকারিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে;[৮৯] 'প্রত্যেকটি গাড়ি, বলদ, উট, গাধা, অর্থাৎ যানবাহনের যে সকল উপকরণ দেশে ছিলো, তার প্রত্যেকটিই' কাজে লাগানো হয়েছিলো; এবং প্রধান প্রধান রেলস্টেশনগুলো ধান-চালের বস্তায় বোঝাই হয়ে উঠেছিলো।[৯০] স্বাভাবিক অনটন ও প্রকৃত চাপের মধ্যে যখন ব্যবসায়িগণ হস্তক্ষেপ করেছিলেন, ঠিক সেই সময় বেসরকারি দান এমন একশ্রেণীর লোককে বাঁচিয়ে রেখেছিলো, যারা সাধারণ ফলনের বছরে কোনোমতে বেঁচে থাকার মতো আয় করে থাকে। বাংলাদেশে মূলধন ও শ্রমের মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক যতোদিন বজায় থাকবে, ততোদিন এই শ্রেণীর লোকেরা অনটনের সময় সর্বদাই অপরের দানশীলতার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে।

১৭৭০ ও ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ

দ্বিতীয় উদাহরণটি নিম্নাঞ্চলের জেলাগুলোর দুটি দুর্ভিক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে। প্রথম দুর্ভিক্ষটি হয় ১৭৭০ সালে এবং দ্বিতীয়টি হয় ১৮৬৬ সালে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক অনটনের তুলনা করার জন্য খুব বেশি তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আমরা জানি যে, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যা নামে অভিহিত বাংলাদেশের একটি অংশের অবস্থা ১৭৭০ সালের সমগ্র প্রদেশের অবস্থার অনুরূপ ছিলো, যে সকল মধ্যবর্তী প্রভাব স্বাভাবিক অনটনের প্রকৃত চাপে রূপান্তরিত হতে বাধা দেয়। অন্ততপক্ষে সেই সকল প্রভাবের ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিদ্যমান ছিলো। যে সকল এলাকায় একই অবস্থা বিদ্যমান ছিলো সেই সকল এলাকার ধানের দাম থেকে বুঝা যায় যে, উভয় দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রেই প্রকৃত চাপ একই ধরনের ছিলো—দাম পাউন্ড প্রতি সর্বাধিক চার পেন্স এবং গড়পড়তা দুই পেন্সের কিছু বেশি বেড়ে গিয়েছিলো। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আজকালকার তুলনায় তখনকার দিনে রূপা দুষ্প্রাপ্য ছিলো। ফসলের ক্ষয়ক্ষতি আনুপাতিক হারে একই পরিমাণ হয়েছিলো বলে মনে হয়। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার জেলাগুলো এবং ১৭৭০ সালে রাজমহল জেলা চরম দুর্দশায় পতিত হয়েছিলো। এই জেলাগুলোর ফসল

---

৮৮. মূল ব্রিটিশ কমিটির জনৈক সদস্যের পত্রের ভিত্তিতে এই উক্তি করা হয়েছে। কলকাতায় প্রকাশিত আমার 'কবাল ভেচেস' নামক পুস্তকে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়েছে।

৮৯. দুর্ভিক্ষ কমিশনারদের রিপোর্ট (১৮৬৬) প্রথম খণ্ড, ৭৩ অনুচ্ছেদ।

৯০ দুর্ভিক্ষ কমিশনারদের রিপোর্ট একই অংশ দ্রষ্টব্য।

সাধারণত যা হয়ে থাকে, তার তুলনায় মাত্র অর্ধেক হয়েছিলো বলে সরকারিভাবে উল্লেখ করা হয়।[৮১] ১৮৬৫ সালের প্রথম দিকে উড়িষ্যায় যে ফসল হয়েছিলো, তা রাজমহলের ১৭৬৯ সালের ফসলের তুলনায় বেশি হলেও পরে উড়িষ্যা থেকে খাদ্যশস্য বাইরে রফতানি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গড়পড়তা একই অবস্থা দাঁড়িয়েছিলো। অতএব ধরে নেয়া যেতে পারে যে, স্বাভাবিক অনটন একই রকমের ছিলো। তবে সুখের বিষয়, প্রকৃত চাপের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। ১৭৭০ সালে স্বাভাবিক অনটন সরাসরি প্রকৃত চাপে রূপান্তরিত হয়েছিলো। বছরের মাঝামাঝি সময়ের আগেই এক কোটি লোক মারা গিয়েছিলো; এবং অনেক সরকারি কর্মচারীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বছরের শেষে দরিদ্র চুন-শ্রমিকদের প্রতি দেড় শ' জনের মধ্যে মাত্র পাঁচজন বেঁচে ছিলো,[৮২] এবং দেশের তিন ভাগের মধ্যে একভাগ জঙ্গলে পরিণত হয়েছিলো। ১৮৬৬ সালে অন্যান্য প্রদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করার জন্য রাস্তা, রেলপথ, খাল প্রভৃতি দিনরাত সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকতো; এবং অবশেষে একদিন এই বিপুল পরিমাণ মাল খালাসের জন্য জায়গা দেয়া বন্দরের[৮৩] পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো এবং রেললাইন ও সাইডিং-এর উপর মাল নামানোর কাজে দেশীয় জাহাজীদের বাধা দেয়ার জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করতে হলো। ১৭৭০ সালে সমগ্র প্রদেশে যে অবস্থা বিদ্যমান ছিলো, ১৮৬৬ সালে নিম্নবঙ্গের একটি অংশে ঠিক সেই অবস্থা বিরাজ করছিলো। এই অংশটির নাম উড়িষ্যা; অভাবের প্রকৃত চাপ যখন স্বাভাবিক অনটনের সমান হয়, তখনকার দুর্দশা ভোগ করে উড়িষ্যার অধিবাসিগণ প্রাচীনকালে দুর্ভিক্ষ শব্দটি দ্বারা যে কি বুঝাতো, তা আধুনিক জগতের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উপায়

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উপায়গুলোকে দুটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়; প্রথম উপায়গুলো স্বাভাবিক অনটন প্রতিরোধ করে এবং দ্বিতীয় উপায়গুলো স্বাভাবিক অনটন ও প্রকৃত চাপের মধ্যবর্তী প্রভাবের উন্নতি বিধান করে। স্বাভাবিক অনটন দু'ভাবে প্রতিরোধ করা যায় : প্রথমত সরকার নিজ ব্যয়ে সেচ ও পানি নিষ্কাশনের কাজ করতে পারেন এবং দ্বিতীয়ত কৃষকদের জমির মালিকানা দিয়ে এই কাজে তাদের উৎসাহ দিতে পারেন; বলাবাহুল্য নিজের জমির উন্নতি বিধানের মুনাফায় আকৃষ্ট হয়ে কৃষকরা মালিক হওয়ার পর স্বভাবতই সেচ ও নিষ্কাশনের কাজে আগ্রহশীল হবে। এ বিষয়ে উড়িষ্যার ১৮৬৬ সালের অবস্থা। ১৭৭০ সালে সমগ্র প্রদেশের অবস্থার অনুরূপ ছিলো : উড়িষ্যায় তখন না ছিলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত,[৮৪] না ছিলো সরকারি পরিচালনাধীন কোনো সেচ ব্যবস্থা;

---

৮১. দুর্ভিক্ষ কমিশনারদের রিপোর্ট (১৮৬৬), প্রথম খণ্ড, ৭৪ অনুচ্ছেদ। রাজমহলের সুপারভাইজার মি. হারউডের রিপোর্ট। কনসালটেশনস, ২৮শে এপ্রিল, ১৭৭০।

৮২. কনসালটেশনস, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১।

৮৩. কুষ্টিয়া। এই ঘটনাটি আমার নিজের আদালতেই ঘটেছিলো।

৮৪. দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের জমিদারগণ চাষাবাদের ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন; উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থগিত রাখার ফলেই তাঁরা এই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

এবং সমগ্র নিম্নবঙ্গের মধ্যে একমাত্র উড়িষ্যাতেই ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দৃশ্যাবলির পুনরাবৃত্তি ঘটেছিলো।[১৫]

স্বাভাবিক অনটন ও প্রকৃত চাপের মধ্যবর্তী প্রভাবের উন্নতি বিধানকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিরোধমূলক উপায়গুলোর সংখ্যা অনেক বেশি। যে সকল উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করা ও মূলধন গড়ে তোলা যায় এবং যে সকল উপায়ে যানবাহন ও বন্টনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়, তার সবগুলোই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি, অধিবাসীদের মধ্যে প্রচেষ্টার মনোভাব সৃষ্টি, বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের পরিবেশ গঠন এবং পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার মনোভাব সৃষ্টির জন্য যা কিছু সহায়ক হতে পারে তার প্রত্যেকটিই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত চাপ হ্রাসে সাহায্য করে থাকে। সমস্ত দফাগুলো সংক্ষেপে বলতে হলে বলতে হয়, কল্যাণকামী সরকার ও আধুনিক সভ্যতা। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য এইগুলোই একমাত্র উপায়। এই সকল ব্যবস্থা যেখানে আছে, সেখানে অনটন কখনো জনশূন্যতায় রূপান্তরিত হবে না; যেখানে নেই, সেখানে সরকারি প্রচেষ্টা দুর্ভিক্ষের তীব্রতা হ্রাস করতে পারে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে জনহিতকর কাজ ও সুগঠিত দাতব্য ব্যবস্থার মতো অতিরিক্ত সাহায্যসূচি কল্যাণকামী সরকার ও আধুনিক সভ্যতার ক্রিয়াশীলতার পক্ষে সহায়ক হতে পারে বটে।

যেক্ষেত্রে স্বাভাবিক অনটন সরাসরি প্রকৃত চাপে রূপান্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের তীব্রতা হ্রাসের জন্য দুটি বিশেষ ব্যবস্থা কম-বেশি সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যে একটি হচ্ছে রফতানি করা এবং অপরটি হচ্ছে সরকারি খরচে আমদানি করা। দুটি ব্যবস্থাই বিপজ্জনক এবং এই ব্যবস্থাই যদি সফল হয়, তাহলে সে সফলতার অর্থ হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না; অর্থাৎ কল্যাণকামী সরকার ও আধুনিক সভ্যতা যেখানে এখনও চালু হয়নি। ১৭৭০ সালে নিম্নবঙ্গে এবং ১৮৬৬ সালে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত উড়িষ্যায় এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিলো।[১৬]

সম্ভ্রান্ত বংশের পতন

১৭৭১ সাল শুরু হওয়ার আগেই এক পুরুষ কৃষকের এক-তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো এবং এককালে ধনবান পরিবারের এক পুরুষ নিঃস্ব ভিখারিতে পরিণত হয়েছিলো। প্রত্যেকটি জেলাতেই এই একই কাহিনী শুনতে পাওয়া যেতো। তখনকার দিনে সরকার বলতে সাধারণ লোকে জমিদারকেই বুঝতো। জমিদাররা বিত্তশালী ও সম্পত্তিপন্ন ছিলেন। কিন্তু সে বছর জনসাধারণের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে না

---

১৫. তবে ১৮৬৬ সালে মানুষ মানুষের গোশত খায়নি, এবং সমগ্র বাংলাদেশে এক কোটির স্থলে সাড়ে সাত লক্ষ লোক মারা গিয়েছিলো।

১৬. ক্ষেত্রবিশেষে সরকার আমদানির কাজে হাত দিতে পারেন বলে স্বীকার করে নিয়ে দুর্ভিক্ষ কমিশনারগণ বলেছেন যে, এর ফলে রফতানির কাজ ব্যাহত হতে পারে না। আমার মনে হয় মি. মিলের এই যুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

পাল্লায় তাঁদের বরখাস্ত ও কারারুদ্ধ করা হয়েছিলো এবং তাঁদের পরিবারবর্গের একমাত্র আয়ের পথ জমিদারী অন্য লোকের কাছে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিলো।[৯৭] বাংলাদেশের যে সকল প্রাচীন পরিবার মোগলদের অধীনে আংশিক স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং ব্রিটিশ সরকার পরে যাদের জমিদার বলে মেনে নিয়েছিলেন, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো। নিম্নবঙ্গের দুই-তৃতীয়াংশ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত সামন্ত পরিবারের পতন ১৭৭০ সাল থেকেই শুরু হয়েছিলো। বর্ধমানে দুর্ভিক্ষের আগুন সর্বপ্রথম জ্বলে উঠেছিলো এবং সর্বশেষে নির্বাপিত হয়েছিলো। দুর্ভিক্ষের শেষের দিকে বর্ধমানের মহারাজা রাজকোষ সম্পূর্ণরূপে শূন্য রেখে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পরলোক গমন করেন। ফলে তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্রকে স্বর্ণনির্মিত পারিবারিক প্রতীক গালিয়ে বিক্রি করতে হয় এবং তা ফুরিয়ে গেলে পিতার শ্রাদ্ধের জন্য তাকে সরকারের কাছে ঋণ ভিক্ষা করতে হয়।[৯৮] ষোলো বছর পর সরকারের দাবি পূরণ করতে না পারায় এই হতভাগ্য রাজপুত্রকে আমরা তাঁর নিজের প্রাসাদেই বন্দি অবস্থায় দেখতে পাই।[৯৯] তিনি এমন একটি বংশের প্রতিনিধি ছিলেন, যে বংশের জমি ও দালান-কোঠা প্রত্যেকটি বড়ো রাস্তার চারদিকে ছড়িয়ে ছিলো, ফলে বংশের প্রধান কর্তা যতো দূরেই সফরে যেতেন না কেন, নিজের এলাকার বাইরে তাঁকে কখনোই পা দিতে হতো না। বর্ধমান মহারাজার বার্ষিক আয় এক লক্ষ পাউন্ডেরও বেশি এবং কলকাতার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মতো একটি উপদেষ্টা পরিষদের সাহায্যে তিনি তাঁর জমিদারী পরিচালনা করে থাকেন। গত শতাব্দীর আর একজন শক্তিমান সামন্ত[১০০] নদীয়ার রাজা অতিকষ্টে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি খুব গরিব হয়ে পড়েছিলেন। ফলে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব যখন তাঁর হাত থেকে নিয়ে তাঁর ছেলের হাতে অর্পণ করা হয়, তখন অপ্রীতিকর হলেও তিনি সম্ভবত কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন।[১০১] বৈষয়িক ব্যাপারে অপূর্ব দক্ষতার অধিকারী রাজশির মহিলা মালিক[১০২] তাঁর জেলার নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু কিছুদিন পরই রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারায় তাঁকে বেদখল করার, জমিদারী বিক্রি করার এবং তাঁর সরকারি ভাতা প্রত্যাহার করার ভয় দেখানো হয়।[১০৩] উদাহরণের সংখ্যা বাড়ানো খুবই সহজ। পরে আমরা

---

৯৭. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র; তারিখ, ফোর্ট উইলিয়াম, ১০ই নভেম্বর, ১৭৭৩। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৯৮. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র; ২৫শে আগস্ট, ১৭৭০, ৫২ অনুচ্ছেদ । ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

৯৯. রেভিনিউ বোর্ডের নিকট প্রেরিত বর্ধমানের কালেক্টরের পত্র, ১৬ই মে, ১৭৮৬। বর্ধমান রেকর্ডস।

১০০. 'ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিতম' নামক পুস্তকে এই পরিবারের একটি বিবরণ আছে। বার্লিন, ১৮৫২।

১০১. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র; তারিখ, ফোর্ট উইলিয়াম, ১০ই নভেম্বর, ১৭৭৩; ৮, ১১ প্রভৃতি অনুচ্ছেদ।

১০২. রানী ভবানী।

১০৩. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১৫ই মার্চ ১৭৭৪; ৬ অনুচ্ছেদ।

পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর পতন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। এখন সম্ভবত এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, স্থানীয় লিখিত ইতিহাসের প্রারম্ভে সাবালক হওয়ার প্রথম বছরই বীরভূমের রাজাকে বকেয়া রাজস্বের জন্য কারাগারে আটক রাখার পর প্রায় মৃত অবস্থায় মুক্তি দেয়া হয়েছিলো এবং মুক্তি লাভের পরই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

কৃষকের অভাব

যে দেশের অধিবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে চাষ-আবাদের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, সেই দেশে জনশূন্যতার পরই সেই অনুপাতে জমিজমা অনাবাদি হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিলো; ফলে মোট জমির এক-তৃতীয়াংশ দ্রুত পতিত জমিতে পরিণত হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের তিন বছর পর এতো বেশি পরিমাণ জমি অনাবাদি হয়ে পড়েছিলো যে, স্থানীয় রাজাদের রাজ্য থেকে প্রজাদের প্রলুব্ধ করে এই সকল জায়গায় আনার জন্য কাউন্সিল উপায় উদ্ভাবন করতে শুরু করেছিলেন।[১০৪] বিলেতে কোম্পানির চাহিদা পূরণের জন্য প্রদেশের উপর যখন সাধারণভাবে বিপুল করভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো, ঠিক সেই সময় ওয়ারেন হেস্টিংস অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'প্রতিবেশী নবাব উজিরের জেলাগুলো থেকে বাসিন্দা আকৃষ্ট করার জন্য' সীমান্ত এলাকায় দৃশ্যত দয়াদাক্ষিণ্য দেখানো প্রয়োজন। ১৭৭৬ সালে পর্যাপ্তসংখ্যক চাষীর অভাবে বাংলাদেশে জমিদার ও প্রজার সম্পর্কে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিলো। আগে বিপুল সংখ্যক কৃষক জমি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতো, কিন্তু পেতো খুব কম লোকই; জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিলো কৃষি; এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়া অজ্ঞাত ছিলো; এবং কৃষকগণ জমিদার ও তালুকদারদের অধীনে এতো বেশি নির্যাতিত হতো যে, পূর্বে বা পরে তেমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর পর কয়েক বছর প্রচুর পরিমাণ ফসল হওয়ায় দেশে সমৃদ্ধি[১০৫] এসেছিলো, কিন্তু ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং একজন নবাগত মানুষও অতি সহজেই দেখতে পেতেন যে, কৃষকের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি অনাবাদি অবস্থায় রয়েছে। মি. ফ্রানসিস ১৭৭৬ সালে লেখেন, 'দেশের বর্তমান অবস্থায় রায়ত জমিদারের উপর সুবিধে ভোগ করেছে। যেখানে এতো জমি পতিত রয়েছে, অথচ চাষ করার লোক এতো কম রয়েছে, সেখানে জমি নেয়ার জন্য কৃষকদের সাধাসাধি করা ছাড়া উপায় নেই।'[১০৬] ক্রমে ক্রমে কৃষকদের মধ্যে দুটো শ্রেণী গড়ে উঠলো; প্রথম

---

১০৪. কোর্ট অব ডিরেক্টরের প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১০ই নভেম্বর, ১৭৭৩; ১৬ অনুচ্ছেদ।

১০৫. এক বছর এক শ পাউন্ড (প্রায় এক মন দশ সের) চাল এক শিলিং (প্রায় .৬৭ পয়সা) দরে বিক্রি হয়েছিলো; এবং কথিত আছে যে ঢাকার একজন গভর্নর চালের দাম তার শাসনামলের সর্বনিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ শিলিং প্রতি দেড়শ' পাউন্ড নেমে না আসা পর্যন্ত একটি তোরণ বন্ধ করে রেখেছিলেন।

১০৬. মিঃ ফ্রানসিসের বিবরণ—রাজস্ব বিষয়ক আলোচনা, ৫ই নভেম্বর, ১৭৭৬। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

শ্রেণী হচ্ছে আবাসিক কৃষক,[১০৭] অর্থাৎ যারা ভিটেবাড়ির প্রতি মমতাবশত, অথবা ক্ষেত্রবিশেষ জমিদারের কাছে দেনাবশত অন্যত্র না গিয়ে দুর্ভিক্ষের আগে যে জমি চাষ করতো, পরেও সেই জমিতেই থেকে গেলো; এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে অবাসিন্দা বা ভ্রাম্যমাণ কৃষক,[১০৮] অর্থাৎ যারা আগে জমি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গিয়ে সস্তায় জমি সংগ্রহ করতো। দুর্ভিক্ষের পর ছয় বছর সময়ের মধ্যে এই শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো এবং পাইকাস্ত রায়তদের ভূমিকা ইতিপূর্বে অনুল্লেখ্যযোগ্য হলেও তিরিশ বছর যাবৎ তারা বাংলাদেশের পল্লী সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। প্রাচীনকালে জমি পাওয়া যেতো না বলে পাইকাস্ত রায়তদের প্রদেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হতো; কিন্তু ১৭৭০ সালের পর খোদকাস্ত রায়তরাও পাইকাস্তদের দলে যোগ দিলো, কারণ, আগের তুলনায় সর্বত্রই সস্তায় জমি পাওয়া যেতে লাগলো। এই সময় কোনো কালেক্টর যদি বলতে চাইতেন যে, কোনো ইংরেজ ভদ্রলোক সস্তায় জমি সংগ্রহ করেছেন, তাহলে তিনি তাঁকে 'পাইকাস্ত রায়ত' বলে অভিহিত করতেন।

জঙ্গল আর জঙ্গল

দুভিক্ষের পর প্রথম পনেরো বছরে জনশূন্যতা বেড়ে গিয়েছিলো। অভাব-অনটনের সময় শিশুটিই আগে মারা যায় এবং ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত বয়স্ক লোকদের মধ্যে অধিকাংশই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছিলো।[১০৯] এই ব্যাপক দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের মধ্যে তীব্র বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। কারণ, তাদের এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদি অবস্থায় পড়েছিলো; এবং প্রত্যেকেই সস্তায় জমি দেয়ার ও মামলা-মোকাদ্দমা থেকে রক্ষা করার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবেশী জমিদারের এলাকা থেকে প্রজা ভাগিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন।[১১০] চাষ-আবাদ না হওয়ায় যতোই তাঁদের আয় কমে যাচ্ছিলো, ততোই তাঁরা চাষী সংগ্রহের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলো; ফলে পাইকাস্ত রায়তরা অর্ধেক খাজনায় জমি পেয়েছিলো।[১১১] খোদকাস্ত রায়তরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে না পারায় তাদের পূর্ববর্তী জমি ছেড়ে দিলো। ইতিপূর্বে তারা কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে সঙ্গতিপন্ন ছিলো; কিন্তু এখন তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত বলে মনে করতে লাগলো; এবং ব্যাপকহারে সাবেক জমি ছেড়ে দিতে লাগলো। এই জমি

---

১০৭. খোদকাস্ত রায়ত।

১০৮. পাইকাস্ত রায়ত।

১০৯. উদাহরণস্বরূপ বীরভূমের কথা বলা যেতে পারে। রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জন শোরের নিকট লিখিত কালেক্টর ক্রিস্টোফার কিটিং-এর পত্র, ৩রা জুলাই, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১১০. রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জন শোরের নিকট প্রেরিত কালেক্টর ক্রিস্টোফার কিটিং-এর পত্র, ৩০শে আগস্ট, ১৭৮৯। রাজস্ব বোর্ড হইতে কালেক্টরের নিকট প্রেরিতপত্র, ১০ই মে, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১১১. গরীব দাস লিখিত 'বাংলাদেশের জমিজমা সংক্রান্ত মোকররী ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত'; জনৈক সহ; লন্ডন, ১৭৯৪। ১৭৯২ সালে 'মর্নিং ক্রনিকল' পত্রিকায় মি. জে. ফিলসেপ ও মি. টমাস ল'-এর যে বাংলানুবাদ প্রকাশিত হয়, এটি তার পুনর্মুদ্রণ। উত্তরপাড়া সংগ্রহ।

ত্যাগ শেষপর্যন্ত এমন আকার ধারণ করেছিলো যে, ১৭৮৪ সালে পার্লামেন্ট কৃষকদের এই জমি ত্যাগের কারণ সম্পর্কে তদন্তের আদেশ দিয়েছিলেন।[১১২] বলা বাহুল্য পার্লামেন্ট কেবলমাত্র বাহ্যিক বিশৃঙ্খলার কথাই জানতেন, কিন্তু তার কারণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। পার্লামেন্টের আইন দ্বারা অবশ্য কোনো প্রদেশকে জনমানবে পরিপূর্ণ করে তোলা যায় না। ফলে ১৭৬৯ সাল পর্যন্ত জমি অনাবাদি রয়ে গেলো এবং তিন বছর যাবৎ সতর্ক তদন্তের পর লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলাদেশে কোম্পানির এলাকার এক-তৃতীয়াংশ পশুপাখিতে পরিপূর্ণ জঙ্গল বলে ঘোষণা করলেন।[১১৩]

খাজনা আদায়ের কড়াকড়ি

বাংলাদেশ যখন ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সেখানকার অবস্থা এইরূপ ছিলো। পশ্চিমাঞ্চলের দুটি রাজ্য সম্পর্কে আমি এই পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। দুর্ভিক্ষের চার বছর আগে ১৭৬৫ সালে বীরভূমে প্রায় ছয় হাজার গ্রামে চাষ-আবাদ হয়েছিলো এবং প্রত্যেকটি গ্রামের চারদিকে বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত ছিলো।[১১৪] কিন্তু দুর্ভিক্ষের তিন বছর পর ১৭৭১ সালে মাত্র সাড়ে চার হাজার গ্রামে লোকবসতি ছিলো।[১১৫] কৃষকগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গিয়েছিলো; কিন্তু তবু ১৭৭১ সালে বীরভূমের জনৈক অফিসার লিখেছেন, 'এমন কি বড়ো বড়ো শহরেও এক-চতুর্থাংশ বাড়িতে আদৌ লোকবসতি ছিলো না।'[১১৬] পরের বছর ১৭৭২-৭৩ সালে মুসলমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও দেশীয় অধঃস্থ কর্মচারীদের সাহায্য ছাড়াই ওয়ারেন হেস্টিংসের খাজনা সংক্রান্ত বিষয়টি প্রথমবার বুঝাপড়া করার চেষ্টা করেছিলেন এবং গ্রামের সংখ্যা ১৭৭১-৭২ সালের চেয়ে প্রায় একশ' বেশি বলে উল্লেখ করেছিলেন।[১১৭] কিন্তু সত্যকে গোপন করা সম্ভব হয়নি : ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত জনশূন্যতা বহাল ছিলো এবং এই সময়ের মধ্যে গ্রামের সংখ্যা কমে গিয়ে চার হাজার চারশতে দাঁড়িয়েছিলো। এছাড়া ১৭৬৫ সালে যে ছয় হাজার সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিলো, তার মধ্যে প্রায় দেড় হাজার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো এবং সমস্ত জমি জঙ্গলের কবলে চলে গিয়েছিলো।[১১৮] এমন কি যে সকল এলাকা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছিলো না, সেখানেও বহু বর্গমাইল উর্বর জমি পতিত ছিলো এবং একদলের পর আর একদল আদায়কারী আপ্রাণ চেষ্টা করেও জনসাধারণের কাছ

---

১১২. উত্তরপাড়া সংগ্রহ।

১১৩. গভর্নর জেনারেলের বিবরণ, ১৮ই সেপ্টেম্বর,১৭৮৯। কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত তাঁহার ১৭৮৯ সালের ২রা আগস্টের পত্রও দ্রষ্টব্য।

১১৪. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র, ৩রা জুলাই, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১১৫. বাংলা ১১৭৮ সালের হস্তবুদ হিসেবে ও দলিলপত্র (ইংরেজি ১৭৭১-৭২)। রাজস্ব বোর্ড, ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

১১৬. সুপারভাইজার মি. হিগিনসনের রিপোর্ট, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১। ইন্ডিয়া অফিস।

১১৭. বীরভূম হস্তাবুদ,-রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র, ৩রা জুলাই, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১১৮. নিশ্চিহ্ন গ্রামের সঠিক সংখ্যা ছিলো ১৪৪৫।

থেকে খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। ১৭৭২ সালে বৃদ্ধ কৃষকগণ সুখী-সমৃদ্ধির সকল আশাই ছেড়ে দিয়েছিলো; কিন্তু পাওনাদারগণ তাদের ছেড়ে দেয়নি—বকেয়া দেনার দায়ে তাদের কলকাতার কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। প্রত্যেকবার রাজস্ব আদায়ের সময় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো; আদায়কারীরা আদায় করতে পারেনি বলে জমিদার ইংরেজের কোষাগারে রাজস্ব জমা না দেয়ার কৈফিয়ত দিয়ে রেহাই পেতো এবং আদায়কারীরা বিনা কৈফিয়তেই জেলে যেতো। দুর্ভিক্ষের প্রায় কুড়ি বছর পরে জেলার সরাসরি শাসনভার গ্রহণ করে ইংরেজরা রাজস্ব সংক্রান্ত কয়েদিতে জেলখানা পরিপূর্ণ দেখতে পান; এবং তাদের মধ্যে একজনেরও আর মুক্তিলাভের কোনো সম্ভবনা ছিলো না।[১১৯] এজন্য অবশ্য একমাত্র রাজাই দায়ী ছিলেন না; ইংরেজদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। দেশে যখন প্রতি বছরই অভাব-অনটন বেড়ে যাচ্ছিলো, ব্রিটিশ সরকার তখন ক্রমেই বেশি পরিমাণ খাজনা দাবি করছিলেন। ১৭৭১ সালে সরকারি দলিলপত্রে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি 'পরিত্যক্ত'[১২০] বলে উল্লেখ করা হয়; এবং ১৭৭৬ সালে একই দফায় অর্ধেকেরও বেশি জমি পতিত বলে দেখানো হয়। অবশিষ্ট যে পরিমাণ জমিতে আবাদ হতো সেখানে সাত একর আবাদ হলে চার একর অনাবাদি থাকতো।[১২১] পক্ষান্তরে কোম্পানির টাকার দাবি বেড়েই চলেছিলো; ১৭৭২ সালে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে এক লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং ধার্য করেছিলেন, কিন্তু ১৭৭৬ সালে কোম্পানি টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে এক লক্ষ বারো হাজার স্টার্লিং করেন। মুসলমান সৈন্যরা মারধর করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো, কিন্তু চরম নির্যাতন সত্ত্বেও আদায়ের পরিমাণ ধার্য পরিমাণের অর্ধেকও হতো না।[১২২]

বীরভূমে বাঘের রাজত্ব

১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের শেষভাগে বীরভূমের যে অবস্থা ছিলো, সে সম্পর্কে 'খ' পরিশিষ্টে প্রত্যক্ষদর্শীর সরকারি বিবরণ পাওয়া যাবে। দশ বছর পর জেলাটিকে আমরা বিচ্ছিন্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় দেখতে পাই। প্রাচীনকালে এই জেলার মধ্য দিয়ে

---

১১৯. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র, ১লা আগস্ট, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১২০. 'পলাতিকা'। বাংলা ১১৭৮ সালের বীরভূম সম্পর্কিত হস্তাবুদ বিবরণ। ক্যালকাটা অফিস রেভিনিউ রেকর্ডস।।

১২১. বাংলা ১১৮৩ সালের বীরভূম সম্পর্কিত হস্তাবুদ বিবরণ। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

১২২.

	সরকার কর্তৃক ধার্য পরিমাণ	প্রকৃত আদায়
১৭৭২	৯৯,৪১৩ পাউন্ড	৫৫,২০৭ পাউন্ড
১৭৭৩	১,০৩,০৮৯ পাউন্ড	৬৬,০৬৫ পাউন্ড
১৭৭৪	১,০১,৭৯৯ পাউন্ড	৫২ ৭০০ পাউন্ড
১৭৭৫	১,০০,৯৮৩ পাউন্ড	৫৩,৯৯৭ পাউন্ড
১৭৭৬	১,১১,৪৮২ পাউন্ড	৬৩,০৫০ পাউন্ড

সেনাবাহিনীর যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাজপথ ছিলো; এই জেলাতেই একাধিকবার যুদ্ধ হয়েছে এবং সেই যুদ্ধে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু ১৭৮০ সালে একদল সেপাই অতিকষ্টে ঘন জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিলো। সম্ভবত এই দলের কোনো অফিসার সংবাদপত্রে একখানি পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রে বলা হয়েছে যে, 'একশ কুড়ি মাইল পথ তারা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন; মাঝে মাঝে দুই-একখানা ছোটখাটো গ্রাম দেখা গিয়েছিলো; গ্রামের চারদিকে কিছু পরিমাণ আবাদি জমি ছিলো, কিন্তু তার পরিমাণ এতোই কম যে, দুই ব্যাটেলিয়ান সৈন্যের জন্যও সেখানে ছাউনি ফেলা যায় না। জঙ্গলে অসংখ্য বাঘ-ভালুক বাস করে, রাত হলেই তারা ছাউনিতে হানা দিতো; তবে একদিন একটি শিশুকে নিয়ে যাওয়া এবং কয়েকটি বলদ মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনো ক্ষতি তারা করেনি।'[১২৩] জেলার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত না থাকায় পথের বাধা বিঘ্নের ভিত্তিতে বিচার করে পত্রলেখক সেপাইদের অভিযান সম্পর্কে এমন প্রশংসাসূচক বর্ণনা দিয়েছেন যে, তা পড়লে মনে হবে সেপাইদল যেন এমন একটি সাফল্যময় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, যা আগে কখনো সম্ভবপর হয়নি। নয় বছর পর জঙ্গল এমন দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিলো যে, দুটো গুরুত্বপূর্ণ শহরের মধ্যকার সমস্ত সংযোগ ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গিয়েছিলো এবং পঞ্চাশ মাইল পথ ঘুরে অন্য একটি জেলার মধ্য দিয়ে ডাক যেতে হতো।[১২৪]

গ্রামবাসিগণ ঘরবাড়ি ছেড়ে ক্রমে ক্রমে যতোই জেলার মধ্যস্থলের দিকে এসে বসবাস শুরু করছিলো, জঙ্গলের জন্তু-জানোয়াররা ততোই তাদের এক্তিয়ার বাড়িয়ে গ্রামবাসীদের পিছু-পিছু এগিয়ে আসছিলো। কোম্পানি অবশেষে নিরুপায় হয়ে প্রত্যেকটি বাঘের মাথার জন্য এমন নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেন, যার সাহায্যে একটি কৃষক পরিবারের তিন মাসের সংসার খরচ নির্বিবাদে চলে যেতো। জরুরি পরিস্থিতির জন্য একসময় কোম্পানিকে অন্য সমস্ত খরচ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছিলো; কিন্তু বাঘ মারার পুরস্কারের খরচ বন্ধ করা হয়নি। এই সময় কেবলমাত্র বাঘ মারার পুরস্কার ও কয়েদিদের খাবার খরচ ছাড়া অন্য সমস্ত খরচই বন্ধ রাখা হয়েছিলো।[১২৫] কিন্তু কোম্পানির এই প্রচেষ্টাও তেমন ফলবতী হয়নি। প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামের চারদিকেই বাঘ-ভালুকে পরিপূর্ণ ভয়াবহ জঙ্গল ছিলো; এবং এই সময়কার দলিলপত্রে প্রায়ই ডাকের থলি বন্য পশুতে নিয়ে গিয়েছে বলে উল্লেখ দেখা যায়।[১২৬] জঙ্গল সাফ করার জন্য জমিদারদের উপর একাধিকবার আদেশ জারি করা হয়েছিলো, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। বীরভূমের মধ্য দিয়ে যে নতুন সামরিক রাস্তা চলে গিয়েছি, সেটা চালু রাখার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিশ অবশেষে বাধ্য হয়ে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর

১২৩. হিকিস গেজেট, কলিকাতা, ২৯শে এপ্রিল, ১৭৮০।
১২৪. বিবিধ খরচের বিল, ২৯শে মে, ১৭৮৯। বীরভূম রেজিডেন্ট রেকর্ডস।
১২৫. বীরভূমের কালেক্টরের নিকট প্রেরিত একাউন্ট্যান্ট-জেনারেলের পত্র, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৭৯০ ও ২৮শে জানুয়ারি, ১৭৯১। বীরভূম রেজিডেন্ট রেকর্ডস।
১২৬. কালেক্টরের নিকট প্রেরিত রাজস্ব বোর্ডের পত্র, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৯। বীরভূম রেজিডেন্ট রেকর্ডস।

করেছিলেন[১২৭]। বুনো হাতির অত্যাচার সবচেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো এবং জেলাটি ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার পর বেশ কিছুদিনের জন্য বুনো হাতির বিনাশ সাধন করা কালেক্টরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। দেশীয় শাসন ব্যবস্থার শেষ কয়েক বছরে 'বুনো হাতির দল দুটি এলাকায় মোট ছাপ্পান্নটি গ্রাম ধ্বংস করে ফেলেছিলো এবং এই এলাকার জমি ক্রমে জঙ্গলে আবৃত হয়ে গিয়েছিলো।'[১২৮] এই সময়কার একটি সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, বুনো হাতির অত্যাচারে জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট চল্লিশটি হাটবাজার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছিলো। বাংলার নওয়াবের[১২৯] অনেকগুলো পোষা হাতি ছিলো; বুনো হাতি ধরার জন্য এই পোষা হাতিগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নওয়াবের অনুমতি সংগ্রহের জন্য বীরভূমের রাজা কোম্পানির কাছে একখানা দরখাস্ত পেশ করেছিলেন।[১৩০] এই দরখাস্তে ধৃত বুনো হাতিগুলোকে উপঢৌকনস্বরূপ নওয়াবকে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী না হওয়ায় বুনো হাতির অত্যাচারে জেলা জনশূন্য হয়ে পড়েছে বলে কারণ দেখিয়ে রাজা অবশেষে খাজনার পরিমাণ কমানোর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দরখাস্ত করেছিলেন। কালেক্টর রাজার এই আবেদনকে যুক্তিসঙ্গত বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'দেওঘর সফরকালে বুনো হাতির অত্যাচারের নিদর্শন আমি স্বচক্ষে দেখেছি; এই নিদর্শন এখনো রয়েছে। নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসীরা উঁচু গাছের ডালে তাদের খাটিয়া ঝুলিয়ে রাখে; বুনো হাতির দল যখন হামলা করে, তখন তারা এই খাটিয়ার উপর উঠে পড়ে এবং নীরবে নিরুপায় অবস্থায় নিচে তার কুঁড়েঘর ও অন্যান্য জিনিসপত্রের ধ্বংস অবলোকন করে। গাছে ঝুলানো কয়েকটি খাটিয়া আমি নিজে দেখেছি এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ব্যবস্থার কারণ জানতে পেরেছি। বিলপাট্টায় এখন খুব কম লোকই অবশিষ্ট আছে; এবং এই ধ্বংসকারী প্রাণী নিশ্চিহ্ন করার জন্য কোনো ব্যবস্থা না করা হলে নিকটবর্তী পরগণাগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে বলে জমিদার যে আশংকা প্রকাশ করেছেন, তা কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হবে।[১৩১]

বুনো হাতির ধ্বংসলীলা

ইংরেজরা ছোটবেলা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের পক্ষে বৃহদাকার বন্যপশুর মোকাবিলায় কেবলমাত্র বর্শা ও তীর ধনুকে সজ্জিত দেশীয় লোকদের নিরাপত্তাহীন অবস্থার কথা কল্পনা করাও কঠিন। দেশীয় লোকেরা ইংরেজ শিকারিদের

---

১২৭. কালেক্টরের নিকট প্রেরিত রাজস্ব বোর্ডের পত্র, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৯ও ৩০শে এপ্রিল ১৭৯০। বীরভূম রেজিনিউ রেকর্ডস।

১২৮. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত বীরভূমের কালেক্টরের পত্র; এপ্রিল,১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১২৯. মুবারক-উদ-দৌলত (মুবারক-উদ-দৌলা)।

১৩০. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র , ১৫ই অক্টোবর, ১৭৯০; এবং বোর্ডের জবাব, ২৬শে অক্টোবর, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৩১. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র, ৬ই আগস্ট, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

জন্য জঙ্গল পিটিয়ে শিকারকে বাইরে এনে থাকে; যে সকল ইংরেজ এই উপায়ে শিকার করেছেন, তারা জানেন যে, দেশীয় লোকদের সাহসের অভাব নেই। বীরভূমের পাহাড়ি লোকেরা কয়েকজনে মিলে যে ক্ষিপ্র দক্ষতার সঙ্গে বাঘ ঘেরাও করে মারে, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। কিন্তু বুনো হাতিকে বাধা দেয়া অসম্ভব, ঘরের চাল উলটে, দেয়াল ভেঙে, পায়ের তলায় সমগ্র গ্রাম তছনছ করে তারা এমন অনায়াসে ধ্বংস সাধন করে যে, দেখলে মনে হয় গ্রামগুলো যেন সাগর সৈকতে শিশুদের গড়া বালির শহর। সেই আমলে সবচেয়ে নামকরা হাতি-শিকারি লিখেছেন, 'এদেশের অধিবাসীদের সৌভাগ্য যে তারা নির্জন পাহাড়ি এলাকায় বাস করতে ভালোবাসে। সমতলভূমিতে বাস করলে সমগ্র রাজ্যই জনশূন্য হয়ে পড়তো।'[১৩২] রাতের বেলায় বুনো হাতিরা ঘরবাড়ি তছনছ করে ফেলতে পারে বলে দেশের বহু এলাকায় কৃষকরা ঘরে ঘুমাতে সাহস করতো না। এমন কি ১৮১০ সালেও বীরভূমের উত্তরে অবস্থিত একটি জেলার সার্ভেয়ার লিখেছেন, 'বুনো হাতি যে ত্রাসের সৃষ্টি করে তা ভয়ংকর। একদিন আমি পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি গ্রামে রাত কাটিয়েছিলাম। আমি তাঁবুতে শুয়েছিলাম এবং আমার একজন প্রহরী ছিলো। আমার তাঁবুর আশে-পাশের বাড়ির পুরুষেরা রাত হতেই গাছের উপরে উঠে গেলো এবং মেয়েরা গরু-বাছুরের মধ্যে লুকিয়ে রইলো; এইভাবে তারা তাদের বাড়ি থেকে দূরে সরে রইলো, কারণ তারা জানে যে, বুনো হাতিরা ধান-চালের লোভে ঘরবাড়ির উপরই চড়াও হয়ে থাকে। দুই দিন আগে কয়েকটা হাতি একখানা ঘরের চাল উলটে ফেলে সমস্ত ধান-চাল খেয়ে যায়। ঘরের বাসিন্দা একটি গরিব পরিবার ধান-চালগুলো সযত্নে মাটির তলায় জমা করে রেখেছিলো।'[১৩৩] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, দুর্ভিক্ষের পর আবাদি জমি যখন জঙ্গলের কবলে যাচ্ছিলো, সেই সময় বুনো হাতির অত্যাচার তীব্র হয়ে উঠলেও, ১৭৭০ সালের বহু আগেই তাদের ধ্বংস অভিযান শুরু হয়েছিলো। বাংলাদেশের যে সকল জেলা তখন সবচেয়ে সমৃদ্ধ, মুসলমান শাসনের গৌরবময় আমলেও সেই সকল জেলায় বুনো হাতির উৎপাত ছিলো এবং হাতিই তখন রাজস্বের প্রধান এবং কখনো একমাত্র উপায় ছিলো। একটি বিরাট উর্বর এলাকা থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব ছিলো, হাতি বেচা টাকা থেকে তার চেয়ে নিতান্ত কম আয় হতো না।[১৩৪]

পল্লী শিল্পের পতন

১৭৮৬ সালে বুনো হাতির উৎপাত চরমে উঠেছিলো। এই বছর থেকেই বীরভূমে মোটামুটি সরাসরি ব্রিটিশ তদারকি শুরু হয়েছিলো। বাঘ ও হাতির ভয়ে কেবলমাত্র

---

১৩২. সিলেটের কালেক্টর অনারেবল রবার্ট লিন্ডসের আত্মকাহিনী ১৭৭৮-১৭৮৯। লর্ড লিন্ডসে লিখিত 'লাইভস অব দি লিন্ডসেস' তৃতীয় খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

১৩৩. ই. আই. হাউসের বুকানন পেপার্সের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব ভারতের ইতিহাস, প্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।

১৩৪. রেভারেন্ড জেমস লং প্রণীত 'বাংলা কবিতা রাজমালার বিশ্লেষণ', ১৯ পৃষ্ঠা, কলিকাতা। 'লাইভস অব দি লিন্ডসেস', তৃতীয় খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

কৃষকরাই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায়নি। প্রাচীনতম ব্রিটিশ দলিল-দস্তাবেজে দেখা যায় যে, বন্যজন্তুর ভয়ে কামাররা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে; কাঠ-কয়লা প্রস্তুতকারীরা কাজকর্ম বন্ধ করে চলে গিয়েছে। বহু কারখানা ও হাটবাজার পরিত্যক্ত হয়েছে; জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা গবাদিপশুর বেচাকেনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে; এবং পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে যাওয়ার পথে গরু-ছাগলের পাল যেখানে ঘাস-পানি খেতো, সেই বাথানগুলোকে পতিত এলাকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩৫]

দস্যুদের রাজত্ব

কিন্তু বাঘ প্রভৃতি বন্যজন্তুই চাষীদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু ছিলো না। ইংরেজরা বাংলাদেশকে দস্যুকবলিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলো এবং বজমুষ্ঠি খানের[১৩৬] মতো গত শতাব্দীর সকল নেতাদের নাম প্রত্যেকটি স্থানীয় ইতিহাসেই দেখতে পাওয়া যায়; এই ইতিহাস লুণ্ঠন ও নির্যাতনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। মুসলমান খাজনা আদায়কারীদের হাতে জমি থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বেদখল হয়ে দেশের বহু প্রধান প্রধান পরিবার লুঠতরাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো; পাহাড়ি এলাকা ও সমতল ভূমির মালিকদের মধ্যে এই মাত্র পার্থক্য ছিলো যে, পাহাড়ি এলাকার মলিকরা প্রকাশ্যে ও ব্যাপক আকারে লুণ্ঠন করতো। সমতল ভূমির মালিকরা তাদের জমিদারিতে ডাকাতদল পোষণ করতো এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রামগুলো থেকে হামলা না করার মূল্য হিসেবে টাকা আদায় করতো; যে সকল গ্রামের অধিবাসীরা এই শর্ত মেনে নিতে রাজি হতো না, তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুঠতরাজ করে নেয়া হতো। এই সকল জমিদারের পল্লীভবন দস্যুদলের আড্ডাখানা ছিলো এবং প্রথম আমলের ইংরেজ শাসকরা দলিলপত্র উল্লেখ করে গিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি লুঠতরাজের পেছনে একজন না একজন জমিদারের হাত ছিলো।[১৩৭] মুসলিম সেনাবাহিনীর বরখাস্ত সৈন্যরা দলবেঁধে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতো এবং যেখানেই যেতো সেখানেই লুঠতরাজ করতো। গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার জন্য প্রায়ই তারা কোম্পানির সৈন্যদের মতো একই ধরনের পোশাক পরিধান করতো। কোম্পানির সৈন্যরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় পথে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিশৃঙ্খলা আচরণ করতো; ফলে দস্যুদের পক্ষে তাদের আচরণ নকল করা সহজ হয়ে পড়েছিলো। সৈন্যদের এই আচরন বন্ধ করার জন্য কোম্পানি কড়াকড়ি আইন চালু করেছিলেন, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে; ফলে দরিদ্র কৃষকদের শীতকালীন সম্বল সমস্ত ধান-চাল লুণ্ঠিত হওয়ার পর তারা নিজেরাও ডাকাতে পরিণত হলো। ১৭৭১ সালের গোড়ার দিকে স্থানীয় অফিসারগণ লিখেছেন, 'দুঃখ-দুর্দশায় হতাশ ও নিষ্ঠুর হয়ে কিছু সংখ্যক লোক প্রায়ই গ্রামে গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। যে সকল রায়ত ইতিপূর্বে প্রতিবেশীদের মধ্যে সৎ ও সজ্জন বলে পরিচিত ছিলো

---

১৩৫. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত বীরভূমের কালেক্টরের পত্র; ৯ই অক্টোবর, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৩৬. পার্শ্ববর্তী জেলা বর্ধমানের বিখ্যাত জবরদস্ত খান।

১৩৭. ১৮০১ সালে প্রচারিত প্রশ্নমালার জবাব।

তাদের মধ্যে অনেকেই জীবন ধারণের রসদ সংগ্রহের শেষ উপায় হিসেবে এই পন্থা অবলম্বন করছে।'[১৩৮] এই জাতীয় লোকেরা কথাকথিত গৃহহীন ধার্মিক[১৩৯] দলে দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতো এবং তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছিলো। ১৭৭৩ সালে কাউন্সিল লিখেছেন, 'সন্ন্যাসী বা ফকির নামে পরিচিত একদল উচ্ছৃঙ্খল দস্যু দীর্ঘদিন যাবৎ এই দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ধর্মীয় তীর্থযাত্রার অজুহাতে বাংলাদেশের প্রধান অংশে ঘোরাঘুরি করছে,—যেখানেই তারা যাচ্ছে এবং যখনই সুযোগ পাচ্ছে, সেখানেই এবং তখনই পরিবেশ অনুসারে ভিক্ষে করছে, চুরি করছে ও লুঠতরাজ করছে।'[১৪০] দুর্ভিক্ষের পরবর্তী কয়েক বছরে বহু সহায়-সম্বলহীন নিরন্ন চাষী যোগ দেয়ায় তাদের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এই সকল কৃষকের না ছিলো বীজধান, না ছিলো আবাদের সাজসরঞ্জাম, ফলে একরকম বাধ্য হয়েই তারা সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেয়। ১৭৭২ সালের শীতকালে তারা নিম্নবঙ্গের ফসল সমৃদ্ধ এলাকায় এসে চড়াও হয় এবং 'পঞ্চাশ হাজার লোকের এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে।'[১৪১] এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কালেক্টরগণ সেনাবাহিনী তলব করেন; কিন্তু সাময়িকভাবে সফলতা লাভ করলেও 'সেনাবাহিনী শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। এই বাহিনীর নেতা ক্যাপ্টেন টমাস তাঁর দলবল নিয়ে পশ্চাদপসরণ করেন।'[১৪২] শীতকালের শেষের দিকে অবশ্য কাউন্সিল কোর্ট অব ডিরেক্টরকে জানিয়েছিলেন যে, একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির নেতৃত্বে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য তাদের বিরুদ্ধে সফলতার সঙ্গে কাজ করেছে;[১৪৩] কিন্তু এক মাস পরে দেখা যায় যে, সন্ন্যাসীদের শক্তি তখনো এতোটুকুও কমেনি। ১৭৭৩ সালের ৩১শে মার্চ ওয়ারেন হেস্টিংস সরাসরিই স্বীকার করেন যে, ক্যাপ্টেন টমাসের স্থলে যে সেনাপতিকে নিয়োগ করা হয়েছিলো 'দুঃখের বিষয় তিনিও পরাজিত হয়েছেন।' তিনি আরও জানান যে, এই সময় চার ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ সৈন্য সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলো এবং জমিদাররাও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলো; কিন্তু এই সমবেত প্রচেষ্টাও শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দস্যুদলের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের সমর্থন ও সহানুভূতি থাকায় খাজনা আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং পল্লী অঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের শান্ত-অবিচল জীবনে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বার্ষিক বিষয়ে পরিণত হয়।

---

১৩৮. রাজশির (রাজশাহী?) সুপারভাইজর মি. রাউসের পত্র, ১৩ই এপ্রিল, ১৭৭১। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

১৩৯. সন্ন্যাসী।

১৪০. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের (গোপন দফতর) পত্র, ১৫ই জানুয়ারি, ১৭৭৩, ১৩ অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

১৪১. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের গোপন দফতর পত্র, ১লা মার্চ, ১৭৭৩, ১৬ অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

১৪২. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের গোপন দফতর পত্র, ১৫ই জানুয়ারি, ১৭৭৩। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

১৪৩. ১৭৭৩ সালের ১লা মার্চের পত্র, ১৬ অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

শহর-বাজার ভস্মীভূত

দারিদ্র্যবশত অথবা চরিত্রদোষবশত যারা দস্যুবৃত্তি করতো, তারা ছাড়াও এমন বহু সমৃদ্ধ বংশ ছিলো, যারা পৈতৃক পেশা হিসেবে লুঠতরাজ করতো। ঠগ ও ডাকাতরা তাদের পেশাকে নিন্দনীয় বলে মনে করতো না এবং দেশবাসী তাদের এমন ভীতির চোখে দেখতো, যে ভীতিকে তৎকালীন ভারতে শ্রদ্ধা থেকে পৃথক করা যেতো না। একজন ঠগ জনৈক ব্রিটিশ অফিসারকে গর্বের সঙ্গে বলেছিলো, 'আমি একজন রাজকীয় শ্রেণীর ঠগ', গত বিশ পুরুষ যাবৎ আমরা এই পেশা করে আসছি।' একজন বিখ্যাত ডাকাত বলেছিলো, 'আমি সর্বদাই আমার পৈতৃক ব্যবসা করে আসছি।' আর একজন জানিয়েছিলো, 'আমার আগে আমার পূর্বপুরুষরা এই কাজ করতো এবং তাদের মতো আমরাও ছেলেদের এই কাজে শিক্ষা দিয়ে থাকি।' ঠগী ও ডাকাতি কমিশন এ সম্পর্কে এতো অধিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে, যে-সময় পল্লী অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে ইংরেজদের হাতে চলে যাচ্ছিলো সেই পঁচিশ বছর কালের মধ্যেই আমি আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।[১৪৪] ১৭৭২ সালে লিখিত একখানি রাষ্ট্রীয় দলিলে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের ডাকাতরা ইংল্যান্ডের দস্যুদের মতো নয়। ইংল্যান্ডের দস্যুরা আকস্মিক অভাবের তাড়নায় এই পথ বেছে নেয়, আর বাংলাদেশের দস্যুরা পেশাগত, এমন কি জন্মগতভাবেই দস্যু। তাদের একটা পৃথক সম্প্রদায় আছে এবং লুঠতরাজের মাল থেকেই তাদের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ চলে।'[১৪৫] এই লুঠতরাজের মাল প্রায়ই বহু দূর থেকে আসতো; গঙ্গা নদীর তীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা কলকাতায় চুরি-ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। ওয়ারেন হেস্টিংস তাই যথার্থই বুঝেছিলেন যে, এই অপরাধ দমন করতে হলে কেবলমাত্র যারা ঘটনাস্থলেই অপরাধ করে তাদেরই নয়, নিরাপদ দূরত্বে থেকে যারা চোরাই মালের ভাগ পায়, তাদেরও সমানভাবে শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। কোনো অপ্রীতিকর কাজ করতে হলে ওয়ারেন হেস্টিংস সব সময় দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে অগ্রসর হতেন; এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেকটি দণ্ডিত ডাকাতকে তার নিজের গ্রামে নিয়ে গিয়ে 'আইনের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা ও ভয়াবহতার সঙ্গে' ফাঁসি দিতে হবে, তার পরিবারের সমস্ত লোককে ক্রীতদাসে পরিণত করতে হবে এবং গ্রামের প্রত্যেকটি বাসিন্দাকে জরিমানা করতে হবে। এই নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রায় পঁচাত্তর বছর যাবৎ ডাকাতদের তৎপরতা অব্যাহত ছিলো। ডাকাতরা পাঁচ থেকে একশ' জন একত্রিত হয়ে ডাকাতি করতো এবং প্রথমে ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে গ্রামে বা বড় শহরে সশস্ত্র হামলা করতো। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনেক সময় সমগ্র এলাকাই পুড়ে যেতো।

---

১৪৪. মি. কেই লিখিত 'এডমিনিস্ট্রেশন অব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পরবর্তীকালের ঠগী ও ডাকাতি সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যাবে।

১৪৫. সার্কিট কমিটি কর্তৃক কাশিমবাজার হইতে লিখিত ও কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের নিকট প্রেরিত পত্র, ১৫ই আগস্ট, ১৭৭২।

১৭৮০ সালের মার্চ মাসে এই জাতীয় একটি অগ্নিকাণ্ডে কলকাতায় পনেরো হাজার বাড়ি পুড়ে গিয়েছিলো এবং প্রায় দুশ' লোক মারা গিয়েছিলো।[১৪৬] এই সময় বিদ্বেষবশত অগ্নিসংযোগের ঘটনা বহু ঘটেছিলো; ফলে বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয় যে, দুষ্কৃতকারীদের পাকড়াও করার জন্য খড়ের ঘরের মালিকদের একটা করে লম্বা বাঁশ রাখতে হবে এবং এই বাঁশের একপ্রান্তে তিনটি করে আঁকশি থাকবে।[১৪৭] আজকাল যেগুলো রাজধানীর বিলাসবহুল এলাকা বলে গণ্য হয়ে থাকে, তার অতি নিকটেই সংঘবদ্ধভাবে লুঠতরাজ হয়েছে। ১৭৮০ সালের কলকাতার পত্রিকাটিতে ঘোষণা করা হয়, 'কয়েক রাত আগে চার জন সশস্ত্র লোক চৌরঙ্গীর কাছে একটি বাড়িতে হানা দেয় এবং গৃহস্বামীর মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়।' প্রবীণ বাসিন্দাদের এখনো মনে আছে যে, স্থানীয় লোকেরা একসময় ভালো শাল গায়ে গিয়ে রাত্রিকালে বাইরে যেতে সাহস পেতো না। তাছাড়া ইংরেজদের প্রাসাদসহ প্রত্যেকটি বাড়িতেই একটা নিয়ম চালু ছিলো যে, প্রত্যেকবার খাওয়া-দাওয়ার সময় বাইরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হতো এবং খাওয়া শেষ হওয়ার পর থালাবাসন বাকসে তালাবদ্ধ করার পর খুলে দেয়া হতো।

কার জমি?

বীরভূম ও পশ্চিম সীমান্ত বরাবর এই বিশৃঙ্খলা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো যে, জটিল গৃহযুদ্ধের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য ছিলো না। বীরভূমের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে জনৈক পুরাতত্ত্ববিদ বলেছেন, 'যুগ যুগ ধরে তারা সমতলভূমিতে চুরি-ডাকাতি ও খুন-খারাবি করেছে এবং মুসলমান জমিদাররা তাদের কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে।'[১৪৮] বীরভূমের রাজা নিম্নভূমির একটি বিরাট এলাকা দখল করেছিলেন; সেখানকার অধিবাসীরা প্রাচীরবেষ্টিত শহরে অবরোধ অবস্থার মধ্যে বাস করতো। রাজার একটি বিরাট উচ্চভূমি এলাকাও ছিলো এবং সেখানে একটি পৃথক সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো। তাদের উৎপত্তি, ভাষা ও ধর্ম সমতলভূমির লোকদের চেয়ে পৃথক ছিলো এবং এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে বিবাদ-বিসংবাদ বিদ্যমান ছিলো। নিকটবর্তী জেলার জনৈক রাজস্ব সার্ভেয়ার লিখেছেন, 'মুসলমান রাজাদের আমল থেকেই এই পাহাড়ি লোকেরা নিকটবর্তী জেলাগুলোর পক্ষে ভয়ের কারণ ছিলো। কারণ এই সকল জেলার অধিবাসীদের কাছ থেকে তারা হামলা না করার মূল্য হিসেবে টাকা বা দ্রব্যসামগ্রী আদায় করতো এবং তা যখন আদায় হতো না, তখন বাঁশের তীর-ধনুকে সজ্জিত হয়ে দলে দলে পাহাড় থেকে নেমে এসে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ করতো। এই কাজে কেউ বাধা দিলে তারা তাদের খুন করতো এবং লুণ্ঠিত

---

১৪৬. রেভারেন্ড জে. লং লিখিত 'ক্যালকাটা ইন দি ওলডেন টাইমস, ইটস পিপল,' ৩৭ পৃষ্ঠা। কলিকাতা।

১৪৭. রেভারেন্ড জে. লং লিখিত 'ক্যালকাটা ইন দি ওলডেন টাইমস, ইটস পিপল,' ৩৭ পৃষ্ঠা। কলিকাতা।

১৪৮. রাজমহল। পুস্তিকা, ২১ পৃষ্ঠা।

মালমাত্তা নিয়ে এমন গহীন বনে ফিরে যেতো যে, সেখানে কেউ তাদের অনুসরণ করতে সাহস পেতো না।[১৪৯] বীরভূমের উত্তর পার্শ্বে গঙ্গা নদী বরাবর একশ' মাইল এলাকায় সন্ধ্যার পর নদীর দক্ষিণ তীরে কেউ নৌকা ভিড়াতে সাহস করতো না; ডাকের থলি প্রায়ই লুঠ হয়ে যেতো এবং সরকারি টাকা-পয়সা বহনকারী দলের উপর হামলা করা হতো। একসময় রাজকীয় সড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং ভাগলপুর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত বহুসংখ্যক ভাঙা দুর্গের সারি এখনও এলাকাটিতে জীবন ও সম্পত্তির অনিশ্চয়তার সাক্ষ্য বহন করছে।

সাধারণ বিবরণ অবশ্য সুনির্দিষ্ট তথ্যের মতো জোরদার নয় এবং পাছে কোনো বংশানুক্রমিক সামন্ত প্রধানের শাসনকালে সুখময় কাহিনী পাঠকের স্মৃতিপটে জেগে থাকে, সেজন্য আমি বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের প্রথম দুই বছরের অভিজ্ঞতা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করছি; কারণ এই দুই বছরের পূর্ণাঙ্গ দলিলপত্র রয়েছে। যে বিশৃঙ্খলার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিশ জেলাগুলোকে একজন ব্রিটিশ অফিসারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অধীনে এনেছিলেন, তা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। যে চিঠিতে সর্বশেষবার বীরভূমকে স্থানীয় রাজার অধীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে জানানো হয়েছে যে, এক হাজার দস্যুর একটি দল শীঘ্রই সুপরিকল্পিত উপায়ে হামলা করতে যাচ্ছে।[১৫০] স্থানীয় ব্রিটিশ শাসনের নথিপত্রের প্রথম চিঠিতে ধন্যবাদের সঙ্গে সেপাইদের একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানির আগমন স্বীকার করা হয়েছে; এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই দলের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হয়েছে।[১৫১] এই চিঠিগুলোর মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়ে দস্যু দমনের ব্যাপারে মি. শেরবোর্নের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিলো বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। ইংরেজরা বাংলাদেশে এসে যে অবস্থা দেখতে পেয়েছিলেন এবং মুসলিম কুশাসনের যে উত্তরাধিকার তারা লাভ করেছিলেন, পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত তো নয়ই এবং তার চড়া সুরের মাত্রা অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

১৭৮৯ সালের বীরভূম

প্রধান ব্রিটিশ অফিসার কালেক্টর পদবিতে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর এলাকায় প্রধান সেনাপতি ও বেসামরিক গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর কর্তব্যের সামরিক দিকটি কয়েক বছর যাবৎ নিঃসন্দেহে অযথা প্রাধান্য লাভ করেছিলো। প্রত্যেক শীতকালের গোড়ার দিকে যখন ফসল কাটার বড়ো মৌসুম এগিয়ে আসতো, তখন তিনি সেনাবাহিনীর প্রধানের কাছে বিভিন্ন রাস্তার একটি তালিকা দিতেন। বর্ষাকাল না আসা পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে এই সকল রাস্তায় দস্যুদলের আগমন

---

১৪৯ ক্যাপটেন শেরউইলের রিপোর্ট, ২৬ পৃষ্ঠা। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

১৫০. গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল-এর নিকট প্রেরিত এডওয়ার্ড আটো আইহসের পত্র। বীরভূম ভূতিশিয়াল রেকর্ডস।

১৫১. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টর ক্রিস্টোফার কিটিং-এর পত্র, ২২শে নভেম্বর, ১৭৮৮। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

প্রতিরোধ করতে হতো। একবার এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব করা হলে তিনি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সেক্ষেত্রে তিনি জেলার দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হবেন না। 'সামরিক চিঠিপত্র' নামে এই সময়কার যে নথি পাওয়া যায়, তাতে কেবলমাত্র সিনিয়র ক্যাপ্টেনের প্রতি প্রদত্ত তাঁর তিন বছরের আদেশ-নির্দেশগুলো রয়েছে। প্রধান কালেক্টর মি. কিটিং-এর [১৫২] আমলের নথিপত্রগুলো এখনও অক্ষত রয়েছে। এই পদে নিযুক্ত হওয়ার দুই মাসের মধ্যেই তাঁকে পাঁচশ' দস্যুর একটি দলের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাতে হয়েছিলো। এই দস্যুবাহিনী ব্রিটিশ রাজধানী থেকে অশ্বপৃষ্ঠে মাত্র দুই ঘন্টার পথের দূরত্বে অবস্থিত একটি বাজারে 'নেমে এসেছিলো' এবং 'তিরিশ থেকে চল্লিশ গ্রামের অধিবাসীদের খুন করেছিলো, অথবা ত্রাস সৃষ্টি করে তাড়িয়ে দিয়েছিলো।[১৫৩] কয়েক সপ্তাহ পরে(১৭৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) পাহাড়ি লোকেরা পাহারা ঘাঁটিগুলোর বেষ্টনী ভেদ করে দলে দলে ঢুকে পড়েছিলো এবং 'জেলার মফস্বল গ্রামগুলোর সর্বত্র হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ চালিয়েছিলো।'[১৫৪] সর্বত্র রক্তপাত ঘটেছিলো ও ত্রাসের সঞ্চয় হয়েছিলো এবং কয়েকদিনের মধ্যে সীমান্ত এলাকার পথগুলো থেকে ঘাঁটি তুলে দেয়া হয়েছিলো। তারপর দস্যুদলের বিরুদ্ধে নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে কাজ করার জন্য ১৭৮৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মি. কিটিং একটি আধা-সমরিক বাহিনী গঠন করেন। এই সময় 'তিন-চারশ' দস্যুদর এক একটি দল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে হাটবাজারের উপর প্রায় হামলা চালাচ্ছিলো।' ফলে ক্ষীণ প্রচেষ্টায় তাদের কাবু করার উপায় ছিলো না। সপরিষদ গভর্নর জেনারেল অবশেষে দস্যু দমনের জন্য কয়েকটি সংলগ্ন জেলার কালেক্টরকে এলাকাগত এক্তিয়ারের কথা ভুলে গিয়ে[১৫৫] সমবেতভাবে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। এই সমেবত অভিযানের ফলে দস্যুদল শেষপর্যন্ত দুর্গম পাবর্ত্য অঞ্চলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু একজন অফিসারের তুচ্ছ ঈর্ষাপরায়ণতার জন্য এই সাফল্য পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। বিভিন্ন জেলার কালেক্টরদের নিয়ে যে অভিযান পরিষদ গঠিত হয়েছিলো, নিকটবর্তী একটি জেলার কালেক্টরকে তার সদস্য করা হয়েছিলো না; ফলে দস্যুদল সেই জেলার এলাকায় আশ্রয় লাভ করে। এই ঘটনায় যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে মি. কিটিং একটি বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের দলের একজন আহত সেপাইয়ের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, পাচেয়াট জেলার সীমান্তে দস্যুদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু তারা যখন দস্যুদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন কালেক্টরের প্রহরীরা তাদের

---

১৫২. ক্রিস্টোফার কিটিং লেখক হিসেবে ১৭৬৭ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় এসেছিলেন; ১৭৮৮ সালের ২৯শে অক্টোবর বীরভূমের কালেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন; পরে ১৭৯৩ সালের ১লা আগস্টের আগে তিনি বীরভূম ছেড়ে যাননি। ১৮০৪ সালের সিভিল লিস্টে তাঁকে সিনিয়র মার্চেন্ট রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

১৫৩. লেফটেন্যান্ট জে. এফ. স্মিথের নিকট লিখিত কালেক্টরের পত্র, ১০ই জানুয়ারি, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৫৪. সামরিক চিঠিপত্র, ১৫ পৃষ্ঠা। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৫৫. বর্ধমানের কালেক্টর লরেন্স মার্কারের নিকট লিখিত ক্রিস্টোফার কিটিং-এর পত্র, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

বাধা দেয়। প্রহরীরা আমাদের বাহিনীর কাজে সাহায্য না করে জেলার এক্তিয়ারে ঢুকতে তাদের বাধা দেয় এবং দস্যুদের কিছুসংখ্যক লোককে আশ্রয় দেয়। সেপাইটি আমাকে বলেছে যে, পাচেয়াট জেলার প্রহরীদের এই অযথা হস্তক্ষেপের জন্য আমাদের বাহিনীর লোকেরা তাদের চার-পাঁচ জনকে আটক করেছে এবং কৈফিয়ত আদায়ের জন্য তাদের ধরে আনা হচ্ছে।'[১৫৬] শান্তির সময় সামরিক লোকেরা প্রহরী আটক করায় পাচেয়াটের কালেক্টর যে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং দুই পক্ষের মধ্যে যে রেষারেষির সৃষ্টি হয়েছিলো, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

১৭৮৯ সালের বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুরে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিলো, অপেক্ষাকৃত কম অশান্তির সময় তাকে অনায়াসে বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা যেতো। বকেয়া রাজস্বের জন্য রাজাকে বন্দি করা হয়েছিলো এবং কালেক্টর মি. হেসিলরিজের[১৫৭] হেড এসিসট্যান্টের উপর তাঁর জমিদারীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। ফলে প্রজারা দস্যুদের সঙ্গে হাত মিলেয়ে সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে। ১৭৮৯ সালের জুন মাসে সরকারকে সাহায্য করার জন্য একদল সৈন্য পাঠানো হয়; আট দিন পর আরো সৈন্য পাঠানো হয়, কিন্তু তার আগেই জনসাধারণ ও দস্যুরা সমবেতভাবে জেলার প্রধান পণ্য প্রস্তুতকারী শহরকে দিনের বেলায় লণ্ডভণ্ড করে ফেলে।[১৫৮] পরের মাসে মি. কিটিং সরকারকে জানান যে, 'তলোয়ার ও গাদাবন্দুকে সুসজ্জিত হয়ে দস্যুদের একটি বিরাট দল' অজয় নদী পার হয়ে এসে বীরভূমে আস্তানা গেড়েছে এবং তাদের অপসারণের প্রচেষ্টার অর্থই হচ্ছে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা।

ইতিমধ্যে বর্ষাকাল এসে পড়ায় সরকারের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধে হয়েছিলো। দস্যুরা এই সময় তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় ফিরে গেলো; কিন্তু বিষ্ণুপুরকে দখলে রাখার জন্য কিছুসংখ্যক লোক পিছনে রেখে গেলো, কারণ শীতকালে লুঠতরাজ শুরু করার জন্য বিষ্ণুপুরকে তাদের শিবির হিসেবে ব্যবহার করার দরকার ছিলো। মি. কিটিং সীমান্ত এলাকার রক্ষাব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশকে তিনি জানান যে, জেলাটি দখলে রাখার জন্য বর্তমান সামরিক শক্তি অপর্যাপ্ত। স্থানীয় সামন্তরা যে সকল সৈন্য দিয়ে থাকেন, তারা দুর্বলচিত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল এবং দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে মনে মনে তাদের সঙ্গে লড়াই করারই পক্ষপাতী। অতএব নিম্নভূমিতে শান্তি বজায় রাখতে

---

১৫৬. একই শ্রেণীর পত্র। ৯ই এপ্রিল, ১৭৮১।

১৫৭. পরে স্যার জার্বাস হেসিলরিজ, বার্ট। ১৭৭৩ সালে লেখক হিসেবে ভারতে আসেন। ১৭৮৬ সালের ২৫শে এপ্রিল থেকে ৯ই জুলাই পর্যন্ত বীরভূম ও পরে বিষ্ণুপুরের সহকারী কালেক্টর ছিলেন এবং মাঝে মাঝে অস্থায়ী কালেক্টর হিসেবেও কাজ করেন; তহবিল তসরুপের পরে এই অভিযোগে তাকে এই পদ থেকে অপসারণ করা হয়। পরে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়, এবং ১৭৯৩ সালের ১লা মে থেকে তিনি যশোরের কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮০৪ সালের সিভিল লিস্টে তাঁকে সিনিয়র মার্চেন্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫৮. অজয় নদীর তীরে অবস্থিত এলামবাজার।

হলে নিয়মিত বাহিনীর বাছাই করা সৈন্যদের প্রত্যেকটি প্রবেশপথে মোতায়েন করতে হবে।[১৫৯] এই সকল নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যদের চারদিকে অবশ্য অনিয়মিত বাহিনীর সৈন্যদের মোতায়েন করা যেতে পারে। ফেরত ডাকে লর্ড কর্নওয়ালিশ দ্রুত এই চিঠির জবাব দিয়েছিলেন এবং এই দ্রুত কাজ করার ক্ষমতাই ভারতের শাসক হিসেবে তাঁর সাফল্যের মূল কারণ। তিনি লিখলেন, 'প্রধান সেনাপতিকে পর্যাপ্তসংখ্যক সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে; ডাকাতরা সাধারণত যে সকল ঘাট (গিরিপথ) দিয়ে নিম্নভূমিতে প্রবেশ করে থাকে, সেই সকল ঘাটে কালেক্টর এই সৈন্য মোতায়েন করেন। নভেম্বর মাসে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটে সৈন্য মোতায়েন করা হয়; একদল সৈন্যকে বিষ্ণুপুর রাখা হয়; এবং ডাকাতদল যাতে নদী পার হতে না পারে, সেজন্য আর একদল সৈন্যকে অজয় নদীর তীরে এলমবাজারে রাখা হয়। আগের গ্রীষ্মকালে এই বাজারটিই ডাকাতরা লণ্ডভণ্ড করেছিলো। অজয় নদী প্রকৃতপক্ষে একটি জেলাকেই দু'ভাগে ভাগ করেছে—দক্ষিণে বিষ্ণুপুর ও উত্তরে বীরভূম। অতিরিক্ত সামরিক ব্যবস্থার ফলে বিষ্ণুপুরে অপেক্ষাকৃত শান্তি বজায় থাকলেও বীরভূম প্রায় প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়ে। মি. কিটিংই লিখেছেন, 'একটি রাতও বিনা ডাকাতিতে অতিবাহিত হয় না।' নৈশ অভিযানে পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণ ডাকাতদের সঙ্গে পেরে উঠেছিলো না, এমন কি বড়ো শহরগুলোও রক্ষা করতে পারছিলো না। ১৭৮৯ সালের ২৫শে নভেম্বর এই দলের সেনাপতি জানান যে, রাজধানীতে সরকারি অফিসগুলো পাহারা দেয়ার জন্য মাত্র চারজন সৈন্য অবশিষ্ট আছে। কয়েক সপ্তাহ পর একটি সরকারি দল যখন প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে জেলার মধ্য দিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছিলো, তখন তিনি তাদের সঙ্গে কোনো প্রহরী দেয়ার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। সামরিক শক্তির এই অপ্রতুলতার জন্য প্রাচীন রাজধানী ও বংশানুক্রমিক রাজাদের আবাসভূমি রাজনগর ৫ই জুন ডাকাতদের দখলে চলে যায়।[১৬০] পাঁচশ' বছরেরও বেশি আগে বীরভূমে অনুরূপ আর একটি বিপর্যয় ঘটেছিলো। ১২৪৪ সালে দক্ষিণ-পশ্চিমের অসভ্য উপজাতিরা শহরে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ চালিয়েছিলো এবং সামাজিক বিপ্লবের ন্যায় একটি অখ্যাত জেলায় ইতিহাসের একই ধারার পুনরাবৃত্তি থেকে যায় যে, মুসলিম শাসনের গোড়ার মতো শেষের দিকেও একই ধরনের অনাচার ঘটেছিলো।

জেলা রাজধানীতে হামলা

মি. কিটিং-এর দায়িত্ব খুবই কঠিন ছিলো। অজয় নদীর দক্ষিণে বিষ্ণুপুর ও উত্তরে বীরভূমের প্রতিরক্ষা ছাড়াও পশ্চিম সীমান্তের সমস্ত গিরিপথই তাঁকে পাহারা দিতে হতো। ব্রিটিশ শক্তির সদর দফতর হিসেবে বীরভূমের গুরুত্বই ছিলো সর্বাধিক; কিন্তু

---

১৫৯. ১৭৮৯ সালের ১৬ই অক্টোবরের পত্র। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৬০. এক বছর আগে নিকটবর্তী প্রদেশ রামগড়ের (বিহার) রাজধানী শহরের উপর দস্যুরা হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চালিয়েছিলো। রামগড়ের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর এ. সিটন কর্তৃক বীরভূমের কালেক্টরের নিকট লিখিত পত্র, ২৩শে এপ্রিল, ১৭৮৯।

বীরভূম রক্ষার জন্য বিষ্ণুপুর থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে আনা হলে সেখানে আগের বছরের বিপর্যয়ের পুনারাবৃত্তি ঘটতো। আবার সীমান্ত এলাকার গিরিপথ থেকে সৈন্য সরিয়ে আনা হলে উত্তর ও দক্ষিণের সমগ্র জেলাটিই ডাকাতদের দখলে চলে যেতো। মি. কিটিং স্থির করলেন যে, সীমান্ত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ না করে, বিষ্ণুপুর থেকে সৈন্য সরিয়ে আনাই অধিক যুক্তিসঙ্গত; কারণ এই ব্যবস্থার ফলে বিষ্ণুপুরে দস্যুদের উৎপাত বেড়ে যাবে বটে, কিন্তু তাহলেও সীমান্তের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বীরভূম রক্ষার জন্য বিষ্ণুপুর থেকে সৈন্য সরিয়ে আনা হয়; কিন্তু সেনাবাহিনী নদী পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রায় এক হাজার বিদ্রোহীর একটি বাহিনী বিষ্ণুপুর দখল করে।' এই বিদ্রোহ ক্রমে নিকটবর্তী এলাকাগুলোতেও বিস্তার লাভ করে এবং দক্ষিণাঞ্চলের কালেক্টরগণ মি. কিটিং-এর নিজের সীমান্তের ঘাঁটিগুলোর প্রহরা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বহু জেলার শান্তি বিনষ্ট করার জন্য তাঁকে দোষারোপ করেন। গিরিপথগুলোর পাহারা যতো বেশি জোরদার করা হচ্ছিলো ততো বেশিসংখ্যক দস্যু একটি দীর্ঘ বিকল্প পথ ধরে অজয় নদীর দক্ষিণের অরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করছিলো। তাদের অত্যাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো এবং ইতিমধ্যে বর্ষাকাল এসে পড়ার ফলে সামরিক অভিযান অসম্ভব হয়ে পড়ায় কয়েক মাস যাবৎ বিষ্ণুপুর দস্যুদের কবলে থাকার আশংকা দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু পরে কৃষকগণ এক বছর আগে যাদের মিত্র বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো, তাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মরণ-পণ করে সেই দস্যুদের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ালো; ফলে অনাচারের মধ্য থেকেই তার প্রতিষেধক ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলো। তিনশ' বছর আগে বাংলাদেশে হাবসী বাহিনীর যে দশা হয়েছিলো, বিষ্ণুপুরের দস্যুদের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটলো। দু-তিন জন দস্যুকে একসঙ্গে প্রাচীরবেষ্টিত শহরের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্ত কৃষকগণ তাদের লাঠিপেটা করে মেরে ফেললো। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক দস্যুর ভাবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেলো। ১৭৯০ সালের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে মি. কিটিং কৃষকদের প্রেরিত 'চোর ও ডাকাতদের আটক রাখার উদ্দেশ্য বিষ্ণুপুরে একজন অফিসারের অধীনে সামরিক প্রহরা মোতায়েন করার জন্য' সিনিয়র ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দেন।

১৭৯২ সালের বীরভূম

বীরভূমের ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দুই বছর এইভাবে অতিবাহিত হয়। এই দুই বছরের পূর্ণাঙ্গ নথিপত্র আমাদের কাছে আছে। আগের অবস্থা যে কি ছিলো, এই দুই বছরের বিপর্যয় থেকেই তা আমরা অনুমান করতে পারি। দস্যুরা যে কি পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করেছিলো, কয়েক বছর আগে সম্পাদিত একখানি রাষ্ট্রীয় দলিল থেকে সে সম্পর্কে আভাস পাওয়া যেতে পারে। ১৭৮২ সালের বেনারস জেলা সম্পর্কিত এই দলিলে বলা হয়েছে, 'দুই মাসের বিশৃঙ্খলার জন্য ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ৬,৬৬,৬৬৬-১০-১০ সিক্কা টাকা[১৬১] (৭০ হাজার স্টার্লিং-এরও বেশি) বাদ দিতে হবে।' দুই মাসের হাঙ্গামার

১৬১. এশিয়ার দেশীয় রাজাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ও সমঝোতা, ৯০ পৃষ্ঠা, (১৮১২)।

ক্ষয়ক্ষতি যদি এই হয়, তাহলে দুই বছরের ক্ষতির পরিমাণ কতো হতে পারে? কিছুদিন পরে যখন শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হয়, তখন মি. কিটিং শান্ত অথচ হতাশভাবে তাঁর পরিশ্রমের ফলাফল পর্যালোচনা করেন। তিনি লিখেছেন, 'বীরভূমের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বিরাট জঙ্গল রয়েছে। এই জঙ্গল দীর্ঘদিন যাবৎ বহু ডাকাতদলকে বিচারের এক্তিয়ার থেকে আড়াল করে রেখেছে। ডাকাতরা এই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে নিকটবর্তী এলাকার অসহায় রায়তদের ওপর হামলা করে। বহু জনবহুল শহর এখন পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে; পণ্য প্রস্তুতকারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; এবং একদিন যেখানে বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো সেখানে আজ অল্প কয়েকটি জরাজীর্ণ ঘরবাড়ি মাত্র দেখা যায়। অজয় নদীর দুই তীরে এবং বিশেষত ১৭৮৯ সালে লুণ্ঠিত এলমবাজারের সর্বত্র এই একই দৃশ্য দেখা যায়। সারাকুন্ডা একসময় একটি বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো, কিন্তু এখন তা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যক্ত হয়েছে। সীমান্তের এই সকল স্থানে আর ধনসম্পদ না থাকায় ডাকাতদের হামলাও বন্ধ হয়ে যায়। ডাকাতদের দৃষ্টি তখন জেলার কেন্দ্রস্থলের ওপর নিবদ্ধ হয় এবং কালেক্টরের বাসভবনের মাত্র দুই ক্রোশের (চার মাইল) মধ্যে তিন শতাধিক ডাকাত কয়েকটি শহর লুঠ করে ও লোকজন খুন করে।'[১৬২]

এই লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ডের বোধকরি আর বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার দরকার নেই। সেই সময় থেকে তেরো বছর আগের সাঁওতাল যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বীরভূমে আর কখনো সশস্ত্রভাবে সরকারের বিরোধিতা করা হয়নি। এমন কি ব্রিটিশ শাসনের প্রথম হাঙ্গামাপূর্ণ বছরগুলোতেও কৃষকগণ যে নিরাপত্তা লাভ করেছিলো, ইতিপূর্বে বহু বছর যাবৎ তারা তা পায়নি। চাষাবাদ এই সময় বেড়ে গিয়েছিলো এবং মি. ফোলেকে যখন বীরভূমের তত্ত্বাবধান করতে পাঠানো হয় তখন থেকে মি. কিটিং-এর গিরিপথ সুরক্ষিত করার সময় পর্যন্ত তিনশ' আঠাশটি পল্লীতে পুনরায় লোকবসতি ও চাষাবাদ শুরু হয়েছিলো।[১৬৩] এই পুনর্বাসনের ফলে জেলার পল্লীর সংখ্যা শতকরা সাত ভাগেরও বেশি বেড়ে যায়। যে দুটি বিপর্যয়পূর্ণ বছরের সঙ্গে আমরা সর্বাধিক পরিচিত, সেই দুই বছরেই সবচেয়ে দ্রুত উন্নতি হয়েছিলো। মি. কিটিং ১৭৮৮ সালের নভেম্বর মাসে দেখতে পান যে, দস্যুরা জেলার সর্বত্র বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ি এলাকা থেকে দস্যুদের আগমন প্রতিহত করার জন্য তিনি ঘাঁটি স্থাপন করেন; কিন্তু এই বাধা উপেক্ষা করে দস্যুদের আগমন অব্যাহত থাকে; এবং যখন আমরা শাসনভার গ্রহণ করেছিলাম, তখনকার তুলনায় ১৭৮৯ সালের অবস্থা দৃশ্যত বেশি নিরাপদ ছিলো না। মি. কিটিং-এর শাসনের প্রথম শীতকালে যে বিপর্যয় ঘটেছিলো তার প্রকৃতি থেকেই তিনি চাহিদার প্রকৃতি নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতিরিক্ত সৈন্য আগমন করায় ঘাঁটিগুলোর শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিলো এবং এই শক্তি সর্বদা বজায় রাখা হয়েছিলো। ফলে দস্যুদল সোজাপথে ঢুকতে না পেরে ঘুর-পথে দক্ষিণে চলে যায় এবং অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে আস্তানা গাড়ে। ১৭৯০ সালের বর্ষাকালের আগে সকলের সাধারণ শত্রু দস্যুদের

---

১৬২. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র, ১লা জুন, ১৭৯২। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।
১৬৩. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের রিপোর্ট, ৩রা জুলাই, ১৭৮৯।

নির্মূল করার জন্য জনসাধারণ সানন্দে সরকারের সঙ্গে যোগদান করে; এবং অপরদিকে বীরভূমের সমস্ত দস্যুদল যেন সমূলে ধ্বংস হওয়ার জন্যই গাঁজার লোকদের মতো এক জায়গায় সমবেত হয়।

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি ও লুঠতরাজের সংখ্যাও কমে যায়। মাঝে মাঝে অবশ্য সশস্ত্র ডাকাতি এবং জমিদারের মধ্যে দাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু তার সংখ্যা এতো কম যে, তা কেবলমাত্র লোকের মনে আগেকার দিনের অনাচারের স্মৃতিই জাগরূক করে রাখতে সাহায্য করতো, আজকাল যেমন সিং-ভূম (সিংহের স্থান), শের-ঘর (বাঘ-বাজার), শের-ঘাঁটি (বাঘ-কেন্দ্র), শিকার-পুর (শিকার করার জায়গা) প্রভৃতি নাম সেই সময়ের কথা ক্ষীণভাবে মনে করিয়ে দেয়, যখন ফসলের অধিকাংশই বন্যপশুদের এক্তিয়ারে চলে যেতো। ১৮০২ সালে স্যার হেনরি স্ট্রাচি বীরভূমকে সংঘবদ্ধ ডাকাতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন; বর্তমানে এই জেলাটি সম্ভবত বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত; এবং একখানি সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় দলিলে সম্ভবত অতীতের কথা ভুলে গিয়েই জেলাটিতে 'আগের মতোই অপরাধবিহীন অবস্থা বিরাজ করছে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বন্যজন্তুর অত্যাচারের ব্যাপারেও অনুরূপভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। জেলার কোনো অংশেই এখন আর বুনো হাতিও দেখা যায় না, বাঘের কথাও শুনা যায় না। বীরভূমে সর্বশেষবার বাঘ শিকারের চেষ্টা করা হয় ১৮৬৪ সালের মে মাসে। পাহাড়ি এলাকার প্রায় পাঁচশ' লোক বহু বর্গমাইল জঙ্গল পিটিয়ে শিকারের খোঁজ করে, কিন্তু বাঘ বা হাতি তো দূরের কথা, একটি ভাল্লুক বা চিতাবাঘও পাওয়া যায়নি। এই অভিযানে সবচেয়ে বড়ো যে জন্তুটি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, তা হচ্ছে একটি ডোরাকাটা হরিণ। দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ভল্লুক ও চিতাবাঘ অবশ্য এখনও আছে, কিন্তু তারা কখনো লোকালয়ে এসে উৎপাত করে না। স্কটল্যান্ডের উচ্চভূমিতে গুলি করে ঈগল মারার মতো এই সকল ভল্লুক বা চিতাবাঘ আটক করাও প্রায় অসম্ভব।

বাঙালিরা জাতি নয়

ইংরেজরা বাংলাদেশে যে বিশৃঙ্খলা দেখতে পেয়েছিলো, তার জন্য দেশীয় সামন্ত সম্প্রদায়কে দোষী করা যায় না। কারণ, সেই সময় মুসলমানদের অত্যাচার এবং নানাবিধ ব্যাপক বিপর্যয় এই সম্প্রদায়কে এমন একটি পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, যেখান থেকে জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা হিসেবে কাজ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব ছিলো না। বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশার একটি গূঢ়তম কারণ আছে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের একটি দৃঢ় মনোভাব থাকলে কখনই তাদের ওপর এমন একটানা অত্যাচার হতে পারতো না। ইসলাম যখন বিস্তৃতি লাভ করছিলো, তখন এশিয়ার দেশগুলোতে এই মনোভাব না থাকায় একদিকে বিজয় ও অপরদিকে জাতীয় অবমাননা

অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো। ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদরা যখন বাংলাদেশের নানা মত ও পথের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একটি জাতীয় জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, সেই সময় এতো পরিশ্রমী, এতো ধৈর্যশীল এবং এমন চতুর হাজির-জবাব হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিরা যে কেন কখনো জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়নি, সঠিকভাবে তার কারণ উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। বাঙালির পারিবারিক জীবনে ও কৃষি ব্যবস্থায় এমন অনেক জিনিস রয়েছে, যা অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না; এবং এই সকল জিনিসের মূলেও একই কারণ বিদ্যমান রয়েছে। ফলে মূল বিষয়বস্তু থেকে একটু দূরে সরে গেলেও এই পুস্তকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। যে সকল মৌলিক ও কাঠামোগত ত্রুটি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ দোআঁশলা মানুষকে এতোদিন যাবৎ জাতি হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, পরবর্তী দুটো অধ্যায়ে আমি সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের নিম্নভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান

আর্য ও অনার্য

পঞ্চাশ বছর যাবৎ হামলা ও লুঠতরাজের পর ১৭৯০ সালের সংযুক্ত জেলায় শান্তি ফিরে আসে এবং নতুন শাসকরা তাদের আওতাভুক্ত জনসাধারণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অবসর পান। বিষ্ণুপুরের রাজা, তাঁর অধীনস্থ সামন্তগণ এবং সমস্ত অধিবাসীই হিন্দু ছিলেন। অজয় নদীর অপর তীরে বীরভূম রাজবংশ এবং তাদের অধীনে চাকরিরত কতিপয় ধনবান মুসলিম পরিবার নিজেদের আফগান বা পাঠান বংশগত বলে দাবি করতেন; এবং তারা স্থানীয় লোকদের সাথে রক্তের মিশ্রণ ঘটাতে ঘৃণা বোধ করতেন। ধর্ম, ভাষা এবং বংশগৌরবে প্রজাদের থেকে পৃথক এই শ্রেণীটি সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সংখ্যায় তারা খুবই নগণ্য ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে দুটি বংশের অস্তিত্ব ছিলো; এবং ভাষা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান প্রভৃতি দিক থেকে তাদের মধ্যে একটিকে মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অপরটিকে সর্বনিকৃষ্ট বলে ধরা হয়েছে। আর্যদের হাতে সমৃদ্ধ উপত্যকা থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশের আদিম উপজাতিরা বীরভূমের পাহাড়ি এলাকায় বসতি স্থাপন করে; এবং প্রাচীনকালে যে সকল পাহাড় বিভিন্ন উপজাতির এলাকার মধ্যকার সীমারেখা বলে গণ্য হতো, এখনও সেই পাহাড়গুলোই এক উপজাতিকে অন্য উপজাতি থেকে পৃথক করে রেখেছে। সভ্যতার দুটি অসমান পর্যায়ের বংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী সংমিশ্রণের ফলে যে মিশ্রিত বংশের সৃষ্টি হয়, ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আমি আর্য ও আদিম উপজাতিদের মধ্যে সংমিশ্রণ এবং বংশগত দিক থেকে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

যে সময়ে পিতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা কায়েম ছিলো বলে মনে করা হয়, সেই সময় থেকেই আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে।[১] তবে ভারতের প্রাচীন জীবনব্যবস্থার

---

১ এম. মিচেলেটের 'বাইবেল দা লা' হিউম্যানাইট (প্যারিস : ক্যামেরট, ১৮৬৪) সম্পর্কে স্যাটারডে রিভিউয়ার পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'বেদে বর্ণিত ভারতবর্ষ এম. মিচেলেটের নিকট পবিত্রতা, মর্যাদা ও পরিতৃপ্তির একখানি গার্হস্থ্য চিত্র বলে মনে হয়েছে।' তিন বা চার হাজার বছর যাবৎ ভক্তিপুত লক্ষ লক্ষ আর্য রামায়ণ পাঠ ও আরাধনার মধ্যে দিনযাপন করেছে বলে

প্রতিধ্বনির সঙ্গে সিসিলির অলস জীবনধারার কোনো সামঞ্জস্য নেই; ভারতীয় জীবনধারার প্রতিধ্বনি এবং অত্যাচারিত যন্ত্রণাকাতর ও সতত সঙ্করমান মানুষের আর্তনাদ বলেই মনে হয়। প্রাচীন ভারত সম্পর্কে সংগৃহীত প্রথম পর্যায়ের তথ্যাবলীতে চারণভূমি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা বরং বর্তমান যুগেই বেশি মানানসই। এইসকল তথ্যে বলা হয়েছে যে, ইউরোপের মতো এশিয়াতেও প্রাচীনকালের মানুষ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে জীবনযাপন করতো; এবং শহর-জীবনসহ নানাবিধ উত্তেজনাময় বিষয়ের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সভ্যতার অর্থ হচ্ছে শৃঙ্খলা ও শান্তি।

ভারতে মানবজাতির প্রাচীনতম পরিবার সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পেয়েছি, তাতে দেখা যায়, উৎপত্তির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক দুটি উপজাতি রয়েছে এবং প্রাধান্য লাভের জন্য তারা সংগ্রাম করছে। প্রাচীনতম যুগে একটি দীর্ঘাকৃতি ফর্সা রঙের জাতি হিমালয় অতিক্রম করেছিলো। তারা একটি বিজয়ী জাতির বংশধর ছিলো। নিয়মিত সমাজজীবনে যে নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য উপভোগ করা যায়, তা তাদের কাছে অজানা ছিলো না। তারা বহু কিংবদন্তী ও ভক্তিমূলক আচার-আচরণ সঙ্গে করে এনেছিলো; কিন্তু তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সময়, (এমনকি ভারতে তাদের প্রথম পদার্পণের সময়ও হতে পারে) তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের এমন একটি সুদৃঢ় মনোভাব বিদ্যমান ছিলো, যা কেবলমাত্র সেই সকল লোকের মধ্যে দেখা যায়, যারা নিজেদের বেহেশতি ওহির হেফাজতকারী বলে বিশ্বাস করে।[২] স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এই নবাগত জাতির বেঁচে থাকার সংগ্রাম সম্পর্কে কোনো নথিপত্র নেই। তাদের যাত্রার তারিখ, বা তাদের নেতাদের নামও আমরা জানিনে। সত্তর পুরুষ ধরে মজাদার বলে পরিগণিত হওয়ার মতো কোনো কাহিনীও আমরা তাদের সম্পর্কে জানিনে। একমাত্র ভাষাতত্ত্ববিদই বলতে পারেন যে, একটি উচ্চ বংশের একটি শাখা জনবহুল নিম্নশ্রেণীর উপজাতিদের মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিলো,এবং ইতিহাসের সূত্রপাত হওয়ার আগেই স্থানীয় উপজাতিরা ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিলো, অথবা জঙ্গলে বিতাড়িত হয়েছিলো।

এম. মিচেলেট যে কাল্পনিক চিত্র এঁকেছেন, সংস্কৃত ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

২. বেদের স্তোত্রে যে অনুপ্রেরণা রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, তা ভাষ্যকারগণই সৃষ্টি করেছেন, লেখকগণ নয়। ভাষ্যকারগণ বিনা বাধায় এই দাবি করে এসেছেন, কিন্তু হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে সর্বদা মূল স্তোত্রেই অনুপ্রেরণা রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। মূল বেদের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদগুলো অবশ্য ভক্তিমান বিশ্বাসী পণ্ডিতের মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখে না। 'প্রাচীনকালের মুনিঋষিগণ, যারা দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গীয় সত্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন।'—ঋগবেদ, ১-১৭৯। 'যিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, সেই জ্ঞানী সর্বজ্ঞই স্বর্গের গোপন রহস্য ঘোষণা করেছেন।'—ঋগবেদ, ৭—৮৭। 'দেবতাগণ প্রথমে স্তোত্র, তারপর অগ্নি এবং তারপর নৈবেদ্য সৃষ্টি করেছেন।'—ঋগবেদ, ৮—৮৮। এ বিষয়ে মূল লিখিত 'ম্যানসক্রিট টেক্সটস' নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। (তৃতীয় খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৬১)।

আর্য জাতি

নবাগত লোকেরা সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো, আর্য (আক্ষরিক অর্থ মহৎ) নামে উল্লেখিত হয়ে যাদের খ্যাতি মধ্য এশিয়া থেকে প্রাচীন বিশ্বের শেষ সীমারেখা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাদের একটি শাখা চীনের সীমান্তে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং একটি আধ্যাত্মিক ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছিলো। অপর একটি শাখা পারস্য বংশের গোড়াপত্তন করেছিলো। তৃতীয় শাখাটি এথেন্স ও লেসডেমন গড়ে তুলেছিলো এবং চতুর্থ শাখাটি সিটি অব সেভেন হিলস নির্মাণ করেছিলো। এই জাতিরই একটি দূরবর্তী শাখা ইতিহাস-পূর্ব যুগে স্পেন রূপোর খনি আবিষ্কার করে; এবং ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম ইতিহাসে আর্য বাসিন্দাদের কর্নওয়াল এলাকায় মাছ ধরা ও খনির কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। আর্যদের ভাষার ভিত্তিতেই এশিয়ার প্রায় অর্ধেক এবং ইউরোপের প্রায় সমগ্র এলাকার ভাষা গড়ে উঠেছে; এই ভাষাই এখন নয়া দিগন্তের বনানীতে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং ভারত-জার্মান কৃষ্টিকে দক্ষিণ মহাসাগরের দ্বীপ সাম্রাজ্যগুলোতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পণ্ডিতগণ প্রাচীন বিশ্বের ইতিহাসকে ভূমধ্যসাগরের তীরে বাসকারী স্বল্পসংখ্যক আর্যদের ইতিহাস বলেই মনে করে থাকেন; এবং আধুনিক সভ্যতা বলতে একই সম্প্রদায়ের পশ্চিমাঞ্চলে বাসকারী পরিবারগুলোর সভ্যতা বুঝানো হয়ে থাকে।

তাদের উত্তরের বাসভূমি

বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, আর্যদের ভারতীয় শাখাটি তাদের নতুন ঘরবাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। যে পথ ধরেই তারা আসুক না কেন, তারা যে হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম উপত্যকার সরস জমিতে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলো সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পাঞ্জাবের সাতটি নদী ভারত ও পারস্য উভয় এলাকার আর্যদের স্মৃতিতেই স্থান লাভ করেছে এবং এই ঘটনাটি পণ্ডিতদের এই ধারণাকে আরও জোরদার করে তুলেছে যে, হিমালয়ের ভারতীয় দিকেই বৈদিক ও আবেস্তীয় ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এসেছিলো।[৩] পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচরণের সময় সংস্কৃত সম্প্রদায় কখনোই উত্তরাঞ্চলে তাদের আদি বাসভূমির কথা ভুলতে পারেনি। বিশুদ্ধ ভাষার দেশ[৪]; স্বর্গীয় জ্ঞানের উৎসে; পবিত্র পানির নির্ঝরিণী;

---

৩. জেন্দাবেস্তার হপ্ত হেন্দু এবং বৈদিক স্তোত্রের সপ্ত সিন্ধব-এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই। বর্তমানে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি ধর্মমতের মধ্যে যে সকল উৎপত্তিগত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, এটি তার মধ্যে অন্যতম। হাউগ উল্লেখ করেছেন যে, জেন্দাবেস্তায় সংস্কৃত মন্ত্রকে মন্থ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং জোরোস্টারকে মন্থ্রন বা আবেস্তীয় মন্ত্রকার বলে অভিহিত করা হয়েছে। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণম, দুই খণ্ড, প্রারম্ভ, ১৮৬৩)। স্পিয়েগেল তাঁর ইনট্রোডাকটরি ডিসকোর্স টু দি আবেস্তা নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, যিমা শব্দটির অর্থ সংস্কৃত যম শব্দের অর্থেরই অনুরূপ। দ্রষ্টব্য : মুর লিখিত স্যানস্ক্রিট টেক্সটস, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৩ ও ২৯৪ পৃষ্ঠা; এবং তার প্রকাশিত পুস্তিকা 'যম' লন্ডন, ১৮৬৫।

৪. স্যানস্ক্রিট টেক্সটস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, ১৮৬০।

উমার জন্ম, দুঃখ-দুর্দশা ও গৌরবময় বিবাহের দৃশ্য[৫] ; তাত্ত্বিক রাজা হিমালয়ের রাজ্য[৬] ; যে দেশে অর্জুন একাকী মহাদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো[৭] ; এবং পরাজিত হলেও দেবতার আশীর্বাদ ও ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেছিলো—এই সকল এবং অন্য বহু কিংবদন্তী থেকে সেই সময়টির পরিচয় পাওয়া যায়, সংস্কৃত সম্প্রদায় যখন পথ চলতে চলতে তাদের প্রিয় উত্তরাঞ্চলে কিছুদিনের জন্য থেমেছিলো। সেখানে পাহাড় ছিলো; এই পাহাড় থেকে মানুষের কাছে স্বর্গীয় বাণী নেমে আসতো; পাহাড়ের ছায়ায় সাধুসজ্জনদের বাসগৃহগুলো শোভা পেতো এবং দুটি পবিত্র হ্রদে[৮] তাদের ছায়া প্রতিফলিত হতো। একটি উপত্যকা বিশেষ করে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিলো। ভারতীয় আর্যদের কাছে এই উপত্যকাটি পবিত্রভূমি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে এবং যে নদীটি[৯] এই এলাকাটিকে সরস করে রাখে, সেই নদীকে দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে স্মরণ করে রাখা হয়েছে। ইহুদিরা জর্দান নদীর প্রতি যে শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করে থাকে, এই শ্রদ্ধাভক্তি তার তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়।

এই সুখময় উপত্যকা থেকে বাসিন্দারা পূর্বে ও দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে এবং তাদের রীতি-নীতিগুলো জাতীয় বিধির আকারে সংগৃহীত হওয়ার আগেই তারা সমগ্র বাংলাদেশ জয় করে। মনু তাঁর সময়ের সংস্কৃত ভূগোল সম্পর্কে কতিপয় কবিতা রচনা করেছেন। ডক্টর মূর এই কবিতাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে নতুন ও প্রামাণিক আলোকপাত করেছেন। মনু তাঁর সমসাময়িক সভ্যজগৎকে এমন একটি ধূমকেতুর আকারে চিত্রিত করেছেন, যার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং প্রশস্ত পুচ্ছটি দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপাসগার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই জগৎকে তিনি চারটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং উত্তরাঞ্চলের গোড়া থেকে যে অংশটি যতো দূরে অবস্থিত, সেই অংশটি ততো কম পবিত্রভূমি বলে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটি অংশকে তিনি আর্য বসতির পৃথক পৃথক যুগের প্রমাণ বলেও অভিহিত করেছেন।

প্রথম অংশটি হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের উপত্যকা, অর্থাৎ মূল পবিত্রভূমি; মনু বলেছেন, এই অংশটি 'ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট ও সৃষ্টিকর্তার নামে অভিহিত দুটি পবিত্র নদীর[১০] মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত'।[১১] এই অংশের সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পবিত্র গায়কদের ভূমি

---

৫. কুমারসম্ভব কাব্যের ভূমিকায় উমার কিংবদন্তীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখন এই কিংবদন্তী ছাড়া ঘটনাটির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

৬. কালিদাস লিখিত কুমারসম্ভব কাব্য, প্রথম সর্গ।

৭. উত্তরাঞ্চলের শেষসীমায় অবস্থিত উত্তর কুরুকে শান্ত-স্নিগ্ধ-আনন্দময় জীবনধারার ইন্ডিয়ান কল্পনায় সৃষ্ট আদর্শ চিত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। —লাসেন লিখিত ইন্ডিয়ান এন্টিকুইটিস, প্রথম খণ্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা।

৮. মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদ।

৯. সরস্বতী নদী।

১০. সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদী।

১১. দেবনির্মিতম দেশম ব্রহ্মাবর্তম। মানবধর্ম শাস্ত্র, দ্বিতীয় সর্গ, ১৭ শ্লোক, কল্প ও বইলিস, ১৮২৫। মূর লিখিত স্যানসক্রিট টেক্সটস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা।

অবস্থিত।[১২] এই এলাকাটি আর্যদের প্রথম অভিযানের নিদর্শন। বৈদিক স্তোত্রের শেষের অংশ অন্ততপক্ষে এই এলাকায় রচিত হয়েছিলো; এখানকার নদীগুলোর প্রায় প্রত্যেকটি বাঁকে তীর্থস্থান থাকায় এলাকাটিকে মূল পবিত্রভূমির চেয়ে খুব কম পবিত্র বলে মনে হয় না। 'এখানে জন্মগ্রহণকারী একজন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তার কর্তব্য শিক্ষা করুক।[১৩]

বাংলাদেশে আর্য বসতি

কিন্তু এই নতুন এলাকা দখলে আসার পরও ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার জন্য তা যথেষ্ট ছিলো না; ফলে পরে আরো একটি বড়ো এলাকা দখল করা হয়। মনু এই এলাকাটিকে মধ্যভূমি[১৪] বলে অভিহিত করেছেন। উত্তর ভারতের সমস্ত নদী এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত; এর উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্বে এলাহাবাদ হতে পশ্চিমে সেই মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে পবিত্র নদীটি অপবিত্র জাতির দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য বালুকারাশির নিচে আত্মগোপন করেছিলো বলে কথিত আছে। বৈদিক যুগ শেষ হওয়ার আগে এখানে বসতি স্থাপন শুরু হয়েছিলো বলে মনে হয় না এবং এই বসতির কাজও যুগ যুগ ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। এইখানেই গায়কদের সরল বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার আচার-সংস্কার গড়ে উঠেছিলো এবং অবশেষে একদিন সংস্কারের চাপে বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এইখানেই ঐক্যবিহীন পিতৃপ্রধান সম্প্রদায় থেকে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা আবদ্ধ কয়েকটি সুসংবদ্ধ জাতি গড়ে উঠেছিলো; কিন্তু এই জাতিগুলো বর্ণপ্রথা দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় কালক্রমে একদিন সংস্কৃত সম্প্রদায়ের পতন ঘটে। মনুর পুস্তকে বর্ণিত জমিসংক্রান্ত আইনের সংগ্রাহকগণ মধ্যদেশের বাসিন্দা না হলেও এলাকাটির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলো যে, মধ্যদেশকে তাঁরা তাঁদের জাতির উৎসস্থল বলে মনে করতেন; এবং একথা সত্য যে, ভারতীয় আর্যগণ মধ্যদেশে বসতি স্থাপন করে সভ্যতা গড়ে না তোলা পর্যন্ত মনু কর্তৃক প্রণীত বলে অভিহিত পুস্তকখানি রচনা করা হয়নি।

এই তিনটি এলাকা নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন যাবৎ আর্যদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট বলে পরিগণিত হতো। ভারতীয় নদীর মাঝ রাতের ঝড়, অপ্রতিরোধ্য স্রোত, বিপজ্জনক আবর্ত ও ভয়াবহ শান্তভাব সম্পর্কে যারা অবহিত আছেন, তারা একথা শুনে বিস্মিত হবেন না যে, আর্যরা গঙ্গা নদীর নিম্ন উপত্যকার অবতরণ করতে ইতস্তত করেছিলো। কিন্তু নদী সবসময়ই বিভিন্ন জাতির যাত্রাপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আগেই হোক আর পরেই হোক সংস্কৃত জাতি গঙ্গা নদীর পথ ধরেই বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। উত্তর ইউরোপের দস্যুদলের মতো তারা একই অবস্থায় 'নদীর অজ্ঞাত

১২. ব্রহ্মবির্দেশ।
১৩. মানবধর্ম শাস্ত্র, ২—২০।
১৪. মধ্য-দেশ।

পথে অগ্রসর হয়েছিলো এবং নিজেদের শক্তি ও সাহসিকতার ওপর বিশ্বাস থাকায় সম্ভাব্য যে কোনো বিরোধী শক্তি সম্পর্কে তারা উদাসীন ছিলো[১৫]; এবং তাদের জাতীয় রীতিরেওয়াজ পুস্তকাকারে সংগৃহীত হওয়ার আগে 'পূর্ব থেকে পশ্চিম মহাসাগর পর্যন্ত'[১৬] সমগ্র বাংলাদেশে তারা ছড়িয়ে পড়েছিলো। রীতি-রেওয়াজের পুস্তকখানি সাধারণত মনু কর্তৃক লিখিত বলে বিশ্বাস করা হলেও এটা সম্ভবত একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হয়। আর্যদের বসতি এলাকাকে মনু আর্যপথ বলে অভিহিত করেছেন। তখনকার দিনে সমগ্র সংস্কৃত জগৎ বলতে এই এলাকেই বুঝাতো। এই এলাকার বাইরে সমস্তই ছিলো অজ্ঞাত দেশ; সংস্কৃত লেখকরা বলেছেন, অজ্ঞাত দেশে দৈত্য-দানব ও নরঘাতক বাস করে, তৃণভোজী পশুরা চরতে ভয় করে এবং আর্যদের সেখানে বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আমরা সাধারণত ভারতকে একটিমাত্র দেশ এবং ভারতবাসীদের একটিমাত্র জাতি হিসেবে গণ্য করতেই অভ্যস্ত; কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, ইতিহাস, এলাকা ও জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করা হলে ভারতে একটি দেশের চেয়ে একটি মহাদেশের বৈচিত্র্যই বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এলাকা বিশেষের রীতি-রেওয়াজ বা বিশ্বাস সমগ্র ভারতভূমিতে প্রচলিত বলে ধারণা সৃষ্টি হওয়ায় এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি সাধারণ সিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হওয়ায় এই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে। ইংরেজগণ ভারত সাম্রাজ্যকে ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশগুলোর মধ্যে অন্যতম রাজনৈতিক ইউনিট বলে গণ্য করায় এই ইউনিটের বিভিন্ন অংশকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে তারা এক ও অবিভাজ্য বলে মনে করে থাকে। সম্প্রদায় ও ধর্ম মতের দিক থেকে ভারতে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবক্ষেত্রে উপলব্ধি না করে অস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয় মাত্র। মুসলিম সমাজ ও তাদের ধর্মের কথা বাদ দিলে, সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, ভারতের অদিবাসিগণ হিন্দু এবং যুগ যুগ ধরে তারা হিন্দুই ছিলো; ইতিহাসের গোড়া থেকেই হিন্দু ধর্মই হচ্ছে ভারতের ধর্ম; এবং স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় সমাজ হিন্দু বর্ণ নামে পরিচিত চারটি কৃত্রিম বিভাগে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এই জাতীয় অভিমত ভারতীয় জনসাধারণ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে। এই ভুল ধারণাই ভারতের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক আচরণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ইংল্যান্ড এশিয়ায় যে সক্রিয় মানবিকতা ও বিশুদ্ধ বিশ্বাস সংবলিত নতুন সভ্যতার দূত ও প্রতিনিধি, সেই সভ্যতা ও আমাদের প্রাচ্যদেশীয় প্রজাদের মধ্যে এই ভুল ধারণাই বাধাস্বরূপ হয়ে রয়েছে।

মনুর পদ্ধতি স্থানীয় মাত্র : বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার

যে সভ্যতাকে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা বলে সাধারণত গণ্য করা হয়ে থাকে এবং ব্রাহ্মণগণ ও মনুসংহিতা যে সভ্যতার নিদর্শন, তা সামগ্রিকভাবে উত্তরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ

১৫. গিবন।
১৬. মনু, ২—২২।

ছিলো। মনু এই এলাকাকে মধ্যদেশ বলে অভিহিত করেছেন এবং বর্তমানে তা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব নামে পরিচিত। বিজিত উত্তরাঞ্চলে বিজয়ীদের জীবনে কর্তব্যের গুরুভার ধীরে ধীরে নেমে আসে; চিন্তার যুগের পর পরিশ্রমের যুগ শুরু হয় এবং আর্যগণ শান্ত দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিকে পরিণত হয়। মেগাস্থিনিস এই দার্শনিকদেরই আম্রকাননে প্রধানত জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনারত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। পবিত্র ধর্মীয় শ্লোকগুলো সংবদ্ধভাবে সাজানো হয়েছিলো এবং সহজ প্রার্থনাগুলো বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত করে জটিল ও ব্যয়বহুল কুসংস্কারে পরিণত করা হয়েছিলনা। একটি চিন্তাশীল ও কল্পনাপ্রবণ বংশ প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে গূঢ় তাৎপর্য সন্ধানের প্রচেষ্টায় তাদের বাস্তবধর্মী পূর্বপুরুষদের প্রত্যেকটি উক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মত্ত হয়ে উঠলো। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে কাটছাঁট করে বস্তুতে পরিণত করা হলো; আবহাওয়ায় সম্পর্কিত একটি মন্তব্য ধর্মীয় নীতিতে রূপান্তরিত হলো; এবং বিজয়ের পরবর্তীকালীন একটি ধন্যবাদ অনুষ্ঠান থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হলো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো, প্রত্যেকটি শব্দ নিংড়ে বিবিধ অর্থের নির্যাস প্রস্তুত হতে লাগলো এবং অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানের উদ্ভব হতে লাগলো। শেষপর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, বৈয়াকরণিক অস্পষ্টতা প্রচার অথবা সাফল্যের সঙ্গে নৈবেদ্য নিবেদন করাই আর্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো। নৈবেদ্য নিবেদন অনেক সময় তিন বংশ ও শতাধিক বছর যাবৎ করতে হতো।[১৭] নিম্ন বঙ্গের আর্য বাসিন্দাগণ কিন্তু এই সূক্ষ্ম ধর্মীয় আচার-বিধি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। কারণ, তারা যখন এই এলাকায় আসে, তখন তাদের সমগোত্রীয় লোকেরা চিন্তাবিদ ছিলো না, কর্মী ছিলো; দক্ষিণ উপত্যকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দর্শনশাস্ত্র সহজে পথ করে নিতে পারেনি। ফলে বেঁচে থাকার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেয়ে বেঁচে থাকার উপায় উদ্ভাবনের জন্যই তারা বেশি উৎসুখ ছিলো। তাদের বিরোধীদলের লোকেরা নতুন ব্যাখ্যার অস্ত্রে সজ্জিত পণ্ডিত ছিলো না, তারা ছিলো ধারালো বর্শা ও বিষাক্ত তীরে সজ্জিত একটি কৃষ্ণকায় জাতি। লিখিত ইতিহাস শুরু হওয়ার আগে মূল বাংলার হিন্দুরা প্রকৃত অর্থে পুরোপুরিভাবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেনি। বৌদ্ধধর্ম তখন উত্তরাঞ্চলে তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি, কারণ সেখানে তখন বহুসংখ্যক ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রাচীন সংস্কার এবং কায়েমী স্বার্থবাদ প্রচলিত ছিলো। কিন্তু নিম্নবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের পথ বেশ সহজ হয়ে উঠলো; কারণ সেখানকার অধিবাসীদের তখন নিজস্ব কোনো বিশেষ ধর্মমত ছিলো না, ফলে বৌদ্ধধর্মকে তারা সাদর সম্ভাষণই জানালো। মধ্যদেশের বাইরের এলাকাগুলোতেই বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে সহজে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছিলো; এবং পরে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত বৌদ্ধ স্মৃতিসৌধগুলো এখনও বীরভূমের সংলগ্ন জেলাগুলোতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসেবে বিরাজ করছে। মধ্যদেশে যে আর্য-ধর্ম প্রচলিত ছিলো, নিম্ন উপত্যকার বাসিন্দারা সম্ভবত তা তাড়াতাড়ি ভুলে

১৭ হাউগ উল্লেখ করেছেন যে, নৈবেদ্য নিবেদন এমন কি এক হাজার বছর ধরেও চলেছে। উদাহরণের জন্য তিনি যজুর্বেদের (৩—১০৫১০) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, প্রথম খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা ও ফুটনোট।

গিয়েছিলো, অথবা এই ধর্ম চালু হওয়ার আগেই তারা দক্ষিণের পথে যাত্রা শুরু করেছিলো। কারণ, ইতিহাসের পাতায় যখন তাদের সর্বপ্রথম দেখা যায়, তখন তারা হিন্দু নয়, বৌদ্ধ; তাদের রাজারা ছিলেন আদিম উপজাতি, আর্য নয়; এবং মিশ্র বাঙালি জাতি তাদের বর্তমান ধর্ম গ্রহণ করার কয়েক শতাব্দী আগেই আয়োনাতে কেল্টগণ খ্রিষ্টান ধর্মের বাণী শ্রবণ করেছিলো। বাঙালিরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেও প্রথম দিকে এই ধর্ম এতোই অসম্পূর্ণ ছিলো যে, প্রায়ই তাদের মধ্যদেশ থেকে নানাবিধ আচার-বিধি আমদানি করতে হতো। এই আমদানির যে বিষয়টি সম্পর্কে ইতিহাসে আমরা সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই, তা হচ্ছে উত্তরাঞ্চল থেকে গৌড়ের রাজার ব্রাহ্মণ আমদানি। উত্তর ভারতে যে সকল ধর্মীয় আচার বহুদিন যাবৎ প্রচলিত ছিলো, মূল বাংলার ব্রাহ্মণগণ তা সম্পাদন করার উপায় জানতেন না। তাদের এই সম্পাদন-ক্রিয়া শিক্ষা দেয়ার জন্যই গৌড়ের রাজা উত্তরাঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ আমদানি করেছিলেন। নিম্ন উপত্যকার স্থানীয় স্মৃতিসৌধ ও রীতি-রেওয়াজ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারা যায় না যে, মনু ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বর্ণিত হিন্দু ধর্ম উত্তরাঞ্চল থেকে তুলনামূলকভাবে আধুনিক আমদানি এবং বাঙালিরা সর্বপ্রথম যে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম।[১৮]

বর্ণপ্রথা

কিন্তু স্থানীয় রীতি-রেওয়াজ ও বিশ্বাসকে সমগ্র ভারতের বলে চালানোর প্রবণতা ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার ওপর অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া করেছে। ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক অনুষ্ঠান ও বাস্তব জীবনধারা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিদগণ যে ধারণা গড়ে তুলেছেন, এই প্রবণতা তাকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমরা এতোদিন যাবৎ শুনে আসছি যে, ভারতীয় সমাজ-জীবন কৃত্রিম ও স্থিতিশীল; এবং মনু কর্তৃক বর্ণিত ও সমগ্র হিন্দুসমাজ সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রযোজ্য

১৮. এই উক্তি আমি মগধের (বিহার) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত প্রদেশ মূল বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি; মধ্যদেশের নিকটবর্তী হওয়ায় পরে এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। খ্রিষ্টের জন্মের পর চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বুদ্ধদেবের বিখ্যাত দাঁত জগন্নাথে রাখা হয়েছিলো; এখন যেমন এই স্থানটি হিন্দুদের তীর্থস্থান, তখন ছিলো তেমনি বৌদ্ধদের পবিত্র কেন্দ্র। প্রিনসেপ, লাসেন ও বারনোফ অশেষ পাণ্ডুলিপি ও মূলত পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিখন থেকে প্রমাণ করেছেন যে, খ্রিষ্টের জন্মের ৩০০ বছর আগে থেকে ৪০০ বছর পর পর্যন্ত ভারতের বহু স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিলো। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যে এই ধর্ম চালু ছিলো, চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাং-ই তার প্রমাণ। বাংলাদেশের রাজাগণ ইংরাজি ৭৮৫ থেকে ১০৪০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন; তাদের রাজধানী ছিলো গৌড়; তাঁরা অন্ততপক্ষে ৯০০ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন। ইংরেজদের আগমন পর্যন্ত এই ধর্ম বীরভূম ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানেও প্রচলিত ছিলো। বর্তমান বীরভূম জেলার প্রধান মন্দিরটি মূলত বৌদ্ধরাই নির্মাণ করেছিলো— রাজমহল, ১৯ পৃষ্ঠা। উড়িষ্যা সফর সংক্রান্ত তথ্য, পুস্তিকা, ২ পৃষ্ঠা। বুকানন পেপার্সের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব ভারতের ইতিহাস। ক্যাপটেন শেরউইল প্রণীত সার্ভে রিপোর্ট অব বীরভূম, ১৪ পৃষ্ঠা, কলিকাতা, ১৮৫৫। সেন্টহিলেয়ার প্রণীত লা বুদ্ধা এট সা রেলিজিয়ন, প্যারিস, ১৮৬২। স্যার ই. টেনেন্ট প্রণীত সিলোন, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড।

বর্ণপ্রথা যে প্রকৃতপক্ষে মধ্যদেশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য, তা প্রমাণ করতে হলে দীর্ঘ পর্যালোচনা ও তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ভারতের এবং বিশেষত নিম্নবঙ্গের বর্ণপ্রথা স্থিতিশীলও নয়, কৃত্রিমও নয়; এই প্রথা একটি প্রাচীন সমাজের বিজয়ী ও বিজিতের সার্বজনীন ও স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। মনু আর্যদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যে কড়াকড়ি ও স্থিতিশীলতা রয়েছে, তা ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের পক্ষে খুবই হতাশাব্যঞ্জক এবং নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য একটি ভালো অজুহাত বলেও গণ্য হতে পারে। এই নিষ্ক্রিয়তা অন্যত্র অলসতা বলে প্রতীয়মান হতে পারে। পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় দেখা যাবে যে, জনসাধারণের ইতিহাস দ্বারাই তথাকথিত স্থিতিশীলতা এবং চারপ্রকার শ্রেণীভেদ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে; এবং বাংলার জনসাধারণ দুটি সুস্পষ্ট গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বাভাবিকভাবে গঠিত বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

মধ্যদেশে শান্তি ও জননিরাপত্তা থাকায় সামাজিক শ্রেণী বিভাগ গড়ে উঠেছিলো; কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দাগণকে আদিম উপজাতিদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকতে হতো বলে এ সম্পর্কে চিন্তা করার তাদের অবসরও ছিলো না এবং এই শ্রেণীবিভাগ চালু রাখার মতো অর্থসম্পদও ছিলো না। বর্ণপ্রথা যে ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিলো, তার সঠিক তারিখ নির্ণয় করা অসম্ভব; তবে কোন যুগে যে এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিলো না, কখন তার প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় এবং কখন এই প্রথা দেশের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রভাবশালী ব্যবস্থায় পরিণত হয়, তা অপেক্ষাকৃত সহজভাবে বলা যেতে পারে। ঋগ্বেদে প্রকৃতপক্ষে বর্ণপ্রথা সম্পর্কে কোনো উল্লেখই নেই, কিন্তু পরে শ্লোক বিকৃত করে দেখানো হয়েছে যে, ঋগ্বেদে বর্ণপ্রথা অনুমোদন করা হয়েছে।[১৯] হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীবিভাগও সুস্পষ্টরূপে গড়ে উঠেছিলো; এবং যজুর্বেদে সন্দেহাতীত প্রমাণ রয়েছে যে, এই বেদটি যে জেলায় লিখিত হয়েছিলো, সেখানে আগে থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদের একটি জটিল ধর্মীয় ব্যবস্থা চালু ছিলো এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ বলতে মানুষে মানুষে যে নির্মম বিভেদ বুঝায় সমাজে তা কিছু কিছু স্বীকৃতি লাভও করেছিলো। জাতীয় রীতি-রেওয়াজগুলো মনুসংহিতার আকারে সংগৃহীত ও সংকলিত হওয়ার আগেই বর্ণপ্রথা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিলো। মনুসংহিতায় অবশ্য একটিমাত্র প্রদেশে, অর্থাৎ মধ্যদেশে ভারতীয় সমাজের অবস্থা সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পশ্চিম দিকে বর্ণপ্রথা কখনো সিন্ধুনদ অতিক্রম করেনি; এমন কি এই প্রথা সিন্ধুতীরের কয়েক শ মাইল এলাকার মধ্যেও পৌছাতে পেরেছিলো কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। লিখিত ইতিহাস শুরু হওয়ার আগে রাজপুতরাও চার

---

১৯. পুরুষ সূক্ত (ঋগ্বেদ, ১০—৯০)। স্যানসক্রিট টেক্সটস পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই শ্লোকটির উপমামূলক প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডক্টর মুর অবশ্য মেহেরবানি করে তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রুফ-শিটগুলো আমাকে দেখিয়েছেন; এই সংস্করণে বলা হয়েছে যে, অনেকে যতোখানি মনে করে থাকেন, ঋগ্বেদে বর্ণপ্রথা সম্পর্কে ঠিক ততোখানি অজ্ঞানতার প্রমাণ নেই।

প্রকারের শ্রেণীভেদ গ্রহণ করেনি। সিন্ধু অববাহিকার পরবর্তী এলাকায় যে সংস্কৃতভাষী উপজাতিরা বাস করতো, তাদের অভিমত ছিলো না, ঈশ্বর সকল মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে উপাসনা করার জন্য যাজকদের দেয়া কোনো পদ্ধতির দরকার হয় না। এই এলাকার পরবর্তী অঞ্চলে কাশ্মীরের সমগ্র আর্যগণই একই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত[২০] বলে বর্ণিত হয়েছে; এবং মধ্যদেশের পশ্চিমে প্রকৃতপক্ষে প্রায় কোনো স্থানেই মনু-বর্ণিত চার প্রকারের শ্রেণীভেদের সন্ধান পাওয়া যায় না। পশ্চিমের এই সংস্কৃতভাষী জাতিগুলো মধ্যদেশের সভ্যতা প্রত্যাখ্যান করে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস ও রীতি-রেওয়াজ গ্রহণ করায়, সংস্কৃত-সাহিত্যের ব্রাহ্মণবাদ্য শাখার সর্বত্রই তাদের সম্পর্কে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হয়েছে। বর্ণপ্রথা গ্রহণ বা বর্জন করার অর্থ ছিলো ব্রাহ্মণ্যবাদের সমগ্র আচার-বিধি গ্রহণ বা বর্জন করা; ফলে কালক্রমে এই বিষয়টি মধ্যদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলের আর্যদের মধ্যে বিরোধের বস্তুতে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুগণ কখনো শান্তিপূর্ণভাবে এবং কখনো সর্বোচ্চ বর্ণে প্রবেশাধিকার ঘুস দিয়ে দেশবাসীর ওপর তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থা জোর করে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো[২১]; কিন্তু এই উপায় ছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভয়াবহ ধর্মীয় যুদ্ধের মারফত অন্যের ওপর নিজেদের ধর্ম চাপিয়ে দিতো। বৈদিক স্তোত্রের পরবর্তীকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে ধর্মীয় অসহনশীলতার প্রমাণ হিসেবে এই সকল যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে; এবং এই সকল যুদ্ধের মধ্যে একটি প্রথম জাতীয় সংগ্রাম হিসেবে সংস্কৃত ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।[২২] বর্ণপ্রথা ক্রমে ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়; এবং মনু প্রায় যথার্থই বলেছেন যে, বর্ণচ্যুত পলাতক ক্ষত্রিয়দের মধ্যে থেকেই গ্রিক ও পারসিকদের উৎপত্তি হয়েছে।[২৩]

বর্ণের সীমানা

মনু হিমালয়কে মধ্যদেশের উত্তর এবং বিন্ধ্যপর্বতকে দক্ষিণ সীমারেখা বলে উল্লেখ করেছেন। একথা নিশ্চিতরূপেই সত্য যে, মনু বর্ণিত চার ভাগে বিভক্ত বর্ণপ্রথা কখনই এই পাহাড়গুলো অতিক্রম করেনি। দক্ষিণ ভারতের সমগ্র আর্য সম্প্রদায় নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে; অতএব তাদের মধ্যে কোনো ক্ষত্রিয় পরিবার বা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়

---

২০. আমি কেবলমাত্র কাশ্মীরের আর্য জনসাধারণ সম্পর্কেই এই মন্তব্য করছি। আদিম উপজাতিদের অবশিষ্টাংশ, এবং তাদের মধ্যে থেকে যে মিশ্র বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিলো, তারা ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো কাশ্মীরেও বসবাস করছে

২১. একাধিক সংস্কৃত কিংবদন্তীতে নিম্নবর্ণের রাজপুত্রদের উচ্চবর্ণে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণরা তাদের নিজেদের মতলব অনুসারেই এইসব কাহিনী বলেছে; কিন্তু আমার মনে হয়, এই কিংবদন্তীগুলোতে মধ্যদেশে বর্ণপ্রথা কড়াকড়িভাবে চালু হওয়ার পূর্ববর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা প্রসারের ইতিহাসই হালকা ছদ্মাবরণে বর্ণিত হয়েছে।

২২. ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে পরশুরামের যুদ্ধ এবং শেষপর্যন্ত তার জয়লাভ। মূলার এই বর্ণযুদ্ধকে গ্রিসের দীর্ঘ সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন; এই সংগ্রামের ফলে গ্রিসে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটে, এবং সাধারণতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয়।

২৩. যবন ও পহলবগণ। বিষ্ণুপুরাণেও এই একই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

দেখা গেলে, তারা অতি সম্প্রতি দক্ষিণাঞ্চলে গিয়ে বসতি শুরু করেছে বলে নির্ণয় করতে খুব অসুবিধে হয় না। বিন্ধ্যপবর্তের উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে বহু মিশ্রবর্ণের লোক রয়েছে; কিন্তু মনু বর্ণিত প্রথম তিনটি বর্ণের মধ্যে বিয়ে-শাদীর ফলে এই মিশ্র বর্ণের উৎপত্তি হয়নি। এই মিশ্র বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে আর্যদের সঙ্গে আদিম উপজাতিদের বিয়ের ফলে।

নিম্ন বাংলার বর্ণপ্রথা

মনু মানুষকে যে চারটি কৃত্রিম ভাগে ভাগ করেছেন, তা মধ্যদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে উত্তরে, পশ্চিমে, দক্ষিণে বা পূর্বে অবিকৃতভাবে বিস্তার লাভ করেনি; এবং মধ্যদেশের পূর্বে যে নিম্নবঙ্গ অবস্থিত, সেখানে এই চার প্রকারের শ্রেণীভেদ দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন মধ্যদেশের সীমান্তে অবস্থিত উত্তর বিহারে অবশ্য এই বর্ণভেদ বেশ স্পষ্ট আকারে দেখা যায়।[২৪] নিম্নবঙ্গের সংলগ্ন দক্ষিণ বিহারে বর্ণভেদ একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না; এখানকার অধিবাসীগণ মনুর শ্রেণীভেদে বিভক্ত নয়—অর্থ, অনার্য ও মিশ্র শ্রেণীতে বিভক্ত।

মধ্যদেশের পূর্বে ও পশ্চিমে বসবাসকারী আর্যদের বর্ণের মধ্যে অবশ্য একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। আর্যরা যখন সিন্ধুনদ অতিক্রম করেছিলো, তখন তারা পরস্পর যুদ্ধরত উপজাতি মাত্র ছিলো; এবং সিন্ধুনদের পশ্চিমে তারা যে বসতি স্থাপন করেছিলো সেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধই জীবনের প্রধান কাজ ছিলো। অতএব মধ্যদেশের ব্রাহ্মণরা যখন তাদের চার প্রকার শ্রেণীভেদ চালু করেছিলো, তখন পশ্চিমাঞ্চলের রাজপুত এবং প্রাচীন বাহিকাদেশের অন্য উপজাতিদের স্বাভাবিকভাবেই সামরিক বর্ণ বলে গণ্য করা হয়েছিলো। সিন্ধু এলাকা ত্যাগের পর আর্যরা যেখানে ছাউনি ফেলেছিলো, সেই পবিত্র ভূমিতে এবং ব্রহ্মর্ষিদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকার ফলে সাহিত্য ও অন্যান্য মানসিক উৎকর্ষের প্রসার ঘটেছিলো এবং মানসিক গুণাবলি দৈহিক বা সামরিক গুণাবলির চেয়ে অনেক বেশি সম্মানজনক বলে মনে করা হতো।[২৫] রথ বলেছেন', এমন কি ঋগ্বেদেও যে সকল ধর্মীয় ধারণা ও পবিত্র রেওয়াজকে আমরা সরল ও সংযোগহীন আকার থেকে জটিল ও বহুরূপী আকারে রূপান্তরিত হতে দেখি, সেগুলো তখন জনসাধারণের সমগ্র জীবনে সম্প্রসারিত হয়ে গিয়েছে এবং যাজকদের হাতে তা সকল বিষয়ের ওপর প্রধান শক্তিতে পরিণত

---

২৪. বিহারে ক্ষত্রিয় আছে, কিন্তু তারা সময় নিজেদের সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে বলে যে, তারা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে উত্তরাঞ্চল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আগমন করেছে। বুকানন পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় পূর্ব ভারতের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। বিহারের ক্ষত্রিয়গণ নিজেদের নিম্নবঙ্গের যে কোনো বিচ্ছিন্ন পরিবারের চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন বলে মনে করে।

২৫. 'আর্য উপজাতিগণ দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে মধ্য-ভারতের সমৃদ্ধ সমতলভূমি ও সৌন্দর্যময় বনানী দখল করার পরই বাইরের জগতের পরিবর্তে মনের জগতের প্রতি তাদের সকল প্রচেষ্টা ও সকল শক্তি নিয়োগ করে।'—ম্যাক্স মূলার প্রণীত হিস্ট্রি অব এনসিয়েন্ট স্যানসক্রিট লিটারেচার, ২৫ পৃষ্ঠা, লন্ডন, ১৮৫৯।

হয়েছে।' পরবর্তীকালীন আর্যগণ যখন নিম্নবঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়, তখন যাজক সম্প্রদায় সমাজের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে তখনো সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ গড়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। গত শতাব্দীতে ভারতে আগত প্রত্যেকটি ইংরেজ যেমন তার এস্কোয়ার[২৬] উপাধি রয়েছে বলে দাবি করেছে, তেমনি নিম্নবঙ্গে আগত বাসিন্দাগণও নিজেদের সর্বোচ্চ শ্রেণীর আর্য বলে দাবি করেছে। নিম্নবঙ্গের আর্যরা এবং মধ্যদেশের ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো; এবং মূল দেশে যখন কড়াকড়িভাবে শ্রেণীবিভাগ চালু হয়ে গেলো, তখন দূরবর্তী প্রদেশগুলোর সম্ভ্রান্ত লোকেরা মূল দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের সমান মর্যাদা ও পদবি দাবি করলো। কিন্তু এই মর্যাদা তারা পুরোপুরিভাবে কখনোই পায়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার আর্যগণ অবশ্য সহজেই ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করতে পারতো, কিন্তু মধ্যদেশের ব্রাহ্মণরা কখনোই তাদের নিজেদের সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে স্বীকার করেনি। কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার জমিদারদের সঙ্গে ব্রিটিশ জমিদারদের যে সম্পর্ক, নিম্নবঙ্গের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অযোধ্যার ব্রাহ্মণদেরও ঠিক সেই সম্পর্ক ছিলো। প্রত্যেকটি জমিদারই সম্ভ্রান্ত এবং প্রত্যেকেই এস্কোয়ার পদবির দাবিদার, কিন্তু প্রত্যেকের সামাজিক ইতিহাস পৃথক; এবং স্থানীয় লোকেরা নবাগত বাসিন্দাদের কখনই তাদের সঙ্গে সমান মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করেনি। কিন্তু মধ্যদেশের ব্রাহ্মণগণ আরো এক ধাপ এগিয়ে নিম্নবঙ্গের ব্রাহ্মণদের কেবলমাত্র সামাজিক দিক থেকেই নয়, ধর্মীয় সামর্থ্যের দিক থেকেও নিম্নশ্রেণীর বলে ঘোষণা করে। এখনো পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের বহু ব্রাহ্মণ নিম্ন উপত্যকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একত্রে আহার করে না; এবং উত্তর-পশ্চিম এলাকার দণ্ডিত অপরাধিগণ আদেশ অমান্য করার জন্য কারাগারে বারবার মারধর খেতেও আপত্তি করে না, কিন্তু বাঙালি ব্রাহ্মণের রান্না করা খাবার তারা কখনোই গলাধঃকরণ করে না। বহু বছর যাবৎ নিম্নবঙ্গের ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্যায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করতে পারতো না এবং দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা ও মধ্যেদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারতো না। উত্তরাঞ্চল থেকে পরবর্তীকালে আগত ব্রাহ্মণগণও নিম্ন উপত্যকার কোনো আর্য রমণীর পানি গ্রহণ করতে পারতো না এবং এইরূপ নারী-পুরুষের কোনো সন্তান হলে তাকে জারজ বলে ঘোষণা করা হতো।

নিম্ন বাংলার জাতিতত্ত্ব

পণ্ডিতদের মতে নিম্নবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে পাঁচটি শ্রেণী রয়েছে এবং তারা পর পর এখানে এসেছে : প্রথম, অনার্য, আদিম উপজাতি; দ্বিতীয়, প্রথম আর্য বাসিন্দা বৈদিক ও সরস্বতী ব্রাহ্মণগণ; তৃতীয়, ক্ষত্রিয় মোহাজের, পরশুরামের হাত থেকে কোনোকরমে রক্ষা পেয়ে যারা পালিয়ে এসেছিলো; তাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বৈশ্য পরিবারও

২৬. প্রমাণ, ১৭৮৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখের ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত 'মি.—এর সবিনয় নিবেদন'। কলিকাতার একখানি পুরাতন পত্রিকায় আমি একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি; এই বিজ্ঞাপনে জনৈক সামরিক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, তিনি এস্কোয়ার উপাধি বর্জন করেছেন।

এসেছিলো, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই বিহারের পরে আর এগোতে পারেনি; চতুর্থ, পরবর্তীকালে ৯০০ খ্রিস্টাব্দে আগত ব্রাহ্মণগণ; আদিশ্বর কর্তৃক কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনার কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; এবং পঞ্চম, উত্তরাঞ্চল থেকে সাম্প্রতিক কালে আগত সামরিক অভিযাত্রী, রাজপুত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, আফগান ও মুসলমানগণ। মনু যে শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন, এই সকল লোকের মধ্যে তার অস্তিত্ব নেই। চতুর্থ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তা সংক্ষেপে এই : গৌড়ের রাজা আদিশ্বর এমন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন, নিম্ন উপত্যকার ব্রাহ্মণদের যা পরিচালনা করার যোগ্যতা ছিলো না। তাই তিনি কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ প্রথমে গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে; ফলে তাদের বহু ছেলেমেয়ে হয়। এই সকল সন্তানদের তারা বরেন্দ্র নামে অভিহিত করে। তারপর যখন তারা মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, সেই সময় কনৌজ থেকে তাদের বিবাহিত স্ত্রীগণ তাদের কাছে চলে আসে। ফলে ব্রাহ্মণগণ তাদের উপপত্নী ও জারজ সন্তানদের গঙ্গা নদীর পূর্বতীরে (ঢাকার বিক্রমপুরে) রেখে বিবাহিত স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের নিয়ে নদী পার হয়ে চলে যায়। তাদের এই বৈধ সন্তানদের বংশধররাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ নিম্নবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের ব্রাহ্মণ। ৯০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই ঘটনা ঘটে এবং কারা আগে এসেছে আর কারা পরে এসেছে, তাই নিয়ে তুমুল বিতর্ক ও অশান্তি শুরু হয়ে যায়। দুই শতাব্দী পরে বাংলাদেশের সর্বশেষ সার্বভৌম রাজা বল্লাল সেন তাঁর আর্য প্রজাদের সমগ্রিক শ্রেণীবিভাগ করে আগে-পরের সমস্যাটির সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রদেশের বহু প্রাচীন পরিবারকে নবাগতদের সঙ্গে একত্রিত করা হয়। বিশুদ্ধ আর্য বংশধরদের প্রায় সকলকেই সমান অধিকার দেয়া হয় এবং প্রাচীন বাসিন্দাদের খুব কমসংখ্যক বংশধরই এখন তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।[২৭] কনৌজ ব্রাহ্মণদের অনুসারীদের মধ্য থেকে কায়স্থদের ন্যায় কয়েকটি মিশ্র বর্ণ স্থাপন করা হয়। কিন্তু মনু বর্ণিত অপর দুটি দ্বিজ বর্ণ, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে দক্ষিণ উপত্যকায় এমন একটি পরিবারও নেই, যারা উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে তাদের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালীন উৎপত্তি-সূত্র স্থাপন করতে পারে না। মনু সমাজের যে চারপ্রকার সুস্পষ্ট শ্রেণীভেদ করেছেন, নিম্নবঙ্গে তা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত।

আমার এই সিদ্ধান্ত যে ভুল বুঝা হতে পারে এবং বিকৃতভাবে বর্ণিত হতে পারে, সে সম্পর্কে আমি সচেতন আছি। সমাজের প্রকৃত অবস্থা এবং নির্মম শ্রেণীভেদ আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে খাড়া করা হবে। জগন্নাথ, গয়া, এমন কি খোদ বীরভূম জেলার পবিত্র শহরকে নিম্নবঙ্গে হিন্দুধর্মের অবিকৃত প্রকৃতির প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হবে। কিন্তু এই সকল বিখ্যাত মন্দিরের সঙ্গে যে কুসংস্কার জড়িত রয়েছে, মাত্র আট শতাব্দী আগে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হওয়ার পর হিন্দুধর্মের অনুকূলে যে ব্যাপক

---

২৭. আমার পণ্ডিতদের বিবৃতি ও পেশাদার হিন্দু কোষ্ঠিকারদের রিপোর্ট সংক্ষেপ করে এই বিবরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। কোলব্রুক লিখিত এক্সামিনেশনস অব ইন্ডিয়ান ক্লাসেস, পঞ্চম খণ্ড, এবং এসেস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৭—৯০ পৃষ্ঠা (১৮৩৭) দ্রষ্টব্য।

সহানুভূতির সঞ্চার হয় তার সাহায্যেই তার সঙ্গত ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া নিম্নবঙ্গের সামাজিক শ্রেণীভেদ ভারতের অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে বেশি নির্মম বটে, কিন্তু এই শ্রেণীভেদের সম্পূর্ণ পৃথক কারণ রয়েছে।

আদিম জাতি

সংস্কৃতভাষী বাসিন্দাগণ নতুন জায়গায় আগে থেকেই লোকবসতি রয়েছে বলে দেখতে পেয়েছিলো। এই পুরোনো বাসিন্দাদের বংশ-গোত্র সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি; এবং বীরভূমের ন্যায় কয়েকটি সীমান্ত জেলা ছাড়া সর্বত্র তারা নবাগতদের চাপে এমনভাবে হারিয়ে গিয়েছে যে, তাদের সহায়তায় যে মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছে, তারাও এক হাজার বছরেরও আগে তাদের পৃথক অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছে। দুনিয়ার বুকে একসময় অসংখ্য শ্রেণীর জন্তু-জানোয়ার বিচরণ করেছে, কিন্তু আজকের চিড়িয়াখানায় তাদের কোনো নমুনা নেই। ঠিক তেমনি অসংখ্য জাতের মানুষ দুনিয়ায় বাস করেছে, সভ্যতা গড়ে তুলেছে এবং তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; ইতিহাস আজো তাদের সম্পর্কে নীরব রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে মানুষের জন্মের আগে অসংখ্য জাতের বিরাটাকায় পাখি কানেকটিকাটের মরুভূমিতে বিচরণ করে বেড়াতো, গভীর জলাভূমিতে শিকারের সন্ধান করতো এবং কঠিন চর্মে আবৃত মাছ ধরে খেতো; আরও বড়ো আকারের দানবরা এই পাখি ধরে ধরে খেতো। এই পাখির কোনো অস্তিত্ব এখন নেই, দানবও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, জলাভূমি শুকিয়ে পাথরে পরিণত হয়েছে এবং অবশিষ্ট মাছগুলো প্রস্তরীভূত হয়ে রয়েছে। লিয়সের এই পাখিগুলোর সঙ্গে ভারতের প্রাচীন জাতিগুলোর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। পাখিগুলোর মতোই তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ সম্পর্কে একমাত্র যা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে তা হচ্ছে এই যে, একসময় তারা ছিলো বটে, কিন্তু আজ আর নেই। ভাষাতত্ত্বে অনেক নিশ্চিহ্ন জাতি সম্পর্কে অনেক সুস্পষ্ট উক্তি করা হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতের নিশ্চিহ্ন জাতিগুলো সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এখনও পর্যন্ত তারা অজ্ঞাত-অখ্যাত রয়ে গিয়েছে; তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, কোনো জাতি তাদের সঙ্গে সম্পর্কও স্বীকার করবে না। ভারতের মাটি একদিন যেমন জঙ্গলে আবৃত ছিলো, তারাও তেমনি ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকা দখল করে রয়েছে; এবং ইতিহাসকে উচ্চতর জাতির জন্য প্রস্তুত করে দিয়ে নিজেরা সকলের অজ্ঞাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।[২৮]

স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিরোধই সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিরোধের ফলে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিলো, তা যাজকের স্তোত্রে, আইনপ্রণেতার নীতিতে এবং প্রাচীন কবিদের কিংবদন্তীতে স্থান লাভ করেছে। ডেভিডের প্রার্থনা-গীতির মতো বহু বৈদিক সঙ্গীত মুক্তির জন্য প্রার্থনা, বা বিজয়ের জন্য শুকরিয়ার আকারে চালু হয়ে গিয়েছিলো। ক্রোধের মুহূর্তে মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে

২৮. লাসেন তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা থেকে কোনোক্রমে বিরত হয়েছেন।

সঙ্গীতগুলোতে সেই তীক্ষ্ণ ভাষায় শত্রুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সংস্কৃত লেখকদের বর্ণনার ভিত্তিতে আদিম উপজাতির বিষয় বিবেচনা করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অবজ্ঞজনোচিত হাতে তাদের ছবি আঁকা হয়েছে। প্রকৃত সংঘর্ষ শেষ হওয়ার পর এবং পরাজিত জাতির জঙ্গলে পলায়নের পর আরো একটি ঘটনা ঘটেছিলো, যার ফলে তাদের সম্পর্কে আর্যদের বিবরণ আরো বিকৃত আকার ধারণ করেছে। তাদের ভাগ্যে সেমিটিক ইতিহাসের রেফাইমের[২৯] বংশধরদের মতো একই ঘটনা ঘটে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তারা দানব ও বিপথগামী দেবদূত হিসেবে চিত্রিত হয়।[৩০]

দেখতে পেয়েছিলো এবং যাদের তারা ভূমিদাস হওয়া বা জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ার উভয় সংকটে ফেলেছিলো। বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যকার পার্থক্য কখনোই মুছে যায়নি; এবং হিন্দুসমাজে যে অসম্মানজক সামাজিক বিভেদ রয়েছে, তা একই শ্রেণীর লোকের মধ্যকার বিভেদ নয়; দুটি পৃথক ও পরস্পরবিরোধী জাতির মধ্যকার বিভেদ। মনুর চার প্রকারের শ্রেণীবিভাগ কেবলমাত্র সংস্কৃত কেন্দ্র বা মধ্যদেশে প্রযোজ্য হলেও, নিম্নবঙ্গ ও ভারতের অন্য সমস্ত স্থানে প্রযোজ্য দুই প্রকারের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতেই তা গড়ে উঠেছে। এই দুই প্রকারের শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে, মনু বর্ণিত দুইবার জন্মগ্রহণকারী বা দ্বিজ বা আর্য; এবং অনার্য উপজাতি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যেই বিপুল সংখ্যায় দেখা যায়; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এবং তাদের থেকে উদ্ভূত মিশ্র বর্ণের লোকই ভারতের সর্বত্র সমগ্র হিন্দুসমাজের অপরিবর্তনীয় অঙ্গ।

সংস্কৃত ভাষা

এই জাতিগত পার্থক্য যে কেমন করে তিক্ততায় পরিণত হয়েছিলো তা উপলব্ধি করা খুব কঠিন কাজ নয়। আর্যদের প্রাধান্য এতো প্রবল ছিলো যে, তারা আদিম

২৯. ফিলিস্তিনের বিরাটকায় আদিম উপজাতি। 'তারা এমন দূর অতীতের বাসিন্দা যে পরবর্তীকালে বিরাটকায় 'অভিভাবক' বা পাতালপুরীর ভূতের বর্ণনা দেয়ার জন্য তাদের নাম 'রেফাইম' ব্যবহার করা হতো।'—আর্থার পেনরিস স্টানলি, ডি. ডি. প্রণীত লেকচার্স অন দি হিস্ট্রি অব দি জুইশ চার্চ, ২০৮ পৃষ্ঠা, লন্ডন, ১৮৬৩। মিসরের রাখাল উপজাতিগণ (মিলম্যান প্রণীত হিস্ট্রি অব দি জস প্রথম খণ্ড) এবং টাইফোনিয়ানগণ বা পূর্বাঞ্চলীয় ফেরাউনের প্রজাগণ, যারা মেনেচেরেসের বিরোধিতা করেছিলো; কিন্তু গ্রিক সাহিত্যে তাদের হেলেনিক দানব ও দানব টাইফোনদের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে।—অসবার্ন প্রণীত মনুমেন্টাল হিস্ট্রি অব ইজিপ্ট, খণ্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা। ১৮৫৪।

৩০. রাক্ষসগণ, যাদের শক্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রাচীনকালে পূজার মারফত সংস্কৃত দেবতাদের সাহায্যপ্রার্থী হতো। সেকালে রাবণই (রাক্ষসেন্দ্র) রাক্ষসদের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং আজকাল বাংলা যাত্রাদলের অভিনেতারা প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। সিংহলের আদিম উপজাতিদেরও একই লজ্জাকর নামে অভিহিত করা হতো; চীনা পরিব্রাজকগণ এবং সিংহলী ঐতিহাসিকগণ একথা স্বীকার করেছেন। স্যার ইমার্সন টেনেন্ট শব্দটিকে 'ইয়াকো' বলেছেন; স্পষ্টতই শব্দটি 'রাকো'-র সমতুল্য, এবং সংস্কৃত 'রাক্ষস' শব্দটিকে চলতি ভাষায় 'রকো'-ই বলা হয়ে থাকে।—মহাবংশ, সপ্তম সর্গ, রাজাবলী, ১৭২ পৃষ্ঠা; স্যার ইমার্সন টেনেন্ট প্রণীত 'সিংহল' নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠায়, এবং তৃতীয় সংস্করণের ৩২৮ ও ৩৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

অধিবাসীদের নিচু পর্যায়ের পশু[৩১] বলে মনে করতো। এই সেদিনও বীরভূমের কোনো ব্রাহ্মণ সাঁওতাল ভূমিতে বাস করতে গেলে সেখানকার উপজাতিদের কুকুরের মতো ঘৃণা করতো এবং কিছুদিন আগেও তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করতো। যে কোনো দিক থেকেই দুটো জাতির তুলনা করা যাক না কেন, সংস্কৃত সাহিত্যে দাস্য[৩২] নামে বর্ণিত আদিবাসীরা বেদনাদায়করূপে নিকৃষ্ট ছিলো। তাদের ভাষা ছিলো ভাঙা ভাঙা ও অপূর্ণাঙ্গ। আর্য যোদ্ধারা তাই 'অস্পষ্ট উক্তির'[৩৩] ও 'অপরিচ্ছন্ন কথার'[৩৪] মানুষদের ওপর জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করতো। পক্ষান্তরে আর্যদের ভাষা ছিলো শক্তি ও সাবলীলতায় পরিপূর্ণ; পরিবর্তনশীল শব্দ ও ব্যাকরণের সম্ভারের তাতে অভাব ছিলো না। মানুষের সুখ-দুখ, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি সবকিছুই এই ভাষায় নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা যেতো; এবং লিখিত ইতিহাস শুরু হওয়ার সময় থেকে এই ভাষায় আর্যদের সর্বোচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার বাহন হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। ফলে সংস্কৃতভাষী বিজয়িগণ প্রাচীন দাস্য বা তাদের বংশধর বর্তমান উত্তর সীমান্তের পাহাড়ি উপজাতিদের সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ ভাষাকে যে কি ঘৃণার চোখে দেখতো তা সহজেই অনুমান করা হয়। এই ভাষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, যা-কিছু চোখে দেখা যায়, বা হাতের ধরা যায়, তার প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য এতে বহু শব্দ রয়েছে; অথচ বুদ্ধিবৃত্তিগত ভাব বা ধারণা এই ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।[৩৫] কোনো বিষয়ের সম্পর্ক এবং বিশেষত কারণ ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক প্রকাশের জন্য কোনো শব্দ এই ভাষায় নেই।[৩৬] অনুভূতি ও চিন্তার সংমিশ্রণে যে উচ্চতর ভাবধারা ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়, তা একই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; এবং সর্বোপরি মানুষের চিন্তা-জগতের রহস্য বর্ণনার জন্য এই ভাষায় কোনো শব্দ নেই।[৩৭] ভাষাটি তাই শিহরণের ভাষা, অনুভূতির নয়; দৃশ্যের, অদৃশ্যের নয়; এবং বর্তমানের, ভবিষ্যতের বা অতীতের নয়।

---

৩১. রামায়ণ মহাকাব্যে তাদের কপি বা বানর জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে; হিমালয় ও সিংহল এলাকায় তারা নাগ (সাপ) জাতি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে হিন্দু যাত্রাদলেও তাদের নাগরূপে চিত্রিত করা হয়; নিম্ন অঞ্চলের (পাতালের) দানবদের মতো পোশাক পরে অভিনেতারা মঞ্চে অবতীর্ণ হয়, তাদের মূল মানুষের মতো, কিন্তু সাপের মতো একটি লেজ থাকে এবং মাথার পিছনে কৃত্রিম সাপের ফণা পরিধান করে।

৩২. শব্দটি দস্যু ও দাস রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। দাস শব্দটি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত আদিবাসীদের পারিবারিক নাম হিসেবে এখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং ইংরেজি ভাষায় সাধারণত ডস রূপে লিখিত হয়ে থাকে।

৩৩. মৃদ্রবাচ। তবে বাটলিংক ও রথের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

৩৪. অংশ ম্লেচ্ছ। এই শব্দগুলো নানাভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে যে অর্থ করা হয়েছে, তা সাধারণত গ্রহণযোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে; এবং অধ্যাপক গোল্ডস্টাকারের বিশ্লেষণের পর বহু বৈদিক শ্লোক সম্পর্কে এই কথা বলা যেতে পারে।

৩৫. কোচ, বোদো ও ধীমল ভাষায় বস্তুত, অনুপ্রেরণা, শূন্যতা, প্রবণতা, কারণ, সচেতনতা, পরিমাণ, গুরুত্ব প্রভৃতি শব্দের সমতুল্য কোনো শব্দ নেই।—বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের বি. এইচ. হজসন প্রণীত এসে অন দি কোচ, বোদো অ্যান্ড ধীমল ট্রাইবস, শব্দসম্ভার, ১১ পৃষ্ঠা।

৩৬. বোদো ও ধীমল ভাষায় কারণ ও প্রতিক্রিয়া আদৌ প্রকাশ করা যায় না এবং কোচ ভাষায় কেবলমাত্র সংস্কৃত শব্দের সাহায্যেই করা যায়। একই পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৭. এই ভাষাগুলোতে পৃথিবী, বেহেশত, দোজখ, এই জগৎ বা পরবর্তী জগৎ প্রভৃতির সমতুল্য কোনো শব্দ নেই। ধীমল-ভাষীরা এই সকল বিষয় প্রকাশের জন্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে থাকে। আকাশের যেটুকু চোখে দেখা যায়, বোদোরা সেটুকুই মাত্র প্রকাশ করতে পারে, তার বাইরে আর কিছুই তারা কল্পনা করতে পারে না।

জঘন্য দাস্যবর্ণ

সম্ভবত যে বিষয়টি অন্য যে কোনো একক বিষয়ের চেয়ে এই দুই জাতির বিভেদ বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিলো, তা হচ্ছে তাদের গাত্রবর্ণের পার্থক্য।[৩৮] আক্রমণকারীরা উত্তরাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ জাতীয় লোক ছিলো; ফলে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণবর্ণ লোকদের প্রতি সর্বত্র যে ঘৃণার ভাব পোষণ করে থাকে, সেই মনোভাব তাদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো।[৩৯] 'যে দেবতা দাসদের ধ্বংস করে আর্য বর্ণকে রক্ষা করেছেন,' এবং 'যে বজ্রদেব তাঁর শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদের শস্যশ্যামল মাঠ দিয়েছেন, সূর্য দিয়েছেন এবং পানি দিয়েছেন,' প্রাচীন গায়করা সেই দেবতার প্রশংসাগীতি গেয়েছেন।[৪০] এই বাক্যটিতে যতোই অস্পষ্টতা থাকুক না কেন, গায়করা 'কালো চামড়া' সম্পর্কে যে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।[৪১] গায়করা তাদের গানের মধ্য দিয়ে 'ঝঞ্ঝা দেবতাদের' জয়গান গেয়েছেন, 'যারা উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো হামলা করে কৃষ্ণবর্ণদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন।' তারা 'ইন্দ্র কর্তৃক ঘৃণিত কৃষ্ণবর্ণদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত'[৪২] হওয়ার কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র 'যুদ্ধের সময় আর্য-পূজারীদের রক্ষা করেছেন, মনুর জন্য উচ্ছৃঙ্খলদের দমন করেছেন এবং কৃষ্ণবর্ণদের জয় করেছেন।'[৪৩] 'কৃষ্ণবর্ণদের বংশধর ক্রীতদাসদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য' এবং 'জঘন্য দাস্যবর্ণদের দূরীভূত করার জন্য'[৪৪] পূজারীরা দেবতাদের বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছে।

আদিবাসীদের প্রতি আর্যদের ঘৃণার আর একটি কারণ হচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাদের বদ-অভ্যাস। জীবনের প্রতি তাদের কোনো দয়ামায়া ছিলো না; তাদের মধ্যে অনেকে ঘোড়ার গোশত খেতো, অনেকে মানুষের গোশত খেতো এবং অনেকে আবার রান্না না করেই কাঁচা গোশত খেতো, আদিবাসীদের প্রায় সকলেই পশুপাখির গোশত এমনভাবে আহার করতো, যা দেশে সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন আর্যরা বিতৃষ্ণ ও মর্মাহত হতো। বৈদিক গায়করা তাই তাদের সর্বভুক বর্বর বলে অভিহিত করেছে এবং আর্যদের সমস্ত ঘৃণা ও নিন্দা 'কাঁচা-ঘাতক'[৪৫] শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করেছে।

---

৩৮. মুর প্রণীত মূল স্যানসক্রিট টেক্সটস, প্রথম খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৮৪ ও ৩২৩ পৃষ্ঠা। মূল স্তোত্রগুলো উল্লেখ করা সম্ভব না হওয়ায় আমি এই পুস্তক থেকে বৈদিক উক্তি উদ্ধৃত করেছি।

৩৯. ঋগ্বেদ, ৩—৩৪,৯।

৪০. ঋগ্বেদ, ১—১০০,১৮।

৪১. কৃষ্ণম ত্বচম, ঋগ্বেদ, ৯—৪১, ১; মুর বলেন, এই শ্লোকটি শামবেদে (১—৪৯১, ও ২—২৪২) পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

৪২. ঋগ্বেদ, (৯—৭৩,৫।

৪৩. ঋগ্বেদ, ১—১৩০,৮।

৪৪. ঋগ্বেদ, ২—২০, ৭. এবং ২—১২,৪। সে সকল পণ্ডিত কখনও বেদ পড়েনি তাদের মুখেও 'দাসম বর্ণম অধরম' শ্লোকটি শুনতে পাওয়া যায়।

৪৫. 'অমদ', ঘৃণা প্রকাশের জন্য যে অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, স্যানসক্রিট টেক্সট পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

দেবতাবিহীন দাস

আর্যদের ঘৃণার আর একটি কারণ হচ্ছে আদিবাসীদের কুসংস্কার। আর্যরা তাদের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-আচরণ এনেছিলো।[৪৬] কিন্তু নতুন জায়গায় এসে তারা দেখতে পেলো যে, দাসদের কোনো বোধগম্য ধর্মমত নেই এবং অধিকন্তু তারা নানা প্রকার অলীক ভয়-ভীতিতে সর্বদা সন্ত্রস্ত। খ্রিস্টধর্মের পূর্বে আল্লাহ্র একত্ব ও আত্মার অমরত্ব—এই দুটি মহৎ ভাবধারা চালু ছিলো এবং প্রাচীনতম সংস্কৃত রচনায় এই দুটি নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। শতাব্দীব্যাপী পরাজয় ও রাজনৈতিক অপমান ভোগ করা সত্ত্বেও সংস্কৃতভাষী আর্যজাতি কখনই এই নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। এই সত্য অবশ্য ধূলিমলিন হয়ে পড়েছে এবং ভুলভ্রান্তিতে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সত্যটি সর্বদাই রয়েছে। একটি কল্পনাপ্রবণ জাতির পক্ষে যে ভুল করা স্বাভাবিক, আর্যরাও সেই ভুল করে এবং সর্বশক্তিমানকে তাঁর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিস্তারিতভাবে স্বীকার করতে গিয়ে কার্যত বহু ঈশ্বরবাদী হয়ে পড়ে; ফলে কর্মকে কর্মীর চেয়ে এবং সৃষ্টিকে স্রষ্টার চেয়ে বেশি আরাধনা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বেদে বর্ণিত বহু দেবতার আরাধনায় এবং আধুনিক হিন্দুধর্মের অসংখ্য সংস্কারের মধ্যে মূল দেবতার একত্বের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্যদের 'ধর্মের প্রধানমত উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই যোগসূত্র পুনঃস্থাপন করা, যে যোগসূত্রে তাদের নিজের আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ সাধিত হয়েছে।'[৪৭] ফলে আধুনিক পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কেউ বহু ঈশ্বরবাদিতার অভিযোগ করলে তিনি জবাব দিয়ে থাকেন, 'এগুলো একই ঈশ্বরের বহুবিধ প্রকাশমাত্র; আকাশে একটিমাত্র সূর্যই থাকে, কিন্তু হ্রদের পানিতে তার অসংখ্য প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। আরাধনার বিভিন্ন শাখা একই নগরীতে প্রবেশ করার বিভিন্ন প্রবেশদ্বার মাত্র।'[৪৮]

---

৪৬. ভারতীয় চিন্তাবিদগণ আধুনিক ধর্মবাদ সমস্যার যে কতো গভীরে প্রবেশ করেছিলেন তা উপলব্ধি করার জন্য 'আমরা যা কিছু ভালোবাসি, তাকে পরমাত্মার আশ্রয়স্থল বলেই ভালোবাসি', এই হিন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে জনাথন এডওয়ার্ডের 'থিওরি অব ডিগ্রিজ অব বিয়িং'-এর তুলনা করা যেতে পারে।

৪৭. মুলার প্রণীত হিস্ট্রি অব এনসিয়েন্ট স্যানসক্রিট লিটারেচার, ১৯ পৃষ্ঠা। ড. মুর তাঁর স্যানসক্রিট টেক্সটস পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেকটি বর্ণই তাদের নিজ নিজ দেবতাকে সর্বশক্তিমানরূপে পূজা করে থাকে। কৃষ্ণের পূজারি তার প্রার্থনায় বলে, 'তোমার জয় হোক, তুমি সর্বস্রষ্টা, তুমি সকলের আত্মা, সকলের উৎস, তুমি বিষ্ণু, বিজয়ী, হরি, কৃষ্ণ।' তারপর যে সকল নামে তাঁকে আরাধনা করা হয়, সেই সকল নামের তালিকা দেয়া হয়েছে।—স্যানসক্রিট টেক্সটস, চতুর্থ খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা।

৪৮. মি. লং তার 'নোটস অন ভিজিটস টু পণ্ডিটস' পুস্তিকার (কলিকাতা) প্রথম পৃষ্ঠায় এই জবাবটি উল্লেখ করেছেন। আমি নিজেও একাধিকবার একই জবাব পেয়েছি। দেবতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কিত দার্শনিক বর্ণনার জন্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অষ্টম সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ৪৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য : 'এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় যে, কিছু লোক একটি মূর্তি পূজা করছে এবং অপর কিছু লোক একটি পৃথক আকৃতির মূর্তির পূজা করছে, অথচ মূর্তি দু'টি মূলত একই দেবতার। এই পৃথক পৃথক মূর্তির আরাধনা ও তাদের ইতিহাসের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়; ফলে ক্রমে মূর্তি দু'টি দুইজন পৃথক দেবতার বলে পরিগণিত হয়।'—হোয়েটলির আলোচনা।

আদিবাসীরা ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে এতো বেশি অজ্ঞ ছিলো যে, আর্যদের কাছে তাদের আদৌ কোনো ঈশ্বর আছে বলে মনে হতো না। তাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় অনুভূতি ছিলো একটি অস্পষ্ট অলীক ভীতি। অন্য বহু ঘৃণাব্যঞ্জক শ্লোক ছাড়াও চারটি বৈদিক বাক্যে তাই তাদের 'ইন্দ্র বর্জনকারী', 'ত্যাগী নয়', 'দেবতাহীন', ও 'আচারহীন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৯]

অনন্ত জীবন সম্পর্কে আর্যদের অভিমত

এবার অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। যে সকল প্রাণী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাদের সঙ্গে মানুষের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে আর্যদের ধর্মে একটি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে; কিন্তু আদিবাসীরা এ সম্পর্কে কিছুই অবগত নয়। মৃত্যুর পর আর একটি জীবন রয়েছে বলে আর্যরা গভীরভাবে বিশ্বাস করে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আত্মা যে একাকী পথ অতিক্রম করে, এই রহস্যের সঙ্গে আর্যরা প্রথম থেকেই পরিচিত ছিলো। ফলে প্রাচীনকালের কল্পনাপ্রবণ জাতিগুলোর মতো তারাও এমন একজন স্বর্গীয় মানুষের কল্পনা করেছিলো, যে মানুষ মূলত দেবতাদের সমকক্ষ না হলেও অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। মিসরের রাজা মৃত্যুর পর আরকে সিঞ্চিত হয়ে পিরামিডে শায়িত হলে থিউট তাঁর আত্মাকে পথ দেখিয়ে মৃতের বিচারের জায়গায় নিয়ে যেতো। গ্রিকদের জন্য হারমেসও একই ভূমিকা পালন করতো এবং রোমানদের আত্মা মার্কারি বহন করে নিয়ে যেতো। বিভিন্ন নামে অভিহিত আজরাইলও সকল যুগের সকল ধর্মমতের সেমিটিক জাতির আত্মাকে সেই একই নিরপেক্ষ ভূমিতে নিয়ে যায়। আর যম হচ্ছে আর্যজাতির নেক্রোপম্পোস। যমের প্রাচীন ইতিহাস হিমালয়ের পারসিক দিকে সংরক্ষিত রয়েছে। জেন্দ কিংবদন্তীতে বলা হয় যে, দুঃখ, পীড়া ও মৃত্যু যখন অজ্ঞাত ছিলো, যিম বা যম তখন রাজা ছিলেন। কালক্রমে পৃথিবীতে পাপ ও পীড়ার আবির্ভাব হয় এবং মৃত্যুর প্রয়োজনে তাদের আগমন দ্রুততর হয়ে ওঠে। এই সময় বৃদ্ধ রাজা যম পংকিল পৃথিবী থেকে তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে আর একটি রাজ্যে চলে যান এবং এখনো তিনি সেইখানেই রাজত্ব করছেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় আর একটি কাহিনী পাওয়া যায়। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, যমই প্রথম মানুষ, যিনি মৃত্যু অতিক্রম করে অমরত্ব লাভ করেন। পরবর্তী জগতে প্রবেশ করার পথ আবিষ্কার করার পর তিনি সেখানে একটি রাজ্য লাভ করেন। ঋগ্বেদের দশ সর্গে বলা হয়েছে যে, অন্য লোকদের তিনি পথ দেখিয়ে এই রাজ্যে নিয়ে গিয়ে থাকেন। একটি শ্লোকে তাকে একটি পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষের তলায় ভোজনরত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫০] অন্যান্য শ্লোকে তিনি সর্বাধিক অভ্যন্তরে অবস্থিত স্বর্গে সিংহাসনে সমাসীন হয়ে ধার্মিক

---

৪৯. 'অনিন্দ্র'; 'আযায্যু'; 'অদেব'; 'অব্রত'। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, এই বাক্যগুলো সকল আদিবাসীর প্রতি প্রযোজ্য ছিলো না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো সম্ভবত ধর্মীয় বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণকারী আর্যদের প্রতিও প্রয়োগ করা হতো।

৫০. ঋগ্বেদ, ১০—১৩৫, ১। অথর্ববেদ, ১৮—৪,৩।

লোকদের জ্যোতির্ময় বাসস্থান দান করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫১] তাঁর তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ ও অনন্ত ক্ষুধার্ত লালচে রং-এর কুকুর দুটি মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।[৫২] অথবা সার্বিরাসের মতো যমপুরীর প্রবেশপথ পাহারা দিচ্ছে; এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়। 'সত্মমি যম, তুমি মৃত্যু, তুমিই প্রথম নদীতে পৌঁছেছো, বহু লোকের জন্য পথ আবিষ্কার করেছো; তুমি দ্বিপদ ও শ্বাপদ প্রাণীর কর্তা।'[৫৩] 'অঞ্জলি দিয়ে তোমার পূজা করি যমরাজ, তুমিই লোকদের একত্রিত করো, তুমি স্রোতোস্বিনী পানিতে গমন করেছো, তুমি বহু লোকের জন্য পথ আবিষ্কার করেছো।'[৫৪]

ধার্মিক আর্যগণ মৃত ব্যক্তির নশ্বর অংশকে অবিনশ্বর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য দাহ করাকেই পবিত্রতম পদ্ধতি বলে মনে করতো। আমাদের ধর্মের মতো আর্যদের ধর্মও তাদের মৃত্যুকে জীবনের পরিসমাপ্তি হিসেবে গ্রহণ না করে নবজন্ম হিসেবে গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছিলো; এবং আগুন তাদের জন্য বিনাশকারীর নয়, মুক্তিদাতার কাজ করতো। মানুষ যেমন তার মাতাপিতার কাছ থেকে স্বাভাবিক জন্মলাভ করে এবং ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে আংশিক পুনর্জন্ম বা দ্বিতীয় জন্মলাভ করে; ঠিক তেমনি আগুন তার আত্মাকে মাটির দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে তার তৃতীয় বা স্বর্গীয় জন্ম সম্পাদন করে। তার আত্মীয়-স্বজন তার চিতার চারদিকে দাঁড়িয়ে তার চক্ষুকে সূর্যে, নিঃশ্বাসকে বাতাসে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মাটি, পানি ও গাছপালায় বিলীন হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়, কারণ এগুলো এই সকল জায়গা থেকেই নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু 'হে অগ্নিদেবতা, তার যে অংশটি সাধারণভাবে জন্মলাভ করেনি, তোমার উত্তাপ দিয়ে তাকে গতিসম্পন্ন করো; তোমার শিখা ও উজ্জ্বলতা দিয়ে তাকে উজ্জ্বল করো; এবং তাকে সৎ ও ধার্মিকদের রাজ্যে প্রেরণ করো।'[৫৫]

তেরো বছর আগে অধ্যাপক মুলার ব্রাহ্মণদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন; এই প্রবন্ধে তিনি একট মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। চিতার উপর লাশ স্থাপন করার পর মৃতের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা এই মন্ত্র পাঠ করে তাকে বিদায় জানাতো। 'তুমি চলে যাও, প্রাচীন পথ ধরে তুমি সেখানে চলে যাও, যেখানে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা চলে গিয়েছে। সেখানে প্রাচীনদের সঙ্গে দেখা করো,[৫৬]

---

৫১. ঋগ্‌বেদ, ৯—১১৩, ৭.৮। ও ১০—১৪, ৮, ৯, ১০।

৫২. ঋগ্‌বেদ, ১০—১৪, ১১ ও ১২। কুকুর দু'টিকে অন্যত্র কালেটি ও ডোরাকাটা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদ, ৮—১, ৯।

৫৩. অথর্বদেব, ৬—২৮, ৩। তবে ম্যাক্সমুলারের লেকচাস পুস্তকের (দ্বিতীয় কিস্তি) ৫১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫৪. ঋগ্‌বেদ, ১০—১৪, ১। যারা এ বিষয়ে আরো তথ্য জানতে চান, তারা আর এ এস জার্নালের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৬৫) ডঃ মুর লিখিত 'যম' শীর্ষক আলোচনা পড়তে পারেন। এই উদ্ধৃতি এবং পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলো এই পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে।

৫৫. অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্তোত্র; মৃতদেহে আগুন ধরিয়ে দেয়ার পর এই স্তোত্র পাঠ করতে হয়।

৫৬. পিতরগণ (পিতৃগণ)।

মৃত্যুদেবতার সঙ্গে মিলিত হও, স্বর্গে তোমার বাসনা পূর্ণ করো। তোমার অসম্পূর্ণতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজ গৃহে চলে যাও। বৃহত্তর দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হও, উজ্জ্বলতায় সজ্জিত হও। তুমি যাও, চলে যাও, এখান থেকে দ্রুত চলে যাও।'[৫৭] এই মন্ত্রের জবাব আসতে পারে : 'যাদের জন্য অমৃতের নদী প্রবাহিত হয়, সে তাদের কাছে যাক। তপস্যার ফলে যারা জয়লাভ করেছে; যা চোখে দেখা না, সে সম্পর্কে ধ্যান করে যারা স্বর্গলাভ করেছে, সে তাদের কাছে যাক। সে তাদের কাছে যাক, যারা যুদ্ধকালে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, যারা অপরের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে, যারা দরিদ্রদের ধনসম্পদ দিয়েছে।'[৫৮] অপর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে : 'তোমার উপর সুরভিত মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হোক। বারি সিঞ্চনকারী দেবদূতগণ তোমাকে উপরে তুলে নিয়ে যাক, বাতাসের মধ্য দিয়ে দ্রুত বহন করে তোমায় শীতল করুক, তোমার উপর শিশিরের বিন্দু বর্ষণ করুক। তোমার আত্মা স্বস্থানে চলে দ্রুত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হোক।' বেদের একটি প্রার্থনাগীতি সমবেতকণ্ঠে গীত হওয়ার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় : 'তাকে নিয়ে যাও, বয়ে নিয়ে যাও, সমস্ত গুণাবলিসহ তাকে ধার্মিকদের রাজ্যে নিয়ে যাও। তার চারদিকে যে অন্ধকার উপত্যকা দিগন্ত প্রসারিত রয়েছে, তা অতিক্রম করে তার আত্মকে স্বর্গে নিয়ে যাও—যে পাপে সিক্ত, তার পদযুগল ধুয়ে দাও; পরিচ্ছন্ন পা নিয়ে সে উপরে উঠে যাক। যে আত্মার জন্ম হয়নি, অন্ধকার অতিক্রম করে বিস্ময়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে স্বর্গে আরোহণ করুক।'[৫৯]

ভাবি জীবনের বিবরণ

প্রাচীন বেদে আত্মার বিবর্তন বা পুনর্জন্মবাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। চিতার চারদিকে দাঁড়িয়ে মৃতের আত্মীয়-স্বজন এই বিশ্বাস নিয়েই মন্ত্র পাঠ করতো যে, মৃত ব্যক্তি সরাসরি মোক্ষ ও কৃপাময় পরিবেশে চলে যাবে এবং তার আগে যারা চলে গিয়েছে, সেই সকল প্রিয়জনদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবে। 'হে ঈশ্বর, আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাও, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হতে দাও।'[৬০] 'দেহের অক্ষমতা পিছনে ফেলে, পঙ্গুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের মাতাপিতা ও আমাদের সন্তানদের সঙ্গে আমাদের মিলিত করো।'[৬১] স্ত্রীও তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবে।[৬২] 'হে পরম পবিত্র, আমাকে তুমি সেই চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় জগতে আশ্রয় দাও, যেখানে গৌরব ও অলোক বিরাজমান। যেখানে সুখ, আনন্দ ও পরিতৃপ্তি বিরাজ করে, যেখানে বাসনা পরিপূর্ণ হয়, সেই জগতে আমায় তুমি

৫৭. ঋগ্বেদ, ১০—১৪।
৫৮. ঋগ্বেদ, ১৫৪।
৫৯. অথর্ববেদ, ৯—৫, ১।
৬০. অথর্ববেদ, ১২—৩, ১৭।
৬১. অথর্ববেদ, ৬-১২০, ৩।
৬২. কোলব্রুক প্রণীত 'এসেস' প্রথম খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা (১৮৩৭)। অথর্ববেদ, ৯—৫,২৭।

অমর করো।'[৬৩] রথ বলেন, 'এখানে আমরা অমরত্বের চমৎকার ধারণা দেখতে পাই; শিশুর মতো সরল বিশ্বাসের সঙ্গে সহজ ভাষায় এই ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে।'

দুনিয়ার যারা সৎভাবে জীবনযাপন করেছে, কেবলমাত্র তাদের জন্যই এই উজ্জ্বল জগতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত স্তোত্রগুলো যে যুগের, তার অনেক পরে পরকালে শাস্তি লাভের ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু একখানি ধর্মীয় গ্রন্থে এই সকল স্তোত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে : 'পরকালে মানুষের পাপ ও পুণ্য পাল্লায় ওজন করা হবে। পাপ বা পুণ্য-পাল্লার যে দিকই ভার হোক না কেন, মানুষকে সেই পথ অনুসরণ করতে হবে। যে ব্যক্তি এই বিষয় অবগত আছে, সে ব্যক্তি এই জগতেই নিজেকে পাল্লায় স্থাপন করে থাকে; ফলে পরকালে তাকে আর ওজন হতে হয় না।'

এই ধারণার উৎস কোথায়

উপরে উদ্ধৃত বৈদিক স্তোত্রগুলোতে অমরত্ব সম্পর্কে যে গভীর দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে, অন্য কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায় না,—এমন কি সেমিটিক রচনাবলিতেও[৬৪] না, অথবা গ্রিস ও রোমের পরবর্তীকালীন আর্য সাহিত্যেও না। বেদে নশ্বর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মা অপর একটি সুস্পষ্ট ও মহত্তর দেহ ধারণ করে থাকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এই আত্মা পুরোনো বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সুখময় পরিবেশে মিলিত হয়ে বাস করে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। হোমার পরকালের যে ছবি এঁকেছেন, তা একটি অস্পষ্ট, অনিশ্চিত এলাকা বিশেষ; সেখানে যারা বাস করে, তারা ছায়ামাত্র এবং তাদের অধিকাংশই অসুখী। উজ্জ্বল জীবনের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক ভালোবাসা আছে, হোমারের জগৎ তার এমন পরিপন্থী যে, একিলিস ইউলিসিসকে বলেছেন যে, তিনি পরকালের রাজা হওয়ার চেয়ে এই জগতের চাকর হয়ে থাকার পক্ষপাতী। অন্ধ কুসংস্কারের যুগের পর জুলিয়ানের রাজদরবারের দার্শনিকগণ সেন্ট পলের ব্যাখ্যার আলোকে প্লেটোর রচনাবলি পাঠ করার সময় মরণশীল সম্পর্কে অনেক কিছুই সান্ত্বনাদায়ক বিষয় খুঁজে পান। কিন্তু গ্রীস ও রোমের স্বাভাবিক দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে তৎকালীন পণ্ডিতগণ যে অমরত্ব সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট আশার সন্ধান পাননি, সে সম্পর্কে আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গিবন বলেছেন, 'সিসারো ও প্রথম সিজারদের আমলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্র, কার্যক্রম ও অনুপ্রেরণা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে অবগত আছি; কিন্তু পরকালের পুরস্কার বা শাস্তি সম্পর্কিত কোনো বিশ্বাস তাদের ইহকালের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করেছে বলে আমাদের মনে হয় না।' টাসকুলান ডিসপিউটেশনে একটি অলীক সংকটের ভিত্তিতে চিরন্তন সুখময় পরিবেশের অনুকূলে যুক্তি খাড়া করা হয়েছে; এবং সিসারো আম্রকাননে বসে যে বিষয়ে ধ্যান

৬৩. সোমদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা । সোমরসের অঞ্জলিকে নিরাকার দেবতারূপে কল্পনা করা হয়। ঋগ্‌বেদ, ৯—১১৩, ৭ ও ১১।

৬৪. এমন কি ইহুদিদের ধর্মপুস্তকেও পরকালের জীবনকে এই জগতে সৎপথে থাকার আকর্ষণ হিসেবে তুলে ধরা হয়নি।

করেছেন, জনসমক্ষে তিনি সেই বিষয়ের প্রতিই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। অন্ধযুগের চিন্তাশীল ব্যক্তি যে যুক্তির মধ্য থেকে মৃত্যুকে জীবনের পরিবর্তন মাত্র বলে আশ্বাস লাভ করেছে, অথবা ফিলিও যে স্বপ্নের বিষয় উল্লেখ করেছেন, তা থেকে জনৈক বন্ধু পক্ষ থেকে সিসারো কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার[৬৫] দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ভবিষৎ জীবন বা পরকাল নিঃসঙ্গ মানুষের কালক্ষেপ করার বিষয়বস্তু মাত্র; দুনিয়ার কোনো মানুষই ভবিষ্যৎ জীবন দ্বারা তার দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে রাজি নয়।

বিষয়টি নিঃসন্দেহে পরীক্ষা করে দেখার উপযুক্ত। উত্তর ভারতের প্রাচীন গায়কগণ কেমন করে গ্রিস ও রোমের দার্শনিকদের চেয়ে মানুষের ভবিষ্যৎজীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুগভীর ধারণা লাভ করেছিলো? শিশু কেমন করে বয়স্ক মানুষের চেয়ে বেশি জ্ঞান লাভ করেছিলো এবং প্রকৃতির আলোকই বা কেমন করে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিলো? দিনের সুশীতল পরিবেশে আদম যে শিক্ষা লাভ করেছিলো, প্রাচীন যুগের সরল বিশ্বাস কি তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়? আদমের এই শিক্ষা কি প্রাচীনকালের সমগ্র মানবজাতির জন্য ধ্রুব সত্যের সাধারণ বিষয়বস্তু বলে পরিগণিত হয়েছিলো? এই শিক্ষার প্রতিধ্বনি কি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসংখ্য জাতির মানুষকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে শোনাতে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে পণ্ডিতদের অসার যুক্তি ও ক্রুদ্ধ তর্কের চাপে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে? এই মতবাদ কোনো সুষ্ঠু ধর্মীয় দর্শনেরই পরিপন্থী নয়। ডক্টর স্ট্যানলি বলেন, 'বালামের জীবনে মনোনীত জাতির বাইরেও স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের সংকীর্ণতা এই সত্যকে অস্বীকার করলেও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে এই সত্য সর্বদাই স্বীকার করা হয়েছে এবং বিশ্বজনীন ধর্মব্যবস্থায় সকল যুগের সকল জাতিরই উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।'[৬৬]

অনার্যদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

আর্যদের অমরত্বের আশ্বাসের তুলনায় উত্তর সীমান্তের আদিবাসীরা যে কথা বলে তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনদের ইহজগত থেকে বিদায় দিয়ে থাকে, তা রীতিমতো অপমানজনক। মহাকাল সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই; তাদের কয়েকটি ভাষায় যে দীর্ঘতম সময়ের বর্ণনা দেয়া যায়, তা একটি মানুষের জীবনকাল মাত্র; এবং একটি ভাষার সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে সাত।[৬৭] মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি চোখের অগোচর করাই আদিবাসীদের সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য। উত্তর-পূর্ব এলাকার পাহাড়ি লোকেরা মানুষ

৬৫. প্রো ফ্লুরেনসিয়ো। গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত এই বন্ধুটির বিচারের সময় সিসারো আদালতে এই বক্তৃতা করেন।

৬৬. লেকচার্স অন দি হিস্ট্রি অব দি জুইশ চার্চ, ১৯০ পৃষ্ঠা। বালামের স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার কথা হোয়েটলিও স্বীকার করেছেন।—ডিজার্টেশন অন দি রাইজ প্রগ্রেস এন্ড করাপশন অব ক্রিশ্চিয়ানিটি।

৬৭. বোদো ভাষা।—এসে অন দি কোচ, বোদো এন্ড ধীমল ট্রাইবস, বি. এইচ. হজসন প্রণীত, ১১৭ পৃষ্ঠা; কলিকাতা, ১৮৪৭।

মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে; কোনোরকম আচার-অনুষ্ঠান তারা পালন করে না। মৃতদেহকে গর্তে লুকিয়ে ফেলার পরই আত্মীয়-স্বজনরা নিকটবর্তী নদীতে স্নান করে করে নিজ নিজ কাজে ফিরে যায়। যে সকল উপজাতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আচার-অনুষ্ঠান চালু করেছে, মানুষের মৃত্যু তাদের কাছে ভোজন ও মাতলামির উপলক্ষ্য মাত্র। খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হওয়ার পর তারা কবরের কাছে গিয়ে মৃত ব্যক্তিকে খাদ্য ও মদ পরিবেশন করে এবং এই কথা বলে বিদায় দেয় : 'এই নাও খাও। এতোদিন তুমি আমাদের সঙ্গে একত্রে খেয়েছো ও পান করেছো, কিন্তু আর কখনো তুমি তা করতে পারবে না।'এতোদিন তুমি আমাদেরই একজন ছিলে, কিন্তু আর তেমন থাকতে পারবে না। আমরা আর তোমার কাছে আসবো না, তুমিও আর আমাদের কাছে যাবে না।'[৬৮] এই বিদায়ই শেষ বিদায়। আর্যদের বিদায়বাণীতে পরকালে পুনর্মিলনের আশা আছে, কিন্তু আদিবাসীরা ভয়ের কাছ থেকে সরে যাওয়ার মতো মৃতের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তাই পরকালে মিলনের কথা তো দূরে থাক, তারা কামনা করে, মৃত ব্যক্তি যেনো আর কখনো তাদের কাছে ফিরে না আসে।

আর্য ও আদিবাসীদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অসমতা সম্পর্কে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি; কারণ, আমি মনে করি যে, ভারতের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে যে নির্মম সামাজিক বিভেদ রয়েছে, এই অসমতাই তার প্রকৃত কারণ। সংস্কৃত ইতিহাসে দাস জাতিকে প্রথমে শত্রু, তারপর দুষ্ট প্রেতাত্মা, তারপর পশু এবং সর্বশেষে আর্যজাতির ক্রীতদাস রূপে দেখানো হয়েছে।[৬৯] প্রাচীনকালের অন্যান্য জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যকার পার্থক্যের চেয়ে এই পার্থক্য অনেক বেশি ব্যাপক; নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর ঘৃণাও তেমনি অনেক বেশি তীব্র। সংস্কৃত সাহিত্যের পাতায় পাতায় এই ঘৃণার নির্দশন রয়েছে; এবং ক্রোধোন্মত্ত প্রাকৃত-ভাষী প্রভু তার ক্রীতদাসের ভাঙা ভাঙা কথার প্রতি—তার গো-হো (মানুষ), গো-দাম (পা), পো-তা (পেট)[৭০] প্রভৃতি শব্দের প্রতি যে সীমাহীন ঘৃণা প্রকাশ করেছে, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। প্যাট্রিসিয়ানরা প্লেবিয়ানদের প্রতি অথবা হেলেন তার হেলটের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ করেছে, এই ঘৃণা তার চেয়েও তীব্র; সুইফটের হৌয়িনহামরা ইয়াহুদের অস্পষ্টতার জন্য যে তীক্ষ্ণ ও ক্রুদ্ধ ঘৃণা প্রকাশ করেছে, একমাত্র তার সঙ্গেই এই ঘৃণার তুলনা করা যেতে পারে।

---

৬৮. এসে অন দি কোচ, বোদো এন্ড ধীমল ট্রাইবস, ১৮০ পৃষ্ঠা। দক্ষিণাঞ্চলের আদিবাসীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্যায়ের ছিলো।

৬৯. কোনো কোনো আদিম জাতি (তথাকথিত বানর উপজাতি) আর্য বাসিন্দাদের যে বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। হিন্দুরা বানরদের কাছ থেকে সেই শ্রদ্ধা দাবি করে এবং সেই ভিত্তিতেই তাদের বিচার করে; পরে অবশ্য আর্যরা তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিলো। সিনর গোরেসিও তাঁর 'ডিজার্টেশনস অন এন্ড নোটস টু দি রামায়ণ' নামক পুস্তকে বানর জাতি সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। (১) শত্রু, (২) দানব, (৩) পশু ও (৪) সিংহলী আর্যদের ক্রীতদাস হিসেবে আদিবাসীদের মর্যাদার শ্রেণীবিভাগ খুবই সুস্পষ্ট। মহাবংশে, ৩৭ অধ্যায়। রাজাবলী, ২৩৭ পৃষ্ঠা। রজত-নাচারি, ৬৯ পৃষ্ঠা। টেনেন্ট প্রণীত 'সিলোন' নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড ৩৭০ পৃষ্ঠা ও তৃতীয় সংস্করণের টীকায় উল্লেখিত।

৭০. স্যানসক্রিট টে-ক্সটস পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় আদিবাসী শব্দের একটি মূল্যবান তালিকা দেয়া হয়েছে।

আর্যদের উপর অনার্য প্রভাব

কিন্তু তথাপি দুটি জাতি পরস্পরকে প্রভাবিত না করে কখনোই যুগ যুগ ধরে একত্রে বসবাস করতে পারে না। শ্রেষ্ঠ জাতি নিকৃষ্ট জাতিকে করায়ত্ত করতে পারে বটে, কিন্তু নিজেরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। আদিবাসীরাও তাই আর্যদের ভাষা, ধর্ম ও রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রথম দিকেই নিম্নবর্ণের লোকদের ব্যবহৃত অপভ্রংশ বা চলতি সংস্কৃত ভাষায় আদিবাসীদের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। কোলব্রুকের অনুসরণে ডোনাল্ডসন এই ভাষাকে 'প্রাদেশিক জগাখিচুড়ি' বলে অভিহিত করেছেন এবং ড. মূর এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।[৭১] স্থানীয় বৈয়াকরণিকগণ ভারতের চলতি ভাষাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন : একটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত এবং অপরটি আদিবাসীদের ভাষা থেকে উদ্ভূত। বাংলাদেশে আদিবাসীদের অবদানটি ভাষা নামে এবং দক্ষিণ-ভারতে আতসু-তেলেগু, দেশীয় প্রভৃতি নামে পরিচিত। নিম্নবঙ্গের উপভাষা এবং বিশেষত বীরভূম ও জাতিগত সীমান্তের অন্যান্য জেলার অধিবাসিগণ যে ভাষায় কথা বলে, তাতে এমন অনেক শব্দ রয়েছে, যেগুলো সংস্কৃত থেকে গৃহীত হয়। এই শব্দগুলো লিখিত বাংলা থেকে সতর্কতার সঙ্গে বাদ দেয়া হলেও গৃহস্থ, রাখাল, কাঠুরিয়া প্রভৃতি সকলেই প্রতিনিয়ত তা ব্যবহার করে থাকে; এবং মা যে ভাষায় তার সন্তানকে আদর করে থাকে, সেই ভাষাতেও এই জাতীয় বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিম্ন উপত্যকার আর্যরা তাদের দানব-উপাসনার অনেক শব্দ নিঃসন্দেহে আদিবাসীদের কাছ থেকে নিয়েছে। পূজা করার চেয়ে অনিষ্ট কামনার যে অনুষ্ঠানগুলো এখন হিন্দু সংস্কারের লজ্জাকর অংশ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে, সেগুলো আদিবাসীদের অনিষ্ট কামনার জন্যই আর্যরা উদ্ভাবন করেছিলো। পরে আমি দেখাবো যে, শিবভক্তগণ তাদের উপাসনার বিষয়বস্তু আদিবাসীদের কাছ থেকেই পেয়েছে। গত ছয় শতাব্দীর মধ্যে এই শিবভক্তগণ ভারতের আধিবাসীদের একটি বিরাট অংশকে তাদের দলভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। শিব বা রুদ্র যে পুরা-কাহিনীরই অংশ হোক না কেন, একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নিম্ন বাংলায় যে শিবপূজা করা হয়, তা আর্যদের পূজার মূল ভাবধারার পরিপন্থী এবং কৃষ্ণবর্ণ জাতির কুসংস্কারেরই নিদর্শন। সিনর গোরেসিও উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচীনকালে আদিবাসীদের পূজার প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিলো এই ভয়াবহ দেবতা; এবং এই দেবতাকে খুশি করার জন্য তারা নররক্তের অঞ্জলি দিতো। এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে ব্রিটিশ সরকার সর্বদাই এই ধরনের নির্মম পূজা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করে আসছেন; কিন্তু অনটনের সময় সমৃদ্ধি কামনা করে নিম্নবঙ্গের পূজারিগণ এখনও এই চির-ক্ষুধার্ত দানবের উদ্দেশ্যে শিশুবলি করে থাকে। তিন হাজার বছর আগেও এই এই দেবতা জঙ্গলের আদিবাসীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে।

দেশে যাতে দুর্ভিক্ষ না হয় সেজন্য ১৮৬৫-৬৬ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নরবলি দেয়া হয়েছিলো। এই সময় নরবলির যে দুটি ঘটনা ধরা পড়েছিলো, সে সম্পর্কে

---

৭১. নিউ কানিটিলাস, ৮৫ পৃষ্ঠা (১৮৩৯)। স্যানসক্রিট টেক্সটস, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

সংবাদপত্রে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় সরকার সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন; এবং পুলিশ সর্বদা বিশেষভাবে সতর্ক থাকায় খুব বেশি সংখ্যক নরবলি হতে পেরেছিলো বলে মনে হয় না। ১৮৬৬ সালে যশোর জেলায় যে নরবলি হয়েছিলো, নিচে তার বিবরণ দেয়া হলো। বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় সর্বপ্রথম লোকবসতি শুরু হয়েছিলো যশোর জেলা তার মধ্যে অন্যতম; শিক্ষা-দীক্ষায় সর্বাধিক অগ্রসর জেলাগুলোর মধ্যেও যশোর অন্যতম। 'প্রায় সাত বছর বয়সের একটি মুসলমান বালককে লক্ষ্মীপাশা কালীমন্দিরের (কালী শিবের স্ত্রী) সংলগ্ন হাড়কাঠের কামরায় পাওয়া গিয়েছে; তার ঘাড় হাড়কাঠে আটকানো এবং ঘাড় কাটা। তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে দুই পাটি দাঁতের মাঝখানে আটকে রয়েছে, চোখ দুটি খোলা রয়েছে এবং দেহের কয়েক জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। বালকটির সারাদেহ সম্পূর্ণরূপে নগ্ন এবং ঘাড়ে খুনদার দুটো কোপ দেখা যাচ্ছে। দেহ থেকে মস্তকটি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাই বলির উদ্দেশ্য হওয়ায় বলিটি সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। সম্প্রতি হুগলীর একটি নরবলির ঘটনায় কাটা মাথাটি মূর্তির সামনে ফুলের স্তুপের উপর রাখা হয়।'[৭২] তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হওয়ার জন্য বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিমে এলাকার আদিম উপজাতিরা জঙ্গলের মধ্যে নরবলি দিয়েছে বলে আমি নিজে শুনতে পেয়েছি।

অনার্য আচারের প্রভাব

ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি এলাকায় দানব-পূজা ও নিন্দনীয় আচার-অনুষ্ঠানের এই একই প্রবণতা দেখা যায়। যে এলাকায় আদিবাসীদের প্রভাব যতো বেশি, সেই এলাকায় ততো বেশি জোরেশোরে এই জাতীয় কাজ করা হয়। উত্তর ভারতে, অর্থাৎ মনু বর্ণিত মধ্যদেশের সর্বত্র আদিবাসিগণ আর্যদের চাপে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গিয়েছে; ফলে দানবপূজা সেখানে প্রায় দেখাই যায় না। নিম্ন বাংলায় আর্যশক্তি আদিবাসীদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করতে পারেনি, ফলে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে সংশোধিত আকারে দানব পূজা চালু রয়েছে। মধ্য এলাকার সমতল ভূমিতে আর্যরা কখনো বসতি স্থাপন করেনি; ফলে সেখানে দানব-পূজাই একমাত্র প্রচলিত ধর্ম। সিংহলে খুব কম সংখ্যক আর্য বসতি স্থাপন করেছিলো; ফলে দানব পূজা সেখানকার পল্লী অঞ্চলের পূজা-আরাধনার মূল ভাবধারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সিংহলের কঠোরতাবাদী হিন্দু রাজারাও সরকারি খরচে পল্লী অঞ্চলের দানব-নর্তকদের ভরণপোষণ করতে বাধ্য হয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মকে পরাভূত করেছিলো বটে, কিন্তু দানব পূজা কোনোমতেই বন্ধ করতে পারেনি; শেষপর্যন্ত বৌদ্ধগণ এ বিষয়ে ইচ্ছে করেই উদাসীন মনোভাব গ্রহণ করে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ পাদ্রিগণ স্থানীয় লোকদের বৌদ্ধধর্ম থেকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দানব পূজার ব্যাপারে সিংহলীদের আগ্রহ বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারেননি। সিংহলের ওয়েসলিয়ান ও ব্যাপটিস্ট মিশনারিগণ রোমান ক্যাথলিকদের প্রোটেস্ট্যান্টে রূপান্তরিত করার পরও এই আদিম কুসংস্কার থেকে তাদের মুক্ত করতে পারেননি।[৭৩]

---

৭২. দি ইংলিশম্যান, ১৯শে মে, ১৮৬৬। কলিকাতা। (বর্তমান কালের স্টেটসম্যান পত্রিকা)।
৭৩. স্যার ইমার্সন টেনেন্ট প্রণীত 'সিলোন', প্রথম খণ্ড, ৫৪২ পৃষ্ঠা, তৃতীয় সংস্করণ।

গ্রামদেবতা

নিম্ন বাংলায় গ্রামদেবতা ও গৃহদেবতার পূজা একটি মনোরম বিষয়। এই কুসংস্কারটি ক্ষতিকর নয় বটে, কিন্তু হিন্দুরা যে এই আচারটি আদিম উপজাতিদের কাছ থেকে পেয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পাহাড়ি উপজাতিরা যে কীভাবে এই পূজা সম্পাদন করে তা আমি পরে বর্ণনা করবো। সমতলভূমি এলাকায় ব্রাহ্মণদের চেয়ে মিশ্র বংশের নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যেই গ্রামদেবতা সমধিক ভক্তির আসনে অধিষ্ঠিত; এবং বহু জায়গায় উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যে এখন আর এই পূজার প্রচলন নেই। বুকানন অবশ্য এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিম্ন বাংলার উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলোর সর্বত্র এই পূজার প্রচলন দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেন : 'সাধারণ মানুষ কখনোই গ্রামদেবতার পূজা ছাড়তে পারেনি। গ্রামকে তারা যে দেবতার আশ্রয়ের অধীন বলে মনে করে, পূর্বপুরুষদের পদাংক অনুসরণ করে তারা সেই দেবতাকে উপরে বর্ণিত দ্রব্যাদি (পান, তামা, চাল, পানি) নৈবেদ্য দেয়। এই দেবতার সাধারণ কোনো নাম থাকে না। অনেক সময় তারা বিভিন্ন ভূতপ্রেত বা হিন্দু দেবতাকেও গ্রামদেবতা হিসেবে পূজো করে থাকে। এই সকল ভূতপ্রেত বা অন্য কোনো নামের গ্রামদেবতা সাধারণত সেই সকল দেবতাই, সকল বর্ণের লোক বিপদের সময় যাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। এই দেবতার পূজায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে বলি দিয়ে বা অন্য কোনো নৈবেদ্য দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এই সকল দেবতার সাধারণত কোনো মূর্তি নেই, কোনো মন্দিরও নেই। গাছতলায় মাটির ঢিবিই মূর্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং নিম্নবর্ণের কোনো যাজক পূজা সম্পাদন করে।'[৭৪] এই নিম্নবর্ণের যাজকের মধ্যে আদিবাসীদের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। কোনো কোনো গ্রামদেবতার গোড়াপত্তন আর্য বসতি শুরু হওয়ার আগেই হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট দলপতি স্থানীয় ব্যক্তিও কালক্রমে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের পূজা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাদের পরিচয় লোকে বহুকাল আগেই ভুলে গিয়েছে; তাই কোনো কোনো জেলায় তাদের বংশধরদের পূজা করা হয়। আচার-অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বত্রই কৃষ্ণবর্ণ জাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতি, কাঁচা গোশত খাওয়ার অভ্যাস ও ভোজন বিলাসিতার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বুকানন তাই যথার্থই বলেছেন, 'অংশত ভীতিবশত এবং অংশত কাঁচা গোশতের ক্ষুধা মিটানোর জন্যই তারা দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়।'[৭৫] যে সকল মিশ্রবর্ণ আর্যদের প্রায় সমতুল্য এবং হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধ অন্যদের তুলনায় বেশি মেনে নিয়েছে, তাদের ভিতরকার আদিম উপজাতীয় দুর্ধর্ষ প্রবৃত্তিও এই উপলক্ষে জাগ্রত হয়ে ওঠে; ফলে গো-মেষ পালকদের এই সময় শূকরের কাঁচা গোশত খেতে দেখা যায়। অন্য সময় এই জাতীয় খাদ্যকে তারা হয়তো পুরোপুরি ঘৃণা করে থাকে। বীরভূমে এবং বিশেষত পশ্চিমের সীমান্ত এলাকায় এই পূজা খুবই জনপ্রিয়। বছরে একবার রাজধানীর সমস্ত লোক জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এক পূজামণ্ডপে সমবেত হয় এবং

---

৭৪. বুকানন পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত 'হিস্ট্রি অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া', প্রথম খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।
৭৫. বুকানন পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত 'হিস্ট্রি অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া', প্রথম খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা।

সেখানে একটি বেল গাছে সমাসীন এক ভূতের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করে।[৭৬] গাছটির বয়স বড়ো জোর সত্তর বছর হবে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা বলে কয়েক হাজার বছর। আরও কিংবদন্তী আছে যে, মণ্ডপে যে তিনটি গাছ আছে, তা কখনো মোটাও হয় না, লম্বাও হয় না; চিরদিন এই অবস্থায় রয়েছে। আদিম উপজাতিদের পূজার নিদর্শন সংবলিত উৎসবে যেমন হয়ে থাকে, এই উৎসবেও তেমনি অসংখ্য পশু বলি দেয়া হয়; এবং এই পশুর গোশত মহাসমারোহে ভোজন করার মধ্য দিয়েই দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। কুসংস্কারের গোড়াপত্তন আদিবাসীদের মধ্যে হয়েছিলো; এই পশুবলির মধ্যে দিয়ে তাই তাদের প্রাচীন রূপটিই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। কেবলমাত্র ধনীরাই ছাগল বলি দিয়ে থাকে। অন্য লোকেরা সাধ্যমতো মাটির সঙ্গে কিছু চাল বা কয়েকটি তামার পয়সা মিশিয়ে উৎসর্গ করে। আদিবাসীদের শিবপূজাও গ্রামদেবতা পূজার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ব্রাহ্মণরা বা বিশুদ্ধ আর্য বংশের হিন্দুরা শিবপূজা গ্রহণ করেছে, কিন্তু গ্রামদেবতা পূজা মিশ্রবর্ণের সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। শিবপূজা এখন গঙ্গা নদীর সমগ্র নিম্ন উপত্যাকার সর্বত্র সমান জনপ্রিয়। কিন্তু প্রাচীনকালে এই পূজা ব্রাহ্মণদের মধ্যে আদৌ জনপ্রিয় ছিলো না, আজকাল যেমন গ্রামের ছোটোখাটো দেবতার পূজা তাদের কাছে জনপ্রিয় নয়। কিন্তু অবস্থার এখন পরিবর্তন ঘটেছে; তাই সর্বাধিক অবহেলিত শিব মন্দিরের জন্যও আজকাল আর ব্রাহ্মণ পূজারীর অভাব হয় না।

অনার্য দেবতা শিব

বাংলাদেশের মিশ্রবর্ণের জনসাধারণের[৭৭] মধ্যে যে সকল দেবতা প্রাধান্য লাভ করেছে তার মধ্যে শিবই আদিবাসী যুগের একমাত্র দেবতা নয়। তবে শিবের সঙ্গে জনৈক সংস্কৃত ধর্মনেতার বহু সাদৃশ্য আছে বলে শিব এখন তার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে এবং তার নামেই অভিহিত হচ্ছে। লক্ষণীয় যে, জনসাধারণের ওপর আদিবাসীদের যে পরিমাণ প্রভাব আছে, দানব পূজা ও গ্রামদেবতা পূজার মতো শিবপূজাও ঠিক সেই পরিমাণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যে পাহাড়গুলো আদিবাসীদের আর্য জাতি থেকে পৃথক করে রেখেছে, সেই পাহাড়ে অথবা সংস্কৃত সভ্যতার অন্য কতিপয় সীমান্তে শিবের গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলো অবস্থিত। হিমালয়কে শিবের লীলাভূমি বলে উল্লেখ করা হয়; এবং প্রতি বছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী বীরভূমের উচ্চভূমিতে তার বেদীতে গমন করে থাকে। অধ্যাপক উইলসন যথার্থই বলেছেন যে, শিবপূজার বিষয়টি রহস্যে আবৃত

৭৬. মণ্ডপটি বাতাসপুর থেকে কিছু দূরে পউরা ও নাগরি গ্রামের মধ্যবর্তী জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। এখানে তিনটি গাছ আছে : বাঁ দিকে একটি বেল গাছ; এই গাছেই ভূত থাকে. গাছতলায় রক্তের দাগ আছে। মাঝখানে একটি কাচমল গাছ এবং ডান দিকে একটি শেওড়া গাছ। ভক্তরা গাছতলায় মাটি, চাউল, পয়সা প্রভৃতি নৈবেদ্য ছুড়ে দেয়। একজন ঠাকুর খাড়া হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কোনো পশু নিয়ে গেলে ঠাকুর খাড়ার এক কোপে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তারপর আশীর্বাদ সহকারে দেহটি ভক্তকে ফিরিয়ে দেয়।

৭৭. বুকানন 'মালিক বাম্না' নামক আধুনিককালে উদ্ভূত এক গ্রাম দেবতার কথা বলেছেন। বিহার ও সংলগ্ন এলাকার সর্বত্র এই দেবতার পূজা করা হয়। অনুরূপ বহু দেবতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

রয়েছে; কারণ অপেক্ষাকৃত মার্জিত জাতির পূজার বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে যে চমকপ্রদ কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে, শিবপূজার ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব নেই এবং শিবের একমাত্র দর্শনীয় নির্দশন হচ্ছে একটি কৃষ্ণ স্তম্ভ।[৭৮] তথাপি শিবপূজাই হচ্ছে এখন ধর্মের একমাত্র আকার, যা নিম্নউপত্যকার জনসাধারণের কাছে খুবই জনপ্রিয়। কৃষ্ণ বা বিষ্ণু উচ্চবর্ণের লোকদের দেবতা এবং তার পূজাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে সমারোহ বা প্রমোদ বলেই বেশি মনে করা হয়। বাঙালিরা তাই সকল প্রয়োজনে শিবের কথাই স্মরণ করে। অথচ প্রাচীন আর্য লেখকগণ এই দেবতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবহিত ছিলেন না।

শিব ও গ্রামদেবতা

হিন্দুধর্মের ওপর আদিবাসী কুসংস্কারের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ রূপে তুলে ধরতে গিয়ে আমি সম্ভবত সত্যের অতিকথন করিনি। নিম্নবঙ্গে প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে প্রাচীন রচনায় বর্ণিত আর্যধর্মের বৈসাদৃশ্যই প্রথমে বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনার ফলে আমি জানতে পারি যে, তাদের ধর্মনীতির মধ্যকার পার্থক্য শিক্ষাগত নয়, জাতিগত। এমন কি হিন্দুধর্মের গোঁড়া ও জনপ্রিয় মতবাদের মধ্যকার পার্থক্যও স্তরগত নয়, শ্রেণীগত। এই পার্থক্যের মধ্যে হিন্দুদের সাহিত্য ও অবাহ্যিক ধর্মব্যবস্থার ব্যাখ্যা রয়েছে। আর্য বাসিন্দারা তাদের বিশুদ্ধ বংশধরদের যে ধর্মমত দিয়ে গিয়েছেন, তা হচ্ছে অবাহ্যিক বাইরের জাঁকজমক তাতে খুব বেশি নেই। আর বাহ্যিক ধর্মমতটি হচ্ছে মিশ্রবর্ণের লোকদের সৃষ্টি; নরবলি দেয়া, কাঁচা গোশত খাওয়া, কালো রঙের জংলী লোকদের কুসংস্কার থেকেই তারা এই আচার সংগ্রহ করেছে। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই দুই জাতির সংমিশ্রণের অব্যবহিত পরই একদিকে যেমন আর্য ধর্মমতের মধ্যে বাইরের আচার-অনুষ্ঠান ঢুকে পড়েছিলো, অন্যদিকে তেমনি একটি মিশ্রবর্ণের[৭৯] উদ্ভব হয়েছিলো—এই তথ্য থেকে এই মতবাদেরই অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের এই মিশ্রবর্ণের ধর্ম অনেকটা নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয়দের ধর্মের মতোই বহু মিশ্রিত। ইউরোপীয়দের ধর্মে অবশ্য ভারতীয় ধর্মের মতো এতো মূর্তিপূজা নেই; তবে এই ধর্ম যে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ব্রিটিশ, হিন্দু ও মুসলমানদের কাছ থেকে এসেছে, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। হিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকায় আমি তিন বছর বসবাস করেছি; তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমি এ সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ থেকে দূরে সরে গিয়েছি, আমি যেখানে বাস করেছি, সেখানে পাহাড় ও সমভূমির অধিবাসীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা আছে এবং একের রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সঙ্গে অপরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। পাহাড়ের উপরে বসবাসকারী খর্বাকৃতি

---

৭৮. এসেস এন্ড লেকচার্স অন দি রিলিজিয়ন অব দি হিন্দুস; এইচ. এইচ. উইলসন প্রণীত। কালেকটেড ওয়ার্কস, প্রথম খণ্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা। ট্রাবনার, ১৮৬২। পরবর্তী অধ্যায়ে শিবপূজার উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

৭৯. ব্রিটিশ পাঠকদের নিকট 'বর্ণ-শংকর' নামে পরিচিত।—হ্যালহেড প্রণীত জেন্টু কোড; ভূমিকা ও ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; ১৭৮১।

উপজাতি থেকে শুরু করে ঢালু এলাকার অধিবাসী, উপত্যকার নিম্নবর্ণের বাসিন্দা এবং বীরভূমের রাজধানী শহরের দীর্ঘকায়, শান্তচক্ষু, ক্ষুদ্রাকৃতি উন্নতমস্তিষ্ক ও মেধাসম্পন্ন হলুদ বর্ণের ব্রাহ্মণদের মধ্যে অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ আছে; কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ আপাতদৃষ্টিতে ভালোভাবে ধরা পড়ে না।[৮০] ধর্মের ক্ষেত্রে এই একই কথা বলা যেতে পারে। এমন কিছুসংখ্যক কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলো এলাকাবিশেষে আদিবাসীদের নিজস্ব আচার বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণরা এই সকল কুসংস্কারের প্রতি তীব্রতম ধারণার মনোভাব পোষণ করে থাকে। কিন্তু কয়েকটি জেলায় এই সংস্কারগুলোকে দুই ধর্মের মাঝামাঝি স্থানীয় বলে গণ্য করা হয়। গ্রামদেবতার পূজার ব্যাপারেই এই বিষয়টি বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। জনসংখ্যা যেখানে সম্পূর্ণরূপে আদিবাসী, সেখানে এই সংস্কারটি আদিবাসী সংস্কার রূপেই পরিগণিত হয়; ফলে পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার ভয়ে কোনো ব্রাহ্মণই সেখানে এই পূজা সম্পাদন করতে যায় না। কিন্তু যে সকল এলাকায় মিশ্রবর্ণের লোকেরা বাস করে এবং আধা-আর্য বাসিন্দারা প্রাচীন গ্রামদেবতা, বা বনদেবতার পূজা করে থাকে, সেখানে কোনো কোনো দরিদ্র ব্রাহ্মণকেও এই পূজায় পৌরোহিত্য করতে দেখা যায়। এই সকল এলাকায় এই পূজা আধা-হিন্দু আচার বলে মনে করা হয়। কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ হিন্দু এলাকায় আবার এমন একটি ব্রাহ্মণ সমাজ দেখা যায়, যারা বিভিন্ন গ্রামের গ্রামদেবতার অনুরাগী ভক্ত। এছাড়া আবার এমন কয়েকটি এলাকাও রয়েছে, যেখানে গ্রামদেবতা বা বনদেবতার পূজা হিন্দুদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। অতএব বলা যেতে পারে যে, বীরভূমের জঙ্গলের ভূতপূজা এবং বিহরের মালিক বায়া ও অনুরূপ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির পূজা থেকে শুরু করে শিবপূজা পর্যন্ত একটিমাত্র স্তরভেদ রয়েছে। সীমান্ত এলাকার অধিবাসীদের বিষয়টি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় থাকে না যে, যে-সকল সংস্কার আর্য ও আদিবাসীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করেছে, শিব পূজা তার মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। বাঙালিরা আজকাল ব্যাপকভাবে শিবপূজা করে থাকে। প্রত্যেকটি শহরে শিবের পুরোহিত সম্প্রদায় রয়েছে, প্রত্যেকটি রাস্তার পাশে পিরামিড আকারের শিব মন্দির রয়েছে এবং গঙ্গা নদীতে কয়েক মাইল পর পর শান বাঁধানো শিবের ঘাট রয়েছে।

অনার্যদের প্রতি ঘৃণা

বাংলাদেশের ভাষার ওপর আদিম উপজাতিদের প্রভাব খুবই স্পষ্ট; ধর্মের ওপর এই প্রভাব আরো স্পষ্ট ও ক্ষতিকর। তবে বাংলার অধিবাসীদের সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক ভাগ্যের ওপরই সম্ভবত এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় ও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হয়েছে। মিশ্র বংশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ ঘটায়

---

৮০. বাউরি, বাগদি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা পাহাড়েও বাস করে, আবার সমতল ভূমিতেও তাদের বসতি আছে। আদালতে এই সকল বর্ণের সাক্ষীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হয় যে, তারা একই নামে পরিচিত বংশের হিন্দু না সাঁওতাল (আদিবাসী) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

বাঙালিরা কখনো জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি; কারণ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রভু ও অপরটি ভৃত্য হলে তারা কখনোই একটিমাত্র জাতীয়তাবাদে একত্রিত হতে পারে না। একত্রিত হওয়ার আগে উভয় পক্ষকেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং রাজনৈতিক দিক থেকে এক হওয়ার আগে সামাজিক দিক থেকে এক হতে হয়। যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত ভাবধারা নিজেকে আদিবাসী ভাবধারা থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে; এবং সংস্কৃত সম্প্রদায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার থেকে আদিবাসীদের বঞ্চিত করে রেখেছে। রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সম্মান তো দূরের কথা, বাণিজ্যিক লেন-দেনের ক্ষেত্রেও উচ্চবর্ণের লোকেরা কড়া বাধা-নিষেধের ভিত্তিতে ও প্রতিপক্ষের জন্য বিশেষ প্রতিকূল শর্তে নিম্নবর্ণের লোকদের অধিকার দিয়েছে। কেবলমাত্র হীনতম কাজের দরজাই আদিবাসীদের জন্য খোলা ছিলো। এবং উচ্চবর্ণের দ্বিজরা সকল প্রকার লাভ ও সম্মানজনক কাজ বংশগতভাবে নিজেদের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছিলো। এমন কি এই অসম ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রয়োজন হলে অথবা সুবিধে মনে করলে উচ্চবর্ণের লোকেরা আদিবাসীদের প্রচলিত ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করতে দ্বিধাবোধ করতো না। আর্যদের জন্য এক ধরনের উত্তরাধিকার আইন ছিলো; এবং অনার্যদের জন্য ছিলো আর এক ধরনের।[৮১] তাছাড়া যে আন্তবিবাহ দুটি পরস্পর-বিরোধী জাতির মধ্যে একতা বিধান করতে পারে, তা তখন সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিলো। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যৌনসঙ্গম তীব্র ঘৃণার চোখে দেখা হতো এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের ধর্মদ্রোহিতার জন্য নির্ধারিত কঠোর সাজা দেয়া হতো। একজন জার্মান রাজকুমারীর সঙ্গে রোম সম্রাট গালিয়েনাসের বিবাহকে রোমানরা যেরূপ তীব্র ঘৃণার চোখে দেখতো, বর্তমানকালে, এমন কি উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরাও অসবর্ণ বিবাহকে ঠিক সেই চোখেই দেখে থাকে। রোমানদের ঘৃণা এতো তীব্র ছিলো যে, আন্তর্জাতিক নিয়মে জার্মান রাজকুমারী গালিয়েনাসের পত্নী বলে পরিগণিত হলেও ইতিহাসে তিনি রোম সম্রাটের উপপত্নী রূপেই বর্ণিত হয়েছেন।

ভারতীয় আর্যদের অগ্রগতি ব্যাহত

এই ঘৃণার জন্য নিম্নবংশের আর্যদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষে তিন হাজার বছর যাবৎ বাইরের লোক দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেয়া খুব প্রশংসনীয় ব্যবস্থা নয়। হিন্দু সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা দৈহিক পরিশ্রমকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করায় নিজেদের অক্ষম করে ফেলেছে এবং শক্তিশালী ও সম্পদশালী হওয়ার পথ রুদ্ধ করে ফেলেছে। যুগ যুগ ধরে যারা নিজেদের হাতে দেশের কাজ করে এসেছে, সেই মিশ্রবর্ণের লোকেরা আজকাল দায়িত্বশীল ও অর্থকরী পদ থেকে উচ্চবর্ণের লোকদের হটিয়ে দিচ্ছে; তবে এখন তাদের অতিরিক্ত সুবিধে হচ্ছে এই যে, এবারই সর্বপ্রথম তারা একটি নিরপেক্ষ সরকারের নিরাপত্তা লাভ করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এতদিন যাবৎ ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার ছিলো, কিন্তু সেখানেও আজ অনার্যদের

৮১. মানব-ধর্ম-শাস্ত্র, ৯—১৫৬, ১৫৭। ১৮২৫।

প্রতিযোগিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের তিন শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বীরভূমের সরকারি স্কুলটি প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে।[৮২] একসময় যে বর্ণকে অতিশয় ঘৃণিত বলে মনে করা হতো, সেই বর্ণেরই একজন লোক এখন এই স্কুলের হেডমাস্টার। দেশের সর্বত্র এখন হাজার হাজার ব্রাহ্মণ-বালক এমন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করছে, যাদের পারিবারিক নাম (দাস) থেকেই বুঝা যায় যে, তারা ক্রীতদাস-প্রায় আদিবাসী উপজাতির (দস্যু) বংশধর। পরিশ্রম করাকে হিন্দুরা দাসত্বের লক্ষণ বলে মনে করতো; ফলে চাহিদা পূরণের জন্য যতোটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম তারা কখনোই করতো না। খরচ করার পর উৎপন্ন দ্রব্যের যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে, তাই হচ্ছে মূলধন; ফলে মূলধন তখন আদৌ ছিলো না; এবং মূলধন না থাকলে বস্তুগত সভ্যতার কোনোকরম অগ্রগতির সম্ভবপর হতে পারে না। অগ্রগতির আর একটি ভিত্তি হচ্ছে সহযোগিতা, কিন্তু তাও তখন অজ্ঞাত ছিলো। শ্রমবণ্টনের শব্দগত অর্থে প্রত্যেকটি লোককে পৃথক কাজ দেয়া বুঝায় এবং এই অর্থে শ্রমবণ্টন পুরোমাত্রাতেই চালু ছিলো। কিন্তু অর্থনৈতিক তাৎপর্য অনুসারে শ্রমবণ্টন হচ্ছে সহযোগিতার একটি পদ্ধতি; সীমাহীন ঘৃণা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করায় এই অর্থে শ্রমবণ্টন কখনোই সম্ভবপর হয়নি। এ বিষয়ে মিথ্যা দৃশ্য এবং সেই দৃশ্যের ভুল নাম বহু লেখকের মনেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিষয় হিসেবে শ্রমবণ্টনের অর্থ হচ্ছে ফলাফলের সমাবেশ সাধনের উদ্দেশ্যে পদ্ধতির বণ্টন করা। কিন্তু ভারতে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবণ্টন বলতে যা বুঝায়, তা হচ্ছে ফলাফলের বণ্টন; একজন মানুষ কেবলমাত্র একটি কাজই করতে সক্ষম; এবং এই ফলাফল পদ্ধতির সমাবেশ থেকেই আসে, অর্থাৎ একটি ফলের জন্য প্রয়োজনীয় সমগ্র পদ্ধতি একজন মানুষই সম্পাদন করে থাকে। স্থানীয় অনার্যদের দাবিয়ে রাখার ফলে ভারতীয় আর্যদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়েছে এবং তাদের জীবনে যে স্থবিরতা ও জাতীয় অগ্রগতির অক্ষমতা এসেছে, তা অন্য কোনো স্থানের আর্যদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো, আর্যরা তাদের নিজেদের আলোকের অংশ দেয়নি ফলে যুগ যুগ ধরে তারা নিজেরাও আর কোনো আলোক পায়নি।

কিন্তু এখানেই তাদের শাস্তি শেষ হয়ে যায়নি। বুদ্ধিমত্তার গর্বে তারা নির্বোধ অথচ শক্তিশালী একটি জাতিকে তাদের জীবিতকালে ক্রীতদাসে পরিণত করে রেখেছে এবং মৃত্যুর পর নিজেদের আলোকময় বিশ্বে তাদের প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করেছে। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে তাই দেখা যায়, প্রত্যেকটি বর্ণের লোক কেবলমাত্র সেই বর্ণের লোকদের প্রতিই সহানুভূতিশীল। উচ্চতর বর্ণের লোকদের তারা বিজয়ী বা অত্যাচারী হিসেবে ঘৃণা করে এবং নিম্নতর বর্ণের লোকদের তারা বিশ্বাস করে নিজেদের আওতায় আনতে চায় না। আর্যরাও অবশ্য খুব সুখে কাল কাটাতে পারেনি। যে বুদ্ধিমত্তার গর্বে তারা সতত গর্বিত, তার চেয়ে কম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বিজয়ীরা বারবার তাদের পদানত করেছে। কারণ আর্যদের চেয়ে বুদ্ধিমত্তায় কম হলেও অস্ত্রচালনার

৮২. জনশিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্ট। নিম্নপ্রদেশ, ১৮৬৫—৬৬। পরিশিষ্ট, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

ব্যাপারে তাদের বাহুবল অনেক বেশি ছিলো। আর্যরা দৈহিক পরিশ্রমের সমস্ত কাজ নিম্নবর্ণের লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো, ফলে অনভ্যাসবশত তাদের মধ্যে আর বাহুবলের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট ছিলো না। আফগান, তাতার ও মোগলগণ ভারতে এসে দেখতে পেয়েছে যে, এখানকার আযরা দীর্ঘ অলসতার ফলে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের মধ্যে শতধা বিভক্ত হয়ে জাতীয়তাবাদের সকল মনোভাব হারিয়ে ফেলেছে। এইরূপে দীর্ঘ সাত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুধর্মের সকল উন্নাসিকতা বর্বর আক্রমণকারীদের পদতলে পিষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তাদের সকল প্রকার শ্রেণী ও বর্ণভেদ ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গিয়েছে। কালক্রমে সংস্কৃত পুস্তকের[৮৩] ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত জামানার আবির্ভাব হয়েছে, যখন 'ভারতের অধিবাসিগণ একই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং একটিমাত্র জাতিতে পরিণত হবে।' বর্তমান যুগের বাঙালিদের সম্বন্ধে যারা অবগত আছেন, তারা সহজেই অনুমান করতে পারেন যে, এই জামানার আবির্ভাব হতে আর বেশি দেরি নেই। বাঙালিদের মধ্যে একটি মহান জাতির সকল সামর্থ্য-সঙ্গতিই রয়েছে, এখন তাদের দরকার শুধু সামাজিক সংমিশ্রণ। সংস্কৃত ঋষিগণ বলেছেন যে, ভারতের সকল বর্ণের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হয়ে এই সামাজিক ঐক্যবোধের সৃষ্টি হবে; কিন্তু খ্রিষ্টানরা মনে করে যে, ব্যাপক পুনর্জাগরণের মারফতই বাঙালিদের মধ্যে সামাজিক একতা প্রতিষ্ঠিত হবে।[৮৪] খ্রিস্টানদের আশাবাদই সম্ভবত অধিক সত্য।

আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে নিম্নভূমির মিশ্র হিন্দু জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে, তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পর এখন আমি পাহাড়ি এলাকা ও পশ্চিমাঞ্চলের উপজাতিদের অবস্থা পর্যালোচনা করবো। এই উপজাতিরা এখনো তাদের প্রাচীন বংশগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

---

৮৩. ভবিষ্য পুরাণ।

৮৪. বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করেই এই অধ্যায়ের সর্বত্র আমি আমার নিজব মতবাদ ব্যক্ত করেছি। অন্যের মতামতের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই, কিন্তু এই পুস্তকে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলেই সেগুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করিনি। একটিমাত্র নজির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'দস্যু' শব্দের অর্থ সম্পর্কে বৈদিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে : অনেকে শব্দটির অর্থ 'দানব' বলে মনে করেন; অনেকে আবার দস্যু বলতে আদিবাসীদের কথাই বুঝান। আমি বিনা মন্তব্যের পরবর্তী অর্থই গ্রহণ করেছি; এবং আমি লক্ষ্য করেছি যে, ম্যাক্সমুলার তার 'চিপস' পুস্তকে এই অর্থই অধিক সংগত বলে মন্তব্য করেছেন। দুঃখের বিষয়, এই অধ্যায়টি টাইপ হওয়ার আগে তাঁর মূল্যবান পুস্তকখানি আমার হাতে আসেনি; ফলে আমি তা ব্যবহার করতে বা তা থেকে উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম হইনি।

চতুর্থ অধ্যায়

বীরভূমের আদিম পাহাড়ি জাতি

পাহাড়ি ও জঙ্গি উপজাতি

'সুবৃহৎ ভারত মহাদেশের সর্বত্র প্রত্যেকটি জঙ্গলে ও পাহাড়ি এলাকায় হাজার হাজার মানুষ বাস করে; এবং ট্যাসিটাস বর্ণিত জার্মানদের অবস্থার সঙ্গে এদের অবস্থার তেমন কোনো পার্থক্য নেই।'[১] বাংলাদেশের কৃষ্ণবর্ণ জাতি সম্পর্কে লিখিত সুবৃহৎ পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ভারতের আদিম উপজাতি বিষয়ের জনৈক গবেষক এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রায় তিন কোটি মানুষ একশ' বছর যাবৎ ব্রিটিশ শাসনাধীন বাস করলেও এখনো তাদের উৎপত্তি, ভাষা ও জীবনপদ্ধতি সভ্য জগতের কাছে অপরিচিত রয়েছে। বিষয়টি সত্যিই বিস্ময়কর। যারা সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিলো, সেই ফর্সা চামড়ার লোকেরা যখন আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে, তখন কালো চামড়ার লোকেরা এখনো আগের মতোই অবহেলিত ও ঘৃণিত হয়ে রয়েছে; এখনো তারা সভ্যতার আলোক থেকে তাদের জঙ্গল ও পাহাড়ের আস্তানায় পালিয়ে যায়। মানুষের ইতিহাস বিশ্লেষণের ব্যাপারে আর্যভাষা পর্যালোচনা করে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে সুফল পাওয়া গিয়েছে, ইতিপূর্বে পঞ্চাশ বংশধর ব্যাপী পণ্ডিতদের গবেষণাতেও তা সম্ভবপর হয়নি। সংস্কৃত ভাষা আবিষ্কারের সময় থেকে মানুষের চিন্তাধারার একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ ভাষাতত্ত্বের চাবিকাঠি বলে পরিগণিত হয়েছে এবং সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের ওপর গভীর প্রভাব রেখে গিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য জাতির বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ এই জাতিগুলোর আরও প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে এবং অনুসন্ধান করা হলে হয়তো আরো অধিক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। যে অল্প কয়েকজন গবেষক গোড়ার দিকে এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তারা বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার আগেই বাধা পেয়েছিলেন; ফলে তাদের গবেষণার প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। সরকারও বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের উন্নতিলাভের উপযুক্ত বলে মনে করতেন না এবং তাদের সম্পর্কে সরকারি আচরণ এই নীতি অনুসারেই পরিচালিত হতো। সরকার মনে করতেন যে, মরে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তারা নীরবে নির্বিবাদে থাকলেই মঙ্গল।

---

১. বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের বি. এইচ. হজসন প্রণীত দি কোচ, বোদো এন্ড ধীমল ট্রাইবস, ২ পৃষ্ঠা, ভূমিকা। কলিকাতা, ১৮৪৭।

দক্ষিণ ভারতের আদিবাসিগণ অবশ্য একটু বেশি মনোযোগ লাভ করেছে, কিন্তু তবু তাদের অতীত ইতিহাস এখনো উদঘাটিত হয়নি। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের স্থানীয় ভাষাগুলোতে আদিবাসীদের প্রভাব এতো বেশি যে, যে-সকল জাতি এই প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের বিষয় একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র তেলেগু ভাষার শব্দ-সম্ভারেরই তিন-চতুর্থাংশ এসেছে আদিবাসীদের কাছ থেকে।[২] দক্ষিণ ভারতে অনার্য ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় রাজনৈতিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা আদিবাসী ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে ফেলেছিলো; ফলে আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে গবেষণা নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হতো। মি. হজসন ও তাঁর পরবর্তী কয়েকজন গবেষক যে সাফল্য লাভ করেছেন, সেই তুলনায় তাঁরা অনেক বেশি সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

গবেষণার নতুন ক্ষেত্র

বীরভূমের পাহাড়ি জাতিগুলোর ইতিহাস, ভাষা, জীবনধারণ ও সামর্থ্য সম্পর্কে আমি যা-কিছু জানতে পেরেছি, পরবর্তী অধ্যায়ে তার বিবরণ দিয়েছি। আমি আশা করি এই বিবরণ পণ্ডিত ও রাষ্ট্রবিদদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। পণ্ডিতগণ দেখতে পারবেন যে, তাদের ভাষা ও অতীত ভাবধারা আমাদের জাতির ইতিহাসের একটি অলিখিত অধ্যায়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছে। আর ভারতীয় রাষ্ট্রবিদগণ বুঝতে পারবেন যে, এই সকল বনের সন্তানদের তারা এতোদিন যাবৎ মানব সমাজ থেকে যতোখানি দূরবর্তী বলে মনে করতেন, আসলে তারা ততোখানি দূরে অবস্থিত নয়। তারা আরও বুঝতে পারবেন যে, আদিম উপজাতিরাও অন্যান্য মানুষের মতোই স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে; উন্নতি-অগ্রগতির আহ্বানে অন্যান্য জাতির মতোই সাড়া দিয়ে থাকে; এবং সভ্যতার আলোক গ্রহণের ব্যাপারে তাদের সামর্থ্যের উপরই বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রচেষ্টার সম্প্রসারণ বিশেষভাবে নির্ভর করেছে।

সাধারণভাবে ভারতের জাতিগুলোকে আর্য ও অনার্য বা আদিবাসী, এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আর্য জাতি একটিমাত্র বংশ থেকে উদ্ভূত হলেও আদিবাসীদের মধ্যে একাধিক বংশ রয়েছে; এবং জাপানিরা যেমন মিসরীয় বা ডেনমার্কবাসীদের থেকে পৃথক জাতি, এই বংশগুলোও তেমনি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শরীরবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ দেহের গঠন ও আকৃতি-অবয়ব দেখে বলে দিতে পারেন যে, ভারতের কয়েকটি আদিম উপজাতির সঙ্গে মালয়ি জাতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে এবং অপর

---

২ সমগ্র শব্দসম্ভারের অর্ধাংশ আতও-তেলেগু বা বিশুদ্ধ আদিম উপজাতীয়; তৎসম ও তদ্ভব অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহীত শব্দ এক-চতুর্থাংশ; এবং অন্য দেশীয় বা তেলেগু ছাড়া আদিম উপভাষা থেকে গৃহীত শব্দ অপর এক-চতুর্থাংশ। মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসের মি. এলিস, রেভারেন্ড ডক্টর কল্ডওয়েল, ও মি. এ. ডি. ক্যাম্পবেল দক্ষিণ ভারতে যে গবেষণা চালিয়েছেন, তারপর উত্তর ভারতের উপজাতিগুলো সম্পর্কে গবেষণা চালানো হলে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ পাবেন যে, প্রাচীনকালে একটি তিমুলীয় বংশের অস্তিত্ব ছিলো। আর আগে এই সিদ্ধান্ত কোনোমতেই সম্ভব হবে না।

কয়েকটি উপজাতির মধ্যে চীনা জাতির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। অবশিষ্ট উপজাতিগুলোর সঙ্গে চীন বা মালয়ের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই. অথবা খুব দূরের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু শরীরবিদ্যা এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি; এবং ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে যা পাওয়া গিয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, বিষয়টি আরো বেশি রহস্যে আবৃত হয়ে পড়েছে; কারণ এই গবেষণার ফলে এমন অসংখ্য ভাষা উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলোর একটির সঙ্গে আর একটির কোনো দৃশ্যত সম্পর্ক নেই। একজন গবেষক একটি হালকা জনবসতি এলাকায় আঠাশটি পৃথক উপভাষার সন্ধান পেয়েছেন। এই সকল ভাষায় যারা কথা বলে, তারা একে অপরের ভাষা বুঝতে পারে না।[৩] সমগ্র ভারতের উপজাতীয় ভাষার সংখ্যা দু'শ'র চেয়ে কম হবে না। প্লিনি বলেছেন যে, কোলসিয়ান বাজারে যে একশ' তিরিশটি ভাষা চালু ছিলো, সেগুলো একটি মূল ভাষা থেকেই উৎপত্তি রয়েছে। ভারতের উপজাতীয় ভাষাগুলোও অনুরূপভাবে একই ভাষার পৃথক পৃথক রূপ কিনা, তা এই পর্যায়ে বলা যায় না; কারণ বিষয়টি সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের জ্ঞান খুবই অপ্রতুল। ভাষাগুলো সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালানো হলে একদিন হয়তো এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবও হতে পারে।

আদিম ভাষা

চার বছর আগে এই অধ্যায়টি শুরু করার সময় এই সঙ্গে আমি বীরভূমের পাহাড়ি উপজাতিদের ভাষাসহ ছয়টি উপজাতীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ ও শব্দসম্ভার জুড়ে দেবো বলে মনে করেছিলাম। ভারতের অনার্য জাতিগুলো সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তা বিশেষভাবে সহায়ক হতো। কিন্তু পরে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গবেষণার সময় মি. বি. এইচ. হজসনের দুই প্রস্থ মোটা পাণ্ডুলিপি আমার হাতে পড়ে। তিরিশ বছর যাবৎ হিমালয়ের উপজাতিদের মধ্যে কার্যরত থাকার সময় মি. হজসন এই মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথমে মনে করেছিলাম যে, মি. হজসনের এই. অপ্রকাশিত রচনা আমি এই অধ্যায়ের সঙ্গে জুড়ে দেবো; কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যে, মি. হজসনের আবিষ্কারের প্রতি সুবিচার করতে হলে এই বইয়ের সমস্ত পাতাই ব্যবহার করা প্রয়োজন। ফলে আমি স্থির করেছি যে, মি. হজসনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে উত্তর ভারতের আদিবাসীদের সম্পর্কে আমি একখানি পৃথক পুস্তক সংকলন করবো; অতএব শব্দসম্ভার সংযোজন করে এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার আর প্রয়োজন নেই। প্রস্তাবিত পুস্তকে আমি আশিটি অনার্য ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করার আশা রাখি; শব্দসম্ভারের সংযোজন তাই সেই পুস্তকেই বেশি শোভন ও সঙ্গত হবে।

---

৩. কুমায়ুন ও আসামের মধ্যবর্তী জেলায়। আসামের নিকটে একটি ক্ষুদ্র জেলার বাসিন্দা নাগা উপজাতিদের মধ্যেও প্রায় তিরিশটি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এই অবস্থা থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, অলিখিত ভাষা থেকে একাধিক উপভাষা সৃষ্টি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো জেলার ভাষা বিভক্ত করার জন্য একটি পাহাড়, একটি বিল, অথবা একটি নদীর দূরত্বই যথেষ্ট।

বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলের সাঁওতাল বা পাহাড়ি জাতিগুলো আদিবাসীদের সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, শারীরিক দিক থেকে যাদের সঙ্গে চীন বা মালয়ীদের কোনো সাদৃশ্য নেই। সাঁওতালরা সুগঠিত, লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি ও ওজনে আট স্টোন। আর্যদের মতো তাদের গঠন হালকা নয়, তবে মালয়ীদের মতো ভারিও নয় এবং চীনাদের মতো চোখ দুটি কিঞ্চিৎ তির্যক হলেও তার ফলে তাদের আকৃতিতে কোনো বৈসাদৃশ্য ঘটেনি। তাদের মাথা গোলাকার, প্রশস্ত বা চাপা নয়; মুখমণ্ডলও গোলকার, লম্বাটে বা চতুষ্কোণ নয়; নিচের চোয়াল ভারি; নাক কিঞ্চিৎ অনিয়মিত; ঠোঁট দুটি আর্যদের চেয়ে মোটা, তবে দৃষ্টিকটু নয়; চোয়ালের হাড় হিন্দুদের চেয়ে উঁচু, তবে মঙ্গোলীয়দের মতো বেশি উঁচু নয়, ইংরেজদের চেয়ে স্কচম্যানদের চোয়ালের হাড় যেমন উঁচু, ঠিক সেই রকম। লম্বায় তারা সাধারণ হিন্দুদের মতোই, তবে বিশুদ্ধ আর্য ব্রাহ্মণদের চেয়ে খাটো। হিন্দুদের চেয়ে তারা ভারি, পরিশ্রমী ও সুগঠিত; হিন্দুদের চেয়ে তাদের কপাল উঁচু নয়, তবে অপেক্ষাকৃত গোলাকার ও প্রশস্ত। সাঁওতালদের দেখলেই মনে হয়, তাদের জন্ম পরিশ্রম করার জন্য, চিন্তা করার জন্য নয়; বর্তমানের দৈহিক পরিশ্রমের কাজের জন্যই তারা বেশি উপযুক্ত, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা বা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কাজে উপযুক্ত নয়।

সমুদ্রের কয়েক মাইলের মধ্য থেকে শুরু করে ভাগলপুরের পাহাড় পর্যন্ত নিম্নবঙ্গের সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় সাঁওতালদের বাস। এলাকাটি প্রায় চারশ' মাইল লম্বা ও একশ' মাইল চওড়া, আয়তন সম্ভবত চল্লিশ হাজার বর্গমাইল এবং আকারে অনেকটা বাঁকা ভূখণ্ডের মতো। পশ্চিম দিকের জঙ্গলে একমাত্র সাঁওতালরাই বাস করে; উত্তর দিকে অন্যান্য লোকও কিছু কিছু বাস করে; তবে মোট জনসংখ্যার কুড়ি ভাগের উনিশ ভাগই সাঁওতাল; সমতল ভূমির দিকে সাঁওতালদের সংখ্যা খুবই কম; এবং এই অঞ্চলে যেখানে সাঁওতালদের এলাকা শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বসতি শুরু হয়েছে। সাঁওতালদের সংখ্যা পনের লক্ষের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি, এমন কি বিশ লক্ষও হতে পারে। উৎপত্তি ও ভাষার দিক থেকে তারা এক ও অভিন্ন; একই রীতি রেওয়াজ তারা পালন করে এবং একই দেবতাদের পূজা করে। সকল দিক থেকেই তারা আদিম উপজাতিদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক জাতি।

সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা কোথা থেকে এসেছিলো, সে সম্পর্কে বর্তমান সাঁওতালরা কিছুই বলতে পারে না। তাদের ঐতিহ্যও তেমন সমৃদ্ধ বা তথ্যপূর্ণ নয়; লিখিত কাগজপত্রও তাদের কিছু নেই। সাঁওতালদের গ্রামে গিয়ে তাদের জীবনযাত্রা দেখে, তরুণদের কলগুঞ্জন শুনে এবং সন্ধ্যার পর বুড়োরা শাল গাছের তলায় বসে যে কিংবদন্তী বর্ণনা করে, তা শুনে প্রথমে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, পরে গবেষণা করলে বা তথ্য সংগ্রহ করলেও তার তেমন পরিবর্তন ঘটে না।

সাঁওতাল কিংবদন্তী

সাঁওতালরা যে প্রাচীনতম বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেবহাল, তা হচ্ছে একটি পাহাড়ি পরিবেশ। সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে কিংবদন্তী প্রচলিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ :—

মানুষের জন্মের আগে মহান পাহাড় পবিত্র নীরবতায় নিজের সঙ্গে কথা বলতো। তারপর মানুষের জন্মের সময় সে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। পাহাড়ই মানুষকে পোশাক দেয় এবং তাকে জীবনের প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো উৎপন্ন করতে শিক্ষা দেয়। প্রথম নর-নারীকে বিবাহ বন্ধনে মিলিত করে পাহাড় সাঁওতালদের উৎস ও উৎপত্তিস্থলে পরিণত হয়। এই সময়েরও আগে মহান পাহাড় একাকী পানির মধ্যে দাঁড়িয়েছিলো। একদিন সে দেখতে পায় যে, পাখিরা পানির উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সে নিজের কাছেই প্রশ্ন করে, পাখিগুলোকে আমরা কোথায় রাখবো? পানির মধ্যে যে পদ্মফুল আছে, তার উপরেই তাদের জায়গা দেয়া যায়; তারা সেখানেই থাকুক। তারপর বড়ো বড়ো গলদা চিংড়ি মাছ সৃষ্টি করা হয়; কিন্তু চিংড়িরা পানির মধ্যে থেকে পাথর ও পদ্মফুল উপরে তুলে আনে। তারপর পাথরগুলোকে নানাপ্রকার লতাপাতায় আবৃত করা হয়; এবং মহান পাহাড় বলেন, লতাপাতাগুলো মাটি দিয়ে পাথরগুলো ঢেকে দিক এবং লতাপাতা সেই অনুসারে কাজ করে। পাথরগুলো আবৃত হওয়ার পর সকলের সর্বময় কর্তা মহান পাহাড়কে ঘাস লাগানোর আদেশ দেন; তারপর ঘাসগুলো বড়ো হয়ে উঠলে পদ্মফুলের উপরে পাড়া দুটি পাতিহাঁসের ডিমের মধ্য থেকে প্রথম পুরুষ ও প্রথম নারীর আবির্ভাব হয়। তারপর সর্বময় কর্তা মহান পাহাড়কে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কি? মহান পাহাড় জবাব দেন, ওরা পুরুষ ও নারী; ওরা যখন জন্মলাভ করেছে, তখন ওদের বাঁচতে দেয়া হোক। তারপর সর্বময় কর্তা মহান পাহাড়কে তাকিয়ে দেখতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও নারী পূর্ণাঙ্গ আকারে বেড়ে উঠলো; কিন্তু তারা তখন উলঙ্গ ছিলো। সর্বময় কর্তা তাই মহান পাহাড়কে তাদের পোশাক দিতে নির্দেশ দিলেন এবং মহান পাহাড় তাদের কাপড় দিলেন; পুরুষকে দিলেন দশ হাত কাপড়, আর নারীকে দিলেন বারো হাত কাপড়; পুরুষের কাপড় যথেষ্ট হলো, কিন্তু নারীর কাপড় যথেষ্ট হলো না।

পুরুষ ও নারী তখন দুর্বল থাকায় মহান পাহাড় তাদের তেজি মদ বানাতে বললেন। তিনি তাদের কিছু তাড়ির বীজ দিয়ে বললেন, এটুকু এক কলস পানির মধ্যে রেখে দাও এবং চার দিন পরে আবার এসো। অতএব তারা তাড়ির বীজটুকু এক কলস পানির মধ্যে রেখে দিলো এবং চার দিন পর আবার এলো; কলসের পানি ইতিমধ্যে সাঁওতালদের তেজি মদে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তারপর পেয়ালা বানানোর জন্য মহান পাহাড় তাদের গাছের পাতা দিলেন, কিন্তু নির্দেশ দিলেন যে, পান করার আগে তারা যেন এক পেয়ালা তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে।

সাঁওতালদের জন্মকাহিনী

তারপর মহান পাহাড় বললেন, জমি রয়েছে, পুরুষ রয়েছে, নারী রয়েছে; কিন্তু জমিতে বাস করে পুরুষ ও নারী যদি মারা যায়! আমরা তেজি মদ দিয়ে তাদের আনন্দিত করে রাখবো এবং তাদের সন্তান হবে। এইরূপে তেজি মদের সাহায্যে মহান পাহাড় তাদের আনন্দিত করে রাখলেন এবং তাদের সাতটি ছেলেমেয়ে হলো।[৪]

৪. শালীনতা বজায় রাখার জন্য কিংবদন্তীর এই জায়গা থেকে কিছু অংশ বাদ দেয়া হলো।

এইরূপে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যেতে লাগলো এবং তাদের এতো বেশি সন্তান হলো যে, দেশে আর তাদের স্থান-সংকুলান হলো না। এই সময় তারা হিহিরি-পিপিরিতে বাস করতো; কিন্তু সেখানে আর যখন জায়গা হলো না, তখন তারা চায়ে চম্পায় চলে গেল; এবং চায়ে চম্পায় যখন জায়গার অভাব দেখা দিলো, তখন তারা সিলদায় গেলো; এবং সিলদায় যখন আর জায়গা হলো না, তখন সিকারে গেল; সিকার থেকে তারা গেলো নাগপুর এবং নাগপুর থেকে উত্তরে, এমন কি তারা সির অবধি চলে গেলো।

বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলে মানুষের জন্ম ও বিস্তার লাভের কাহিনী এভাবেই বর্ণনা করা হয়। যারা এই কাহিনী বলে, তারা একবর্ণও বাংলা জানে না। রাত্রিকালে বাঘ বা চিতাবাঘ হামলা করলে তারা যেরূপ ভয়ার্ত হয়ে ওঠে, তার চেয়ে তারা অনেক বেশি ভয়ার্ত হয় কোনো হিন্দুকে তাদের গ্রামের দিকে আসতে দেখলে। দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের সাঁওতালদের কাছে একই কিংবদন্তী শুনতে পাওয়া যায়, এমন কি তারা একই শব্দ ব্যবহার করে। অপরিচিত লোকদের সম্পর্কে অজ্ঞানতা, ঘৃণা ও ভীতিবশত এক জাতির কিংবদন্তীকে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হলে এই কিংবদন্তীগুলো নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ আদিবাসী ঐতিহ্যের নির্দশন। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না যে, এইরূপে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব হতে পারে। যে স্বল্পতম ইতিহাস পাওয়া যায়, তা পর্যালোচনা করে এবং সতর্কতার সঙ্গে তাদের ভাষা পরীক্ষা করে আমার মনে হয়েছে যে, বিশুদ্ধ আদিবাসী কাহিনীতে তারা সংস্কৃত দৃশ্য ও ঘটনাবলি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই জুড়ে দিয়েছে।

পরিশিষ্ট ভাগে[৫] আমি ছয়টি কিংবদন্তীর আক্ষরিক অনুবাদ দিয়েছি। উড়িষ্যার সাঁওতালগণ রেভারেন্ড মি. ফিলিপ্‌সের কাছে এই কাহিনীগুলো বলেছিলো। পূর্বে বর্ণিত কিংবদন্তীটি যেখানকার সাঁওতালদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সেখান থেকে উড়িষ্যার এই সাঁওতাল এলাকা দুশ' মাইল দূরে অবস্থিত; তাছাড়া এই দুটি এলাকা জঙ্গল ও নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং লিখিত উপায়ে সংযোগ সাধনের কোনো ব্যবস্থা নেই।

মুসার কাহিনীতে ও হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত সৃষ্টিকাহিনীর সঙ্গে সাঁওতাল সৃষ্টিকাহিনীর যে সাদৃশ্য রয়েছে, তা অতি সহজেই চোখে পড়ে। পানিতে নিমজ্জিত পৃথিবী, মাটির আবির্ভাব, মানবজাতির জন্য মাটির প্রস্তুতি, আমাদের প্রথম মাতাপিতার নগ্নতা, তাদের পোশাকের জন্য স্বর্গীয় ব্যবস্থা এবং পরে মানুষের বিস্তারলাভ—এই বিষয়গুলো সর্বত্র সাধারণ বক্তব্য। কিন্তু আমার মনে হয় সাঁওতাল সৃষ্টি কাহিনীর মতো অন্যান্য জাতির (আর্য বা সেমিটিক জাতি ছাড়া) সৃষ্টিকাহিনীতেও সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে মহাপ্লাবনের ইতিহাসটি মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে; অবশ্য যদিও নিম্নশ্রেণীর জাতিগুলোর সৃষ্টিকাহিনী বন্যার বিবরণ দিয়ে শুরু হয় না। এই দুটি ঘটনা সম্পর্কে আর্যদের দুটি পৃথক ইতিহাস থাকলেও এ সম্পর্কে তারা ভিন্নরূপ বর্ণনা দিয়ে থাকে। তাদের সৃষ্টিকাহিনীটি রহস্যে আবৃত এবং মুসার সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যগুলোর চেয়ে কম গাম্ভীর্যপূর্ণ নয়; কিন্তু

৫. দ্র পরিশিষ্ট।

তাদের মহাপ্লাবনের কাহিনীটি বাস্তব ঘটনার মতো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। বেদে সৃষ্টি সম্পর্কিত বিবরণে বলা হয়েছে, তখন অস্তিত্বও ছিলো না, অনস্তিত্বও ছিলো না; বায়ুমণ্ডলও ছিলো না, তার উপরে আকাশও ছিলো না। তখন মৃত্যুও ছিলো না, অমরত্বও ছিলো না; দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। প্রকৃতির সঙ্গে একজন মাত্র শান্তভাবে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন; তাঁর উপরে বা তাঁর থেকে পৃথক কিছু ছিলো না। সেখানে অন্ধকার ছিলো।' পক্ষান্তরে খ্রিস্টধর্মের প্রথম পঞ্চগ্রন্থের মতো মহাপ্লাবনের সংস্কৃত কাহিনীতেও বিষয়টি সম্পর্কে কোনো রহস্যের আবরণ নেই। প্রথমে একখানি জাহাজ প্রস্তুত করা হলো, সেই জাহাজে বীজ নেয়া হলো, তারপর একটি মাছ কিছুক্ষণের জন্য জাহাজখানি টেনে নিয়ে বেড়ালো এবং সর্বশেষে জাহাজখানি হিমালয়ের একটি চূড়ার উপর কূলে ভিড়লো।

মূলত পানি অপসারিত হওয়ার কাহিনী

সাঁওতাল কিংবদন্তীতে সৃষ্টিকাহিনীর চেয়ে পানি অপসারিত হওয়ার কাহিনীই ভালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; এবং এই পানি অপসারণের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিখুঁত ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান পাহাড় পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো; এবং সামুদ্রিক পাখি ও পানির লতাপাতা পানির উপরে বাস করছিলো। পানি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথর এবং গলদা চিংড়ি ও অন্যান্য কঠিন আবরণযুক্ত মাছ ও প্রাণীর আবির্ভাব হলো। পানি আরও সরে যাওয়ার পর পলিমাটির সঙ্গে অসংখ্য কীটপতঙ্গ মাটির উপর থেকে গেলো। তারপর সেই মাটি ঘন সবুজ ঘাসে ঢেকে গেলো। এবং পৃথিবী মানুষের বাসের উপযোগী হয়ে উঠলো। মুসার কাহিনী ও সাঁওতাল কিংবদন্তীতে শক্তিশালী মদ ব্যবহার এবং তার প্রভাবে অশ্লীল কাজ করার কথা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে এই উল্লেখ সম্ভবত আকস্মিক ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়।

আর একটি আকস্মিক বিষয় পাওয়া যায় প্রথম নর-নারীর সন্তানের সংখ্যায়। ঘটনাটিকে সাদৃশ্য বলে অভিহিত করতে চাইনে। সাঁওতাল কিংবদন্তীতে মানবজাতিকে দ্রুত সাতটি পরিবারের ভাগ করে ফেলা হয়েছে এবং সংস্কৃত কাহিনীতে মহাপ্লাবনের পর সাতজন ঋষির উপর মানবজাতির বিস্তারের দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়েছে।

সাঁওতালদের আদি বাসভূমি নিঃসন্দেহে হিমালয় পর্বতে অবস্থিত। তাদের প্রাচীন কাহিনী থেকেও এই কথাই প্রমাণিত হয়। মধ্য ভারতের পর্বতমালা বা সমতলভূমিতে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই, যা সাঁওতালদের মনের উপর এমন স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারে; তাছাড়া সাঁওতালরা কখনো বিন্ধ্য পর্বতমালার ধারে-কাছে গিয়েছে বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর উত্তর দিক থেকেই যদি তারা না এসে থাকে তাহলে মধ্য ভারতের সমতলভূমিতে যে তারা কেমন করে উপনীত হয়েছে, তাও ঠিক বুঝা যায় না। মালয়ী জাতির আকৃতি-অবয়ব ও মালয়ী ভাষার সঙ্গে তাদের আকৃতি-অবয়ব ও ভাষার কোনো সাদৃশ্যই নেই; তাছাড়া তাদের কাহিনী কিংবদন্তীতেও সমুদ্র বা বড়ো আকারের সামুদ্রিক মাছের কোনো বর্ণনা নেই। অতএব আমরা যদি মেনে নিতে রাজি

থাকি যে, তারা একটি পৃথক জাতি, মধ্য ভারতের পার্বত্যাঞ্চলের তাদের জন্ম হয়েছে এবং মানবজাতির অবশিষ্টাংশ যে প্রথম মাতাপিতার কাছ থেকে এসেছে, তারা সেই মাতাপিতার কাছ থেকে আসেনি; একমাত্র তাহলেই আমরা বিশ্বাস করতে পারবো যে, সাঁওতালদের বহুকথিত পাহাড়ি বাসভূমি উত্তরে নয়, দক্ষিণে অবস্থিত।

প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি

কিন্তু সাঁওতালদের কিংবদন্তী ও ধর্মীয় বিশ্বাসে মহান পাহাড় ছাড়াও আর একটি প্রাকৃতিক জিনিসের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। একটি বড়ো নদীর তীরে যারা বাস করে, তাদের জীবনে নদীর ভূমিকা কম-বেশি স্থায়ী হয়ে যায়। বাইরের জগৎ সম্পর্কে সাঁওতালদের সচেতনতার মধ্যে এরূপ একটি নদীর সন্ধান পাওয়া যায়। এখন তারা প্রধানত যে এলাকায় বাস করে এবং যুগ যুগ ধরে বাস করে এসেছে, সেখানে পাহাড়ি নদীর অভাব নেই বটে, কিন্তু বড়ো নদীর মর্যাদা পাওয়ার মতো কোনো নদী সেখানে নেই।[৬] এই এলাকার সবচেয়ে বড়ো নদীর নাম দামুদা (দামোদর); কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময়ই এই নদী হেঁটে, এমন কি গাড়িতে চড়েও পার হওয়া যায়। বড়ো বড়ো নদীপূর্ণ এলাকায় বাস করার ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসীদের অসংখ্য জলদেবতা বা দানব[৭] রয়েছে; কিন্তু সাঁওতাল এলাকার আদিবাসীরা এমন একটি নদীও পায়নি, যাকে তারা জাতীয় দেবতার মর্যাদা দিতে পারে। তবে সুদূর অতীতে একসময় তারা বড়ো নদীর তীরে বাস করতো বলে সেই সময়কার একটি ক্ষীণ স্মৃতি এখনো তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তাদের বর্তমান এলাকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী দামুদার প্রতি তারা যে শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকে, তা নদীটির আকারের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাঁওতাল জ্যোতিষ ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য দামুদার তীরেই গমন করে; এবং পূর্বপুরুষদের স্মরণে সমগ্র সাঁওতাল জাতি বছরে একবার এই নদীতে তীর্থযাত্রা করে। এই অনুষ্ঠান 'মৃতের শুদ্ধি' নামে পরিচিত। বড়ো বড়ো নদী সাঁওতালদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর এমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে যে, এখনো বছরে অন্তত একবার নদীতে তীর্থযাত্রা না করলে বীরভূমের পাহাড়ি এলাকার কয়েকটি জায়গায় অপরাধী ব্যক্তিকে একঘরে করে রাখা হয়, সাঁওতালরা পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তিদের মিলনের জন্য যে মর্মস্পর্শী আচার পালন করে, তার মধ্যেও এই প্রভাবের সুস্পষ্ট নির্দশন রয়েছে। সাঁওতাল যতো দূরবর্তী জঙ্গলেই মারা যাক না কেন, তার নিকট-আত্মীয়রা তার দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশ নদীতে নিয়ে গিয়ে স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দেবে। তার পূর্বপুরুষেরা পূর্বাঞ্চলের যে দূরবর্তী জায়গা থেকে এসেছিলো, এই নির্দশন সেই জায়গাতেই পৌঁছাবে বলে তারা বিশ্বাস করে। এমন ঘটনাও জানা গিয়েছে যে, একবার একজন সাঁওতালকে বন্যজন্তুতে নিয়ে

---

৬. এই অনুচ্ছেদে বীরভূমের সংলগ্ন এলাকার সাঁওতালদের কথা বলা হয়েছে; সর্ব দক্ষিণের উড়িষ্যা অথবা উত্তরাঞ্চলের রাজমহলের সাঁওতালদের কথা বলা হয়নি।

৭. মি. হজসন প্রণীত 'এসে অন দি কোচ, বোদো এন্ড ধীমল ট্রাইবস' পুস্তকের ১৬৬ পৃষ্ঠায় আসামের পাহাড়ি জাতির দেব-দেবতার তালিকা দ্রষ্টব্য।

যায়। তার অস্থি নদীতে নিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায় দেখে তার ছেলে সন্তর্পণে জন্তুটিকে অনুসরণ করে এবং পিতার অস্থি সংগ্রহের জন্য অনাহারে অনিদ্রায় কয়েকদিন যাবৎ জন্তুটিকে মেরে ফেলার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করে।

সাঁওতালরা এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো বিবরণ দিতে পারে না; এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা যে নদীপথে এসেছিলো বলে মনে করা হয়, প্রাচ্যের সেই বৃহৎ নদীর সঙ্গে দামুদা নদী মিলিত হয়নি। ফলে সঙ্গতির হয়তো অভাব আছে, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব এতোটুকুও হ্রাস পায়নি। বড়ো আকারের নদী এই জাতির ওপর যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলো, অনুষ্ঠানটিতে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া সাঁওতালদের অস্থি-নৈবেদ্যে পরিপূর্ণ দামুদা নদী শেষপর্যন্ত সাগরে গিয়ে প্রাচ্যের সেই বৃহৎ নদীর পানির সঙ্গে মিলিত হয়েছে, যে নদীতে এককালে তাদের পূর্বপুরুষদের অস্থি বিসর্জন দেয়া হতো।

সাঁওতালদের আমন্ত্রণ-পথে

সাঁওতালরা যে সকল দেশের মধ্য দিয়ে এসে তাদের বর্তমান বাসভূমিতে উপনীত হয়েছে বলে উল্লেখ করে থাকে, সেই সকল দেশের নাম আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এই নামগুলো থেকে যে আমি আলোকের সন্ধান পেয়েছি, তা নয়। কিন্তু আমি এই আশা নিয়ে নামগুলো উল্লেখ করেছি যে, ভবিষ্যতে কোনো গবেষক হয়তো নামগুলো শনাক্ত করে সাঁওতালদের আগমন পথ সম্পর্কে এটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হবেন। হিহিরি-পিপিরি, চায়ে চম্পা বা সিলদা যে কোথায় অবস্থিত, তা আমি জানি না; তবে উল্লেখযোগ্য যে, সাঁওতালী ভাষায় পিপিরি-অম শব্দের অর্থ প্রজাপতি এবং হিহিরি শব্দটি পিপিরি শব্দের বহুবচন-বোধক এখন হিহিরি-পিপিরি বলতে যদি প্রজাপতির দেশ বুঝা যায়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ এলাকাতেই এই দেশ অবস্থিত। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দু বা উর্দু ভাষায় হিহিরি বা পিপিরি শব্দ নেই। যে দেশে সর্বপ্রথম সাঁওতালদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সেই চায়ে চম্পা সম্ভবত পুষ্টশোভিত গাছের দেশ; কারণ চম্পা শব্দের অর্থ হচ্ছে পুষ্পশোভিত গাছ এবং চায়ে চম্পা এই শব্দটির বহুবচনের রূপ। ব্রহ্মপুত্র নদের উচ্চ উপত্যকার কোনো স্থানে এই দেশটি অবস্থিত হতে পারে। চতুর্থ নাম সিকার থেকে আমরা কিন্তু একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ পাই। এই স্থানটি দামুদা নদীর তীরে প্রাচীন বীরভূম জেলার প্রায় মধ্যে অবস্থিত; বর্তমানে এই স্থানটি সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। দামুদা নদীর দক্ষিণ দিকের সাঁওতালরা বলে যে, তারা উত্তর দিক থেকে এসেছে; কিন্তু উত্তর দিকের সাঁওতালরা দক্ষিণ এলাকাকে তাদের সাবেক বাসভূমি বলে উল্লেখ করে থাকে। অতএব ধরে নেয়া যেতে পারে যে, তারা উত্তর বা দক্ষিণ দিকে থেকে আসেনি; এসেছে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে থেকে। সিকার থেকে তারা পশ্চিমে নাগপুর পর্যন্ত গিয়েছে; অতএব তাদের আগমনের দিক পূর্বই রয়ে গেছে। এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেই ঘটেছে। হিন্দুদের অগ্রগতিই সাঁওতালদের স্থান পরিবর্তনের কারণ। হিন্দুরা যত এগিয়ে এসেছে,

সাঁওতালরাও ততো সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছে। এইটিই যে সাঁওতালদের সাধারণ পথ ছিলো, তা তাদের জীবনধারা ও আচার-আচরণ থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। মধ্য ভারতের অতি প্রাচীন পাহাড়ি উপজাতিদের মতো তাদের আচরণে রুক্ষতাও নেই, সীমাহীন অলসতাও নেই। সমতল ভূমি থেকে তারা শৃঙ্খলাবোধ, মানসিকতা, কিছু পরিমাণ সভ্যতা এবং চাষ-আবাদের অভ্যাস সঙ্গে করে এনেছে। কয়েক শ', সম্ভবত কয়েক হাজার বছর পরও তাদের এই আচরণ পরিবর্তন হয়নি। তাদের মধ্যে যে কদাচার আছে, তা হচ্ছে, অত্যাচারিত ও বিতাড়িত মানুষের কদাচার। একটি উচ্চতর অবস্থা থেকে অবনতির ফলেই তাদের মধ্যে এই কদাচার দেখা দিয়েছে, বর্বরদের মতো ভালো জিনিস সম্পর্কে অজ্ঞানতাবশত নয়।

সাঁওতালী ভাষা

সাঁওতালদের কাহিনী কিংবদন্তী সংখ্যায় যেমন অল্প, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তেমনি অসমৃদ্ধ। তবে তাদের ভাষার মধ্যে তথ্য অনুসন্ধানের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। মুদ্রা বা পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ বিবরণের চেয়ে একটি জাতির ভাষার উপরেই সেই জাতির ইতিহাস বেশি গভীরভাবে খোদাই করা থাকে। যে শ্রেণীর ভাষা একটি মাত্র শব্দ থেকে শুরু হয়ে সর্বনাশের সহায়তার রূপ পরিবর্তন করে থাকে, সাঁওতাল ভাষা সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই ভাষা চীনা শ্রেণীর ভাষা থেকে পৃথক, কারণ এতে রূপ পরিবর্তনের কোনো কাঠামো নেই। মাত্র তিনটি অক্ষরের ভিত্তিতে[৮] যে ভাষার শব্দ সম্ভার পল্লবিত হয়ে ওঠে সেই সেমিটিক তৃতীয় ভাষা থেকেও সাঁওতাল ভাষা পৃথক। সাঁওতাল ভাষার মৌলিক শব্দগুলো অপরিবর্তনীয় হওয়ায় দ্বিআক্ষরিক পরিবর্তনীয় শব্দ সংবলিত ভাষাগুলোর সঙ্গে তার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজি ভাষা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে শব্দসম্ভারের পরিবর্তনশীলতা সংস্কৃত ভাষাতেই সুষ্ঠু পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। সাঁওতালী ভাষায় কোনো লিখিত অক্ষর নেই; ফলে লিখিত আকারের কোনো বিধিনিষেধও এই ভাষার ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। অতএব বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে সাঁওতালদের মধ্যে যে ভাষা চালু আছে, তা এই প্রাচীন ভাষাটির আসল রূপ নয়। বংশ থেকে বংশান্তরে হস্তান্তরিত হতে হতে অনেক পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটেছে। এই ভাষার শব্দগুলোর এতো অসংখ্য ও জটিল ব্যাকরণগত রূপ আছে যে, সম্ভবত পাণিনিও কখনো কোনো ভাষা সম্পর্কে তা কল্পনা করতে পারেননি। তবে একথা সত্য যে, এই ভাষার মধ্যেই বর্তমান যুগের সঙ্গে স্মরণাতীতকালের একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

পরিশিষ্টভাবে[৯] আমি সাঁওতালী ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছি। ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যসম্পদ সমৃদ্ধ হয়ে যে সকল গবেষক ধীরে-সুস্থে গবেষণা

৮. এ. ভন শ্লেগেল লিখিত 'অবজারভেশনস সার লা লাংগ এট লিটারেচার প্রোভেনকালস', ১৪ পৃষ্ঠা।
৯. জ-পরিশিষ্ট।

চালাতে পারেন, তারা সম্ভবত এই পরিচয়ের ভিত্তিতে আমাদের চেয়ে সুষ্ঠুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হবেন। সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে যে অল্প কয়েকজন গবেষক অনুসন্ধান চালিয়েছেন, পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় আমি তাদের সংগৃহীত ফলাফল বর্ণনা করেছি। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আমি যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সেগুলো ভুল বলে প্রমাণিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে মূল তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ থাকায় আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ সেগুলো নিজেদের উচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবেন।[১০]

সাঁওতালী ভাষা পর্যালোচনা সময় সর্বপ্রথম যে বিষয়টি চোখে পড়ে, তা হচ্ছে এই যে, এই ভাষায় কোনো হরফ বা লিখিত আকার না থাকলেও সংস্কৃত হরফের সাহায্যে এই ভাষার সবগুলো স্বর প্রকাশ করা যায়। কোনো ভাষার হরফের সংখ্যা যতো প্রচুরই হোক না কেন, অন্য কোনো ভাষার স্বরগুলোর সঙ্গে তা কখনোই পুরোপুরিভাবে খাপ খায় না। পার্সি-আরবি হরফের সংখ্যা প্রচুর এবং প্রায় সমস্ত স্বরই এই হরফের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়; কিন্তু তথাপি দুটি সংস্কৃত স্বরবর্ণ, দুটি সংস্কৃত অনুনাসিক বর্ণ ও সংস্কৃত ভ স্বরের কোনো সমতুল্য বর্ণ এই ভাষায় নেই। পক্ষান্তরে সংস্কৃত ভাষায় সেমিটিক ভাষার পাঁচটি য স্বরের কোনো সমতুল্য স্বর নেই এবং একমাত্র জ স্বরের সাহায্যেই মোটামুটিভাবে এই পাঁচটি স্বর প্রকাশের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া সেমিটিক ভাষার হ-কার যোগে উচ্চারিত মহাপ্রাণ ব্যঞ্জণবর্ণ, হীনপ্রাণ ক বর্ণ এবং আয়েন ও গায়েন বর্ণের সমতুল্য কোনো বর্ণও সংস্কৃত ভাষায় নেই। কথিত আছে যে, গ্রিক ভাষায় প্রথমে ষোলোটি বর্ণ ছিলো এবং স্বর প্রকাশের সুবিধার জন্য পরে চারটি হরফ অন্য ভাষা থেকে ধার করা হয়। হোমারের রচনার কোনো বাক্য মূল ষোলোটি হরফের সাহায্যের লেখার পর তা পড়ার চেষ্টা করা হলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, একশ্রেণীর ভাষার হরফের সাহায্যে অন্য আর এক শ্রেণীর ভাষা লেখার চেষ্টা করা সত্যিই কতো অসুবিধেজনক। সংস্কৃত বর্ণমালার সাহায্যে অবশ্য ভারতীয় উপজাতিদের সকল ভাষার স্বর বা ধ্বনি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, এমন কি যে ভাষাটিকে উপজাতীয় ভাষার টাইপ বলে ধরে নেয়া হয়েছে এবং যে ভাষাটি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষিত হয়েছে ও সবচেয়ে বেশি কথিত হয়ে থাকে, সেই ভাষার সমস্ত ধ্বনিও সংস্কৃত বর্ণমালার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। দক্ষিণাঞ্চলের উপজাতিদের ভাষায় এমন অনেক ধ্বনি আছে, যেগুলো আর্য ভাষার কাছে অপরিচিত; আবার আর্য বর্ণমালার যে সকল ধ্বনি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তার অনেকগুলোই উপজাতীয় ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না।[১১]

আমরা জানি যে, প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণের ঘাটতি ছিলো; ফলে এই দেশের আদি বাসিন্দাদের ভাষা প্রকাশের জন্য আরও কয়েকটি নতুন হরফের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর্যগণ• আদিবাসীদের ভাষা থেকে এই ঘাটতি

১০. অন্যান্য মিশনারিদের পাণ্ডুলিপি ছাড়াও আমি রেভারেন্ড জে. ফিলিপস লিখিত 'ইনট্রোডাকশন টু দি সানতাল ল্যাংগোয়েজ' (কলিকাতা, ১৮৫২) পুস্তকের ব্যাপক ব্যবহার করেছি।

১১. ক্যাম্পবেল প্রণীত তেলেগু ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিত মি. এফ. ডব্লু. এলিসের অভিমত।

ব্যঞ্জনবর্ণগুলো গ্রহণ করে।[১২] পরবর্তীকালের একমাত্র ভ ধ্বনি ছাড়া কোনোরকম ঘাটতি-বাড়তি ব্যতিরেকেই সংস্কৃত বর্ণমালার সাহায্যে সাঁওতালী ভাষা নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হওয়ায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবাগত আর্যগণ এদেশে যে আদিম অধিবাসীদের দেখতে পেয়েছিলো, তারা হয় সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ, অথবা পূর্বপুরুষদের কোনো নিকট জ্ঞাতি। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় কয়েকটি সাঁওতালী শব্দের সন্ধান পাওয়া যাওয়ার পর এই সম্ভবনা আরো জোরদার হয়ে উঠেছে।

ভাষার গঠন

ভাষাকে সর্বনাম ও মূল, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। মূল হচ্ছে বস্তুগত কাঠামো এবং সর্বনাম হচ্ছে গঠনের নীতি। মানবদেহের পক্ষে প্রাণশক্তি যেমন প্রয়োজন, ভাষার পক্ষে সর্বনামও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। মূল থেকে ক্রিয়া ও বিশেষ্যপদের জন্ম হয়; কিন্তু এই ক্রিয়া ও বিশেষ্য স্থানু, সম্পর্কহীন এবং স্থান-কালের অবস্থানবিহীন। কিন্তু কোনো বস্তু সম্পর্কে কথা বলতে হলে স্থানে বা কালে, নিকটে—বাইরে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তার অবস্থান সম্পর্কে মানুষের মনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই অবস্থানকে এখানে বা সেখানে বলে অভিহিত করে থাকেন। সর্বনাম পদই মন ও বস্তুর মধ্যকার এই শূন্যস্থান পূরণ করে থাকে এবং নিষ্ক্রিয় বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের মধ্যে গতিসঞ্চার করে ভাষাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

যে পদ্ধতি অনুসারে সর্বনাম ও মূল সম্মিলিত হয়, এই সম্মেলনের সময় তাদের যে রূপ পরিবর্তন হয় এবং সম্মিলিত হওয়ার পর তাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেই পদ্ধতিকে ভাষার কাঠামো বলে। যে সকল ভাষায় পৃথক জাতীয় সর্বনাম ও মূল ব্যবহৃত হয়, প্রাচীনকালের বৈয়াকরণগণ তাকে পৃথক পৃথক শ্রেণীর ভাষা বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই পার্থক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃশ্যগত, মূলগত নয় এবং এমন কি মূলগত পার্থক্যের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কাঠামোগত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের চেয়ে শব্দগত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য থেকে অনেক কম জোরদার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কাঠামোই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভিত্তি, যার সাহায্যে একটি ভাষাকে অন্য একটি ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং ভাষার জগতে তার প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু এই নীতি সর্বত্র স্বীকৃত হলেও কাঠামোকে এখনো শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি বলে মেনে নেয়া হয়নি। বর্তমানকালে ভাষাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়; প্রথম, চীনা বা এক শব্দবিশিষ্ট অপরিবর্তিত ভাষা; দ্বিতীয়, ইন্দো-ইউরোপীয় বা এক শব্দবিশিষ্ট (দুই হরফ) পরিবর্তিত ভাষা; তৃতীয়, সেমিটিক বা তিন হরফবিশিষ্ট পরিবর্তিত ভাষা; এবং চতুর্থ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার উপভাষা সংবলিত আফ্রিকান তুরানীয় ভাষার ন্যায় অবশিষ্ট ভাষাগুলো। এই শ্রেণীবিভাগে একটিমাত্র নীতি অনুসরণ করা হয়নি। প্রথম দুটি শ্রেণীকে কাঠামোর পার্থক্যের জন্য পৃথক করা হয়েছে,

---

১২. অগাস্ট স্লিচার লিখিত কম্পেন্ডিয়াম, ১১১২ সর্গ; ওয়েমার, ১৮৬৬।

কারণ একটি শ্রেণী পরিবর্তিত এবং অপরটি অপরিবর্তিত। দ্বিতীয় শ্রেণীকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পৃথক করা হয়েছে মূলগত পার্থক্যের জন্য; কারণ, দ্বিতীয়টি দুই হরফ ও তৃতীয়টি তিন হরফ বিশিষ্ট। কাঠামোগত প্রথম নীতি অনুসারে চতুর্থ শ্রেণীকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর অপূর্ণাঙ্গ রূপ বলে অভিহিত করা যেতে পারে; চতুর্থ শ্রেণীতে এক ধরনের পরিবর্তনের অস্তিত্ব রয়েছে। মূলগত দ্বিতীয় নীতি অনুসারে চতুর্থ শ্রেণীটি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে; কারণ, এই শ্রেণীতে দুই হরফের মূলভিত্তিক উপভাষা রয়েছে।

নতুন আলোক

ভাষার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জার্মানি থেকে নতুন আলোক পাওয়া গিয়েছে। কাঠামোকে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং সর্বত্র এই নীতি অনুসরণ করে অগাস্ট শ্লিচার এমন একটি শ্রেণীবিভাগ উদ্ভাবন করেছেন, যা দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক উপরে বর্ণিত সঙ্গতিহীন শ্রেণীবিভাগকে বাতিল করে দেবে।[১৩] এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ভাষা নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত : প্রথম, কেবলমাত্র মূল সংবলিত বিচ্ছিন্ন ভাষা; জটিল আকার গঠন ও রূপগত পরিবর্তনের অযোগ্য। চীনা, অনামিটিক, শ্যামদেশীয় ও বর্মী ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়, পরিবর্তনের অযোগ্য মূল সংবলিত জটিল ভাষা; জটিল আকার গঠনের যোগ্য এবং সম্পর্ক নির্দেশক স্বর সংযুক্ত হলে রূপগত পরিবর্তনের উপযুক্ত। ফিনিক, তাতারিক, ডেকানিক ও আমেরিকার উপজাতিদের ভাষা বাস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকান বা বান্টু উপভাষা এবং সাধারণভাবে অন্য বহু ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়, রূপ পরিবর্তনযোগ্য মূল সংবলিত পরিবর্তনশীল ভাষা; আগে বা পরে ধ্বনি সংযোজনের ফলেও রূপ পরিবর্তন হতে পারে। সেমিটিক ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও এই দুই জাতীয় ভাষাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[১৪]

ভাষার জগতে সাঁওতালী ভাষার স্থান নির্ধারণের জন্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই নয়া পদ্ধতি অনুসারে আমি এই ভাষার কাঠামো পরীক্ষা করবো। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান সংগ্রহ করতে হলে এই জাতীয় পরীক্ষার খুবই প্রয়োজন; কিন্তু এই কাজে যে সকল কারিগরি ও খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করতে

---

১৩. 'কম্পেন্ডিয়াম ডার ভার্গিশেনডেন গ্রামাটিক ডার ইন্ডোজার্মানিশেন স্প্রাশেন; ভন অগাস্ট শ্লিচার প্রণীত, ওয়েমার, ১৮৬৬।

১৪. শ্লিচার প্রণীত কম্পেন্ডিয়াম, ৩ পৃষ্ঠা। শ্লিচার দ হরফকে প্রথম বা মূলগত শ্রেণীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন; দ্বিতীয় বা মূল ও পরে সংযোজিত ধ্বনি সংবলিত শ্রেণীর প্রতীক হিসেবে দ-ধ ভ ব্যবহার করেছেন—দ-ধ মূল ও পরে সংযোজিত ধ্বনির একই হরফে পরিণত হওয়ার পরিচায়ক এবং ভ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সংযোজনের সময় পরবর্তী ধ্বনিটি পরিবর্তনযোগ্য। তৃতীয় শ্রেণীর জন্য দ^ভ ধ^ভ প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে; দ ও ধ-এর উপরের ভ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, রূপান্তরের সময় মূল ও পরবর্তী ধ্বনির দু'টিই পরিবর্তনযোগ্য। পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠায় কিছু বিভ্রান্তি আছে, কিন্তু সংশোধনী পৃষ্ঠায় তা দূর করা হয়েছে।

হবে, তা হয়তো সকল পাঠকের কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে না। অতএব ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় যাদের আগ্রহ নেই, তারা কয়েক পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে পড়তে পারেন; কারণ কয়েক পৃষ্ঠার পর এই গবেষণার ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাঁওতালী ধাতুরূপ

সাঁওতালী ভাষা যে শ্লিচায় বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যেই প্রমাণ করা যেতে পারে। সাঁওতালী ভাষায় বাঘকে বলা হয় 'কুল'। কোনো সাঁওতাল যদি দুটি বাঘের কথা বুঝাতে চায়, তাহলে সে চীনাদের মতো একটি পৃথক শব্দ যোগ করে 'দুটি -বাঘ' বা 'বাঘ-দুটি' বলে না; সে মূল কুল শব্দটির পরে একটি দ্বৈত শব্দ 'কিন' যোগ করে একটিমাত্র শব্দ প্রস্তুত করে বলে 'কুলকিন'। অনুরূপভাবে শ্লিচারের প্রথম শ্রেণীর ভাষাগুলোর মতো সে দুটি শব্দের সাহায্যে বহুবচনে 'বাঘ-বহু' বলে না; সে মূল কুল শব্দের পরে বহুবচন বাচক 'কো' শব্দ যোগ করে একটিমাত্র শব্দের সাহায্যে বলে 'কুলকো'। 'কিন' ও 'কো' শব্দ দুটি কেবলমাত্র সংযোজনী নয়; মূল 'কুল' শব্দের মধ্যেই তাদের কিছু অস্তিত্ব রয়েছে; ফলে সমন্বয়-সাধনের পরে পরিবর্তিত আকারে দ্বিবচন ও বহুবচন প্রস্তুত হয়। এই একই নিয়মে সম্পর্ক নির্দেশক ক্ষেত্রে মূল শব্দটি দুটি বাঘ সম্পর্কিত 'কুলকিনি-রিনি' এবং কয়েকটি বাঘের নিকটে 'কুলকো-থেন' আকারে ধারণ করে।

অতএব সাঁওতাল ভাষা শ্লিচার বর্ণিত দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে এই দুই শ্রেণীর ঠিক কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত, তা নির্ধারণ করতে হলে দেখতে হবে যে,এই ভাষার অব্যয় ও ক্রিয়ার রূপান্তরের সময় মূল শব্দে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় কিনা। এই পর্যায়ে নির্ভুল হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি বাক্যাংশ পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং সমগোত্রীয় ভাষাগুলোর মারফত সাঁওতালী মূল শব্দের উৎপত্তি নির্ধারণ করা দরকার। এই জাতীয় পর্যালোচনার জন্য বহু পৃষ্ঠার প্রয়োজন; তবে যে পদ্ধতিতে আমি এ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা ব্যাখ্যা করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। প্রথমে সাঁওতালী বিশেষ্য পদের কথা বলা যেতে পারে; মূল শব্দের অভ্যন্তরীণ গঠন কখনোই পরিবর্তন হয় না, এমন কি শব্দের শেষ হরফের কোনো ধ্বনিগত পরিবর্তনও হয় না। ফলে, যে সকল বিশেষ্য পদের শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে (যেমন 'হেরেল', অর্থাৎ মানুষ), সেগুলো কেবলমাত্র একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনেই অপরিবর্তিত থাকে না; এমন কি পরে সংযুক্ত শব্দের প্রথমে স্বরবর্ণ থাকলেও একত্রিত হওয়ার সময় কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এইরূপ 'বাদে' (বটগাছ) শব্দের পরে 'ইয়াতে' শব্দ যোগ করা হলে সংযুক্ত শব্দটি 'বাদায়-ইয়াতে' না হয়ে 'বাদে-ইয়াতে'ই থেকে যায়।' 'কাদা' (মহিষ) শব্দের পরেও একই শব্দ যোগ করা হলে সংযুক্ত শব্দটি 'কাদে-আতে' বা 'কাদায়াতে' না হয়ে 'কাদা-ইয়াতে' থেকে যায়। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রয়োজ্য : বচন, পুরুষ ও কাল পরিবর্তন হলেও মূল 'তাহেন' (থাকা) শব্দটি পরিবর্তিত হয় না, পরে অন্য শব্দ যোগ করে পরিবর্তন দেখানো হয় মাত্র। এইরূপে

ভবিষ্যতে কাল ও একবচনের ক্ষেত্রে 'তাহেন-আই' তিনি থাকিবেন; দ্বিবচনের ক্ষেত্রে 'তাহেন-আকিন' (তাহারা দুইজন থাকিবে); এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে 'তাহেন-আকো' (তাহারা থাকিবে) হয়ে থাকে। অতীতকালের ক্ষেত্রে 'তাহেন-এন-আই' (সে থাকিয়াছিলো); 'তাহেন-এন-আকিন' (তাহারা দুইজন থাকিয়াছিলো); 'তাহেন-এন-আকো' (তাহারা থাকিয়াছিলো)। অতীত কালের আর একটি আকারে 'তাহেন-লেন-আই' (সে একসময় থাকিয়াছিলো); দ্বিবচনে 'তাহেন-লেন-আকিন'; বহুবচনে 'তাহেন-লেন-আকো'। সম্ভাবনাবাচক ক্রিয়াপদে 'তাহেন-চো-এ' (সে থাকিতে পারে); 'তাহেন -কোহ-আই' (সে থাকিতে পারিত); নিশ্চিত, 'তাহেন-মাই'; অনির্দিষ্ট, 'তাহেন-তে' অথবা উত্তরাঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে 'তাহেন'। কৃদন্ত পদে : 'তাহেন-কাতে' (থাকিয়া); ও 'তাহেন এন-খান' (থাকার পর)। ক্রিয়াবাচক পদে : 'তাহেন এনতে', 'তাহেন-লেনতে ও 'তাহেন-আকানতে' (থাকার দ্বারা এবং থাকার ফলে)।

খুব কম ক্ষেত্রেই ক্রিয়াপদের শেষে স্বরবর্ণে ধ্বনিগত পরিবর্তন দেখা যায় এবং একটিমাত্র ক্ষেত্রে শেষ অনুনাসিক বর্ণের পরিবর্তন ঘটে।

সাঁওতালী ভাষার সর্বনাম পদ বেশি জটিল, তবে মূল শব্দে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তা দ্বিবচন ও বহুবচনে বিভিন্ন ভিত্তি প্রয়োগের ফলে ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন মূলত প্রথম পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন, 'ইং' (আমি); 'আলিম' বা 'আলাম' (আমরা দুইজন); 'আলে' বা 'আবান'[১৫] (আমরা-বহুবচন)। 'অম' (তুমি); 'আবেন' (তোমরা দুইজন); 'অপে' (তোমরা বহুজন);। 'ওনা' (ইহা); দ্বিবচনে 'ওনাকিন'; বহুবচনে 'ওনাকো' বা 'ওনকো'।

সাঁওতালী ভাষার স্থান

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সাঁওতালী ভাষা শ্লিচারের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কাঠামোগত দিক থেকে এই জাতীয় ভাষা অপর দুটি শ্রেণীর ভাষার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। এই ভাষার সহজতর রূপ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ সমন্বয়ের পরিবর্তে সংযোজনের ফলে মূল শব্দের পরিবর্তন ঘটে। এই ভাষার প্রতীক হচ্ছে দ + দ + দ, প্রভৃতি। পরবর্তী শ্রেণীর ভাষার এমন একটি শক্তি আছে, যার সাহায্যে একটি মূল শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক সূচক আর একটি মূল শব্দের সংযোগ ঘটে; এবং এই সম্পর্কসূচক মূল শব্দগুলো সর্বনাম বা সর্বনাম শব্দাংশ রূপে অভিহিত হয়ে থাকে। এই সর্বনামগুলোকে বিচ্ছিন্ন মূল ধাতু বলে গণ্য করা হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক হবে দ-দ, অর্থাৎ বুঝা যাবে যে মূল ও রূপান্তরের সমন্বয়ে একটি জটিল শব্দ গঠিত হয়েছে। কোনো কোনো সময় রূপান্তরিত মূল শব্দের পরিবর্তন ঘটে; ফলে দ্বিতীয় দ-এর ওপর ভ স্থাপন করে এই পরিবর্তন সূচিত করা যেতে পারে; অর্থাৎ শ্লিচারের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক হিসেবে দ-দ অথবা দ-ভ দ ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্লিচারের তৃতীয়

---

১৫. রেভারেন্ড জে. ফিলিপস; তবে সংস্কৃত 'আসমাদ' শব্দের দ্বিবচন ও বহুবচন দ্রষ্টব্য।

শ্রেণীর ভাষার মূল ধাতু অর্থাৎ ভিত্তি ও সর্বনাম আরো বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং পরিবর্তনযোগ্য; অতএব এই শ্রেণীর প্রতীক হচ্ছে দ^-দ^।

অতএব কাঠামোগত দিক থেকে মানুষের ভাষার বিভিন্ন আকারের মধ্যে কোনো ভাঙন দেখা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণীর ভাষাগুলো স্তরে স্তরে উপরে উঠে গিয়েছে এবং নিচের ভাষার চেয়ে উপরের ভাষাগুলোতে ক্রমাগত বেশি তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিচ্ছিন্ন শ্রেণীর ভাষায় জটিল শব্দ গঠিত হয় না, ফলে একাধিক মূল শব্দ পর পর সাজিয়ে যেতে হয়। সমন্বয় শ্রেণীর ভাষায় এমন একটি শক্তি আছে, যার ফলে সম্পর্ক নির্দেশক ধাতু মূল ধাতুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তবে মূল ধাতু পরিবর্তিত হয় না। রূপান্তর শ্রেণীতে সংযোগ শক্তি আরো জোরদার হওয়ার সম্পর্ক নির্দেশক ধাতু মূল ধাতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে এবং মূল ধাতুতেও অবস্থা অনুসারে পরিবর্তন ঘটে। এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে আকার গঠনের বিভিন্ন পর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে; এবং অযথা জোর না দিয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুখের ভাষার গঠনমূলক শক্তির অনুপাতেই প্রত্যেকটি জাতি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কম বা বেশি তৎপরতা দেখিয়েছে। বর্মী, চীনা ও এনামিটিক জাতির মধ্যে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা আছে; এবং তাদের এক-অক্ষরবিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন ভাষার মতো জাতিগত প্রাণশক্তিরও অভাব আছে। তাদের উপরের শ্রেণীর তাতারিক জাতি মাঝে মাঝে ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে এবং চীনাদের তুলনায় তাদের ভাষা বেশি গঠনমূলক শক্তি সঞ্চয় করায় তারা বেশি কর্মতৎপর ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় বেশি সক্ষম হয়ে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর্য ও সেমিটিক জাতিগুলো সামাজিক ও ভাষাগত তৎপরতায় সবচেয়ে বেশি পারদর্শিতা লাভ করেছে এবং ইহকাল ও পরকালের জন্য সুশৃঙ্খল জগৎ গড়ে তুলেছে; তাছাড়া ভাষার মতো রাজনৈতিক ইতিহাস ও বস্তুগত জীবনেও তারা প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছে। এই তুলনা আরো বেশিদূর গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দেখানো যায় যে, সমন্বয় শ্রেণীর ভাষার মধ্যে যে সকল জাতি দুনিয়ায় খুব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তাদের ব্যাকরণও খুব সমৃদ্ধ। তুংগুসিক জাতিগুলো কখনো ভাষায় বা রাজনীতিতে তৎপরতা দেখায়নি; মঙ্গোলীয়দের স্থান উভয় বিষয়েই এক স্তর উপরে; এবং ভাষা ও সৃষ্টিধর্মিতার দিক থেকে তুর্কি ও ফিনিক শাখার স্থান তুরানির জাতির সর্বশীর্ষে।

ভাষাতাত্ত্বিক স্তর

ভারতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ভাষারই আগমন ঘটেছে। বাংলাদেশে ও তার আশ্রিত রাজ্যগুলোতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রত্যেকটি ভাষা আমদানি হয়েছে। বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্বের সকল শাখার ভাষাই পাওয়া যাবে; বিচ্ছিন্ন ভাষা থেকে সমন্বয়ে ভাষা, সাম্প্রতিককালের রূপান্তর ভাষা, পয়োত্তি বালা ভাষা এবং হিন্দি ভাষা,—পর পর সবগুলোরই সন্ধান পাওয়া যাবে। যেমন :

প্রথম শ্রেণী দ+দ ভাষা	বর্মী :[১৬] বড় বড় শহরের বাসিন্দাদের কথিত চীনা ভাষা; বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের কয়েকটি উপজাতির উপভাষা।
দ্বিতীয় শ্রেণী দভ ও দভ ভাষা	হিমালয়ের উপভাষা : [১৭] সাঁওতালী, কোল এবং যতোদূর জানা যায়, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র পাহাড়ি উপজাতিদের ভাষা।
তৃতীয় শ্রেণী দভ দভ ভাষা	আর্য শাখা : সংস্কৃত; হিন্দুস্তানী; বাংলা; হিন্দি প্রভৃতি। সেমিটিক শাখা : মুসলমান ধর্মনেতাদের আরবি, প্রভৃতি অর্ধ-আর্য শাখা : অর্ধ-আরবি পার্সি ভাষা, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সরকারি ভাষা ছিলো এবং এখনও মুসলমানদের উপরের শ্রেণীর কথ্যভাষা।

বাংলাদেশে সংমিশ্রণ

উত্তর ভারতে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিচ্ছিন্ন রূপান্তর শ্রেণীর আর্য ভাষাগুলোর পারস্পরিক সান্নিধ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সভ্য মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ একই গোত্র থেকে উদ্ভূত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এটা হচ্ছে বিশ্বের জনসংখ্যার একটি মাত্র পরিবার। বাংলাদেশের আদিম উপভাষাগুলো সম্পর্কে অনুরূপভাবে গবেষণা করা হলেও যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি। এই গবেষণার ফলে বহু জাতির বিচ্ছিন্ন তথ্য থেকে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী বেরিয়ে আসবে এবং ভবিষ্যতে তিনটি প্রধান শ্রেণীর ভাষার মধ্যে হয়তো একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। কাপরোথ, এ. রেমুসাট ও ক্যাস্টার্নের মতো ইউরোপের তুরানীয় পণ্ডিতগণকে পরিশ্রম সাপেক্ষ গবেষণা বা বিপজ্জনক সফরের মারফত যে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেই সকল তথ্য ভারতীয় মিশনারি বা ম্যাজিস্ট্রেটদের দরজার সামনেই মওজুত রয়েছে; এবং বাংলাদেশের সমস্ত অনার্য ভাষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার জন্য সরকারি শাসনযন্ত্রকে অতি সহজে ও বিনা খরচে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে মাত্র দুটি কাজ করা দরকার : প্রত্যেকটি উপভাষার শব্দসম্ভার সংগ্রহ করতে হবে এবং ব্যাকরণ সংকলন করতে হবে। যতোদিন পর্যন্ত একখানি পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক অভিধান সংকলিত না হচ্ছে, ততোদিন পর্যন্ত সমন্বয় শ্রেণীর ভাষায় হরফের ধ্বনিগত রূপান্তরও নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারে ব্যবহৃত একই মূল ধাতুর প্রকৃত রূপ নির্ধারণ করাও সম্ভব হচ্ছে না। আর্য ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে এই কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে; ফলে রূপান্তর শ্রেণীর কোন্ ভাষার

---

১৬. গ্রিচার রচিত কম্পেন্ডিয়াম, ৩ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৭. ব্রহ্মপুত্র নদের উচ্চ উপত্যকার পূর্বে অবস্থিত এলাকা একটি ভাষাগত বিভাজিকা। নিম্নবঙ্গের আসাম জেলা একটি জাতিগত ও রাজনৈতিক সীমান্ত।

কোন্ শব্দটি কি কি ভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে, পণ্ডিতগণ তা এখন প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলে দিতে পারেন।[১৮]

আদিম ভাষার ব্যাকরণ সংকলন ও তার শ্রেণীবিভাগের জন্য শ্লিচারের পদ্ধতি থেকে মূল্যবান পথনির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। শ্লিচার মূলত রূপান্তর শ্রেণীর প্রকৃতিই বিশ্লেষণ করেছেন; তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ভারতের আদিবাসীর ভাষাগুলো যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সেই সমন্বয় শ্রেণীর ভাষা মূলধাতুর পূর্বে, পরে ও মধ্যস্থলে শব্দ-সংযোগের ফলে গঠিত হয়েছে। সহজভাবে উপলব্ধি করার জন্য মধ্যম শ্রেণীর বিষয় বাদ দেয়া হলে অপর দুটি শ্রেণী থেকে আমরা চারটি সরল ও চারটি জটিল শাখার সন্ধান পাই। যথা—(১) পরে সংযুক্ত অপরিবর্তিত সর্বনাম সংবলিত মূলধাতু দ-দ; (২) অথবা পরিবর্তিত সর্বনাম সংবলিত, দ-দ[ন]; (৩) পূর্বে সংযুক্ত অপরিবর্তিত সর্বনাম সংবলিত মূলধাতু, দ-দ; (৪) অথবা পরিবর্তিত সর্বনাম সংবলিত, দ[ন]-দ। মূলধাতুর পূর্বে ও পরে শব্দ যোগ করে সম্ভাব্য জটিল শ্রেণীগুলো গঠিত হয়; যথা, (৫) দ-দ-দ, (৬) দন্ত-দ-দ, (৭) দ-দ-দন্ত (৮) দ[ন]-দ-দ[ন]। শ্রেণীবিভাগের এই পদ্ধতি অধিক সঙ্গত বিচ্ছিন্ন ভাষার ন্যায় প্রায় প্রাণহীন শ্রেণী থেকে শুরু হয়ে এমন একটি শ্রেণীতে গিয়ে শেষ হয়েছে, যে শ্রেণীর গঠনক্রিয়া রূপান্তর ভাষার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। ভারতের আদিবাসীদের সম্পর্কে যারা পৃথক পৃথকভাবে গবেষণা করে থাকেন, তারা হন এবং তাদের গবেষণার ফলাফল একযোগে তুলে ধরেন, তাহলে অনার্য ভাষাতত্ত্বের প্রধান অন্তরায় দূরীভূত হয়ে যাবে। একশ্রেণীর সমস্ত হরফের প্রকৃত রূপ নির্ণয়ের জন্য প্রতীকধর্মী হরফগুলোর সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। ভারতীয় পণ্ডিতদের কেবলমাত্র প্রত্যেকটি ভাষাকে তার যথার্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেগুলো সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা ও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ওপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

সাঁওতালী ভাষায় আর্য মূলধাতু

কাঠামোগত দিক থেকে সাঁওতালী ভাষা যদিও সমন্বয় শ্রেণীর দ্বিতীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত, তথাপি রূপান্তর শ্রেণীর ভাষা এবং বিশেষত সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। সংস্কৃত-ভাষী জাতির সঙ্গে সাঁওতালদের সংযোগের বিষয় উল্লেখ করে অধিকাংশ সাদৃশ্যের একটি ব্যাখ্যা দেয়া যায় বটে, কিন্তু সমস্ত সাদৃশ্যের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সাঁওতালী ভাষার তিনটি সর্বনাম ও তিন জাতীয় বিশেষ্য পদের সাহায্যে এই মন্তব্যের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

সংস্কৃত ভাষায় 'চিট' নামে একটি শব্দ আছে; এই শব্দটি কখনোই ব্যক্তিগত সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সম্পর্ক নির্দেশক পদের অনিশ্চয়তা প্রকাশ করে মাত্র।

---

১৮. ডন জর্জ কার্টিয়াস প্রণীত 'গ্রানজুগ ডার গ্রিচিশেন ইটিমোলজি', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২০ ও ১২১ পৃষ্ঠা; লিপজিগ, ১৮৬৬, অথবা শ্লিচার প্রণীত কম্পেন্ডিয়াম দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩৪০ পৃষ্ঠা; ওয়েমার, ১৮৬৬।

যথা, 'কাস' (কে) শব্দের সঙ্গে 'চিট' যোগ করা হলে সংযুক্ত শব্দটি হয় 'কাস-চিট' (কেহ একজন)। একই শব্দ রূপান্তরিত হয়ে 'চেট' (যদি) হয়। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটির কোনো স্বাধীন সর্বনাম সত্তা নেই এবং কেবলমাত্র মহাপ্রাণ মূলধাতুর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পরই ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু সাঁওতালী ভাষায় এই শব্দটি স্বীয় শক্তিবলেই অনিশ্চিত সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; এবং এই শব্দ থেকে সেখানে বহু শব্দ জন্মলাভও করেছে। যেমন, 'চেট (কি); চেট-হং' (যা কিছু); 'চেট-চো' (সম্ভবত, কে জানে); 'চেটলেকো' (কিসের মতো) প্রভৃতি।

সাঁওতালী ভাষার বিশেষণ 'জো-তো' (সকল) শব্দের সঙ্গে অবশ্য সংস্কৃত ভাষার একই অর্থবিশিষ্ট 'সর্ব' শব্দের কোনোরকম সাদৃশ্য নেই। কিন্তু 'জো-তো' শব্দটি 'জা-উতা' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ; এবং নিরাভরণ মূল ধাতু হচ্ছে 'জা'। এই 'জা' শব্দটি সংখ্যা, পরিমাণ, বা ব্যাপ্তিসূচক বহু সাঁওতালী জটিল শব্দের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—'জা-এখ' (বহুবার); 'জা-যুগ' (চিরকাল); 'জা-উহিলো' (সর্বদা); 'জা-আরাতে' (বিপুল পরিমাণ একত্রিত করা, সংগ্রহ করা)। সাঁওতালী বিশেষণ 'জাক' (অসংখ্য, জনবহুল) প্রায় বিনা পরিবর্তনেই অশুদ্ধ বাংলাভাষায় চালু আছে। সংস্কৃত ভাষায় এমন ক্রিয়া-বিশেষণ আছে, যা কোনোরকম পরিবর্তন না করেই মূল আকারে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃত 'জা-তু' (চিরন্তন) ও 'না হা-তু' (কখনই না) শব্দ দুটি কোনো কোনো সময় এই প্রাচীন ভাষার মহাপ্রাণ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত ইন্দো-আর্য সর্বনামের একমাত্র নিরাভরণ প্রতিনিধি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ফলে, সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দো-জার্মানিক ভাষাও সংস্কৃত ভাষার কাছ থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

সাঁওতালী ভাষার একটি নির্দেশক সর্বনাম হচ্ছে 'না-ই'[১৯] (ইহা)। এই শব্দটি একাধিক জটিল আকারেও দেখা যায়; যেমন, 'না-হারি' (ইহাতে, এখন, যতক্ষণ পর্যন্ত না); 'না—তে' (এই দিকে, এই পথে); 'না—তে' (এখানে) প্রভৃতি। এই শব্দের একটি শাখা শব্দ হচ্ছে 'না—সে'; কিন্তু কখনোই ইহা এককভাবে ব্যবহৃত হয় না; সর্বদা বহুবচন নির্দেশক রূপে প্রয়োগ হয়। যেমন, 'না—সে না—সে' (কিছু)। এই শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত 'না-না' (বিভিন্ন) শব্দটি তুলনীয়। সাঁওতালী ভাষায় তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম আকারে যা পাওয়া যায়, অনেকে তাকে ড. ডোনাল্ডসনের অনুমানের প্রমাণ বলে ধরে নিতে পারেন। ত্রিশ বছর আগে ভাষাতাত্ত্বিক ডা. ডোনাল্ডসন তৃতীয় পুরুষ সর্বনামের চারটি পৃথক রূপ উদ্ধার করেন; তার মধ্যে তাঁর পরীক্ষিত ভাষাগুলোতে দুটি রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর চারটি রূপ হচ্ছে, তা, না, নু এবং নি। সাঁওতালী ভাষায় এই চারটি রূপই ড. ডোনাল্ডসনের বর্ণিত আকারে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, তা—ই (তাহার); না—ই (এই ব্যক্তি); নু—আ ও নি—আ (এই বস্তু)। এই সাদৃশ্য আকস্মিকও হতে পারে, তবে লক্ষণীয় বটে।

১৯. 'না'—হরফের পরে হ সহযোগে উচ্চারণ করতে হয়; যেমন 'না—হাই' 'না—হারি' = 'না—আহারি'।

গ্রিক, ইংরেজি ও আরবি বিশেষ্য পদের সঙ্গে সাঁওতালী বিশেষ্য পদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে; কিন্তু সবচেয়ে বেশি পার্থক্য রয়েছে সংস্কৃত বিশেষ্য পদের সঙ্গে। কয়েকটি মূলধাতুর ক্ষেত্রে অবশ্য আবার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সময়ের বিভাগের কথা উঠলে প্রথমেই দিন ও রাত্রির কথা মনে পড়ে। দিন সকল যুগের, সকল দেশের একটি সর্বজনীন বিষয়; এবং ভারতের সংস্কৃত জাতি, ইউরোপের রোমান জাতি ও ব্রিটেনের স্যাক্সন জাতি একই মূলধাতুর সাহায্যে দিনের কথা বলেছেন। এই মূলধাতুটি হচ্ছে 'দিব' (আলো বা উজ্জ্বলতা); তবে সংস্কৃত জাতি যে 'দিন' (দিবস) ব্যবহার করেছে, তা সম্ভবত 'দিব' ধাতুর একটি প্রাচীন রূপ অথবা একটি সম্পূর্ণরূপে নতুন মূলধাতু। 'দিব' ধাতুটি ইন্দো-জার্মানিক ভাষাগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও সাঁওতালী ভাষায় তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না; কিন্তু 'দিন' ধাতুটি এখন অনেক ভাষায় অচল হয়ে গেলেও সংস্কৃত ও সাঁওতালী ভাষায় নিখুঁতভাবে চালু রয়েছে। তবে উভয় ভাষাতেই শব্দটি এখন অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে মহাপ্রাণ শব্দের সঙ্গে একত্রে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। রচনার ক্ষেত্রেই এই ধাতুটি বেশি বিচক্ষণ করে এবং অপর একটি সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়; তবে সাঁওতালী ভাষায় তার কোনো প্রতিযোগী নেই। যেমন, সংস্কৃত ধাতু 'দিন' (দিবস); সাঁওতালী, 'দিন-কালোম' (গত বছর); 'দিন-তালাওতে' (সময় ব্যয় করা, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা); 'দিন-হিলোহ' (দৈনিক, ক্রমাগত)। বিশুদ্ধ সাঁওতালী ভাষায় 'দিন' শব্দটি একক বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের-অবকাশ আছে; তবে উপরে বর্ণিত জটিল শব্দগুলো সাঁওতালী ভাষার আদি ও অকৃত্রিম অংশে। সাঁওতালী ভাষায় 'দিন' অর্থবোধক কয়েকটি শব্দ আছে; এবং তাদের মধ্যে 'মাহা' শব্দটি অধিক প্রচলিত।

সাঁওতালী ভাষায় কোনো বস্তুনিরপেক্ষ শব্দ না থাকায় 'সময়' শব্দের সমতুল্য কোনো শব্দ নেই; তবে মূলধাতু 'কাল' থেকে উদ্ভূত সময়ের বিভাগ নির্দেশক একাধিক জটিল শব্দ রয়েছে, যথা, 'কাল-ওম' (পরের বছর); 'দিন-কাল-ওম' (গত বছর); 'হাল-কালোম' (দুই বছর আগে); 'মাহাং-কালোম' (তিন বছর আগে)। উল্লেখযোগ্য যে, সময় এবং সংস্কৃত শব্দ হচ্ছে 'কাল-অ' এবং ইহা মূলধাতু 'কাল' থেকে উদ্ভূত।

আর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল মানুষেরই একরকম; এবং প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন শাখার লোকেরা একই মূলধাতু থেকে উদ্ভূত নামের সাহায্যে তা প্রকাশ করে থাকে। প্রাথমিক অর্থে মস্তক ছাড়াও প্রত্যেক ভাষাতেই 'মাথা' শব্দটির একটি দ্বিতীয় অর্থ আছে এবং এই অর্থে প্রাধান্য বা কোনো বস্তুর শীর্ষস্থান বুঝানো হয়ে থাকে। সংস্কৃত মূলধাতু 'শির'-এর অর্থ মাথা, গাছের শীর্ষস্থান, সেনাবাহিনীর পুরোভাগ প্রভৃতি। সাঁওতালী ভাষায় 'শির' শব্দটি কখনো পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না, তবে বহু শব্দের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'শির-ওম' (ঘাড়, অর্থাৎ মাথার নিচে; 'ওম' বা 'আম' হচ্ছে অবস্থানের সাঁওতালী সর্বনাম); 'শির-শির-আউতে' (রাগে কাঁপা বা মাথা ঝাঁকানো); 'শির-আরিতে' (লেগে থাকা, জেদ ধরা); 'শিরাহ-বারাহ' (উত্তম, শ্রেষ্ঠ; প্রধানত গোশতের প্রতি প্রযোজ্য); 'শির-হিতে' (ঘরের

চালে খড় দেয়া)। গলার সংস্কৃত মূলধাতু হচ্ছে 'গল্' এবং এই ধাতু থেকে গলানো, কথা বলা, খাওয়া প্রভৃতি অর্থবোধক শব্দগুলো এসেছে। সাঁওতালী ভাষায় যে শব্দের সাহায্যে গলা, খাওয়া প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করা হয়ে থাকে, তা পৃথক উৎস থেকে এসেছে; কিন্তু কথা বলা ও গলানো প্রভৃতি ভাব প্রকাশের জন্য একই ধাতু 'গল্' ব্যবহার করা হয়ে থাকে; যেমন, 'গল্-মারাউতে' (কথা বা গল্প করা); 'গালাম-গালাম' (অস্পষ্ট); 'গল্-আউতে' (ঢিলে হয়ে যাওয়া, গলে যাওয়া পানিতে যেমন চুন গলে যায়)।

ইন্দো-জার্মানিক ভাষাগুলোতে হাতের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'হস্ত' বা সংক্ষেপে 'হাত'। সাঁওতালী ভাষায় এই শব্দটি পৃথক আকারে দেখা না গেলেও অন্য শব্দের সঙ্গে একত্রে দেখা যায়। যেমন, 'হাত-লাহ' (বগল); 'হাত-আউতে' (ছিনিয়ে নেয়া); 'হাত-উয়াতে' (অন্ধকারে হাতড়ানো); 'হাত-আরাউতে' (পানিতে হাতড়ানো, হাত দিয়ে মাছ ধরা)। যে ইন্দো-জার্মানিক মূলধাতু থেকে সংস্কৃত 'গর্ব-হা' (পেট) শব্দটি এসেছে, সাঁওতালী ভাষায় তা ক্রিয়াপদের আকারে 'গবরাউতে' (গর্ভপাত করা) হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত অধিক সন্দেহজনক সাদৃশ্যের বিবরণ দিয়ে এই তুলনামূলক বিচার শেষ করা যেতে পারে। ইংরেজি ভাষার মূলধাতু 'ম্যান' (মানুষ) থেকে অধিকাংশ ইন্দো-জার্মানিক ভাষার মানুষের প্রতিশব্দ গৃহীত হয়েছে। 'ম্যান' শব্দটি মূলত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন প্রাণী বুঝায়। শব্দটি মূল 'মান' (চিন্তা করা) ধাতু থেকে গৃহীত হয়েছে। মানবজাতি ও মানুষের চিন্তাধারার কার্যক্রম সম্পর্কিত অসংখ্য শব্দের জন্য সাঁওতালী ভাষায় এই একই ধাতু ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

মূলধাতু : মান, চিন্তা করা

ইংরেজি	গ্রিক	সংস্কৃত	সাঁওতালী
ম্যান, (মানুষ)	স্পিরিট[২০] (আত্মা) বি ইগার (আগ্রহশীল হওয়া)	মান, উপলব্ধি করা মনু, প্রথম মানুষ মানব, মানুষ	মান-এতে, চিন্তা করা মান-এ, আত্মা মানিকো, প্রথম মানুষ মান-ও-ই, মানুষ মান-জনম বা মানোই-জনম, মানুষ থেকে জন্ম।

যে সকল মিশনারি সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন শাখার ভাষা ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা এই শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে ধার করা হয়েছে বলে লক্ষ্য করেননি। কিন্তু এই শব্দগুলোর সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার প্রতিশব্দগুলোর সাদৃশ্য খুবই ঘনিষ্ঠ। এমন কি শব্দগুলো যদি বিশুদ্ধ আদিবাসীও হয়ে থাকে, তাহলেও তাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো অনুমান গড়ে তোলা নিরাপদ নয়। উপরের উদাহরণ থেকে প্রাচীন সাঁওতালী ও সংস্কৃত

২০. গ্রানজুগ ডার গ্রিচিশেন ইটিমোলজি; ভন জর্জ কার্টিয়াস প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৭৯ পৃষ্ঠা।

শব্দের সাধারণ মূলধাতু রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু রূপান্তর ও সমন্বয় ভাষার কাঠামোগত পার্থক্য এতো বেশি যে, এই ইঙ্গিতের ওপর ভিত্তি করে কোনো সাধারণ বা সমগোত্রীয় উৎপত্তিস্থলে উপনীত হওয়ায়র চেষ্টা করা সম্ভবপর নয়।

প্রাকৃত ভাষায় সাঁওতালী শব্দ

বর্ণমালা সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, প্রাচীনকালে আর্য-আক্রমণকারিগণ সাঁওতাল বা তাদের সমগোত্রীয় কোনো জাতির সংস্পর্শে এসেছিলো বলে অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সংস্কৃতের অতি প্রাচীন রূপ প্রাকৃত ভাষায় বিশুদ্ধ সাঁওতালী শব্দও স্থান পেয়েছে। ফলে সংস্কৃত-ভাষী লোকেরা আর্য শব্দ 'স্তম্ভ' ব্যবহার না করে আদিবাসী শব্দ 'খুঁটা'[২১] ব্যবহার করেছে। খুঁটা' একটি নিরাভরণ সাঁওতালী শব্দ, কেবলমাত্র শেষ স্বর বর্ণে সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে : যেমন, প্রাচীন প্রাকৃত শব্দ 'খুঁটা'; এবং আধুনিক সাঁওতালী শব্দ 'খুঁটি'। ট ও ঁ-সহ এই সাদৃশ্য খুবই সুস্পষ্ট। 'ভেড়া' শব্দটির মধ্যে আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে সাঁওতালী ভাষায় এই শব্দটি চালু আছে; সংস্কৃত ভাষাতেও এই শব্দটি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো হদিস পাওয়া যায় না। বানানের জন্য 'ড়' হরফ ব্যবহৃত হওয়ায় তার বিশুদ্ধ আদিবাসী শব্দ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর্যগণ এদেশে এসে যে সকল জাতিকে দেখতে পেয়েছিলো, তাদের কাছ থেকেই তারা এই সকল শব্দ ধার করেছে। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ বলেন যে, 'পোটা'[২২] (পেট) শব্দটি মূলত উপজাতি। এবং পরে প্রাকৃত ভাষাতেও স্থান পেয়েছে। এই শব্দটি সাঁওতালদের মধ্যে এখনো চালু আছে এবং প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে ভুঁড়িওয়ালা লোককে উপহাস করে 'পোটিয়া' (পেট-মোটা) নামে ডাকা হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য আদিবাসী শব্দ আর্য ভাষায় এসে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সাঁওতালী সংখ্যা 'পোনিয়া' বা 'পণ' (চার) শব্দটির কথা বলা যেতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় এসে এ শব্দটি 'চতুর' এবং আধুনিক বাংলা ভাষায় 'চারি' হয়ে গেছে। বাংলা ভাষায় এখনো অবশ্য 'পৌণে' (এক-চতুর্থাংশ কম) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বাঙালিরা তাই দুই ও তিন-চতুর্থাংশ না বলে পৌণে তিন বলে; পঁচাত্তর না বলে পৌণে একশ বলে; এবং সাড়ে সাত শ না বলে পৌণে এক হাজার বলে। এই শব্দটি বাংলা ভাষায় সংখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সর্বদা এক-চতুর্থাংশ কম অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে সাঁওতালী সংখ্যা চার ও বাংলা পৌণে একই শব্দ : সাঁওতালী 'পৌণিয়া' (চার) ও বাংলা 'পৌণে' (এক-চতুর্থাংশ কম)। তাছাড়া প্রাচীন বাংলায় পোইয়া' (পোয়া বা এক-চতুর্থাংশ) নামে একটি শব্দ আছে; শব্দটি এখনও পল্লী অঞ্চলের বাজারে চালু আছে। বৈয়াকরণগণ মনে করেন যে, শব্দটি সংস্কৃত 'পাদ' (যাওয়া), বা 'পদ' বা 'পদো' (পা) শব্দ থেকে এসেছে। 'পোইয়া' ও 'পদ'-এর মধ্যে

---

২১. মৃচ্ছকটি, ৪০; মুর প্রণীত স্যানসক্রিট টেক্সটস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।
২২. মৃচ্ছকটি, ৭২ ও ১১২; স্যানসক্রিট টেক্সটস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।

যোগসূত্র উদ্ভাবনের ব্যাপারে বৈয়াকরণগণ সম্ভবত ঠিক পথেই গিয়েছেন; কিন্তু 'পদ' থেকে 'পৌইয়া' শব্দ এসেছে বলে তারা যে অনুমান করেছেন, তা নিশ্চয়ই ভুল। বাংলা 'পৌণে' ও 'পোয়া' যে সাঁওতালী 'পৌণিয়া' থেকে এসেছে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে প্রথমে যে মিশ্রিত ভাষায় কথাবার্তা হতো, সেই ভাষার মধ্যে অনার্যরা 'পোয়া' শব্দটি ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতে এই শব্দের চারটি প্রতিশব্দ[২৩] ছিলো; এবং সংস্কৃত অধিক শক্তিশালী ভাষা হওয়ায় তা অনার্য শব্দটিকে বাংলা ভাষা থেকে বিতাড়িত করেছিলো; ঠিক যেমন আর্যরা আদিবাসীদের বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। আদিবাসীদের যে অবশিষ্ট কিছু লোক তখনো বাংলাদেশে ছিলো, তাদের যেমন ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিলো, তাদের 'পোয়া' শব্দটিকেও তেমনি মার্জিত ভাষা থেকে অপসারণ করে ফেরিওয়ালার ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছিলো এবং এই আকারে শব্দটি এখনো চালু আছে। পক্ষান্তরে সংস্কৃত ভাষায় আদিবাসী 'পৌণে' শব্দের কোনো প্রতিশব্দ না থাকায় বাংলা ভাষায় এই শব্দটি স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

সাঁওতালরাও আর্য ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ ধার করেছে। তাদের ভাষায় এমন অনেক শব্দ রয়েছে, যেগুলো বাংলা বা হিন্দি ভাষা থেকে এসেছে বলে মনে করা হয় না; মনে হয় কোনো প্রাচীন উপভাষা থেকে এসেছে; কিন্তু আসলে এই শব্দগুলো সুনিশ্চিতরূপে সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে আমরা দেখেছি। যে, প্রাকৃত ভাষা সাঁওতালী ভাষার সংস্পর্শে আসে এবং অনেক পরে সাঁওতালী থেকে শব্দ সংগ্রহ করে; অতএব বলা যেতে পারে যে, প্রাকৃত ভাষার কাছেও সাঁওতালী ভাষার অনুরূপ ঋণ রয়েছে। সাঁওতালী ভাষায় যে অল্প কয়েকটি বস্তুনিরপেক্ষ শব্দ আছে, সেগুলো প্রাচীন আর্যদের অপভ্রংশ ভাষা থেকে বিনা পরিবর্তনেই নেয়া হয়েছে।

আর্যরা যখন ভারতে আসে তখন থেকেই তাদের রাজনৈতিক ইউনিট হচ্ছে গ্রাম এবং এই গ্রামের ভিত্তিতেই হিন্দুদের সমগ্র সামাজিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। অথচ ইন্দো-আর্য ভাষার 'গ্রাম' শব্দটি বিশুদ্ধ সাঁওতালী ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ আদিবাসীদের রাজনৈতিক ইউনিট হচ্ছে পরিবার এবং পরিবার হচ্ছে যাযাবর সমাজের প্রাণকেন্দ্র। আর্যদের গৃহস্থালী সূচক 'কুলা' শব্দটি সাঁওতালী ভাষায় এককভাবে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন আকারে শব্দটি সাঁওতাল সমাজে চালু আছে। সাঁওতাল গ্রাম বলতে প্রধানত একটিমাত্র রাস্তার দুই পাশের ঘরবাড়ি বুঝায়; এবং এই রাস্তা সমগ্র সাঁওতাল এলাকায় 'কুলা-হি' (পরিবারসমূহের বিভক্তিকারক) নামে পরিচিত।

সাঁওতালী ভাষা সম্পর্কে যারা আরো কিছু জানতে চান, তারা 'জ' পরিশিষ্টে সাঁওতালী ব্যাকরণ দেখতে পারেন। পশ্চিমবাংলার পাহাড়ি উপজাতিদের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় প্রমাণ করার জন্য পূর্ববর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ দেয়া হয়েছে :

---

২৩. (১) চতুর্থ; (২) চতুর্থাংশ; (৩) পদ, কেবলমাত্র অংশ বা কবিতায় ব্যবহৃত এবং; (৪) একহা, একপদ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ (হিউটন)।

প্রথমত, সাঁওতালী ভাষার কাঠামো সংস্কৃত ভাষার কাঠামো থেকে পৃথক; ভাষাটি রূপান্তর জাতীয় এবং শ্লিচারের দ্বিতীয় শ্রেণীর (সমন্বয় ভাষা) অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত, সাঁওতালী ভাষায় সহজ ভাব প্রকাশক কয়েকটি মূলধন আছে, এইগুলো সংস্কৃত ধাতুর অনুরূপ, তবে সংস্কৃত থেকে গৃহীত নয়, (যেমন সেমিটিক ও আর্যভাষার সাধারণ মূলধাতুগুলো পরস্পরের কাছ থেকে নেয়া হয়নি), সম্ভবত কোনো সাধারণ উৎস থেকে এসেছে।[২৪]

তৃতীয়ত, অতি প্রাচীন যুগে সংস্কৃত ভাষা সাঁওতালী ভাষা বা তার কোনো সমগোত্রীয় ভাষার সংস্পর্শে এসেছিলো। সংস্কৃত ভাষা তার প্রাচীন স্বল্পসংখ্যক বর্ণমালার[২৫] ঘাটতি পূরণের জন্য সম্ভবত বহু সাঁওতালী ধ্বনি গ্রহণ করেছিলো; এবং নিশ্চিতরূপে কিছু সাঁওতালী শব্দ গ্রহণ করেছিলো, যে শব্দগুলো প্রাচীন প্রাকৃত ও বর্তমান সাঁওতালী ভাষায় অপরিবর্তিত আকারে দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যে সম্পর্ক, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাকৃত ভাষারও প্রায় সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলা ভাষা সাঁওতালী ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করেছে; এবং সাঁওতালী ভাষা অতি প্রাচীন আর্য উপভাষা থেকে বহু শব্দ নিয়েছে।

চতুর্থত, সংস্কৃত ভাষা গবেষণার ফলে রূপান্তর শ্রেণীর ভাষার ওপর যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, সাঁওতালী ও ভারতের অন্যান্য উপজাতীয় ভাষা গবেষণা করা হলে সমন্বয় শ্রেণীর ভাষার ওপর সম্ভবত ঠিক সেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে; এবং এইরূপ গবেষণার জন্য একটি সঙ্গত পদ্ধতি রয়েছে। বাংলাদেশ ও তার আশ্রিত রাজ্যগুলোতে মানবজাতির সকল প্রকার ভাষার নমুনা রয়েছে; গবেষণার জন্য এটি এক অপূর্ব সুযোগ; এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিক এই সুযোগের ভিত্তিতে ভাষার এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করতে পারেন।

পঞ্চমত, সংস্কৃত ভাষা থেকে যেমন হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম এলাকাকে ভারতীয় আর্যদের যাত্রা শুরু করার স্থান বলে জানা যায়; সাঁওতালী ভাষা থেকে তেমনি উত্তর-পূর্ব এলাকাকে ভারতীয় উপজাতিদের আদি বাসস্থান বলে আভাস পাওয়া যায়। সাঁওতাল কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, আর্যদের স্থান ত্যাগের আগে সাঁওতালরা পূর্ব বাংলার মধ্যদিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায়, তারপর বিতাড়িত হয়ে নিম্ন উপত্যকার উচ্চভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে।

সাঁওতালদের ধর্ম

সর্বশক্তিমান দয়াময় আল্লাহ্ সম্পর্কে সাঁওতালদের কোনো ধারণা নেই। তাদের ধর্ম হচ্ছে সন্ত্রাস ও প্রার্থনার মারফত ক্রোধ প্রতিরোধের ধর্ম। একটি অধিক শক্তিশালী জাতির দ্বারা দেশ-দেশান্তরে বিতাড়িত হওয়ায় তারা বুঝতে পারে না যে, তাদের ক্ষতি করবে

---

২৪. মুলার প্রণীত 'সার্ভে অব দি থ্রি ফ্যামিলিজ অব ল্যাংগোয়েজেস' ২৭ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংস্করণ। জোনাস্তসন প্রণীত 'মাসকিল লে-সোকার' ১২—৪১ পৃষ্ঠা জেসেনিয়াস; ইউয়ান্ড।

২৫. শ্লিচারের মতে সংস্কৃত বর্ণমালায় প্রথমে মাত্র পনরটি ব্যঞ্জনবর্ণ ছিলো, পরে আদিবাসী ভাষা থেকে উনিশটি সংগ্রহ করা হয়।

না অথচ তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এমন একটি সত্তা কেমন করে থাকতে পারে। দেবতার গুণাবলী সম্পর্কিত আলোচনায় সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন শাখার লোকদের মনে কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি করতে পারে না; তবে তাদের মধ্যে অনেকে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। জনৈক মিশনারি আল্লার সর্বশক্তিমত্তা সম্পর্কে দীর্ঘ সুললিত বক্তৃতা করার পর একজন সাঁওতাল তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'সর্বশক্তিমান যদি আমাকে খেয়ে ফেলে?'

সাঁওতাল জাতি অনুগ্রহ লাভ করতে পারে, এমন কোনো আল্লাহ তাদের নেই বটে; তবে তাদের অসংখ্য দানব ও দুষ্ট ভূত আছে এবং তাদের কুদৃষ্টি এড়াবার জন্য তারা প্রার্থনা করে থাকে। অতএব সাঁওতালদের ধর্ম নেই এমন কথা বলা যায় না; বরং হিন্দুদের চেয়ে তাদের ধর্মীয় আচারের সংখ্যা অনেক বেশি! তাদের মনে কুসংস্কার সদাজাগ্রত থাকে; এবং একটি অদৃশ্য জগৎ অতি নিকটে হাজির আছে বলে বিশ্বাস করায় তাদের আচরণে অধিক বাস্তব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যে আল্লাহ তা'লা ভালো কাজের পুরস্কার দেয়, তার সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না বটে; কিন্তু তারা এমন অসংখ্য দানব-দৈত্যের কথা জানে, যারা দুষ্ট লোকের শাস্তি দিতে, রোগ বিস্তার করতে, গৃহপালিত পশুর মড়ক দিতে এবং ফসল নষ্ট করতে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে! একমাত্র পশুবলি ও রক্তাঞ্জলি দিয়ে তাদের শান্ত করা ছাড়া সাঁওতালদের আর কোনো উপায় নেই।

পারিবারিক ও গ্রামদেবতা

সাঁওতালদের উপাসনা পারিবারিক ভিত্তিতে হয়ে থাকে! প্রত্যেকটি পরিবারের নিজস্ব দেবতা (ওরাবংগা) আছে; নানা আচার-উপাচারে তারা তার পূজা করে এবং অপরিচিত লোকদের কাছে তার পরিচয় গোপন করে রাখে। এই গোপনীয়তা এমন কঠোর যে, এক ভাই কোন্ দেবতার পূজা করছে, তা আর এক ভাই জানতে পারে না; এবং এ সম্পর্কে কেউ বিন্দুমাত্র আভাস পেলে সাঁওতাল পুরুষ ঘোর সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠে, অথবা দ্রুতবেগে ছুটে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যায়। আমি যতোদূর জানতে পেরেছি, সাঁওতালরা এই গৃহদেবতার কাছে অনুগ্রহ কামনার চেয়ে ক্ষতি প্রতিরোধের প্রার্থনাই বেশি করে থাকে। যেমন, 'ঝড় যেনো আমার কুড়েঘর রেহাই দেয়'; 'ফসলের মড়ক যেনো আমার ধানক্ষেত স্পর্শ না করে; 'আমার বউ-এর যেনো মেয়ে না হয়'; 'সুদখোরকে যেনো বাঘে খেয়ে ফেলে।' পরিবারের কর্তা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার বড়ো ছেলের কানে কানে পারিবারিক দেবতার নাম বলে যায় এবং এইভাবে বংশ পরম্পরায় একই দেবতার পূজা চলে আসে। রোমানদের পিনেট পরিবারের দয়াময় রক্ষাকর্তা; কিন্তু সাঁওতালের পারিবারিক দেবতা এমন একটি গোপন কুপ্রভাবের প্রতীক, যার গতি কোনোমতেই রোধ করা যায় না এবং যে কুপ্রভাব প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রত্যেকটি গৃহেই চিরদিন অদৃশ্যভাবে অবস্থান করছে। পারিবারিক দেবতা ছাড়াও প্রত্যেকটি পরিবার পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার পূজা করে থাকে। অমরত্ব বা পরকালের জীবন সম্পর্কে

সাঁওতালদের কোনো ধারণা নেই; ফলে মৃত্যুর পর ইহকালের সঙ্গে মানুষের সকল যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় বলে তারা বিশ্বাস করতে পারে না। তারা মনে করে একটি অশরীরী জগৎ সর্বদা যেন তাদের ঘিরে রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, জীবিতকালে মানুষ যে বাড়িতে বাস করেছে, যে জমিতে আবাদ করেছে বা যে নদীতে মাছ ধরেছে; মৃত্যুর পর তার অশরীরী আত্মা সেই বাড়িতে যাতায়াত করে, সেই জমিতে ঘুরে বেড়ায় ও সেই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। এই অশরীরী প্রেতাত্মাদেরও ক্রোধ আছে এবং তা শান্ত করা প্রয়োজন। সাঁওতাল তাই কেবলমাত্র তার পারিবারিক দেবতাকেই নয়, পূর্বপুরুষদেরও ভীষণ ভয় করে।

সাঁওতাল গ্রামের পাশেই তাদের জাতীয় গাছ[২৬] থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, গ্রামের সমস্ত পারিবারিক দেবতা এই গাছে বাস করে। তাছাড়া পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মারাও এই গাছের ডালে বসে তাদের ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনিদের সংসার ও ঘর-কন্না দেখে; অবশ্য সব সময় যে তারা বিরূপ মনোভাব নিয়ে তাকায়, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তবু গাছের বাসিন্দারা কঠোর সমালোচক এবং তাদের যথাযথভাবে শান্ত না করা হলে তারা হাত-পা অবশ করে দেয়, বাঁকিয়ে দেয় ও কুষ্ঠরোগ দেয়। বছরে কয়েকবার গ্রামের সমস্ত লোক ভালো ভালো পোশাক পরে গাছতলায় সমবেত হয় এবং নাচগান ও বলির মারফত গাছের বাসিন্দাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। নারী-পুরুষ হাত ধরাধরি করে গাছের চারদিকে চক্রাকারে নাচে এবং গ্রামের মূল প্রতিষ্ঠাতার স্মরণে গান গায়; প্রতিষ্ঠাতাকে তারা গ্রামের দেবতাদের মধ্যে প্রধান বলে মনে করে। দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছাগল ও লাল রংয়ের মোরগ জবাই করা হয় এবং কিছু লোক যখন বিরাট অগ্নি-উৎসবের ভোজের জন্য গোশত রান্না করে, অন্যরা তখন নিজ নিজ পরিবারে বিভক্ত হয়ে চলে যায় এবং যে পরিবারের দেবতা যে গাছে থাকে, সেই পরিবার সেই গাছের চারদিকে চক্রাকারে নেচে নেচে গান গায়। বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার পর পর প্রত্যেকটি গাছের চারদিকে নাচে; কারণ ঠিক কোন্ গাছে যে তাদের দেবতা রয়েছে, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে এবং সেই ব্যবস্থার ফলে দেবতার আর কোনোমতেই বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শাল গাছের দেবতা ছাড়াও সাঁওতাল যেখানেই থাক না কেন সেখানেই তার দেবতা, প্রেতাত্মা ও দানব রয়েছে এবং সবগুলোকেই তার খুশি করা প্রয়োজন। যেমন, আবণি বা নরখাদক পিশাচ; পরগণা বঙ্গা বা সংশ্লিষ্ট এলাকার দেবতা (এই দেবতার অসংখ্য নাম আছে) : এই দুই শ্রেণীই পরিত্যক্ত প্রাচীন গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্থায়ীভাবে বাস করার মতো উপযুক্ত গাছ বা গুহা না পাওয়া পর্যন্ত তারা সাঁওতাল এলাকার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। গ্রিকরা যে কুসংস্কারকে একটি সুন্দর রূপ দিয়েছে, সাঁওতালদের মধ্যেও তা রয়েছে। যেমন, দা বঙ্গা (নদীর দানব), দাদ্দি বঙ্গা (কূপের দানব), পাকরি বঙ্গা, (পুকুরের দানব), বুরু বঙ্গা (পাহাড়ের দানব), বীর বঙ্গা (বনদেবতা)। সাঁওতালদের মধ্যে সেবিয়ান আচারের সুস্পষ্ট নিদর্শনও রয়েছে। চান্দো

২৬. শাল গাছ (শোরিয়া রোবাস্টা, বেঙ্গল হর্টিকালচার, ২৪ পৃষ্ঠা)।

বা সূর্যদেবতাকে নীতিগতভাবে সর্বপ্রধান বলে মনে করা হয়; যদিও এই দেবতার জন্য খুব কম সময়ই নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। কখনো কখনো সাঁওতালরা এই দেবতাকে সিম বঙ্গা (মুরগিখাদক দেবতা) হিসেবে পুজো করে এবং চার বা পাঁচ বছর অন্তর তার সম্মানার্থে একবার ভোজ হয়। সাঁওতাল ধর্ম প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক ভিত্তিতে পরিকল্পিত কিংবদন্তী ছাড়া কিছুই নয়; তবে তার মূলে অতি প্রাচীনকালের প্রকৃতি পূজার ভাবধারা রয়েছে।

গোত্র দেবতা

সাঁওতালদের পরিবারভিত্তিক সমাজে গ্রামের পরবর্তী স্তর হচ্ছে গোত্র; এবং এরূপ গোত্র মোট সাতটি[২৭] রয়েছে। প্রত্যেকটি গোত্রের লোকেরা একই মল মাতাপিতার বংশধর বলে দাবি করে এবং নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। বছরে একবার মহাসমারোহে গোত্র দেবতা আবি বঙ্গার পূজা করা হয়; কিন্তু যেহেতু পিতার গোত্রই সন্তানদের অনুসরণ করতে হয়, সেহেতু কেবলমাত্র পুরুষ প্রাণীই বলি দেয়া হয়; এবং উৎসবের শেষে যে বিরাট ভোজ হয় তাতে মেয়েদের যোগ দিতে দেয়া হয় না। সাঁওতালদের প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠান একই ধরনের। অতএব একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিলেই যথেষ্ট হবে। নিচে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হলো : 'হাজার হাজার ছেলে-বুড়ো ও নারী-পুরুষ মহা উল্লাসে অনুষ্ঠানে সমবেত হয়। মেয়েরা ভালো পোশাক ও পিতলের ভারি গয়না পরে খালি মাথায় পুরুষদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচে। পুরুষদের পোশাক আরও বিচিত্র ও জমকালো হয়ে থাকে; রঙধনুর সমস্ত রঙ তারা সংগ্রহ করতে না পারলেও শজারু, ময়ূর ও নানাধরনের পাখির বিচিত্র বর্ণের পালকে অঙ্গসজ্জা করে থাকে, এই সকল পোশাক দৈর্ঘ্যে, বর্ণে ও আকারে-প্রকারে নানা ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো পালকের টুপিও দেখা যায়; মাথার উপরে এইগুলো গাছের মতো পল্লবিত হয়ে থাকে। তবে সমস্ত টুপিই যে উপরের দিকে লম্বা হয়ে থাকে না; কোনোটি বাঁকা হয়ে থাকে এবং কোনোটি একদিকে ঝুলে থাকে। মাথায় ও কোমরে লাল, নীল ও হলুদ কাপড়ের লম্বা ফালি জড়ানো থাকে বলে বর্ণের আরও বিচিত্র সমারোহ সৃষ্টি হয়। কুড়ি অথবা ত্রিশ জন নারী-পুরুষের এক একটি দল হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে অথবা অর্ধ বৃত্তাকারে নাচে এবং ঢোল ও শিঙ্গার বাজনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গায়। উৎসব-প্রাঙ্গণে এইরূপ পঁচিশ-ত্রিশটি দল থাকে; প্রত্যেক দলের বৃত্তের মাঝখানে বাদকরা থাকে; এবং একদিন ও একরাত্রি ব্যাপী এই পরিশ্রম-সাপেক্ষ নাচ-গান চলে। বহু সংখ্যক ঢাকের অবিরাম বাজনা, বহু কণ্ঠের বিচিত্র সুর, বিভিন্ন বর্ণের পোশাক, অর্ধনগ্ন দেহের বন্য উল্লাস,—সবকিছু মিলিয়ে বন্যজীবনের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তা যেমন ভয়াবহ তেমনি চমৎকার।'[২৮]

---

২৭. দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সংখ্যার তারতম্য আছে, উত্তর এলাকায় বারোটি গোত্র এবং দক্ষিণ ও মধ্য এলাকায় সাতটি গোত্র রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

২৮. মি. ফিলিপস।

জাতীয় দেবতা

পরিবারের সঙ্গে গোত্রের যে সম্পর্ক, গোত্রের সঙ্গে জাতির সেই সম্পর্ক। সাঁওতালদের জাতীয় দেবতা হচ্ছে মারাং-বুরু বা মহান পাহাড়। তাদের কিংবদন্তীতে এই দেবতা সাঁওতাল জাতির অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকরূপে বর্ণিত হয়েছে। মারাং-বুরু তাদের জন্মের সময় হাজির থেকেছে, তাদের প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করেছে এবং তাদের প্রথম মাতাপিতাকে বিবাহের মারফত মিলিত করেছে! গোপনে ও প্রকাশে, দুর্দিনে বা সুদিনে, সুস্থতায় বা অসুস্থতায়, প্রসূতির শয্যায় বা মৃত্যুশয্যায় সর্বত্র সকল সময় রক্তাঞ্জলি দিয়ে মারাং-বুরুর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এই দেবতা সাঁওতালদের ধর্মীয় যোগসূত্র ও ঐক্যের প্রতীক। পারিবারিক দেবতার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র কয়েক শ্রেণীর পশুই বলি দেয়া যায়; কিন্তু জাতীয় দেবতার ক্ষেত্রে যা-কিছু মাটিতে জন্মায় বা মাটির ওপর বিচরণ করে, তার সমস্তই উৎসর্গ করা যায়। ছাগল, ভেড়া, বলদ, মুরগি, চাল, ফল, ফুল, যবের মদ, কালো জাম, ধানের শীষ অথবা এমন কি এক মুঠো মাটিও মারাং-বুরুর কাছে গ্রহণযোগ্য। খ্রিস্টান পাঠকরা এই দেবতাকে যে স্তরের বলে মনে করবেন, সাঁওতালদের কাছে তার স্থান তার চেয়ে অনেক উপরে; কারণ মারাং-বুরুকে তারা সমগ্র মানবজাতির সাধারণ পিতা বলে মনে করে। এই দেবতাই উপাসনা প্রবর্তন করেছে, সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের আদি বাসভূমি থেকে চলে এসেছে, জয়-পরাজয় সকল সময় তাদের সঙ্গে থেকেছে এবং এখনো অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়িত্বের প্রতীকরূপে তাদের পাশে পাশে রয়েছে।

মারাং-বুরু পারিবারিক দেবতার সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূপ। প্রথম পরিবার এই দেবতার পূজা করেছে; তারপর প্রথম পরিবারপুঞ্জ বা গ্রাম, তারপর প্রথম গোত্র এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র জাতি এই দেবতার আরাধনা করেছে। মারাং-বুরু তাই পরিবার ভিত্তিতে গঠিত ধর্মের সর্বোচ্চ স্তরের প্রতীক এবং সাঁওতালদের সমস্ত দেবতা ও মানুষের পিতা। আর্যশ্রেণীর ধর্মের মতো সাঁওতাল ধর্মেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লাকে ত্রিগুণাত্মায় বিভক্ত করার প্রবণতা আছে : একটি গুণ বস্তুনিরপেক্ষ ধারণা এবং অপর দুটি পুরুষত্ব ও নারীত্বের প্রতীক। মারাং-বুরু পুরুষেরও প্রতীক নয়, নারীরও প্রতীক নয়, তবে তাদের অস্তিত্বের প্রাণশক্তি তার কাছে থেকেই আসে। এই দেবতার একটি ভাই ও একটি বোন আছে; পুরোহিতরা দামুদা নদীর তীরে মদ, সাদা ছাগল ও একটি বিশেষ রঙের মুরগি উৎসর্গ করে তাদের পূজা করে থাকে। এই ভাই-বোনের মর্যাদা মারাং-বুরুর চেয়ে কম এবং জঙ্গল এলাকায় তারা প্রায় অপরিচিত। ভাইটির নাম মানিকো; সংস্কৃত জাতির সঙ্গে মনুর যে সম্পর্ক, সাঁওতাল জাতির সঙ্গে মানিকোরও সেই সম্পর্ক; এবং মনুর মতো মানিকোও প্রথম পুরুষ। সাঁওতালদের ত্রিগুণাত্মার নারী আত্মা হচ্ছে জাহের-এর; মানিকো তার ভাইও বটে, আবার স্বামীও বটে। সাঁওতালী ভাষায় বিয়ে না করে উপপত্নী গ্রহণ করা, বা উপপত্নীর সঙ্গে বাস করাকে 'জাহের-ইতে' বলে। এই শব্দটি তারা তাদের প্রথম মাতাপিতা মানিকো ও জাহের-এরার অনিয়মিত সম্পর্ক থেকে পেয়েছে; কারণ, তাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিবাহের দ্বারা পবিত্রকরণ করা হয়নি।

মারাং-বুরুর পূজা মূলত রক্তপূজা। কারণ, পূজারি যদি পশু বলি দিতে না পারে, তাহলে তাকে একটি লাল ফুল বা লাল ফল দিতে হয়। ব্রিটিশ সরকার যখন প্রথম বীরভূমের পাহাড়ি এলাকার দখল পান, তখন নরবলি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো এবং এই উদ্দেশ্যে মানুষ সরবরাহের জন্য নিয়মিত ব্যবসা চলতো। এখনো নরবলি হয় কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না; কারণ, হলেও তা এমন দুর্ভেদ্য গভীর জঙ্গলের মধ্যে হয় যে, বাইরে কারো পক্ষে তা কোনোমতেই জানার উপায় থাকে না। হিন্দু রাজাদের আমলে সাঁওতালরা ঠিক এই রকম কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে নরবলি দিতো। নরবলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেও তাদের কাছ থেকে কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় না। তারা ঘুরিয়ে বলে : 'নরবলি দেব কেমন করে? আজকাল মানুষের দাম খুব বেশি; এতো টাকা আর কে দিতে পারে?'

জাতীয় দেবতা ও শিব

সাঁওতালদের এই রক্তপিপাসু দেবতা মারাং-বুরুই যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বর্ণিত রুদ্রদেব এবং বর্তমানে সমতলভূমির[২৯] বাসিন্দা মিশ্র হিন্দুদের শিব, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দুই দেবতার পূজার মধ্যে এতো বেশি সাদৃশ্য রয়েছে, সাধারণ পর্যটকের চোখেও তা একই পূজা বলে প্রতীয়মান হয়; এবং একজন মিশনারি দীর্ঘদিন সাঁওতালদের মধ্যে অবস্থান করার পরও তাঁর রিপোর্টে মারাং-বুরুকে বার বার শিব বা মহাদেব বলে অভিহিত করেছেন। এই অধ্যায় রচনার সময় অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে এই মিশনারির রিপোর্ট থেকেও আমি বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছি। বেদে এরূপ ইঙ্গিত আছে যে, আদিবাসীদের এই দেবতা আর্য দেবসমাজে প্রবেশলাভের চেষ্টা করেছিলেন; এবং পণ্ডিতগণ এই ইঙ্গিতকে মোটামুটিভাবে সুস্পষ্ট বলেই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, প্রকৃতপক্ষে এরূপ একটি আবছা কিংবদন্তীও রয়েছে যে, আদিবাসী দেবতা একসময় সত্য সত্যই আর্য দেবসমাজে প্রবেশলাভ করেছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আছে : 'দেবগণ স্বর্গে গমন করলেন এবং তাঁরা রুদ্রকে (শিব) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?'[৩০] আগন্তুক জবাব দিলেন যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা; কারণ, সত্যই তিনি আদিবাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন। রোমানরা যেমন গ্রিকদের দেবতাদের সঙ্গে তাদের এট্রাস্কান দেবতাদের একত্রিত করে ফেলেছে, রুদ্রও (শিব) তেমনি আর্য দেবতাদের সমাজে মিশে গিয়েছেন। তবে আর্য সমাজে তিনি নবাগত হিসেবে আসেননি, এসেছেন প্রাচীনতন ইন্দো-জার্মানিক দেবতাদের মধ্যে অন্যতম দেবতা অগ্নির অপর একটি রূপ হিসেবে। এই সমাজভুক্তি অবশ্য একদিনে হয়নি। কারণ, দেশের এক এলাকার আর্য পুরোহিতগণ যখন মন্ত্রপাঠ করেছেন, 'রুদ্র, তোমায় প্রণাম, তুমি অগ্নিতে আছো, জলে আছো, তরুলতা ও বৃক্ষে আছো এবং তুমিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠন করেছো;'[৩১] ঠিক সেই সময় অন্য এলাকার (যেখানে সমাজভুক্তি

---

২৯. অরিজিনাল স্যানসক্রিট টেক্সটস, দ্বিতীয় খণ্ড ৪৩৭ পৃষ্ঠা।
৩০. অরজিনাল স্যানসক্রিট টেক্সটস, চতুর্থ খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা।
৩১. অথর্ব বেদ, ৭ : ৮৭, ১।

তখনো সম্পন্ন হয়নি) আর্য পুরোহিতরা রুদ্র ও অগ্নিকে পৃথক পৃথক দেবতা[৩২] হিসেবে পূজা করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মবিদগণ এই পার্থক্য নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করেছেন; এবং তাঁরা যথার্থই বলেছেন যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন নামে অভিহিত কিন্তু এই দেবতা এবং মূলে সংস্কৃত দেবতা অগ্নি এক ও অভিন্ন। এক প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে আছে : 'অগ্নি একজন দেবতা; তাঁর নাম সর্ব, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা তাঁকে এই নামে ডাকে; ভব, বাহ্লিকাবাসীরা তাঁকে এই নামে ডাকে; পশুনমপতি (পশুদের কর্তা), রুদ্র ও অগ্নি। অগ্নি ছাড়া আর সকল নামই অশোভন।' অশোভন শব্দ দ্বারা সম্ভবত বুঝানো হয়েছে যে, এই নামগুলোতে দেবতাকে তার রক্তপিপাসুরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। আদিম উপজাতিরা এইরূপেই তার পূজা করে থাকে। শাস্ত্রে আরো আছে : 'অগ্নিই সবচেয়ে শোভন নাম।'[৩৩] এখানে শোভন শব্দ দ্বারা সম্ভবত বুঝানো হয়েছে যে, এই নামে দেবতার কৃপাময় রূপ প্রকাশ পায়; এবং আর্যগণ এইরূপেই এই দেবতার পূজা করে থাকে।

আদিম উপজাতিদের উৎপত্তি সম্পর্কে সিনর গোরেশিও যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে আমি একমত না হলেও উপজাতীয় দেবতার আর্য দেবসমাজে প্রবেশলাভের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি বলেছেন : 'আমার মনে হয়, এই ঘটনার (দক্ষযজ্ঞ) মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মের পারস্পরিক সংঘর্ষের বিষয়টি রহস্যময় আবরণে আবৃত রয়েছে। শিবকে আমি কুশ বা হ্যামেটিক জাতির দেবতা বলে মনে করি; আর্যদের আগে ভারতে এই জাতির বসতি ছিলো। বিজয়ী জাতির (আর্য) আরাধনা ও উৎসর্গ থেকে শিবকে বাদ দেয়া হয়েছিলো; ফলে তিনি অপমান বোধ করেন এবং পূজা লাভের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত আর্যদের আরাধনার বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং উৎসর্গ অনুষ্ঠানে ভীতি প্রদর্শন করে তিনি পূজা লাভ করতে সক্ষম হন।[৩৪] আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'শিব ধর্মীয় সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ইন্দো-সংস্কৃত দেবসমাজে প্রবেশলাভ করেছেন। প্রাচীন ধর্মগুলোতেও এই জাতীয় সংঘর্ষ প্রায়ই দেখা যায়।'

আদিম শিবমন্দির

বর্তমান যুগে শিবের প্রিয় আশ্রয়স্থল পাহাড়ে অবস্থিত; এবং সাঁওতালদের প্রধান দেবতাদের নাম মহান পাহাড় (মারাং-বুরু)। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রতি বছর হাজার হাজার হিন্দু বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ে অবস্থিত শিবমন্দিরে গমন করে থাকে। শিব ও সাঁওতালদের প্রধান দেবতা যে এক ও অভিন্ন, তার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এই মন্দিরটি একজন সাঁওতাল নির্মাণ করেছিলো; এবং এখনো তা সেই সাঁওতালের নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। যে পাহাড়ে এই মন্দির অবস্থিত, আদিম উপজাতিরা তার

---

৩২. অথর্ব বেদ, ৮ : ৫—১০, স্যানসক্রিট টেক্সটস, চতুর্থ খণ্ড।
৩৩. শতপথ ব্রাহ্মণম, ১ : ৭, ৩, ৮। স্যানসক্রিট টেক্সটস, চতুর্থ খণ্ড।
৩৪. রিমার্কস অন রামায়ণ, নবম অধ্যায়, ২৯১ পৃষ্ঠা; টীকা ৩৫। স্যানসক্রিট টেক্সটস, ৪ : ৩৪৯।

প্রতি যুগ যুগ ধরে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে; এবং বর্তমানে ব্রাহ্মণরা এই মন্দির থেকে তাদের সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করলেও এবং মন্দিরের একটি হিন্দু নাম দিলেও একটি প্রশ্ন সম্ভবত উহ্য থেকে যায় যে, এই পাহাড়ই সাঁওতাল জাতির 'কুনাবুলা' কিনা। মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ সাঁওতালদের জাতীয় দেবতার সঙ্গে শিবের কোনোরকম সম্পর্কের কথা আজও জোরের সঙ্গে অস্বীকার করে থাকেন এবং মন্দিরের সাঁওতালী নাম সম্পর্কে একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন; যদিও মন্দিরের চারপাশে এখনো বহু সাঁওতাল পরিবারের বসতি রয়েছে।

শিবমন্দিরের কিংবদন্তী

তাঁরা বলেন, উচ্চভূমির যে সুদৃশ্য হ্রদের পাশে পবিত্র নগরী অবস্থিত প্রাচীনকালে একদল ব্রাহ্মণ তারই তীরে বসতি স্থাপন করে। তাদের চারদিকে ছিলো শুধু পাহাড় আর জঙ্গল; এবং তার মধ্যে বাস করতো কৃষ্ণকায় জাতি। ব্রাহ্মণরা হ্রদের কাছে তাদের দেবতা শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাকে পূজা করতে থাকে। কৃষ্ণকায় জাতির লোকেরা এই দেবতার পূজা করতে চাইতো না; তারা তাদের পিতৃ-পিতামহের মতো তিন খণ্ড পাথরের[৩৫] পূজা করতো। পবিত্র নগরীর পশ্চিম প্রবেশপথে এখনো এই পাথরগুলো দেখা যায়। ব্রাহ্মণরা চাষ-আবাদ শুরু করে এবং হ্রদ থেকে পানি এনে জমি সরস করে। কিন্তু পাহাড়িরা আগের মতই শিকার করে, মাছ ধরে বা পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে; তাদের মেয়েরা অবশ্য তখন ছোটোখাটো দুই-এক খণ্ড জমিতে আবাদ করতো। জমি খুব উর্বর হওয়ায় ব্রাহ্মণরা কালক্রমে সমৃদ্ধ ও অলস হয়ে পড়ে এবং এমন কি শিবমন্দিরে যাওয়াও প্রায় বন্ধ করে দেয়। পাহাড়িরা পাথরের পূজা করতে এসে এই অবস্থা দেখে বিস্মিত হতো। তারপর একদিন বিজু নামে একজন পাহাড়ি ব্রাহ্মণদের উদাসীন আচরণ লক্ষ্য করে এমন ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লো যে, সে শপথ করে বসলো যে, প্রতিদিন তাদের দেবতা শিবের মূর্তিকে লাঠিপেটা না করে সে খাদ্য স্পর্শ করবে না। বিজু কেবলমাত্র বাহুবলেই নয়, পশুসম্পদেও বলীয়ান ছিলো। সে তার শপথ অনুসারে কাজ করে যেতে লাগলো। কিন্তু একদিন সকালে তার পশুগুলো জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ায় সারাদিনব্যাপী খোঁজাখুজি করে সে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খুবই কাতর হয়ে পড়লো। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে হ্রদে গোসল করে সে তাড়াতাড়ি খেতে বসলো। কিন্তু খাওয়ার জন্য হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেলো। ফলে সে না খেয়ে উঠে পড়লো এবং ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে অতিকষ্টে হ্রদের ধারে গিয়ে

---

৩৫. 'বিরাটকায় তিন খণ্ড সুদৃশ্য স্বচ্ছ পাথর। দুইখানি পাথর দাঁড়া করানো এবং তৃতীয়খানি তাদের মাথার উপর আড়াআড়িভাবে বসানো। প্রত্যেকখানি পাথর বারো ফুট লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া ও চারটি পাশ বিশিষ্ট; ফলে বেড় দশ ফুট; এবং ওজনে সাত টনেরও বেশি। আড়াআড়িভাবে স্থাপিত পাথরখানির দুই প্রান্তে ছিদ্র আছে এবং সেই ছিদ্রপথে দাঁড় করানো পাথর দুইখানির মাথা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। কে বা কখন যে এই পাথরগুলো এমন বিস্ময়করভাবে সাজিয়ে রেখেছে, তা কেউ বলতে পারে না।'—ক্যাপটেন ডব্লু.. এস. শেরউইলের রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্ট, ৬ পৃষ্ঠা, কলিকাতা।

ব্রাহ্মণদের মূর্তিকে লাঠিপেটা করলো। এমন সময় সহসা আলো-ঝলমল্ রত্ন-মাণিক্যে ভূষিত ছিপছিপে গড়নের এক দেবমূর্তি হ্রদের পানি থেকে উপরে উঠে বললো : 'দেখ, আমাকে মারধর করার জন্য একজন মানুষ তার ক্ষুধা ও ক্লান্তি ভুলে গিয়েছে, আর ঠিক সেই সময় আমার পুরোহিতরা আমাকে খাদ্য-পানীয় দেয়ার কথা ভুলে গিয়ে বাড়িতে বিছানায় শুয়ে উপপত্নীদের সঙ্গে মউজ করছে। যে লোকটি আমাকে মারতে এসেছে, সে যা চায়, আমার কাছে প্রার্থনা করুক; আমি তা মঞ্জুর করবো।' বিজু বললো : 'আমি বাহুবলে বলীয়ান, পশুসম্পদে সম্পদশালী। আমি আমার লোকদের নেতা; আমার আর কিসের প্রয়োজন থাকতে পারে? তোমার নাম নাথ (প্রভু), আমাকেও তুমি নাথ নামে পরিচিত করো; আর আমার নাম অনুসারে তোমার মন্দিরের নামকরণ করো।' দেবমূর্তি জবাব দিলো : 'তথাস্তু, আজ থেকে তুমি আর বিজু নও, তোমার নাম বিজনাথ; আর আমার মন্দির এই নামেই পরিচিত হবে।'

সাঁওতালদের মহান পাহাড়ের সঙ্গে মিশ্র হিন্দুদের শিবের সাদৃশ্য এতো বেশি যে, স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু বিষয়টি সম্পর্কে কোনোরকম পড়াশুনা না করে কেবলমাত্র পূজার আচার ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচার করেই তাদের দেবতার সাঁওতালী নামের অর্থ 'হিন্দুদের মহাদেব' (অর্থাৎ শিব) বলে উল্লেখ করেছে।

ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, বর্তমান মিশ্র হিন্দুদের ধর্মে আদিম উপজাতীয় ধর্মের প্রভাবের নিদর্শন রয়েছে; এবং এইমাত্র আমি বীরভূমের পাহাড়িদের মধ্যে প্রচলিত আদিম উপজাতীয় ধর্ম পর্যালোচনা করেছি। অতএব এখন সম্ভবত নিরাপদে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, আদিম উপজাতিদের কাছ থেকে হিন্দুরা তাদের গৃহদেবতা[৩৬] ও তার গোপন আচার; গ্রামদেবতা[৩৭] ও তার সহচর ভূত-দানব; এবং রক্তপিপাসু দেবতা শিবকে পেয়েছে। পল্লী অঞ্চলের বহু গাছে ভূত-দানব বাস করে বলে এখনো বিশ্বাস করা হয়; এবং বাংলাদেশের সর্বত্র নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে শিবের পূজা এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত। হিন্দুদের মধ্যে এই সকল নানাপ্রকার কুসংস্কার বিচ্ছিন্ন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও পারস্পরিক সংযোগবিহীন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাঁওতালদের মধ্যে এগুলো ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার অতি স্বাভাবিক ও অবশ্যসম্ভাবী স্তর রূপে চালু রয়েছে। সাঁওতালদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা পিতৃপ্রধান যুগের রাজনৈতিক ইউনিট পরিবারের ভিত্তিতে গড়ে উঠায় এই স্বাভাবিকতা অতিশয় সুস্পষ্ট আকারে ধরা পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম ও অনার্য আচার

শিবপূজার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের একটি রহস্যময় যোগসূত্র আছে। সংস্কৃত ধর্মের একেশ্বরবাদী ভাবধারা যে কিভাবে মূর্তিবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদের প্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো, সে সম্পর্কে অধ্যাপক মুলার তাঁর পুস্তকে বিস্তারিতভাবে

৩৬. শালগ্রাম।
৩৭. গ্রামের অধীশ্বর দেবতা।

আলোচনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সংস্কার-প্রচেষ্টার ভাগ্যে কি ঘটেছিলো; কেমনভাবে তা কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণ্যবাদের কেন্দ্রগুলোতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো; এবং কেমনভাবে তা উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ পথে বিতাড়িত হয়ে ভারতের আদিম জাতিদের মধ্যে নতুন আলোক ছড়াতে ছড়াতে শেষপর্যন্ত সমগ্র এশিয়ায় সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছিলো তা আজ রীতিমতো গবেষণাসাপেক্ষ ব্যাপার। সংস্কৃত রাজ্য অযোধ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধধর্ম নিম্ন প্রদেশগুলোর পাহাড় ও উপত্যকা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার আধা-উপজাতীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করে। ফলে মূল বাংলার উত্তর সীমান্তের বাইরের সারনাথ[৩৮] থেকে শুরু করে সর্বদক্ষিণে মহাসাগরের তীরে অবস্থিত জগন্নাথ পর্যন্ত বিরাট এলাকার প্রত্যেকটি জেলায় বৌদ্ধমন্দির বা পবিত্র শহর স্থাপিত হয়। বৌদ্ধধর্ম বিচ্ছিন্ন উপজাতিগুলোকে একটি ধর্মভিত্তিক রাজবংশের[৩৯] অধীনে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিপুঞ্জে পরিণত করে। যে রাজ্য থেকে সংস্কার প্রচেষ্টা বিতাড়িত হয়েছিলো, এই রাজবংশ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই রাজ্যের মহত্ত্বের যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, সময়ের বিবর্তনে বা গঙ্গা নদীর গতি পরিবর্তনে তা বিনষ্ট হওয়ার নয়।

নিম্নবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যেকটি জেলায় বৌদ্ধধর্মের অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়; এবং যে সকল এলাকায় এই নিদর্শনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, সেই সকল এলাকায় এখন শিবপূজা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। তাছাড়া আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নিম্ন বাংলায় যে সকল বুদ্ধমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে অনেক মূর্তির নাক চ্যাপটা বা অনিয়মিত এবং ঠোঁট দুটি পুরু। সংস্কৃত ভাষী জাতিগুলোর মধ্যে এই ধরনের নাক বা ঠোঁটের সন্ধান পাওয়া যায় না; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আদিম উপজাতিদের দেহের যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে এই মূর্তিগুলোর আকৃতি ঠিক ঠিক মিলে যায়। তাছাড়া বর্তমান বীরভূম জেলায় সাঁওতালদেরও নাক চ্যাপ্টা এবং ঠোঁট পুরু; কিন্তু একটু দূরের সমতলভূমির ব্রাহ্মণদের দেহে এই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে না; বর্তমানে এই মূর্তিগুলো মাটির তলায় প্রোথিত বা অর্ধ-প্রোথিত অবস্থায় রয়েছে। যে সকল শিল্পী এই মূর্তি খোদাই করেছিলো, তারা নিজেরাও উপজাতীয় সমাজেই সমাদৃত হতে পারতো। তারপর আর্যদের পরবর্তী দল যখন নিম্ন বাংলায় আগমন করে, তখন তারা উপজাতীয়দের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গড়া মূর্তিগুলোর প্রতিও অসীম ঘৃণা প্রকাশ করে; কারণ, নাক চ্যাপ্টা ও ঠোঁট মোটা এই মূর্তিগুলো প্রকৃতপক্ষে আদিম উপজাতিদেরই নিখুঁত প্রতিমূর্তি ছিলো।

প্রাচীন সারনাথের কিংবদন্তীতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষের বিবরণ আছে; সারনাথের মন্দিরটি সর্বপ্রথম আদিম উপজাতিদের দেবতা শিবের মন্দির ছিলো; পরে নিম্ন বাংলার রাজা এটিকে বৌদ্ধমন্দিরে রূপান্তরিত করেন; এবং আরো পরে কনৌজের ব্রাহ্মণগণ মন্দিরটি পুনরায় দখল করে হিন্দুমন্দিরে পরিণত করে। এই বিখ্যাত মন্দিরটি

---

৩৮. বর্তমানকালের বেনারসের নিকটে।

৩৯. গজন্তের উত্তরাধিকারী পাল রাজাগণ।

একসময় ভস্মীভূতও হয়ে গিয়েছিলো। এই মন্দিরের ইতিহাস এবং এমন কি নাম সম্পর্কেও দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই; তাঁরা উত্তরাঞ্চলের এই বৌদ্ধ কেন্দ্রটির[৪০] নামের মধ্যেও সবিস্ময়ে শিবপূজার গন্ধ খুঁজে পান। বীরভূমের পাহাড়ে যেখানে শিবপূজা করা হয়, সেই পবিত্র নগরীর পাশেই আমরা বৌদ্ধধর্মের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পাই। দক্ষিণ ভারতেও বৌদ্ধধর্ম ও শিবপূজার মধ্যে এই একই ধরনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।[৪১] সর্বত্রই বৌদ্ধধর্মকে পরাভূত করা হয়েছে এবং তারপরই আদিবাসীদের রক্তপিপাসু দেবতা শিবের পূজা শুরু হয়ে গেছে।

বৌদ্ধধর্ম : শিবপূজা : হিন্দুধর্ম

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শিবপূজার দার্শনিক যোগসূত্রের অনুসন্ধান আমার বর্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষুদ্র আওতার মধ্যে পড়ে না। তবে যে সকল পদ্ধতিতে প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন এসেছে, মূল বাংলার স্থানীয় ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গেলে, তার নিদর্শনগুলো লক্ষ্য না করে পারা যায় না। উত্তরাঞ্চলের নির্যাতন থেকে পালিয়ে এসে বৌদ্ধগণ নিম্ন উপত্যকায় রাজা হয়েছে এবং আদিম উপজাতিদের মধ্যে কোনোটিকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছে, আবার কোনোটিকে বা অস্ত্রবলে জয় করেছে। নিম্ন বাংলায় বৌদ্ধরা অতি সহজে যে এমন বিপুল জয়লাভ করতে পেরেছিলো, তার কারণ হচ্ছে এই যে, আর্যরা এতোদিন যাবৎ সেখানকার আদিম উপজাতিদের ক্রীতদাসে পরিণত করে রেখেছিলো; এবং তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন পুরোপুরিভাবে চালু রেখেছিলো; কিন্তু বৌদ্ধরা এই নির্যাতিত মানবতার জন্য যেনো মুক্তিদূতরূপে আভির্ভূত হলো। পূর্ববর্তী আর্য বিজয়ীদের ধর্ম ছিলো অস্তিবাচক; তাতে সামাজিক অসাম্যে উৎসাহ দেয়া হতো এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করা হতো। কিন্তু বৌদ্ধরা যে ধর্ম নিয়ে এলো, তা হচ্ছে নেতিবাচক; এই ধর্ম সকল মানুষ সমান বলে ঘোষণা করলো এবং কারো দৈনন্দিন বাস্তব জীবনধারায় হস্তক্ষেপ করলো না; বাস্তবজীবন থেকে ধর্ম বেশ খানিকটা দূরে সরে রইলো। ফলে নিম্ন বাংলার আধা-উপজাতীয় লোকদের কাছে বৌদ্ধধর্ম ছিলো একটি বিরাট লাভ ও আশীর্বাদস্বরূপ; তাই তারা তাড়াতাড়ি এই নতুন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলো। কিন্তু রাজবংশের ধর্ম হলেও নেতিবাচক ধর্ম কখনো জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হতে পারে না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই নিম্ন বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াশীলতা নষ্ট হয়ে গেলো; এবং এই ধর্মের এক্তিয়ার কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির এবং বীরভূমের পবিত্র নগরীর মতো পাহাড়ি এলাকার কয়েকটি নির্জন গ্রামে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো। একটি বৌদ্ধ বংশকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সমাজের বাইরের আবরণে একেশ্বরবাদের একটি পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েই তৎকালীন বৌদ্ধনেতারা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। সাধারণ মানুষও খুশি হয়েছিলো,

---

৪০. জনৈক হিন্দু পুরাতত্ত্ববিদের লেখা সারনাথের একটি সাম্প্রতিক বিবরণ কলিকাতার 'ইংলিশম্যান'স উইকলি জার্নালে' প্রকাশিত হয়েছে; চতুর্থ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।

৪১. দাক্ষিণাত্যের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে মেজর সাইকের রিপোর্ট।

কারণ ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের প্রায় কিছুই করণীয় ছিলো না। কিন্তু কিছু না করতে পারারও একটি মস্ত অসুবিধে আছে। তাই সাধারণ মানুষ আবার ধীরে ধীরে তাদের পূর্বপুরুষদের পূজা শুরু করে দিলো। আর্যরা ইতিপূর্বে একসময় এই পূজা বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছিলো। যে জাতি সূক্ষ্ম ধর্মচিন্তার জন্য প্রস্তুত হয়নি, তার ওপর উচ্চ পর্যায়ের ধর্মীয় ভাবধারা চাপিয়ে দিলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, নিম্ন বাংলায়ও সেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। জনসাধারণ কুসংস্কারে আকণ্ঠ ডুবে ছিলো, কিন্তু বাইরে তারা পরিচ্ছন্ন একেশ্বরবাদের একটি প্রবঞ্চনাময় মুখোশ পরে বেড়াতো। এই অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম জনজীবন থেকে সরে গিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদ তার জায়গা দখল করে নিলো এবং শেষপর্যন্ত বৌদ্ধধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে দিলো। ব্রাহ্মণ্যবাদের দুটি দিক আছে : একটি আধ্যাত্মবাদ, যেমন রক্তপাতহীন স্বাত্বিক বিষ্ণুপূজা; এবং অপরটি মূর্তিবাদ, যেমন পশুবলি সহকারে শিবপূজা। ব্রাহ্মণ্যবাদ ঠেলায় পড়ে শিখেছিলো। ব্রাহ্মণ নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, গণবিমুখ হয়ে কোনো দেশেই কোনো বংশ বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না, এমন কি বাংলাদেশেও না। তাই পুনরায় রক্তপাতহীন পূজা ও ফলমূল দুধ প্রভৃতি উপাচার সংবলিত আচার প্রচলন না করে, তারা তাদের ধর্মের জনপ্রিয় বিষয়গুলো চালু করতে লাগলেন এবং রক্তপাতের সঙ্গে শিবপূজা শুরু করে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে নিম্ন বাংলার আধা-উপজাতীয় লোকদের জন্য এটিই ছিলো সবচেয়ে উপযুক্ত ধর্ম। সীমাহীন কুসংস্কার সবসময়ই ছিলো এবং এখনো সর্বত্র রয়েছে। কয়েকটি এলাকায় বৌদ্ধধর্ম একেশ্বরবাদের যে প্রলেপ দিতে সক্ষম হয়েছিলো, কুসংস্কারের প্রবাহ নবতর বলে বলীয়ান হয়ে তা খণ্ড-বিখণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো। আধুনিক হিন্দুধর্মের শুরু এই সময় থেকেই; তার কুপ্রভাব মানুষের বিকৃত মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে শুরু করে উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। একমাত্র নিম্ন বাংলাতেই এই ধর্মের নিকৃষ্ট দিকটি একটি একক আকারে জাতীয় ধর্মের রূপ নিয়েছে; কারণ এই এলাকাতেই ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছাকৃতভাবে আধ্যাত্মিক দিকটি বাদ দিয়ে ধর্মের অর্ধ-বর্বর কুসংস্কারসম্পূর্ণ রূপটি চালু করেছে, এই ব্যবস্থার ফলেই হিন্দুধর্ম স্থানীয় আধা-উপজাতীয়দের প্রকৃতিতে মিশে যেতে পেরেছে! নিম্ন উপত্যকার হিন্দু যেখানেই থাক না কেন, সর্বত্র সে তার স্থূল বস্তুবাদ ও রক্তপাতসংবলিত ধর্মীয় আচারের জন্য পরিচিত। স্থানীয় পণ্ডিতদের মধ্যে যারা কারণ অনুসন্ধান না করে কেবলমাত্র ঘটনা বিশ্লেষণ করে থাকেন, তারা একটি বিষয় লক্ষ্য করে বিস্ময়বোধ করেন যে, এক হাজার বছর আগে যেখানে একেশ্বরবাদ প্রচলিত ছিলো, সেই নিম্ন প্রদেশগুলো এখন মূর্তিপূজার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ উপত্যাকার বাসিন্দা জনৈক বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ বলেন : 'দীর্ঘদিন যাবৎ বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত বাংলাদেশ কিছুটা প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়েই ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করেছে। বাঙালি যেখানেই থাক না কেন মূর্তিপূজা সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আলেকজান্ডার তার বিজয়ের অভিযান চিহ্নিত করার জন্য অভিযান পথে শহর রেখে গিয়েছিলেন; কিন্তু বাঙালি তার বিদেশ ভ্রমণের প্রমাণস্বরূপ মূর্তি রেখে যায়। ইংরেজরা সুযোগ পেলেই স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন করে, আর বাঙালিদের নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করতে ও রেলপথ

বসাতে শেখায়; আর বাঙালিরা সাঁওতালদের চড়কগাছ[৪২] ঘুরাতে এবং উত্তরাঞ্চলের হিন্দুদের মূর্তি গড়তে শেখায়। যে বাঙালিটি কানপুরে দুর্গামূর্তি (আদিবাসীদের দেবতা শিবের স্ত্রী দুর্গা) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি নাকি কলকাতা থেকে কারিগর আনিয়েছিলেন, কারণ উত্তরাঞ্চলের লোকেরা তখন সিংহারূঢ় দশভুজার মূর্তি গড়তে জানতো না।'[৪৩]

সাঁওতাল পুরোহিত

সাঁওতালদের মধ্যে বর্ণভেদ নেই। প্রথম মাতাপিতার সাত সন্তানের প্রত্যেকেই একটি করে গোত্র প্রতিষ্ঠা করেন; এবং যে সকল এলাকার সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দু-প্রভাব নেই, সেখানে গোত্রের এই সংখ্যা এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। প্রথম পুত্রের বংশধরগণ নিজ-কাসদা-হাদ নামে পরিচিত; অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরগণ নিজ-মুরমু-হাদ; তৃতীয় পুত্রের বংশধরগণ নিজ-সরণ-হাদ; চতুর্থ পুত্রের বংশধরগণ নিজ-হাসদি-হাদ; পঞ্চম পুত্রের বংশধরগণ নিজ-মারুদি-হাদ (এই বংশকে প্রথম মাতাপিতা মারাং-বুরুর পূজায় পৌরোহিত্য করার জন্য নিয়োগ করেন); ষষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ নিজ-কেড-হাদ; এবং সপ্তম পুত্রের বংশধরগণ নিজ-তাদু-দাহ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ইংরেজি ম্যাক বা ফিজ-এর মতে 'নিজ' শব্দটির অর্থ সম্ভবত 'অমুকের পুত্র'; ফলে সাধারণ কথাবার্তায় এটা ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যেকটি গোত্রেরই নিজস্ব নেতা ও চাষী সম্প্রদায় আছে; সুতরাং গোত্রগুলো প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ; তবে দুটি গোত্র ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী বলে অধিকাংশ পুরোহিতই এই দুই গোত্রের লোক। এর মধ্যে একটি গোত্র পরিবারভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ধর্মের ধারক-বাহক; এবং পঞ্চম পুত্রের বংশধরগণ এই ধর্মের পৌরোহিত্য করে থাকে; প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পঞ্চম পুত্র প্রথম পারিবারিক পুরোহিত ছিলো। গ্রামের দেবতাগণ যে শালকুঞ্জে বাস করেন, সেখানে আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার পারিশ্রমিক হিসেবে এই গোত্রের অনেকেই নিষ্কর জমি ভোগ করে থাকে। কোনো কোনো এলাকায়, বিশেষত উত্তরাঞ্চলে পঞ্চম পুত্রের বংশধরদের চেয়ে দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরদের (নিজ-মুরমু-হাদ) ভালো পুরোহিত বলে মনে করা হয়; কিন্তু লক্ষণীয় যে, তারা নিষ্কর জমি ভোগ করতে পারে না; ফলে নিজেদের পরিশ্রম বা যজমানদের উদারতার ওপর নির্ভর করে তাদের সংসার নির্বাহ করতে হয়। তারা সাধারণত ধর্মনেতা ও ধর্মগুরু বলে পরিগণিত হয় এবং দানবপূজার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে থাকে। জাতীয় ধর্মব্যবস্থা পরিবারভিত্তিক হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে তার পঞ্চম গোত্রের পুরোহিতদের কাজও সম্পন্ন করে থাকে। উত্তরাঞ্চলের যে সকল এলাকায় হিন্দুধর্মের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, সেখানে আরও পাঁচটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, সাঁওতাল নারী ও আর্য পুরুষদের জারজ সন্তান থেকেই এই পাঁচটি গোত্রের উদ্ভব হয়েছে। বিশুদ্ধ আর্যদের সঙ্গে

৪২. চড়কপূজা, বর্তমানে এই পূজাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
৪৩. ইংলিশম্যান'স উইকলি জার্নাল; চতুর্থ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, কলিকাতা।

মিশ্রবর্ণের যে সম্পর্ক, বিশুদ্ধ সাঁওতালদের সঙ্গে এই পাঁচ গোত্রেরও ঠিক সেই সম্পর্ক। তবে মিশ্রবর্ণের লোকেরা সমতলভূমির আর্যদের মধ্যে যে মর্যাদা লাভ করতে পারেনি; এই পাঁচ গোত্রের লোকেরা, সম্ভবত আর্য পিতাদের কাছ থেকে পাওয়া উন্নত বুদ্ধিমত্তাবশত, তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এই অতিরিক্ত পাঁচটি গোত্র সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় না। তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তা অনুমানমাত্র; ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। উত্তরাঞ্চলের সাঁওতালগণ হিন্দুধর্মের এতো কাছাকাছি চলে গেছে যে, চারটি গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক পেশা ভাগ করে দেয়া হয়েছে। কেণ্ড-হাদ গোত্রের লোকেরা রাজা, মুরমু-হাদরা পুরোহিত; সরণ-হাদরা সৈনিক; এবং মারুদি-হাদরা কৃষক। এই শ্রেণীবিভাগ স্পষ্টতই হিন্দুদের সৈনিক, পুরোহিত, বণিক ও কারিগর শ্রেণীবিভাগের অনুকরণ মাত্র। এই চারটি গোত্র ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে আরও আটটি গোত্র আছে, তবে এই গোত্রগুলোর জন্য কোনো বিশেষ পেশা ঠিক করে দেয়া হয়নি।

এই জাতীয় স্থানীয় বর্ণভেদ থাকলেও হিন্দুদের মধ্যে যে নির্মম অসমতা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে, সাঁওতালদের মধ্যে তার অস্তিত্ব নেই। গ্রামের সমস্ত লোকই একত্রে আনন্দ উপভোগ বা দুঃখ ভোগ করে থাকে। তারা একসঙ্গে কাজ করে, একসঙ্গে শিকার করে, একসঙ্গে পূজা করে এবং উৎসবের সময় একত্রে আহার করে। হিন্দুদের মধ্যে কেউ স্বগোত্রে ছাড়া বিয়ে করতে পারে না, কিন্তু সাঁওতালদের মধ্যে স্বগোত্রে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। হিন্দুদের প্রথম তিনটি বর্ণ প্রকৃতপক্ষে পেশা বা সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং সামন্ত যুগের ইউরোপীয় আর্যদের মধ্যে নাইটকন্যার সঙ্গে বণিকপুত্রের বিবাহকে যেমন তীব্র ঘৃণার চোখে দেখা হতো, কৃষিপ্রধান ভারতের আর্যদের মধ্যেও এই জাতীয় ঘটনা অনুরূপভাবে ঘৃণ্য বলে পরিগণিত হতো। হিন্দুদের চতুর্থ বর্ণ হচ্ছে কৃষ্ণকায় জাতির লোকেরা; নিউ অর্লিন্স সমাজে কৃষক-কন্যার সঙ্গে নিগ্রো দাসের বিয়ে যেমন অসম্ভব ছিলো, এই চতুর্থ বর্ণের লোকদের পক্ষেও তেমনি অন্য বর্ণের মেয়ে বিয়ে করা কল্পনার অতীত ছিলো। সাঁওতালদের শ্রেণীবিভাগ পরিবারভিত্তিক; সামাজিক মর্যাদা বা পেশাভিত্তিক নয়। প্রত্যেক সাঁওতালই মনে করে যে, সে তার সমগ্র জাতির আত্মীয়; নিজ গোত্র ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে যে পার্থক্য সে অনুভব করে, তা হচ্ছে এই যে, স্বগোত্রের মেয়েরা তার এতো নিকটাত্মীয় যে তাদের বিয়ে করা যায় না। ছেলেরা বাপের গোত্রভুক্ত হয়; এবং মেয়েরা বিয়ের পর বাপের গোত্র বর্জন করে স্বামীর গোত্র গ্রহণ করে।

জাতিচ্যুতি

সাঁওতালদের মধ্যে পারিবারিক অনুভূতি এতো প্রবল যে, গোত্র থেকে বহিষ্কারকেই তারা সবচেয়ে বড়ো শাস্তি বলে মনে করে। রোমান সমাজের সঙ্গে এই ব্যবস্থার একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। কোনো সাঁওতাল গোত্র থেকে বহিষ্কৃত হলে, তার সমস্ত সামাজিক

অধিকার লুপ্ত হয়ে যাবে এবং অন্য কোনো গোত্র তাকে গ্রহণ করবে না। এইভাবে জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার ধারণা তাই সাঁওতালদের কাছে অচিন্তনীয়। কিন্তু বহিষ্কারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে এই শাস্তির ভয়াবহতা কমে গিয়েছে। তাছাড়া বহিষ্কৃত লোকের গোত্রে ফিরে যাওয়ার একটি পথও সর্বদা খোলা থাকে। তবে এজন্য তাকে প্রথমে প্রকাশ্যে প্রায়শ্চিত্ত করে গোত্রের অন্যান্য লোকদের অনুমোদন সংগ্রহ করতে হয়। ফলে তার অপরাধ সম্পর্কে জনমতের প্রকৃতির ওপরই তার গোত্রে ফিরে যাওয়া বা না যাওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করে। ছোটোখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে গোত্রের লোকদের ভোজের জন্য বিশ গ্যালন ধেনো মদ[৪৪] এবং খাদ্যবস্তু কেনার জন্য দশ শিলিং মতো (প্রায় ৬.৬০ টাকা) জরিমানা দিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে মীমাংসার অসুবিধা এতো বেশি যে, হতভাগ্য সাঁওতাল তার ভাগ্যের লিখনকে নীরবে মেনে নেয়; এবং তীরধনুক হাতে করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। সেখান থেকে আর কখনোই হয়তো সে আর ফিরে আসে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে একবার পদস্খলন ঘটলে কোনোমতেই আর গোত্রে ফিরিয়ে নেয়া হয় না।

সাঁওতালের জীবনে ছয়টি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান আছে, যথা : পরিবারে প্রবেশ, গোত্রে প্রবেশ, জাতিতে প্রবেশ, বিয়ের মারফত স্বগোত্রের সঙ্গে আর একটি গোত্রের মিলন; শবদাহের মারফত জীবিতদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ; এবং মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পুনর্মিলন। পরিবারে প্রবেশের অনুষ্ঠানটি গৃহদেবতার পূজার মতো অত্যন্ত গোপনীয় আচার; এবং বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন আকারে পালন করা হয়। একটি এলাকায় পিতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সন্তানের মাথায় হাত রেখে পিতা মনে মনে বংশদেবতার নাম আওড়ায়। গোত্রে প্রবেশের অনুষ্ঠানের নাম 'নার্থা'। এই অনুষ্ঠানটি অপেক্ষাকৃত প্রকাশ্য এবং ছেলের জন্মের পাঁচ দিন ও মেয়ের জন্মের তিন দিন পর অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে সাঁওতাল মা আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়। ধেনো মদ তৈরি করে বড়ো বড়ো কলস ভর্তি করা হয় এবং বাড়ির উভয় দিকের স্বগোত্রীয় লোকদের দাওয়াত করা হয়। কিন্তু যে বাড়িতে সন্তান জন্মেছে, সাঁওতালরা তাকে অপবিত্র বলে মনে করে; ফলে শুদ্ধি আচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সে বাড়িতে কেউ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে না। প্রথমে শিশুর মাথা কামিয়ে ফেলা হয়। গোত্রীয় লোকেরা তখন চারদিকে দাঁড়িয়ে তাদের আত্মীয়-পরিবারের সাময়িক সমাজচ্যুতির জন্য সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ তিক্ত রস[৪৫] মিশ্রিত পানি পান করে। তারপর পিতা সন্তানের নামকরণ করে; ছেলে হলে তার পিতামহ এবং মেয়ে হলে তার মাতামহীর নাম অনুসারে নাম রাখা হয়। নাম ঘোষণার পরই দই চাল ও পানি নিয়ে অতিথিদের কাছে যায়; এবং শিশুর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক অতিথির বুকের ওপর এক ফোঁটা ফেলে। এইভাবে পানি ফেলা শেষ হলে নবজাত শিশু ও তার পরিবারের সকলে পুনরায় গোত্রে

---

৪৪. চাউল থেকে প্রস্তুত মদ; তেজ অনুসারে এক গ্যালনের দাম এক থেকে তিন শিলিং। (১ শিলিং = প্রায় ৬৭ পয়সা)।

৪৫. নিমপাতার রস।

প্রবেশ করেছে বলে ধরা হয়। তারপর শিশুর বাপ ও মায়ের আত্মীয়-স্বজন গোল হয়ে বসে বিরাট মাটির কলস থেকে মদ খায়; সমৃদ্ধ পরিবারে এই সঙ্গে ভোজের ব্যবস্থাও করে।

পাঁচ বছর বয়সের সময় শিশুর জাতিতে প্রবেশের অনুষ্ঠান হয়। প্রচুর মদ তৈরি এবং গোত্র নির্বিশেষে পরিবারের সমস্ত বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করা হয়। তারপর শিশুর ডান হাতে সাঁওতালী চিহ্ন উল্কি করে দেয়া হয়। এই চিহ্নের সংখ্যা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের হয়; তবে সর্বত্র বিজোড় হয়ে থাকে। এই চিহ্ন ছাড়া কেউ মারা গেলে সাঁওতালদের সমস্ত দেবতার রোষ তার ওপর পড়ে। যুগ-যুগান্তর ধরে তার বুকের ওপর বিষাক্ত সাপ ঘুরে বেড়ায় এবং ভৌতিক জগতে সে স্থান পায় না; আর সাঁওতালরা ভৌতিক জগতেই বেঁচে থাকে, ভৌতিক জগতেই কাজকর্ম করে এবং মরার পর ভৌতিক জগতেই চলে যায়।

সাঁওতালী বিয়ে

সাঁওতালের জীবনে তার বিয়ে[৪৬] অর্থাৎ এক গোত্রের সঙ্গে আর এক গোত্রের মিলনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। সাঁওতালদের বিয়ে হিন্দুদের চেয়ে বেশি বয়সে হয়; কারণ অল্প বয়সে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়া সাঁওতালদের কাছে অতিশয় নিন্দনীয় কাজ। সাঁওতাল ছেলেদের ষোলো-সতেরো বছর বয়সে এবং মেয়েদের সাধারণত পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়। সভ্যতার বিলাসিতা যাদের জীবনে দৈনিন্দিন প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে, তাদের কাছে এই বয়স খুব কম বলে মনে হতে পারে; কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলের জঙ্গলে একজন ষোলো-সতেরো বছরের যুবক পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মতোই সংসারের দায়িত্ব বহন করতে পারে; তাছাড়া সাঁওতাল নববধূও তার নতুন সংসারের জন্য একখানি পাতার কুটির এবং খানকয়েক মাটির ও পিতলের থালা-ঘটি-বাটি ছাড়া আর কিছুই আশা করে না। সাঁওতালরা তাড়াতাড়ি বিবাহিত জীবন শুরু করে, ফলে অসতীত্ব বা অবৈধ যৌন সম্পর্কের ঘটনা তাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না; তাছাড়া বহু নাতি-নাতনি ও তাদের ছেলে-পুলে থাকে বলে বুড়োদের শেষ বয়সে দেখাশুনা করার লোকের অভাব হয় না। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া আর কখনো আমি কোনো সাঁওতাল গ্রামে ভিখারি দেখিনি।

সাঁওতাল ছেলেরা বিয়ের আগেই যথেষ্ট বিবেচক হয় বলে সঙ্গিনী বাছাই করার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। হিন্দুসমাজে এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে অপিরিচিত। ছেলের বাপ যখন মেয়ের বাপের কাছে ঘটক (রাই বারি) পাঠায়, তখন থেকেই বিয়ের আয়োজন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। মেয়ের বাপ ঘটককে অভ্যর্থনা জানায় এবং স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করার পর জবাব দেয় : 'ছেলেমেয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হোক, তারপর এ বিষয়ে আলাপ করা যাবে।' নিকটের কোনো বাজারে বা মেলায় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। তারা যদি পরস্পরকে পছন্দ করে, তাহলে

৪৬. জাতিয়ার।

দিনের শেষে ছেলের বাপ মেয়েকে একটা কিছু উপহার কিনে দেয়। মেয়েটি তখন তার পুত্রবধূ হওয়ার ইচ্ছার প্রকাশ্য স্বীকৃতি হিসেবে ভাবি শশুরের পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে। তারপর মেয়ের গোত্রের লোকেরা ছেলের গ্রামে যায়। ছেলে তাদের প্রত্যেককে চুম্বন করে, একবার করে কোলে নেয়,[৪৭] এবং সকলকেই কিছু কিছু টাকা উপহার দেয়; কিন্তু মেয়ের বাপের জন্য তাকে একটি পাগড়ি, ও এক প্রস্থ সূতি পোশাক দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের পর ছেলের পক্ষের লোকেরা মেয়ের বাড়িতে যায়; মেয়ে তাদের প্রত্যেককে প্রণাম করে, একবার করে কোলে নেয়[৪৮] এবং ছেলেমেয়ে পক্ষের লোকদের যেরকম উপহার দিয়েছে, সকলকে ঠিক সেইরকম উপহার দেয়। এইভাবে দুই গোত্রের মধ্যে শুভেচ্ছা ও সখ্যতা স্থাপিত হওয়ার পর ছেলের বাপ ঘটকের মারফত মেয়ের মা-বাপের কাছে বেজোড় সংখ্যার কিছু টাকা উপহার পাঠায়। এই টাকা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে আইনত তার বাপের গোত্র থেকে ভাবি স্বামীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারপর বিয়ের আয়োজন শুরু হয়। মেয়ে পক্ষের লোকেরা তাদের গ্রামে একখানা অস্থায়ী ছাপড়া ঘর বানায়। এই ঘর বানানো শেষ হওয়ার পর বর তার লোকজন নিয়ে এসে হাজির হয় এবং গ্রামের দু'জন মাতব্বর স্থানীয় লোক গ্রামের একমাত্র রাস্তায় ('কুল-আহি' আক্ষরিক অর্থে পরিবারসমূহের বিভক্তিকারক) তাদের অভ্যর্থনা জানায়। এই মাতব্বর দু'জনের ওপর গ্রামের তরুণ-তরুণীদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। তারা বরযাত্রীদের ছাপড়া ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে মদ তৈরির গাছের[৪৯] একটি শাখা গাছের মতো করে মাটিতে পোতা থাকে; তার তলায় একটি পাত্রে চাল ভিজানো থাকে : মেয়ের বাড়িতে এই চাল বিশেষ উপায়ে ভানা হয় এবং লাল রঙে রঙিন করে তোলা হয়; তারপর বরকে শুদ্ধি করা হয় : তার চুল ছাঁটা হয়, গোসল করানো হয়; এবং পুরোনো কাপড় পালটে দিয়ে তাকে পরানো হয়। কনের বাড়ির মেয়েরা আগেই এই নতুন কাপড় সিন্দুরে রঞ্জিত করে দেয়। এইসব কাজে চার দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। পঞ্চম দিনে বর নতুন কাপড়ে সজ্জিত হয়ে তার সঙ্গীদের কাঁধে চড়ে কনের বাড়িতে যায়। বরযাত্রীদের মধ্যে পাঁচ জন লোক আগে থেকে কনের বাড়িতে গিয়ে কনকে একখানি বড়ো ঝুড়ির মধ্যে বসায় এবং কনের ছোট ভাইকে নিয়ে বাড়ির দরজায় অপেক্ষা করতে থাকে। বর হাজির হলে এই ছোট ভাই তার বোনের পক্ষ থেকে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর কনেকে ঝুড়ি সমেত বাইরে আনা হয় এবং একখানি কাপড়ের পর্দার দুই দিক থেকে বর-কনে পরস্পরের ওপর পানি ছিটিয়ে দেয়। এই সময় বর একজন দেবতার নাম জোরে উচ্চারণ করে; এবং উপস্থিত লোকেরা তাকে কনেকে ঝুড়ি থেকে উঁচু করে বাইরে আনতে বলে, কারণ তখন সে তার স্ত্রী হয়ে গেছে। কনে ঝুড়ির বাইরে আসার পর গোত্রীয় লোকেরা বর-কনের কাপড় একত্রে বেঁধে নেয়; এবং কনেপক্ষের মেয়েরা জলন্ত কাঠ-কয়লার আগুন নিয়ে আসে। কনের সঙ্গে

---

৪৭. রাজমহল এলাকার রেভারেন্ড ই.এস. পাসলের রিপোর্ট।

৪৮. ঐ।

৪৯. মহুয়া গাছ।

তার পরিবারের যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ মেয়েরা জলন্ত কয়লাগুলো ডাভার[৫০] সাহায্যে গুঁড়ো করে ফেলে; এবং বাপের গোত্র থেকে কনের চূড়ান্ত বিদায়ের নিদর্শনস্বরূপ পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

বউ নিয়ে বরের বাড়ি ফেরার সময় যে আলোক শোভাযাত্রা হয়, তা দেখতে সত্যই মনোহর। সকলে প্রথমে মহুয়া শাখার নিচে সমবেত হয়ে রঙিন পানিতে ভিজানো চালগুলো দেখে। চালে যদি প্রচুর অঙ্কুরোদগম হয়, তাহলে নবদম্পতির অনেক সন্তান হয়, কম অঙ্কুর দেখা দিলে কম সন্তান হয়; কিন্তু অঙ্কুর না হয়ে চাল যদি পচে যায়, তাহলে বিয়েটি অশুভ বলে মনে করা হয়। সকলে তারপর শোভাযাত্রা সহকারে রওনা হয়; ঢাকা-ঢোল ও সিঙ্গা বাজতে থাকে এবং জ্বলন্ত মশালের তীব্র আলোয় বুনো পাখিরা সচকিত হয়ে পাখা ঝটকাতে ঝটকাতে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে এবং বরের গাঁয়ের কুমারী[৫১] মেয়েরা প্রায় দুই মাইল পথ এগিয়ে এসে কনেকে অভ্যর্থনা জানায়। তারা গান গেয়ে ও বাজনা বাজিয়ে কনেকে তার নতুন বাড়িতে নিয়ে যায়।

সাঁওতালরা এক স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। দ্বিতীয় বিবাহ একেবারে অজ্ঞাত নয়, তবে কেবলমাত্র পুত্রসন্তান লাভের জন্যই দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেও সাঁওতাল তার প্রথম স্ত্রীকেই সর্বদা গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে থাকে। তালাকের সংখ্যা খুবই কম; এবং একমাত্র স্বামীর গোত্রীয় লোকেরা অনুমতি দিলেই তালাক দেয়া যায়। তালাকের জন্য গোত্রের পাঁচজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে ডেকে এনে মদ দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়; এবং যে পক্ষ (স্বামী বা স্ত্রী) তালাক চায়, সে তাদের কাছে অপর পক্ষের দোষ বা অপরাধ বর্ণনা করে। আত্মীয়গণ অপর পক্ষের জবাব শুনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তালাক মঞ্জুর হলে বাদি এই গোত্রীয় আদালতের সামনে একটি পাতা ছিঁড়ে দুই খণ্ড করে ফেলে।

সাঁওতালী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সাঁওতাল জীবনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হচ্ছে জাতির মধ্য থেকে তার আনুষ্ঠানিক অন্তিম বিদায়। কোনো সাঁওতাল যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকে, তখন তাকে কোনো ডাইনী বা কোনো দানবে 'খেয়েছে', তা নির্ধারণ করার জন্য আধা-সন্ন্যাসী, আধা-কবিরাজ ওঝা এসে একটি পাতায় তেল মালিশ করে। মৃত্যুর পর লাশের গায়ে তেল মাখানো হয়, লাল লতাপল্লবে আচ্ছাদি ১ করা হয় এবং নতুন সাদা কাপড়ে ঢাকা দিয়ে বিছানার ওপর রাখা হয়। গোত্রীয় লোকেরা একত্রিত হয়ে দুইখানি পিতলের পাত্র কেনে; একটিতে চাল ও অন্যটিতে পানি ভর্তি করে লাশের পাশে রাখা হয়, সঙ্গে কিছু টাকাও রাখা হয়। নতুন জগতে প্রবেশের সময় মৃত ব্যক্তি যাতে দানবদের খুশি করতে পারে, সেইজন্যই এ ব্যবস্থা। চিতা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর এই উপাচার সরিয়ে

৫০. 'টোক, ওকলি গাছের ডাল দিয়ে তৈরি করা হয়।
৫১. টিটরি-কুরি।

ফেলা হয়। গোত্রের পাঁচজন লোক লাশ কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে তিনবার চিতার চারদিকে পাক দেয়, তারপর লাশটি আস্তে আস্তে চিতার ওপর নামিয়ে রাখে। একটি সুচালো খুঁটো দিয়ে একটি মোরগের[৫২] ঘাড় পেরেক-ফোঁড়া করে চিতার এক কোণে অথবা নিকটে কোনো গাছের সঙ্গে বিঁধিয়ে রাখা হয়। একজন নিকটাত্মীয় তার নিজের কাপড়ের সুতো দিয়ে শুকনো ঘাস বেঁধে একটি মশাল তৈরি করে; তারপর নীরবে চিতার চারদিকে তিনবার ঘুরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মশাল দিয়ে লাশের মুখ স্পর্শ করে। তারপর সকলে চিতার নিকটে এসে দক্ষিণ দিকে মুখ রেখে চিতায় আগুন ধরিয়ে দেয়। লাশটি পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার সময় গোত্রীয় লোকেরা আগুন নিভিয়ে ফেলে। নিকটাত্মীয়টি তখন লাশের মাথার খুলি ভেঙে তিন খণ্ড হাড় বের করে নেয়, লাল লতাগুল্ম রঞ্জিত নতুন দুধে তা ধুয়ে ফেলে এবং তারপর তা একটি ছোটো মাটির পাত্রে রেখে দেয়।

পরকালের সুখী জীবন সম্পর্কে সাঁওতালদের কোনো ধারণা নেই। সুবিচারের স্বভাবজাত অনুভূতি থেকে তারা জানে যে, দুনিয়ায় যারা ধনী অথচ অসৎ মৃত্যুর পর তারা কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। পরকালের জীবন বলতে তারা শুধু দুষ্ট লোকের শাস্তিময় জীবনই বোঝে; কিন্তু সৎ লোক যে সেখানে পুরস্কার পেতে পারে, তা তারা কল্পনা করতে পারে না। সাঁওতালী ভাষায় বস্তুনিরপেক্ষ ভাবপ্রকাশের জন্য উপযুক্ত কোনো শব্দ না থাকায়, এ বিষয়ে তাদের প্রকৃত মতামত সংগ্রহ করা খুবই কঠিন; তবে যে সকল বুদ্ধিমান সাঁওতালের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি, তাদের ধারণা, নির্দয় পুরুষ ও নিঃসন্তান নারীরা অনন্তকাল যাবৎ কীট-পতঙ্গ ও সাপের খোরাক হয়ে থাকে; এবং সৎলোকেরা ফলবান গাছের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। সাধারণ সাঁওতালদের ধারণা অবশ্য খুব গোলমেলে। তাদের ধারণা, ভূত ও দানব তাদের ঘিরে রয়েছে এবং তারা যদি তাদের সন্তুষ্ট না করে, তাহলে এই ভূত-দানবের দল তাদের দৈহিক শাস্তি দেবে। কিন্তু এই ভূত-দানব যে কি বস্তু, তা তারা জানে না; আর মৃত্যুর পর তো সবই শূন্য।

সাঁওতাল জীবনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির পুনর্মিলন। যে নিকটাত্মীয় চিতায় লাশের মাথার খুলি ভেঙে হাড় সংগ্রহ করে, সেই ব্যক্তিই এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। এক থলি চাল ও তিন খণ্ড খুলির হাড়সমেত সেই মাটির পাত্রটি নিয়ে সে একাকী পবিত্র নদীতে যায়। নদীর তীরে পৌঁছে সে হাড় তিনটি নিজের মাথায় রেখে নদীতে নেমে সামনের দিকে ঝুঁকে ডুব দেয়; ফলে হাড়গুলো পানিতে পড়ে স্রোতে ভেসে যায়। এইরূপে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মৃতের পুনর্মিলন ঘটে।

সম্পদময় জঙ্গল

যে জাতি যে দেশে বাস করে, সেই দেশের পারিপার্শ্বিকতাই যে তাদের চরিত্র গঠন করে, সাঁওতালরা তার একটি নিখুঁত প্রমাণ। দক্ষিণে সমুদ্রের নিকটের অসমতল

---

৫২. সিংহলের আদিম উপজাতিরা রোগশয্যায় মরণাপন্ন হয়ে পড়লে সাধারণত মোরগ উৎসর্গ করে থাকে। স্যার ই. টেনেন্ট প্রণীত 'সিলোন', তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ৫৪১ পৃষ্ঠা।

এলাকায় যারা তাদের দেখেছেন, তারা তাদের সম্পূর্ণরূপে কৃষিজীবী বলে অভিহিত করেন; আবার যে সকল পাদ্রী পাহাড়ি জঙ্গলে তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেছেন, তারা তাদের মাছ ও পশুশিকারি বলে জানেন। কিন্তু বীরভূমের উচ্চভূমির সাঁওতালদের নির্দিষ্ট কোনো পেশা আছে বলে মনে হয় না; অনুর্বর দেশে দুই এক খণ্ড জমি আবাদ করে, মহিষ পালন করে এবং জঙ্গলের উৎপন্ন-দ্রব্য সংগ্রহ করে তারা কষ্টেসৃষ্টে একটি আধা-কৃষি, আধা-চারণ জীবনযাপন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জঙ্গলই তাদের বিশ্বস্ত সুহৃদ; নিম্নভূমির হিন্দুদের যা নেই, তার সমস্ত কিছুই তারা জঙ্গল থেকে পায়। গুড়ি কাঠ, উজ্জ্বল রঙ, আঠা, মোম, গাছ-গাছড়া, ওষুধপত্র, তন্ত্রমন্ত্রের শিকড়, কাঠকয়লা, বন্যপশুর চামড়া প্রভৃতি জংলী জীবনের সমস্ত সম্পদই জঙ্গলে মজুদ রয়েছে। সারা শীতকাল তাদের মহিষের গাড়ির দীর্ঘ সারিকে ক্যাচ-ক্যাচ, ঘ্যার-ঘ্যার শব্দ করে ধীর-মন্থর গতিতে বীরভূমের নিম্নভূমির বিভিন্ন জেলায় আসতে দেখা যায়। এই গাড়ির চাকা বিরাটকায় শালগাছের গুঁড়ির মাত্র একখণ্ড কাঠ থেকে তৈরি করা। পথ চলতে চলতে রাত হয়ে গেলে সাঁওতাল গাড়োয়ানদের তাঁবুর অভাব হয় না। পথের পাশে কোনো পুকুরের ধারে গাড়ি থামিয়ে প্রথমে তারা মহিষগুলোকে সামাল দেয়; তারপর গাড়ির নিচে ঢুকে গিয়ে আর একখানি গাড়িকে পিছন দিক থেকে টেনে প্রথম গাড়ির পিছনে লাগিয়ে দেয়। তারপর আগুন জ্বালিয়ে পেটভরে খেয়ে নিয়ে সেই মজবুত তাঁবুর মধ্যে শুয়ে পড়ে।

শিকারি সাঁওতাল

শিকারি হিসেবে সাঁওতাল যেমন পারদর্শী, তেমনি সাহসী। তীরধনুক না নিয়ে সে একপাও অগ্রসর হয় না। শক্ত পাহাড়ি বাঁশ দিয়ে সে যে ধনুক বানায়, তা নিম্নভূমির কোনো হিন্দুই বাঁকাতে পারবে না। তার তীর দুই রকমের : বড়ো জন্তু শিকারের জন্য যে তীর ব্যবহৃত হয়, তা ভারি ও তীক্ষ্ণধার; আর পাখি মারার তীর হালকা এবং তার মাথা বলের মতো নিরেট গোলাকার। যারা এই গোল মাথা তীর ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন, তারা জানেন এই তীরের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করা কতো কঠিন। কিন্তু সাঁওতালরা এগুলো নিখুঁত পারদর্শিতার সঙ্গে ব্যবহার করে। এমন কি এই আদিম অস্ত্রের সাহায্যে একজন সাঁওতাল যতোগুলো পাখি মারতে পারে, আধুনিকতম আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যেও ঝানু ইংরেজ শিকারিদের অনেকেই তার সমান সংখ্যক পাখি শিকার করতে সক্ষম হবে না। তবে পাখি শিকার সাঁওতালদের নৈমিত্তিক কাজ নয়। আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্যই তারা পাখি শিকার করে থাকে। একবার আমি এক দীঘির ধারে কয়েকজন সাঁওতালকে দেখেছিলাম; সারাদিন পথ চলার পর ক্লান্ত হয়ে তারা সেখানে রাতের মতো আশ্রয় নিয়েছিলো। তাদের মধ্যে একজন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দিঘি থেকে কয়েকটা পানিকৌড়ি পাখি শিকার করে রাত্রের আহারের বন্দোবস্ত করে ফেললো। একজন হিন্দুর দেহশুদ্ধি করতে বা একজন মুসলমান পথিকের নামাজ পড়তে

যতোটুকু সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময়ের মধ্যে সে শিকার থেকে শুরু করে রান্নাবান্না পর্যন্ত সব কাজ সেরে ফেললো।

বাঘ বা চিতাবাঘ শিকার করা সাঁওতালের অবসর বিনোদনও বটে, আবার লাভের কাজও বটে। মুনাফার কথা যখন তার মনে থাকে, তখন একমাত্র সম্ভবত কোনো বন্দুকওয়ালা নিকটাত্মীয় ছাড়া আর কারো কাছেই সে বাঘের সন্ধান ভাঙে না; গোপনে সে বাঘটির পানি খাওয়ার জায়গা খোঁজে। এই জায়গার সন্ধান পাওয়ার পর সে তার ভাগ্যবান আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি কোনো গাছের ডালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অনেক সময় এইভাবে কয়েকদিন যাবৎও অপেক্ষা করতে হয়। সাঁওতালের লম্বা নলবিশিষ্ট সেকেলে গাদাবন্দুকের বারুদে আস্তে আস্তে আগুন ধরে; তবে নলের মধ্যে সে কিছু টুকরো লোহা ও পাথরের কুচিও ভরে দেয়; দড়ি বেয়ে আগুন বারুদের কাছে পৌঁছুতেও বেশ সময় লাগে। ইতিমধ্যে যদি বাঘের পানি খাওয়া শেষ না হয়, তাহলে এই খাওয়াই তার শেষ খাওয়া হয়। সাঁওতাল শিকারি তখনো ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে গুলি ছোড়ে না। কারণ, সম্ভবত ত্রিশ মাইল এলাকার মধ্যে আর কোনো বন্দুক নেই; তাছাড়া তার বারুদ সংগ্রহ করতে হয় সমতল ভূমির হিন্দু গ্রাম থেকে, যেখানে যেতে সে আদৌ ইচ্ছুক নয়। এই বন্দুক গুলি করে যদি শিকার না পড়ে, তাহলে লোকসানের কথা চুলোয় যাক, বন্দুকের ভীষণ মানহানি হবে। সাঁওতাল তাই সবদিক থেকে ভালো রকম প্রস্তুত হওয়ার পরই গুলি চালায়। অবসর বিনোদনের জন্য বাঘ শিকার করতে চাইলে সাঁওতালরা তাড়িয়ে মারাই পছন্দ করে। কোনো ইংরেজ শিকারি যদি মুখ দিয়ে কোনোরকমে বের করেন যে, তিনি একটি জঙ্গল পেটাবেন, তাহলে ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া নিয়ে শত শত সাঁওতাল যেনো পাতাল ফুঁড়ে হাজির হয়ে যাবে। একবার মাত্র দুই দিনের সময়ে আমি পাঁচ শ' সাঁওতাল জড়ো হতে দেখেছি। সমগ্র জঙ্গলটি কয়েকভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের কেন্দ্রস্থলে সাঁওতালরা একটি করে কাঠের উঁচু মাচান[৫০] বানায়। ইংরেজ শিকারিরা এই মাচানে বসে থাকে। সহজে যাতে না বুঝা যায়, সেজন্য লতাপাতা দিয়ে মাচানগুলো ঢেকে দেয়া হয়। সাঁওতালরা তীর-ধনুকে সুসজ্জিত হয়ে প্রত্যেক ভাগের জঙ্গলের চারদিকে নীরবে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সমস্ত সাঁওতাল সহসা একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢোল, শিঙ্গা, কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি বিকট আওয়াজে বেজে ওঠে। এই সময় ক্রমে ক্রমে তারা চারদিক থেকে কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, বাঘ-চিতাবাঘ প্রভৃতি শিকার তখন চঞ্চল ও অস্থির হয়ে ওঠে; তারা মানুষের বেড়াজাল ভেদ করে পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সাঁওতালরা যে অসীম সাহসিকতা ও পারস্পরিক নির্ভরতার পরিচয় দিয়ে তাদের পথ রোধ করে, তা এককথায় অপূর্ব; এইভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসার সময় তারা ছোটোখাটো পশু-পাখি যা হাতের কাছে পায় তাই অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে পাকড়াও করে। মাচানের ওপর বন্দুকসহ প্রস্তুত হয়ে থাকা ইংরেজ শিকারিরা ছোটো-খাটো শিকারের ওপর গুলি করার লোভ সংবরণ করে থাকেন, কারণ গুলির শব্দে বড়ো শিকার মরিয়া

৫০. 'মাইচান', গ্রীক মাখাইন ও ইংরেজি মেশিন শব্দের ন্যায় একই মূলধাতু থেকে উদ্ভূত।

হয়ে বেড়াজাল ভেদ করার চেষ্টা করতে পারে। বাঘ ও চিতাবাঘের সংখ্যা আজকাল অনেক কম হওয়ায় অনেক সময় দেখা যায় উৎকৃষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত মাচানের ইংরেজ শিকারি হয়তো একটি শিকারও পায়নি, কিন্তু সাঁওতালদের প্রত্যেকেই একটি পাখি, অথবা একটি খরগোশ অথবা অন্তত পক্ষে একটি বড়ো আকারের সাপ পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে।

কৃষক সাঁওতাল

সাঁওতালরা কিছুদিন আগেও যে কৃষিজীবী ছিলো, তার প্রমাণ তাদের ভাষা ও উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যেই পাওয়া যায়। নিম্নভূমির উন্মুক্ত মাঠ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর জঙ্গল থেকে তাদের জীবনযাত্রার রসদ সংগ্রহ করতে হয়; কিন্তু আসার সময় তারা চাষ-আবাদের স্পৃহা ও পারদর্শিতা সঙ্গে নিয়ে আসে। চাষ-আবাদ সম্পর্কে নিম্নভূমির হিন্দুদের সংস্কৃত থেকে নেয়া একটি রাজসিক ভাষা আছে; এই ভাষার কোনো শব্দই সাঁওতালী ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু গরিব চাষীদের মধ্যে চাষ-আবাদের আর একটি সাধারণ অলিখিত ভাষা চালু আছে; এবং এই ভাষার বহু শব্দ সাঁওতালদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু সাঁওতাল তার চাষ-আবাদের পারদর্শিতার কোনো অংশই আর্যদের কাছ থেকে নেয়নি। তার নিজস্ব ফসল[৫৪], নিজস্ব সাজ-সরঞ্জাম, আবাদের নিজস্ব পদ্ধতি এবং পল্লীজীবন সম্পর্কে নিজস্ব শব্দসম্ভার আছে; এই শব্দসম্ভারের মধ্যে একটিও তাকে আর্যদের কাছ থেকে ধার করতে হয়নি। সমুদ্রের কাছে নিচু জমিতে সে তার হিন্দু প্রতিবেশীদের মতোই উৎকৃষ্ট ধানের আবাদ করে এবং হিন্দুরা হয়রানি না করলে কিছুদিনের মধ্যেই সঙ্গতিপন্ন হয়ে যায়। নিম্নভূমির লোকেরা যতোই এগিয়ে গেছে, সাঁওতালদের ততোই জঙ্গলের দিকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে, ফলে কয়েকটি বড়ো গ্রাম ছাড়া সাঁওতালদের কোনো শহর গড়ে উঠতে পারেনি। বিভিন্ন এলাকার পাদ্রীরা অবশ্য বলেছেন যে, সাঁওতালরা 'দেশের নতুন ও জংলী এলাকাই বেশি পছন্দ করে।' মানুষের জন্য প্রকৃতির সবচেয়ে প্রাচুর্যময় দান ধানই সাঁওতালদের জাতীয় ফসল; তাদের প্রাচীনতম কিংবদন্তীতে ধানের উল্লেখ আছে, তাদের ভাষায় ধানের পৃথক পৃথক অবস্থার[৫৫] জন্য পৃথক পৃথক নাম আছে; এবং এমন কি পাহাড়ি এলাকায় ধান চাষের

---

৫৪. বীরভূমের পাহাড়ি সাঁওতালদের প্রধান খাদ্যশস্য হচ্ছে যব, সাঁওতালী ভাষায় 'জানোরা'। এছাড়া তিনটি রবিশস্যের নাম 'জানহে', 'গুণোলি' ও 'ইরি'; নিম্নভূমির হিন্দুদের আমি এই সকল ফসলের চাষ করতে দেখিনি। নিম্নভূমির লোকদের নৈমিত্তিক খাদ্য হলেও বীরভূমের সাঁওতালদের কাছে ধান একটি বিলাস দ্রব্য। তবে বাংলাদেশের সর্বত্র যে বজরা হয়, তার আবাদ তারা পারদর্শিতার সঙ্গেই করতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলে 'জানহে' বলতে এক রকমের বুনো ঘাস বুঝায়।

৫৫. ধান চাষের প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য সাঁওতালদের নিজস্ব নাম আছে। (১) সাধারণ নাম ধান : বাংলা ভাষায় 'ধান', সাঁওতালী ভাষায় 'হোরো'। (২) বীজধান : বাংলা 'বীজ' বা 'বীচ'; সাঁওতালী 'ইটা'। (৩) ধানকাটা : বাংলা 'কাটা'; সাঁওতালী 'ইর' এবং এই শব্দ থেকে 'ইরেট' অর্থাৎ সংগ্রহ করা। (৪) শুকনো ধানগাছ : বাংলা 'বিচালী'; সাঁওতালী 'বাসুপ'। (৫)

সময়ও তারা কম পারদর্শিতার পরিচয় দেয় না। ধানচাষের প্রত্যেক পর্যায়ে সাঁওতালদের একটি করে উৎসব আছে। জমিতে বীজ বোনার সময় সাঁওতালরা দেবতাদের উদ্দেশে বলি দেয় ও আনন্দ করে (ইরো-সিম উৎসব) করে; ধানের শিষ গজানোর সময়ও একটি অনুষ্ঠান (হোরো উৎসব) আছে; আর ধান কাটার সময় তারা বছরের সেরা উৎসব (জোহোরাই উৎসব) পালন করে।[৫৬]

সাঁওতালরা সদা প্রফুল্ল, অপরিচিত লোকেদের প্রতি অতিথিপরায়ণ এবং নিজেদের মধ্যে বেশি রকমের মিশুক। একটা কিছু উপলক্ষে পেলেই তারা ভোজের আয়োজন করে; বিলাসদ্রব্য তারা জোগাড় করতে পারে না বটে, তবে শিকার করা প্রাণীর গোশত এবং ধেনো মদের প্রাচুর্যে তা পুষিয়ে যায়। দক্ষিণাঞ্চলে প্রত্যেকটি সাঁওতাল বাড়িতে দরজার বাইরে 'অপরিচিতের আসন' আছে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোনো মুসাফির গ্রামে পা দেয়া মাত্র তাকে এই আসনে বসতে অনুরোধ করা হয়। সাঁওতালদের সালাম করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে হিন্দুদের মতো তারা মাটিতে গড় হয়ে আত্মাবমাননা করে না; মর্যাদার সঙ্গে দুই হাত কপালে ঠেকায়, তারপর আগন্তুকের করমর্দনের জন্য দুই হাত বাড়িয়ে দেয়।[৫৭] নিজেদের সমাজের প্রবীণ লোক এবং বাইরের লোকজনদের সঙ্গেই তারা সবচেয়ে বেশি সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করে। সর্বদা সদাচারী ও অতিথিপরায়ণ হলেও তারা দৃঢ়চেতা এবং চাটুকারিতা থেকে মুক্ত। হিন্দুদের মতো তারা কখনোই অপরিচিত লোকের কাছ থেকে টাকা উপার্জন করার কথা চিন্তা করে না; নবাগতদের সঙ্গে আলোচনায় কৌশলে ব্যবসাগত কথাবার্তা এড়িয়ে যায়; এবং বাড়ির বউ যে ফল ও দুধ এনে মেহমানদারি করে তার জন্য দাম দিতে গেলে তারা ব্যথিত হয়ে ওঠে। কোনো রকমে তাদের মেহমানদের কাছে কোনো জিনিস বেচতে রাজি করানো গেলে, একবারেই তারা আসল দাম বলে দেবে, হিন্দুদের মতো বেশি দাম চেয়ে পরে কম নেয় না; এবং কম দিতে গেলে শান্তভাবে মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করে। অপরিচিত লোকদের তাদের গ্রামে যাওয়া তারা সাধারণত পছন্দ করে না, কিন্তু কেউ যদি যায়-ই, তাহলে তারা তাকে রাজসিক মেহমানের মর্যাদা দেয়। মেহমানদের সঙ্গে তারা আদৌ কোনোরকম বেচাকেনা পছন্দ করে না, কিন্তু মেহমান যদি বিষয়টি উল্লেখ করেন, তাহলে তাকে নাখোশ করে না; এবং নিজেদের মধ্যে যেমন করে, ঠিক তেমনি মেহমানের সঙ্গেও ব্যবসায়িক সততার পরিচয় দেয়।

গাছ থেকে ধান ছড়ানো : বাংলা 'ঝাড়া', 'মাড়া' বা 'মাড়াই করা'; সাঁওতালী 'এন-মেন' বা 'মা-এনমেন'। (৬) খোসা (তুষ) ছড়ানো ধান : বাংলা 'চাল'; সাঁওতালী 'চাউলি'; দু'টি শব্দই একই মূল ধাতু 'চালাতে' (বাছাই করা) থেকে উদ্ভূত। (৭) সিদ্ধ করা চাল : বাংলা 'ভাত'; সাঁওতালী 'দাকু'। (৮) চোলাই করা চালের সুরা : বাংলা 'মদ' বা 'পচাই'; সাঁওতালী 'হাঁড়িয়া'। বীরভূম পুলিশের দুইজন সাঁওতাল কনেস্টবল ধুলা মাঝি ও চন্দ্র মাঝির উচ্চারণ অনুসারে আমি এই শব্দগুলো লিপিবদ্ধ করেছি।

৫৬. 'ঝ' পরিশিষ্টে সাঁওতাল উৎসবের তালিকা দ্রষ্টব্য।

৫৭. 'জোহার-ইস্তে'।

সাঁওতালদের পল্লী প্রশাসন

সাঁওতাল গ্রামের শাসনব্যবস্থা পিতৃপ্রধান। প্রত্যেকটি গ্রামেরই একজন করে আদি প্রতিষ্ঠাতা (মাঝি-হানান) আছে; এবং তাকে গ্রামবাসীদের পিতা বলে গণ্য করা হয়। পবিত্র শালকুঞ্জে তার উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তবে তিনি নিজে প্রয়োগ না করে সমস্ত ক্ষমতা তার বংশধরদের ওপর অর্পণ করে থাকেন। যখন যে ব্যক্তি গ্রাম-প্রধান (মাঝি) থাকেন, তখন তিনিই অবিসংবাদিত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন; তবে জটিল ও মারাত্মক বিষয় ছাড়া তিনি হস্তক্ষেপ করেন না; অন্য সকল বিষয়ে তার সহকারীই (পারমাণিক) ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। মাঝির মৃত্যুর পর তার বড়ো ছেলে মাঝি হয়। সাঁওতালদের মধ্যে বাস করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জনৈক পাদ্রী আমাকে বলেছেন যে, কোনো মাঝি বা পরামাণিক কখনো ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে বলে তিনি দেখেননি। মাঝির একটিমাত্র কথার ফলে পথ-ভুল করা মুসাফির যে কতো সহজে খাদ্য, সঙ্গী, গাড়ি প্রভৃতি সাহায্য পেতে পারে, তা সম্ভবত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া অনুমান করা সম্ভব নয়। বয়স্ক লোকদের জন্য যেমন মাঝি ও পরামাণিক আছে, গ্রামের তরুণ-তরুণীদের ওপর নজর রাখার জন্যও তেমনি দু'জন অফিসার আছেন! তারা 'জোগ-মাঝি' ও 'জোগ-পরামাণিক' নামে পরিচিত। ছেলেমেয়েদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তারা এই দু'জন অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকে। গ্রামে আর যে একজন কর্মচারী থাকে, সে হচ্ছে প্রহরী; তবে বিশুদ্ধ সাঁওতালদের মধ্যে অপরাধ ও অপরাধ দমনকারী কর্মচারীর কথা প্রায় অজ্ঞাত।[৫৭ক]

সাঁওতালরা পরিবারের মেয়েদের খুব সম্মান করে এবং উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের যোগ দিতে দেয়। একমাত্র স্ত্রীর আগে আহার করা ছাড়া আর কোথাও স্বামীকে তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে দেখা যায় না। সাঁওতাল নারী নম্র ও বিনয়ী এবং সহজভাবে চলাফেরা করতে ও কথাবার্তা বলতে পারে। হিন্দু নারীর শুচিবাই তার মধ্যে নেই; তাই অপরিচিত লোকের সঙ্গে সে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা বলে এবং স্বামীর মেহমানের মেহমানদারি করে। সাঁওতাল মেয়েদের নাচ বিলম্বিত তালের, কিন্তু অপূর্ব ছন্দময়। পরস্পরের হাত ধরাধরি করে তারা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ায় এবং নাচতে নাচতে সামনের দিকে মাঝখানে বাদকদের কাছে এগিয়ে যায় ও পিছিয়ে আসে। এইভাবে আগু-পিছু করার সময় তারা একটু একটু করে ডান দিকে সরে যায় এবং প্রায় এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে বৃত্তের চারদিকে একবার ঘুরে আসে।

৫৭ক. কয়েক বছর যাবৎ বীরভূম সংলগ্ন সাঁওতাল জেলাটি বহুল পরিচিত 'পুলিশবিহীন ব্যবস্থা' অনুসারে শাসন করা হয়। সরকারের নিকট প্রদত্ত ১৮৫৮ সালের দেওয়ানি ও ফৌজদারি রিপোর্টে (৪, ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা) কমিশনার মি. জি. ডব্লু ইউল এই ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যে সকল সহকারী কমিশনার এই ব্যবস্থা অনুসারে বাস্তবক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন। তারাও এই ব্যবস্থার সফলতা সম্পর্কে একমত প্রকাশ করেছেন।

সাঁওতালরা হিন্দুদের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে বাস করে; পাহাড়ি এলাকায় শিকার করতে গেলে সহসা একখণ্ড ধানের ক্ষেত চোখে পড়তে পারে; তারপর আর কিছু বুঝতে পারার আগেই শিকারি সাঁওতাল গ্রামে পৌঁছে যায়। একমাত্র যে হিন্দুকে সাঁওতালরা বরদাস্ত করে, সে হচ্ছে কামার। প্রত্যেক গ্রামের সঙ্গে একজন হিন্দু কামার সংযুক্ত থাকে; তবে কালক্রমে সেও আধা-সাঁওতালে পরিণত হয়। এই কামার গ্রামের সমস্ত লোহা-লক্কড়ের কাজ করে এবং সাঁওতাল মেয়েদের প্রিয় অলংকার তাগা, চুড়ি প্রভৃতি তৈরি করে। কোনো কোনো গ্রামে কয়েক ঘর ঝুড়ি-বোনা লোক দেখা যায়; তারা নিম্ন বর্ণের হিন্দু; সাঁওতালরা তাদের গ্রামের বাইরে বাস করার অনুমতি দেয়, ফলে হিন্দু ও সাঁওতালদের মাঝখানে তারা প্রায় নিরপেক্ষ জায়গায় থাকে; কিন্তু কালক্রমে তারাও প্রায় সাঁওতাল হয়ে যায় এবং তাদের ধমনীতে এককালে যে মিশ্র আর্য রক্ত ছিলো, তাও একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঁওতালরা এতো সরল যে, তাদের সঙ্গে ব্যবসা করা নিম্নভূমির ধূর্ত হিন্দুর পক্ষে খুবই লাভজনক। ফলে সাঁওতালদের মধ্যে একটুখানি জায়গায় পাওয়ার জন্য তারা যে কোনো লোককে মোটা রকমের ঘুস দিতে রাজি থাকে। গ্রামপ্রধানের অনুগ্রহে কোনো কোনো সময় কোনো হিন্দু দোকানদার বা সুদখোর মহাজন সাঁওতাল গ্রামে আশ্রয় পেয়ে থাকে; এবং সেইদিন থেকেই সততা, শান্তি ও সমৃদ্ধি গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

সাঁওতালদের নবরূপ

১৭৯০ সাল পর্যন্ত সাঁওতালরা সংলগ্ন নিম্নভূমি এলাকার জন্য ত্রাসস্বরূপ ছিলো এবং প্রধানত তাদের পুনঃ পুনঃ হামলার জন্যই লর্ড কর্নওয়ালিশ শেষপর্যন্ত বীরভূমের প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রতি বছর শীতকালে ফসল তোলা শেষ করে এবং ধানকাটার উৎসব পালন করে সমগ্র সাঁওতাল জাতি সমতল ভূমিতে নেমে আসতো; এবং একদিকে যেমন জঙ্গলে শিকার করতো, অন্যদিকে তেমনি লোকালয়ে লুটতরাজ করতো। এইভাবে তিন মাস যাবৎ শিকার ও লুটতরাজ করে প্রচুর মালমাত্রা নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে তারা উৎসব করতো। যে সকল উপায়ে শেষ পর্যন্ত তাদের নিজস্ব এলাকার মধ্যে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে রাখা সম্ভব হয়, ইতিপূর্বে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।[৫৮] ক্রমে ক্রমে তারা সমতল ভূমিতে লুটতরাজ না করে তাদের নিজস্ব এলাকার জঙ্গলে শিকার করেই সন্তুষ্ট থাকতে শেখে; এবং শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে তারা সমতল ভূমির বাসিন্দাদের উৎকৃষ্ট প্রতিবেশীতে পরিণত হয়। ১৭৯০ সালে জমির খাজনা সম্পর্কিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষ-আবাদ অনেক বেড়ে যায়; এবং বন্যজন্তুর হাত থেকে জমি উদ্ধার ও ফসল রক্ষার জন্য সমতল ভূমির লোকেরা সাঁওতালদের মজুরি দিয়ে নিয়োগ করতে থাকে। কারণ, ১৭৬৯

---

৫৮. দ্বিতীয় অধ্যায়।

সালের মহাদুর্ভিক্ষ ও জনশূন্যতার ফলে বন্যজন্তুরা সর্বত্র বিস্তার লাভ করে এবং বহু আবাদি জমি তাদের দখলে চলে যায়। এই কাজ পেয়ে সাঁওতালরা খুব খুশি হয়; কারণ একদিকে তারা যেমন প্রচুর শিকার পেতো, অন্যদিকে তেমনি আবার শিকার করার জন্য মজুরিও পেতো। ক্রমে ক্রমে তারা গৃহস্থদের অধীনে প্রধানত শীতকালে চাষ-আবাদের কাজে নিয়মিত চাকরিও নিতে থাকে। এই ঘটনা তখন এমন বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে যে, লন্ডনের সংবাদপত্রেও তার বিবরণ প্রকাশিত হয়[৫৯] এবং ১৭৯২ সাল থেকে সাঁওতালদের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়।

এই বছর থেকেই সাঁওতালকে বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে দিনমজুর হিসেবে দেখা যায়। মুসলমান রাজশক্তির পতনের সময় যে দুর্ভিক্ষ হয়, তার ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ও লোকসংখ্যার ভারসাম্য যে কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তা আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। কোনো কোনো এলাকায় এক একটি জেলার সমগ্র জমিই অনাবাদি হয়ে পড়েছিলো; এবং রাজস্বের জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে জমিদারি বন্দোবস্ত দেয়ার যে প্রথম ব্যবস্থা আমরা চালু করেছিলাম, তার ফলে ব্যাপক হারে পতিত জমি উদ্ধারের প্রশ্নটি সম্পূর্ণরূপে অবান্তর হয়ে পড়ে; কারণ এই ব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে হলেও অলস ও দুর্বল জমিদাররা যে বাকি-বকেয়া ফেলতো, সে টাকা প্রকৃতপক্ষে কর্মতৎপর ও উন্নতিশীল জমিদারদের কাছ থেকে আদায় করা হতো। কিন্তু ১৭৯০ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন নতুন উদ্ধার করা জমির ওপর আর কোনো খাজনা ধার্য না করার ওয়াদা করেন, তখন জমির উন্নতির জন্য দ্রুত মূলধন নিয়োগ হতে থাকে। প্রত্যেক চাষী যতো একর জমি আবাদ করতে সক্ষম, তাকে এককথায় তাই দেয়া হতে থাকে। কিন্তু তারপরও বহু সরস জমি উদ্বৃত্ত থেকে যায়; ফলে বেশি মজুরি ও সস্তা খাজনায় আকৃষ্ট হয়ে বহু সাঁওতাল সমতল ভূমিতে এসে চাষ-আবাদ শুরু করে। তারা শত শত একর পতিত জমি উদ্ধার করে এবং বীরভূমে একটি নতুন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলে। উত্তরে রাজমহল জেলায় সাঁওতালরা সমতল ভূমির দিকে আরও এগিয়ে আসে; এবং সরকার দূরদর্শিতার সঙ্গে তাদের জমি দিয়ে এবং 'সাধারণ আইন-কানুন ও সকল প্রকার কর থেকে রেহাই' দিয়ে তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার অভ্যাস গড়ে তোলেন। ১৮০৯ সালে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন : 'যে সকল বিরোধের ফলে শান্তিভঙ্গ হয় না, সেগুলোর মীমাংসা তারা নিজেদের রীতি-রেওয়াজ মোতাবেক নিজেরাই করে থাকে; এবং মারামারি, ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি না করার জন্য তাদের বার্ষিক বৃত্তি দেয়া হয়; তবে এই জাতীয় অপরাধ যদি কেউ করে, তাহলে বিশিষ্ট সাঁওতালদের নিয়ে গঠিত পরিষদ তাকে দোষী সাব্যস্ত করলে হাকিম তাকে দণ্ড দিয়ে থাকেন'[৬০]

---

৫৯. 'প্রত্যেকটি জমিদারই জমির উন্নতির জন্য পাহাড়ি এলাকা থেকে কৃষক সংগ্রহ করেছেন।'— 'মর্নিং ক্রনিকেল' লন্ডন, ২৩শে অক্টোবর, ১৭৯২। উত্তাপাড়া কালেকশন্স।

৬০. বুকানন পাণ্ডুলিপি হতে গৃহীত 'হিস্ট্রি, এন্টিকুইটি এটসেট্রা অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'; দ্বিতীয় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। গরিব দাসের চিঠি ও তার জবাব, ১৭৯৪; উত্তাপাড়া কালেকশন্স।

পতিত জমি উদ্ধারে সাঁওতাল

এই সকল ব্যবস্থার সাহায্যে ব্রিটিশ সরকার লুঠতরাজের জন্য অভিযানকে চাষ-আবাদের জন্য দেশত্যাগে রূপান্তরিত করেন; এবং বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে যে জাতি স্মরণাতীতকাল থেকে ত্রাসস্বরূপ ছিলো, তাদের শান্তিপ্রিয় প্রজায় পরিণত করেন। মুসলিম শাসনের আমলে যে জাতি আবাদি জমিকে পতিত জমিতে পরিণত করেছিলো, ব্রিটিশ শাসনের আমলে সেই জাতিই আবার সেই পতিত জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করতে শুরু করলো।

ইতিপূর্বে প্রতি বছর শীতকালে লুঠতরাজ করতে গিয়ে বহু সাঁওতাল প্রাণ হারাতো; কিন্তু এখন তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যেতে লাগলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাদের নিজস্ব এলাকায় জায়গার অভাব দেখা দিলো। ফলে ১৮৩০ সালের দিকে তারা দলে দলে উত্তর দিকে যেতে শুরু করলো। কিন্তু উত্তরের পাহাড়ি এলাকায় তারা আর একটি উপজাতি বাস করছে দেখতে পেলো। এই উপজাতিটি সাঁওতালদের চেয়ে বেটে, কালো ও হিংস্র; সাঁওতালদের তুলনায় নবাগতদের প্রতি অনেক বেশি মারমুখো; তারা যে ভাষায় কথা বলে সাঁওতালরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারে না; এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ। যে জাতি কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে অবশেষে ১৭৮০ সালে অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ডের সততা ও আপোসের নীতির কাছে মাথানত করেছিলো, এ হচ্ছে সেই জাতি। ক্লিভল্যান্ডের কবরের গায়ে তাই খোদাই করা আছে; 'রক্তপাত না ঘটিয়ে এবং ক্ষমতার দাপট না দেখিয়ে কেবলমাত্র আপোস, আস্থা ও উদারতার মধ্য দিয়ে তিনি রাজমহলের জঙ্গল টেরির (জঙ্গলময় সীমান্ত) উচ্ছৃঙ্খল ও বর্বর অধিবাসীদের বশে আনার চেষ্টা করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিলেন। বহুকাল যাবৎ এই জাতি নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে লুঠতরাজ ও খুনখারাবি চালিয়ে আসছিলো। ক্লিভল্যান্ড তাদের মধ্যে সভ্য জীবনযাপনের স্পৃহা সৃষ্টি করেন এবং তাদের মন জয় করে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের অনুগত করেন; শাসন ও প্রভুত্বের এটাই সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও সঙ্গত পন্থা।'[৬১]

সাঁওতাল জনপদ

সাঁওতালরা অপেক্ষাকৃত সভ্য ছিলো বলে এই বর্বর জাতির মধ্যে শান্তিতে বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ফলে তারা দলে দলে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকে। ১৮৩২ সালে একটি পারদর্শী নীতি গ্রহণ না করা হলে তারা হয়তো আবার বর্বর জীবনেই ফিরে যেতো। হিন্দুরা সব সময়ই সংগ্রাম-প্রিয় পাহাড়িদের বিপজ্জনক

---

৬১. 'বাংলাদেশের গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের আদেশক্রমে তাঁহার চরিত্রবলের প্রতি সম্মানস্বরূপ এবং অপরের জন্য নজির হিসেবে লিখিত', ১৭৮৪।

প্রতিবেশী বলে মনে করতো; ফলে উর্বর উতরাই এলাকা জনমানবহীন নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে পড়ে ছিলো। ১৮৩২ সালে সরকার স্থায়ীভাবে পাহাড়িদের এলাকার সীমানা নির্ধারণ করেন এবং সীমানা বরাবর কংক্রিটের খুঁটি বসিয়ে দেন। এই ঘটনার পর হিন্দুরা আবাদি এলাকা বাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে সীমানার ধার পর্যন্ত চলে যায়; কিন্তু খুঁটি ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা আগের মতেই জনশূন্য ও পতিত থেকে যায়; কারণ হিন্দুরা সীমানা পার হতে সাহস করতো না, আর সাঁওতালরা এই জমির প্রতি মনোযোগী ছিলো না। এই উর্বর জমির জন্য লোকের দরকার ছিলো এবং সাঁওতালরাই এই জমির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলো। কারণ, হিন্দুদের তুলনায় কম নিরীহ হওয়ায় তারা পাহাড়ি প্রতিবেশীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম; তাছাড়া জঙ্গলের মধ্যে বাস করেও তারা আধা কৃষিজীবনে অভ্যস্ত; এবং ছেলেবেলা থেকে জংলী জমি পরিষ্কার করতে পারদর্শী। এতদিন যাবৎ সন্ধান করেও তারা যে জমি পায়নি, এই এলাকা ছিলো ঠিক সেই ধরনের জমি।[৬১ক] প্রথমে মাত্র কয়েক শ' সাঁওতাল নামমাত্র খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নেয়। কিন্তু কয়েকটি ফসলের পরই তাদের অবস্থা ফিরে যায়; ফলে তারা দক্ষিণের পাহাড়ি এলাকা থেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিয়ে নিয়ে আসে; এবং ১৩৮৮ সালের আগেই তিন হাজার অধিবাসী সংবলিত চল্লিশটি গ্রাম গড়ে ওঠে। উর্বর জমি ও পশুপাখিতে পূর্ণ শিকারের জঙ্গল ছাড়াও আর যে বিষয়টি সাঁওতালদের এই নতুন এলাকায় আকৃষ্ট করে, তা হচ্ছে এই যে, এখানে তারা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় রাখতে পারে। বীরভূমের এই পতিত জমিতে যারা বসতি স্থাপন করে, কিছুদিনের মধ্যেই তাদের পাহাড়ি এলাকার স্বজাতিরা এবং সমতলভূমির অধিবাসীরা তাদের নিচু বর্ণের হিন্দু বলে গণ্য করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে লোকে তাদের পরিবার-ভিত্তিক ধর্ম, রীতি-রেওয়াজ, সমাজব্যবস্থা এবং মানুষে মানুষে সমতার কথা ভুলে যায়; এবং তাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি নিচু বর্ণ বলে গণ্য করতে থাকে। সমতল ভূমির গ্রামে সাঁওতালকে সত্য সত্যই কাঁচা গোশতভোজী বর্বর বলে মনে করা হতো এবং তাকে সবচেয়ে নিচু মর্যাদার আসন দেয়া হতো। কিন্তু হিন্দুরা কখনো খুঁটির সীমানা পার হয়ে পাহাড়ে প্রবেশ করেনি এবং সাঁওতালরা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এখনো বজায় রেখেছে। সীমানা-ঘেরা এলাকাটি তাই তাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন সাঁওতাল পরিবার সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। ফলে সীমানা নির্ধারণের পঁচিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ১৮৪৭ সালে সেখানে দেড় হাজার সাঁওতাল গ্রাম ও শহর গড়ে ওঠে এবং লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষে পরিণত হয়। সাম্প্রতিক এক হিসেবে লোকসংখ্যা দুই লক্ষেরও অনেক বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬১ক. সিভিল সার্ভিসের মি. জন পেটি ওয়ার্ডকে এই কলোনির প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। খুঁটির বেড়াটির পরিধি ২৯৫ মাইল; এবং এই সীমানার মধ্যে ৮৬৬ বর্গমাইল উঁচু জমি ও ৫০০ বর্গমাইল নিচু বা সমতল জমি রয়েছে। সমতল জমির মধ্যে ২৫৪ বর্গমাইল ১৮৫১ সালে উদ্ধার করা হয়।

দিনমজুর সাঁওতাল

সাঁওতালরা কেবলমাত্র পশ্চিমাঞ্চলের নিম্নভূমিতে জনসংখ্যা ও আবাদযোগ্য জমির ভারসাম্যই বহাল করেনি; সমগ্র বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রচেষ্টা সফল করার উপায় হিসেবেও তাদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বসতবাড়িসমেত কিছু আবাদি জমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়ায় গত দুই পুরুষ যাবৎ প্রত্যেকটি হিন্দু বিদেশী মালিকদের ভাড়া করা মজুর হতে অস্বীকার করেছে। এদেশের লোকসংখ্যা তখনো পুঁজিপতি ও দিনমজুরে বিভক্ত হয়নি; ফলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা বাংলাদেশে পুঁজি খাটাতে এসে শ্রমিকের অভাবের সম্মুখীন হলেন। অতএব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা অগ্রিম টাকা দেয়ার আকারে ঘুস দিয়ে কৃষকদের মজুর বানাতে শুরু করলেন। এই ব্যবস্থা এমনিতে খুব লাভজনক ছিলো না; তাছাড়া টাকা দাদন দেয়ার ফলে গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও ছিলো যথেষ্ট। কালক্রমে ইংরেজ পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের প্রধান পণ্য নীল কৃষকদের কাছে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেললো। কোনো কোনো জায়গায় নীলকর ইংরেজরা দেখলো যে, অগ্রিম টাকা দিয়ে এলাকার সমস্ত লোককে হাত করা, অথবা তাদের সমস্ত আবাদি জমি কিনে নেয়া ছাড়া নীল চাষ করার আর কোনো উপায় নেই। পঁচিশ বছর যাবৎ বাংলাদেশের অধিকাংশ নীলই বাধ্যতামূলকভাবে চাষ করানো হতো এবং চাষীরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই চাপ মেনে নিতো বলেই তা কম অস্বস্তিকর ছিলো না। পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়িরাই শেষপর্যন্ত এই অচলাবস্থার অবসান ঘটায়। ১৮৩৫ সালের দিকে সাঁওতাল ও অন্য আদিম উপজাতিরা দলে দলে পূর্বদিকে চলে আসতে থাকে; জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত ছিলো, তবে চাষ-আবাদের কাজ পেলে তারা বেশি পছন্দ করতো। পশ্চিম বাংলায় পাহাড় ও শুষ্ক লাল মাটির এলাকা চাষ-আবাদের সীমানা নির্ধারণ করে দেয় এবং এই সীমানা পর্যন্ত আবাদ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিলো। পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে উর্বর পয়োস্তি জমি তখনো অনাবাদি ছিলো; ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার বিচ্ছিন্ন জলাভূমি ও জঙ্গলগুলোর আশেপাশে সাঁওতাল গ্রাম গড়ে ওঠে। হিন্দু কৃষকদের দিয়ে জোর করে নীলচাষ করানোর ব্যাপারটি অধিকাংশ ইংরেজের মনঃপূত ছিলো না। কিন্তু সাঁওতালরা দিনমজুর হিসেবে কাজ করায় বলপ্রয়োগ করা এখন অনাবশ্যক হয়ে পড়লো। তাছাড়া নীলচাষের ব্যাপারটি পাহাড়িদের প্রকৃতির সঙ্গে খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো; কারণ, মওসুমে মওসুমে কাজ করার পর তারা শিকার ও অবসর বিনোদনের জন্য প্রচুর অবকাশ পেতো।

সাঁওতালদের দেশ ত্যাগ

নিম্নবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোর অবস্থা ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পশ্চিমের পাহাড়ি এলাকা থেকে এখনো

লোকজনের আগমন অব্যাহত রয়েছে। পূর্বের জমি পশ্চিমের জমির চেয়ে শুধু উর্বরই নয়, সস্তাও বটে। বীরভূমের যে সকল অনুর্বর জমিতে সার দিয়ে ও কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচ করে বছরে মাত্র একটি ফসল পাওয়া যায়, সেই সকল জমিও একরপ্রতি নয় শিলিং-এর কম খাজনায় পাওয়া যায় না। অথচ পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে কেবলমাত্র লাঙ্গল দিতে পারলেই যে সকল জমিতে বছরে দুটি ফসল ফলে, সেই সকল জমি সাত বা আট শিলিং খাজনায় পাওয়া যায়। এই এলাকায় জমিতে সার দেয়া বা কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচ করার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। কলকাতার একটি সংবাদপত্রে এই সময় বলা হয় : 'অনেকে হয়তো জানেন না যে, পশ্চিম বাংলার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা এখন পূর্ববাংলায় গিয়ে বসতি স্থাপন করছে।' নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় সাঁওতাল, ডাঙ্গার প্রভৃতি পাহাড়িদের হিন্দুদের কাছ থেকে দূরে দূরে বাস করতে দেখা যায়; এবং হিন্দুদের মধ্যে বাস করেও তারা তাদের জাতীয় রীতি-রেওয়াজ বজায় রাখে। পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে বহু নীলকুঠির[৬২] অধীনে পশ্চিমের এই পাহাড়িদের একাধিক গ্রাম রয়েছে। দৈহিক পরিশ্রমের বিনিময়ে যেখানে মজুরি পাওয়া যায়, পাহাড়ি পরিবার সেখানে গিয়ে হাজির হয়, কয়েকদিনের মধ্যে পাতার কুটির তৈরি করে ফেলে এবং এক মাসের মধ্যেই এমন সহজ হয়ে ওঠে যে দেখলে মনে হয়, তারা যেন এখনো পাহাড়েই বাস করছে। এই পাহাড়ি জাতি কঠোর পরিশ্রমী, প্রকৃতির সঙ্গে প্রায় একাত্মা, দৈনিক এক পেনিতে সংসারনির্বাহ করতে সক্ষম এবং ভালো খাবার যেদিন না পাওয়া যায়, সেদিন শিকড় বা লতাপাতাই সানন্দে ভক্ষণ করে। তাদের গায়ের রঙ কালো; হিন্দুরা তাদের ঘৃণা করে, তবে তারাও তার শোধ দিতে ছাড়ে না। যেদিন কাজ থাকে না, সেদিন শূকর শিকার করে, অথবা ধেনো মদ খেয়ে হই-হল্লা করে। এই পাহাড়িরা না থাকলে পূর্ববাংলায় ইংরেজদের ব্যবসা করাই অসম্ভব হয়ে পড়তো। অনেক লোক মধ্যভূমির পাহাড়ি এলাকা থেকেও এসেছে; কারণ অভাব-অনটন সেখানে খুবই তীব্র : অধিকাংশ লোককেই প্রায় অনশনে দিন কাটাতে হয়, প্রচুর টাকা খরচ করে পুকুর কাটার পরই চাষ-আবাদের কথা চিন্তা করা যায় এবং তীব্র শীতে প্রতি বছর বহু লোক মারা যায়। তাছাড়া অর্ধভুক্ত শিকারি সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন হয়ে থাকে, তেমনি দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিও সেখানে প্রবল; আর আছে বিরামহীন রাজনৈতিক অসন্তোষ ক্ষুধার্ত জঠরই যার উৎপত্তিস্থল। এই অনুর্বর জায়গা ছেড়ে এসে তারা যেখানে বসতি শুরু করেছে, প্রকৃতি সেখানে মানুষের পরিশ্রমকে প্রায় অনাবশ্যক করে দিয়েছে; সব সময়ই সেখানে নগদ টাকায় ভালো মজুরি পাওয়া যায়; আর দুই এক খণ্ড আবাদি জমি থেকে যা পাওয়া যায়, তার প্রায় সমপরিমাণ সম্পদই পাওয়া যায় জঙ্গল থেকে। প্রতি বছর শীতকালে নীল বাক্সবন্দি হওয়ার পর তাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ গ্রামে বেড়াতে যায়; এবং ফিরে আসার সময় গরিব আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

---

৬২ বনাপাড়া।

আলারিক সৈন্যরা যেমন লম্বার্ডির লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রতি চেয়েছিলো এই গরিব আত্মীয়রাও তেমনি পরবর্তী বসন্তকালে নীল বপন মওসুমের মজুরির দিকে আশার সঙ্গে চেয়ে থাকে। চাহিদা ও সরবরাহের আইন মার্সি বা ক্লাইড নদীর তীরের মতো গঙ্গা নদীর উপত্যকারও সমানভাবে ক্রিয়াশীল; তবে গঙ্গা তীরে তার গতি সম্ভবত একটু মন্থর। বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে জমির তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু পূর্বাঞ্চলের লোকসংখ্যা জমির পরিমাণের সঙ্গে এখনো সমান হয়নি।[৬৩] ফলে পূর্বের শ্রমিকরা পশ্চিমের শ্রমিকদের চেয়ে জমি ও মূলধনের মালিকদের সঙ্গে বেশি দর কষাকষি করতে সক্ষম। তা'ছাড়া, পাহাড়িরা অসভ্য হলেও বেশ বুদ্ধিমান; মাঝে মধ্যে তারা এ জেলা সে জেলা ঘুরে খোঁজ নেয়, বেশি মজুরি কোথাও পাওয়া যায় কিনা। সৃষ্টিকর্তা তাদের বিক্রি করার মতো একটিমাত্র সম্পদই দিয়েছেন এবং তা হচ্ছে পরিশ্রম; তাই স্বভাবতই তারা এই সম্পদ সবচেয়ে বেশি দামে বেচার চেষ্টা করতে থাকে।

হিন্দু বেনেদের প্রবঞ্চনা

ব্রিটিশ সরকারের সদয় আচরণের ফলে উত্তরের খুঁটি পুঁতে ঘেরাও করা সাঁওতাল বসতিটি নিম্নবাংলার যেকোনো জেলার মতোই নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছিলো। প্রতি বছর শীতকালে ফসল কাটার পরই হিন্দু ব্যবসায়ীরা ফসল কেনার জন্য সেখানে যেতে শুরু করে এবং কালক্রমে বসতির প্রত্যেকটি বাজারে একজন করে হিন্দু ব্যবসায়ী বাস করতে শুরু করে। সাঁওতালরা অজ্ঞ; কিন্তু সৎ আর ব্যবসায়ী হিন্দু চালাক ও ধূর্ত। ফলে প্রায় প্রতি বছরই একজন করে হিন্দু দোকানদার পাহাড় থেকে তার নিজের এলাকায় ফিরে গিয়ে সম্পদের প্রাচুর্যে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতো এবং

---

৬৩. নদীয়া জেলায় ধানের জমির সাবেক খাজনা ছিলো একরপ্রতি এক শিলিং ছয় পেন্স। ১৮৬৫ সালে কুষ্টিয়া মহকুমার ভারপ্রাপ্ত অফিসার থাকার সময় আমার এজলাসে যে সকল খাজনার মামলার শুনানি হয়েছিলো, তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো জমির খাজনা একরপ্রতি ছয় শিলিং-এর কম ছিলো; এবং আমার যতোদূর মনে পড়ে, সবচেয়ে বেশি যে খাজনা দাবি করা হয়েছিলো, তা ছিলো একরপ্রতি বারো শিলিং; কিন্তু এই বেশি খাজনার জমিতে পানি সেচ করার দরকার হতো না এবং বছরে দু'বার ফসল হতো। বীরভূম জেলায় এই জাতীয় জমি পাওয়া যায় না। দুই-এক খণ্ড পাওয়া গেলেও তাতে গুটিপোকার চাষ হয় এবং একরপ্রতি চব্বিশ থেকে বিয়াল্লিশ শিলিং পর্যন্ত খাজনা দিতে হয়। পূর্বের জেলাগুলোতে যে উদ্বৃত্ত জমি রয়েছে, ওটবন্দি ব্যবস্থাই তার বড়ো প্রমাণ। এই ব্যবস্থা অনুসারে চাষী মালিকের সঙ্গে কোনোরকম বন্দোবস্ত ছাড়াই অনাবাদী জমিতে প্রবেশ করে, যে কয়টি ফসল পাকার সময় মালিক নতুন আবাদি জমি মাপজোক করে এবং হালসন ও আগাম সনের জন্য একরপ্রতি মোট সাড়ে সাত শিলিং খাজনা আদায় করে, অথচ আগাম সনে জমি হয়তো আগের মতোই পতিত থাকতে পারে। মালিক যে খাজনা আদায় করে তা একত্রে দুই বছরের জন্য, বার্ষিক ভিত্তিতে নয়। ১৮৬৫ সালের পর নদীয়া জেলায় খাজনার হার বেড়ে গিয়েছে বলে আমি জানতে পেরেছি।

জমি-জমা কিনতে শুরু করে দিতো। নিচু শ্রেণীর বেনে হিন্দুরা সাঁওতাল বসতিকে যেকোনো উপায়ে টাকা করার জায়গা বলে মনে করতো এবং টাকা তারা করতোও। সাঁওতালদের সঙ্গে যোগসূত্রের সকল সময় হিন্দুরা প্রতারক, জোর করে টাকা আদায়কারী ও অত্যাচারী বলে পরিচিত; এদেশের মুষ্টিমেয় ইংরেজ অত্যাচারীর আচরণ যেমন সমগ্র ব্রিটিশ জাতির মুখে কালিমা লেপন করে দিয়েছে; এই বেনে হিন্দুদের আচরণও তেমনি সমগ্র হিন্দু জনসংখ্যাকে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় করে তুলেছে। সাঁওতাল বসতির ধার বরাবর উত্তরে খুঁটির-বেড়া থেকে শুরু করে বীরভূমের উচ্চভূমি পর্যন্ত এলাকায় হিন্দু ফেরিওয়ালা ও মুদিরা যেকোনো ছুতোনাতায় আস্তানা গেড়েছে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি লেনদেনে তারা গরিব সাঁওতালকে ঠকিয়েছে। সাঁওতাল ঘি বেচতে এলে তা কেনার সময় হিন্দু তলা-ফুটো চুংগো দিয়ে তা মেপেছে; ধান-চালের বদলে লবণ তেল কাপড় ও বারুদ নিতে এলে হিন্দু ভারি বাটখারা দিয়ে ধান-চাল আর হালকা বাটখারা দিয়ে লবণ তেল প্রভৃতি মেপেছে। সাঁওতাল আপত্তি করলে হিন্দু বেনে তাকে বুঝিয়ে দিতো যে, লবণের ওপর শুল্ক দিতে হয় বলে তার ওজনেও আলাদা বাটখারা ব্যবহার করতে হয়। এই দোকানদারির লাভের সঙ্গে সুদে কারবারের লাভ যোগ হতো। কোনো পরিবার নতুন বসতি স্থাপন করলে জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করার সময় খাওয়ার জন্য তাদের কিছু অগ্রিম ধান-চাল দরকার। হিন্দু বেনে অল্প কিছু চাল দাদন দিতো; কিন্তু জমি তৈরি হলে তাতে ফসল বোনার সঙ্গে সঙ্গে জমি আটক করতো। একটি পরিবার মেহমানদারি করতে গিয়ে ভোজের আয়োজন করে তাদের সমস্ত ফসল খরচ করে ফেলে এবং হিন্দু মহাজনের আড়তে গিয়ে পাকা খাতায় নাম লেখায়। মহাজন অবশ্য তাদের সারা বছর কোনোমতে বেঁচে থাকার মতো ধান দাদন দেয়; কিন্তু যেদিন থেকে চাষী এই দুর্দিনের ধান খেতে শুরু করে, সেদিন থেকেই সে স্ত্রী-পুত্রসহ মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। চাষী তার পরিবারের জন্য যতো কমই ধান নিয়ে থাকুক না কেন এবং অনাহারে অর্ধাহারে যতো কঠোর পরিশ্রম করেই দেনা শোধের চেষ্টা করুক না কেন, মহাজনের হাত থেকে সে কোনোমতেই রেহাই পাবে না; মহাজন তার সমস্ত ফসল তো নেবেই, এমন কি পরের ফসল থেকে আরও আদায় করার জন্য খাতায় বকেয়া লিখে রাখবে। বছরের পর বছর ধরে সাঁওতাল এভাবে হিন্দু মহাজনের হাতে নির্যাতিত হয়ে থাকে। কখনো অতিষ্ঠ হয়ে সে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে চাইলে মহাজন গোপনে গোপনে আদালতে গিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করবে এবং তদবির-তাগাদা করে একতরফা ডিক্রি হয়ে জারির পরোয়ানা না বেরুনো পর্যন্ত তাকে কিছুই জানতে দেবে না। ফলে কোনোরকম আভাস পাওয়ার আগেই সাঁওতালদের গরু-মহিষ, ভিটেবাড়ি, এমন কি পিতলের ঘটিবাটিগুলো পর্যন্ত নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। কখনো কখনো সাঁওতাল মেয়েদের মর্যাদার একমাত্র নিদর্শন সস্তা লোহার বালাও তাদের হাত থেকে জোর করে খুলে নেয়া হয়। প্রতিকারের প্রশ্ন অবান্তর; আদালতের দূরত্ব কমপক্ষে একশ' মাইল,

আর রাজস্ব আদায়ের জটিল সমস্যায় নিমগ্ন ইংরেজ হাকিমের এসব ছোটোখাটো ব্যাপারে মনোযোগ দেয়ার সময়ও নেই। দেশী পাইক-বরকান্দাজরা সকলেই মহাজনের কাছ থেকে টাকা পেয়েছে; পুলিশও বাদ যায়নি। সাঁওতাল হতাশায় ভেঙে পড়ে; বলে 'ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি অনেক দূরে থাকেন'; সে কাঁদে, কিন্তু তাকে সাহায্য করার কেউ নেই।

আদালতে বিচার নেই

সরকার এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সাঁওতালদের বিষয়ে দেখাশোনা করার জন্য মাত্র একজন ব্রিটিশ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিলো; এবং একজন মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তা তিনি সম্ভবত করেছিলেন। চাষ-আবাদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খাজনার হারও বাড়াতে থাকেন এবং অত্যাচার না করে বা প্রতিবাদ সৃষ্টি না করে ১৮৩৮ সালের ৬৬৮ পাউন্ড রাজস্ব বাড়িয়ে ১৮৫৪ সালে তিনি ৬৮০৩ পাউন্ডে পরিণত করেন। বিচারের দায়িত্ব আদালতের নিম্ন পর্যায়ের হিন্দু অফিসারদের ওপর ন্যস্ত থাকতো; এবং তারা সাঁওতাল বিবাদিদের বিপক্ষে হিন্দু বাদিদের পক্ষ সমর্থন করতেন। ইংরেজ সুপারিনটেনডেন্টের কাজ এতো বেশি ছিলো যে, কঠোর পরিশ্রম করে তিনি যদি দিনের স্বাভাবিক রাজস্ব বিষয়ক কাজ দিনের মধ্যেই সমাপ্ত করতে পারতেন, তাহলে নিজেকে রীতিমতো ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের ইতিহাস, আচরণ, বা চাহিদা সম্পর্কে খোঁজখবর করার তার সময়ই ছিলো না। একটি সশস্ত্র, অর্ধসভ্য ও বলবান উপজাতিকে বিনা তত্ত্বাবধানে বাড়তে য়ো হচ্ছিলো;অথচ সরকার আতংকিত না হয়ে এক লক্ষ যাযাবর বর্বরকে বসতি কৃষকে পরিণত করতে পারার সাফল্যে মনে মনে তৃপ্তি বোধ করছিলেন। শুধু তাই নয়, সরকার বার্ষিক রিপোর্ট পড়ে রীতিমতো আনন্দিতও হচ্ছিলেন; কারণ এই সকল রিপোর্টে কিভাবে জঙ্গল সাফ হয়ে দ্রুত আবাদি জমি বেড়ে যাচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকতো। তাছাড়া তখন সস্তা ও বাস্তব শাসনের নজির হিসেবে সাঁওতাল বসতির কথা উল্লেখ করা সরকারের পক্ষে প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো; কিন্তু এই সাঁওতাল বসতিই একদিন এই তথাকথিত সস্তা শাসনের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি হয়ে দাঁড়ালো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রাজস্ব থেকেই মুনাফা করতে হতো; ফলে কোম্পানির কর্মচারীদের প্রায় সকলেই সরকারকে একটি সওদাগরি প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন এবং মুনাফার পরিমাণ দিয়ে সরকারের সাফল্য নির্ধারণ করতেন। কোর্ট অফ ডিরেক্টর সর্বদা এই প্রবণতা রোধ করার চেষ্টা করেছেন বটে; কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণ এ বিষয়ে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিটিই গ্রহণ করেন; কারণ ভারতের ইংরেজ শাসনকগণ কেবলমাত্র কয়েকশ' ইংরেজ শেয়ারহোল্ডারের নয়, বরং সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণেরও মোতয়াল্লি—এই নীতিবাক্যটি ভারতবর্ষ ব্রিটিশরাজের শাসনের অধীনে আসার পরই সুস্পষ্ট ও পূর্ণ

স্বীকৃতি লাভ করে। তার আগে এই নীতিবাক্য নীতিবাক্যই মাত্র ছিলো। সাঁওতাল এলাকার শাসন ব্যবস্থায় মুনাফা হবে না অথচ টাক খরচ হবে, এ জাতীয় সকল কাজই এড়িয়ে যাওয়া হতো। জনসাধারণের ইতিহাস, অবস্থা বা প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করা হতো না। ইংরেজ সুপারিনটেনডেন্ট স্পষ্টতই নিরেট বস্তুবাদী জাতীয় লোক ছিলেন; এসব বাজে কাজে টাকা ঢালা তিনি পছন্দ করতেন না। ফলে ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এই প্রদেশটি যখন দীর্ঘ বিদ্রোহের ক্ষেত্রে পরিণত হলো; তখন কেউ তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না এবং আগেও এ সম্পর্কে কেউ কোনোরকম হুঁশিয়ারি দিতে পারেননি। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত সাঁওতাল বসতিদের সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা ছিলো : হয় তাদের হিন্দু বেনেদের গোলামি করতে হবে, আর না হয় তাদের সেই অনুর্বর আদি বাসভূমিতে ফিরে যেতে হবে। ১৮৪৮ সালে তিনটি বাজারের সমস্ত সাঁওতালই দ্বিতীয় পথটি বেছে নেয় এবং জমাজমি ছেড়ে দিয়ে চরম হতাশা নিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়। অধিকাংশ সাঁওতাল অবশ্য জঙ্গলে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসহ স্থায়ীভাবে অর্ধাহারে থাকার চেয়ে হিন্দুদের গোলামি করাই শ্রেয় বলে মনে করে। এ ধরনের গোলামি বাংলাদেশে স্মরণাতীতকাল থেকে চলে আসছে। ১৮৬০ সাল পর্যন্ত এই দাস প্রথার বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক আইন ছিলো না এবং এই সালের আগে এ বিষয়ে যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়, তাতে দাস প্রথার অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয় না। কারণ এ আইনে[৬৪] দাস প্রথার শর্ত নিয়ন্ত্রণ করা হলেও দাসদের আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। অধিকাংশ সাঁওতালেরই নেয়ার জন্য বন্ধক দেয়ার মতো জমি বা ফসল ছিলো না। বাপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এক-আধ টাকার প্রয়োজনেও সাঁওতালকে হিন্দু সুদখোর মহাজনের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না; কিন্তু নিজের ও ছেলেমেয়ের দৈহিক পরিশ্রম ছাড়া বন্ধক দেয়ার মতো আর কিছু না থাকায় তাকে ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে নিজে ও তার পরিবারের সকলে মহাজনের দাস হয়ে থাকবে বলে খত লিখে দিতে হতো। ধানের সামান্য কয়েকটি টাকা বাপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ভোজের জন্য একদিনেই খরচ হয়ে যায় এবং পরদিন সকালে এই হতভাগ্য পরিবার মহাজনের বাড়িতে গিয়ে দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ হওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। মহাজন অবশ্য ধারের টাকা ফিরে পাওয়ার আশা করে না, টাকা আদায়ের কোনো ইচ্ছেও তার থাকে না; সে শুধু নজর রাখে দাসেরা যেন রাতদিন শুধু তার কাজেই খাটে এবং ধার শোধ করার টাকা উপার্জনের জন্য যেনো এক মুহূর্তও ফুরসৎ না পায়। এভাবে খাটতে খাটতে মারা যাওয়ার সময় সাঁওতাল তার সন্তান-সন্ততির জন্য যে একমাত্র উত্তরাধিকার রেখে যায়, তা হচ্ছে এই ঋণ। প্রথম দিকে তার পরিমাণ যতো কমই হোক না কেন, শতকরা তেত্রিশ টাকা হারের চক্রবৃদ্ধি সুদে

৬৪. ১৮৪৩ সালে ৫ নম্বর আইন (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল)

কিছুদিনের মধ্যেই তা বিপুল পরিমাণে পরিণত হয়। দাস যদি সকল মহাজনের কাজ করতে অস্বীকার করে, তাহলে মহাজন তার ভাত বন্ধ করে দেয়; এবং সে যদি অন্য লোকের খামারে কাজ করে, তাহলে তাকে সশরীরে ধরার জন্য আদালত থেকে পরোয়ানা জারি করার এবং জেলের নির্যাতনের কাহিনী রঙদার করে শুনিয়ে তাকে শিগগিরই নতজানু করে ফেলে।

সুদে কারবার : দাসপ্রথা : রেলপথ

তবে মহাজনরা অনাবশ্যক নির্মমতার আশ্রয় নিয়েছে বলে মনে হয় না। আমেরিকার মহাজনরা দাসদের ওপর যে অত্যাচার করতো, তেমন কোনো অত্যাচার এখানে হয়েছে বলে আমি শুনতে পাইনি। হিন্দুরা তাদের ওপর নির্ভরশীল লোকদের মারধর করতে খুবই ইতস্তত করে থাকে; তাছাড়া জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে দাসের পক্ষে জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। যে সকল দেশে লোকসংখ্যা বেড়ে যায়; কিন্তু জীবিকার উপায় বাড়ে না, সেই সকল দেশে এরূপ কম কঠোর দাস প্রথা খুবই স্বাভাবিক। জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক যখন সম্পূর্ণরূপে পুঁজিপতির কব্জায় চলে যায়, তখন ক্রীতদাস প্রথাই উদ্বৃত্ত শ্রমিকের একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, স্বাধীনভাবে সে যতো পরিশ্রমই করুক না কেন, কোনোরকমে বেঁচে থাকার রসদ ছাড়া সে কিছুই আয় করতে পারে না; এবং মহাজনও খুব কম দিলেও তার দাসকে কোনোমতে বেঁচে থাকার রসদের চেয়ে কম কিছু আর দিতে পারে না। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে সাঁওতাল বসতির লোকসংখ্যা ৩০০০ থেকে বেড়ে গিয়ে ৮২,৭৯৫ হয়েছিলো; খুঁটির-বেড়ার চারপাশে আরও ১০ হাজার লোক ছিলো; ফলে স্বাধীন শ্রমিক হওয়ার চেয়ে ক্রীতদাস হওয়া কোনো অংশেই খারাপ নয় দেখে সাঁওতাল নীরবে তার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলো; কিন্তু ১৮৫৪ সালে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেলো, যার ফলে বাংলাদেশে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেলো। সরকার ভারতের রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সাঁওতাল বসতির পাশ দিয়ে দু'শ' মাইল রেলপথ বসানো হবে বলে স্থির করা হয়। বড়ো বড়ো বাঁধ নির্মাণ, উঁচু জমি কেটে সমান করা, বিরাটকায় সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য শ্রমিকের চাহিদা এতো বেশি বেড়ে যায় যে, ভারতের ইতিহাসে এমন চাহিদা কখনো দেখা যায়নি। কয়েক বছর পরে একমাত্র বীরভূমেই কুড়ি হাজার শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং সাঁওতাল এলাকার মধ্য দিয়ে বা আশপাশ দিয়ে রেলপথ বসানোর কাজে এক লক্ষ [৬৫] লোকের দরকার পড়ে; পঁচিশ বছরকালের মধ্যে যতো সাঁওতাল নতুন এলাকায় বসতি স্থাপন করে, এই সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। এতোদিন যাবৎ সাঁওতাল শ্রমিকরা

৬৫. ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক সম্পর্কে চিফ ইঞ্জিনিয়ার মি. জর্জ টার্নবুলের দৈনিক পড়পড়তা হিসাবের রিটার্ন।

কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতো কিন্তু এখন কাজই তাদের খুঁজতে শুরু করলো। ঠিকাদাররা শ্রমিক সংগ্রহের জন্য প্রত্যেকটি হাটবাজারে লোক পাঠাতো এবং যে সকল সাঁওতাল এই সুযোগে চাকরি নিলো, তারা কিছুদিনের মধ্যেই গেঁজে-ভরা টাকা আর বৌ-এর গা-ভরা রূপোর গহনা নিয়ে ফিরে এলো; আত্মীয়-স্বজনরা বিস্মিত হয়ে বললো, 'ঠিক হিন্দুদের মতো।' প্রত্যেকটি পুরুষ, নারী ও শিশু কাজ পেতো এবং একজন বয়স্ক লোক গ্রামে যা আয় করতো, একটি দশ বছরের বালক রেলপথে তার চেয়ে বেশি আয় করতে লাগলো। ঠিক এই সময় মহাজন ও দাসের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট আকারে দেখা দিলো। ভূমিহীন স্বাধীন সাঁওতালদের প্রায় সকলেই তীর ধনুক হাতে নিয়ে এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সঙ্গে করে দলবেঁধে রেলপথে কাজ করতে চললো; আগে আগে চললো তাদের বাজনাদাররা, ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া বাজাতে বাজাতে। কয়েক মাস পর পর তারা গ্রামে ফিরে এসে জমি কিনতে লাগলো এবং গোত্রীয় লোকদের ভোজ দিতে লাগলো। এই অবস্থা দেখে ক্রীতদাস সাঁওতালরা অস্থির হয়ে উঠলো এবং ক্রমে ক্রমে ক্রীতদাস পালানো নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে পড়লো। হিন্দু মহাজনরা আরও কঠোর, আরও নির্মম হয়ে উঠলো; যে কারণে সাঁওতালরা মুক্তির জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো, ঠিক সেই কারণেই তারা মহাজনদের কাছে আরও বেশি মূল্যবান হয়ে উঠলো। এ সময় একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, যে সকল মানুষ মুক্তি পাওয়ার যোগ্য, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ আইন অনুসারে তাদের দাস করে রাখা যায় কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবত শিগগিরই হয়ে যাবে।

অশান্ত সাঁওতাল

১৮৫৪ ও ১৮৫৫ সালের শীতকালে সাঁওতালদের মধ্যে একটি রহস্যময় অস্থিরতা দেখা দিলো। তারা খুব ভালো ফসল পেয়েছে এবং দেশে পুঁজি বেড়ে যাওয়ায় তাদের উৎপন্ন কৃষিজাত পণ্যের দামও বেড়ে গেছে; কিন্তু তবু তাদের মধ্যে অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করছে। অথচ বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট জেলার এক বছরের অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তার রিপোর্টে সবকিছু শান্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী বলে উল্লেখ করলেন। তিনি লিখলেন, 'জেলার সর্বত্র রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে ব্যাপক কাজ চালাচ্ছেন এবং অসংখ্য গরিব লোককে তারা যে চাকরি দিচ্ছেন, তার ফলে অধিবাসীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে; তাছাড়া প্রচুর ফসল হওয়ায় তাদের আরও কল্যাণ হয়েছে।'[৬৬] কিন্তু সাঁওতালরা তাদের ফসলের জন্য বেশি দাম এবং পরিশ্রমের জন্য বেশি মজুরি পাওয়া সত্ত্বেও অস্থিরতা তাদের একটুও কমলো না। এই অস্থিরতার প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, হিন্দু মহাজনরা সাঁওতালদের ফসল ও পরিশ্রমের জন্য বেশি দাম না দিয়ে আগের মতোই কম দাম দিচ্ছিলো; কিন্তু সম্পত্তিপন্ন সাঁওতালরা আর তাদের কাছে প্রতারিত

৬৬. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট প্রেরিত বীরভূমের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট; ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫। বীরভূম জুডিসিয়াল রেকর্ডস।

হতে চাইলো না; গরিব চাষীরা আর তাদের কাছে হয়রানি সইতে চাইলো না এবং দিনমজুররা আর তাদের দাস হতে চাইলো না।

যে জাতির মনে এরূপ সংকল্প থাকে, তাদের কখনো নেতার অভাব হয় না। সাঁওতালদেরও হলো না। হিন্দু সুদে কারবারির অত্যাচারে জর্জরিত একটি গ্রামের দুই ভাই[৬৭] তাদের জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে খাড়া হয়ে গেলো। তারা স্বর্গীয় আদেশে পরিচালিত বলে দাবি করলো এবং প্রমাণ হিসেবে গায়েবি উৎস থেকে পাওয়া নিদর্শন দেখালো। তারা জানালো যে, সাঁওতালদের দেবতা পরপর সাত দিন তাদের দেখা দিয়েছেন : প্রথমে দেশী পোশাকে একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের রূপ ধরে; তারপর আগুনের শিখার রূপ ধরে, একখানা ছোরা সেই শিখার মধ্যে জ্বলজ্বল করছিলো এবং তারপর শালের গুঁড়ির আস্ত একটা খণ্ড ছিদ্র করে বানানো সাঁওতালী গাড়ির চাকার রূপ ধরে। দেবতা দুই ভাইকে একখানা পবিত্র বই দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বহু কাগজের টুকরো ছেড়েছেন। এই টুকরো কাগজগুলো সমগ্র সাঁওতাল এলাকায় গোপনে ছড়িয়ে দেয়া হয়। প্রত্যেক গ্রামেই এক টুকরো করে কাগজ পাওয়া যায়; কিন্তু গ্রামবাসীর কেউ এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না করে দেবতার রোষ দূরীভূত হবে না মনে করে সঙ্গে সঙ্গে টুকরোটি পাশের গ্রামে পাঠিয়ে দিতে শুরু করে। এভাবে সাঁওতালদের মধ্যে একটা কিছু বড়ো ঘটনার আশা সৃষ্টি করে নেতারা মনে করেছিলো যে, ব্রিটিশ শাসকরা এ বিষয়ে তদন্ত করবে এবং তাদের অভিযোগের প্রতিকার করবে; কিন্তু ব্রিটিশ শাসকদের এসব ছোটো-খাটো ব্যাপারে তদন্ত করার ফুরসত ছিলো না। পরে তারা এলাকার প্রধান রাজকর্মচারীর কাছে আবেদন জানায় এবং অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, তাদের দেবতা তাদের আর দেরি করতে নিষেধ করেছেন। এই অফিসারটি সাঁওতাল জাতি বা তাদের অভিযোগ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। 'সততা ও বাস্তব শাসনে' কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ই একমাত্র কাজ ছিলো; এবং সাঁওতাল এলাকায় এই কাজ ভালোভাবেই চলছিলো। সাঁওতালদের সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে আমাদের যে মারাত্মক আঘাত পেতে হয়েছে, সেজন্য আমাদের শাসন ব্যবস্থাই দায়ী, কোনো অফিসার বিশেষ নয়। ইংরেজ সুপারিনটেনডেন্ট নিয়মিত রাজস্ব আদায় করতেন এবং অভাব-অভিযোগের নথি একপাশে সরিয়ে রাখতেন। সাঁওতাল নেতারা হতাশ হয়ে কমিশনারের দ্বারস্থ হয়। কমিশনার হচ্ছেন প্রদেশের একটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পদস্থ ইংরেজ অফিসার; সাঁওতালরা নাকি তাকে সরাসরি বলেছিলো যে, তিনি যদি কোনো প্রতিকার না করেন তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করবে।[৬৮] কিন্তু কমিশনার বুঝতে পারলেন না যে, তারা কি চায়; আর বুঝবেনই বা কেমন করে; রীতিমতো খাজনা আদায় হচ্ছে; শাসনও আগের মতো সস্তা ও বাস্তব হচ্ছে, অতএব এর মধ্যে গোলমালের অবকাশ কোথায়। সাঁওতাল নেতারা মনে মনে ভাবলোঃ 'ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি বড্ড দূরে থাকেন।' আর একটিমাত্র উপায় ছিলো এবং সাঁওতালরা সেই

৬৭. সিদু ও খানু, বাগানাডিহি গ্রামের বাসিন্দা; পরে তাদের অন্য দুই ভাই চাঁদ ও ভৈরবও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

৬৮. সরকারি নথিপত্র থেকে আমি এই উক্তির সত্যতা নির্ধারণ করতে পারিনি।

উপায়ও অবলম্বন করলো। জাতীয় বৃক্ষ শালের শাখা হাতে করে গ্রামে গ্রামে দূত চলে গেলো এবং সঙ্কেত পেয়ে সাঁওতালরা তাদের অপরিহার্য তীরধনুক নিয়ে দলে দলে এসে জমা হতে লাগলো। উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা কিছুই জানতো না; কিন্তু টুকরো কাগজগুলো তাদের মনে কিছু একটা সম্ভাবনার সঞ্চার করেছিলো।

সশস্ত্র লোক সমাবেশ

নেতা ভ্রাতৃবৃন্দ বুঝতে পারলো যে, তারা যে ঝড় তুলেছে, তা নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। ফলে সকলের প্রতি আদেশ জারি হলো যে, সমতল ভূমিতে নেমে গিয়ে কলকাতা অভিমুখে রওনা হতে হবে, ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন এই বিরাট বাহিনী যাত্রা শুরু করলো।[৬৯] একমাত্র নেতাদের দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিলো ৩০ হাজার। বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার সময় সাঁওতালরা সকলেই কিছু কিছু খাবার সঙ্গে নিয়েছিলো। এই খাবার যতোদিন ছিলো, ততোদিন তারা বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলো; কিন্তু খবরদারি করার জন্য লোক বা ব্যবস্থা না থাকায় এবং গন্তব্যবস্থল সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এই অসংখ্য সশস্ত্র সাঁওতাল কিছুদিনের মধ্যেই বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। তাছাড়া ইতোমধ্যে তাদের খাদ্যদ্রব্য ফুরিয়ে যাওয়ায় লুটতরাজ করার বা নিজেদের নির্ধারিত হারে ধান আদায় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। নেতারা ধান আদায় করার এবং অন্য সকলে লুটতরাজ করার পক্ষে মত দিলো। ৭ই জুলাই একজন দেশীয় পুলিশ ইন্সপেক্টর জানতে পারলেন যে, দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে অসংখ্য সশস্ত্র পাহাড়ি লোক তার এলাকায় প্রবেশ করছে। হিন্দু সুদে কারবারিরা খবর পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলো এবং পাহাড়িদের বিরুদ্ধে সিঁদেল চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে তাদের নেতাদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ ইন্সপেক্টরকে প্রচুর ঘুস দিলো। পুলিশ ইন্সপেক্টর তার প্রহরীদের নিয়ে রওনা হলেন এবং কিছুদূর যেতেই পথিমধ্যে একজন সাঁওতাল দূতের সঙ্গে তাদের দেখা হলো। সাঁওতাল দূত ইন্সপেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলো। ইন্সপেক্টর ছাউনিতে পৌঁছবার পর দুই সাঁওতাল নেতা তাদের লোকদের খাবার সংগ্রহের জন্য ইন্সপেক্টরকে তার এলাকার প্রত্যেকটি হিন্দু পরিবারের ওপর দশ শিলিং করে কর ধার্য করার আদেশ দিলো। ইন্সপেক্টরের রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না; কিন্তু তিনি যখন ফিরে আসবেন, সেই সময় কেমন করে জানাজানি হয়ে গেলো যে, তিনি মিথ্যা অভিযোগে নেতাদের গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন। প্রথমে তিনি একথা অস্বীকার করে বললেন যে, তিনি সর্পঘাতে মৃত্যুর একটি ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু

৬৯. এইদিন সাঁওতাল নেতারা সরকার, ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার, ভাগলপুর ও বীরভূম জেলার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর এবং যে সকল এলাকা দিয়ে তাদের যাওয়ার কথা সেই সকল এলাকার বিভিন্ন পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে একখানা চরমপত্র দিয়েছিলো বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে; কিন্তু আমি এই চরমপত্রের কোনো নিদর্শন উদ্ধার করতে পারিনি। পত্রগুলো যথাস্থানে পৌঁছেছিলো কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। তবে একজন সমসাময়িক লেখক এই ঘটনাগুলো তাঁর প্রায় সামনেই ঘটেছিলো এবং নির্ভুল লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতিও রয়েছে। চরমপত্রে প্রধানত সুদ নিয়ন্ত্রণ, রাজস্বের নতুন বিন্যাস এবং সাঁওতাল এলাকা থেকে সমস্ত হিন্দু বেনের বহিষ্কার (অনেকে বলেন হত্যা) দাবি করা হয়।

পরে তিনি সব কথা স্বীকার করেন এবং জানান যে, সিঁদেল চুরির মিথ্যা অভিযোগে সাঁওতাল নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য হিন্দু মহাজনরা সত্যি সত্যিই তাঁকে ঘুস দিয়েছে। নেতা দুই ভাই বললো : 'আমাদের বিরুদ্ধে তোমার যদি সত্যিই কোনো প্রমাণ থাকে, তাহলে তুমি সচ্ছন্দে আমাদের গ্রেপ্তার করতে পারো।' বোকা ইন্সপেক্টর সাঁওতালদের স্বভাবজাত নিরীহতার কথা স্মরণ করে তার প্রহরীদের প্রতি নেতা দু'জনকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন; কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাঁওতালরা তাকে ও তার প্রহরীদের বেঁধে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বিচারও হয়ে গেলো এবং প্রধান নেতা সিদু নিজের হাতে ঘুসখোর ইন্সপেক্টরকে খুন করে ফেললো। অন্য সাঁওতালরা পুলিশ দলের আরও আট জনকে খতম করে দিলো।

এইদিন অর্থাৎ ৭ই জুলাই থেকেই প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়। রওনা হওয়ার সময় তারা সম্ভবত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিরোধিতার কথা চিন্তা করেনি। সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের নেতারা সরলভাবে জানিয়েছিলো যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, গভর্নর জেনারেলের পদতলে সেই আবেদন পেশ করার জন্য কলকাতায় যাওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো। সাঁওতালরা সাধারণত মিথ্যা বা অর্ধ-সত্যের আশ্রয় নেয় না; তাছাড়া তাদের এই উক্তি যে সত্য ছিলো, তা তাদের স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে রওনা হওয়া থেকেও প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই অভিযানকে প্রথম দিকে তাদের জাতীয় শোভাযাত্রা থেকে পৃথক করে ভাবারও উপায় ছিলো না; জাতীয় শোভাযাত্রার পুরোভাগেও ঠিক একই ধরনের ঢাক-ঢোল-সিঙ্গা বাদকের দল থাকে; কিন্তু অবিবেচকের মতো পুলিশ হত্যা এবং খাদ্যাভাববশত লুটতরাজ শুরু করায় তাদের অভিযানের প্রকৃতিই বদলে যায়। অর্ধ-সভ্য নিরীহ সাঁওতাল অনেকদিন পর রক্তের স্বাদ পাওয়ায় তার পুরোনো স্বভাব নতুন বিক্রমে জাগরিত হয়ে ওঠে; কিন্তু তবু তাদের কার্যকলাপে সুবিচারের একটি বন্যরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। নেতাদের ওপর যে গায়েবি হুকুম জারি হয়েছিলো, তাতে সমস্ত হিন্দু সুদে কারবারিকে দেখামাত্র খুন করতে বলা হলেও অন্য কারো ওপর কোনোরকম জুলুম করতে নিষেধ করা হয়। ফলে নেতারা অজ্ঞমূর্খ জনসাধারণকে এই মর্মে আশ্বাসও দিয়েছিলো যে, মহান ব্রিটিশ কর্তা তাদের এই কাজ অনুমোদন করবেন এবং লুটের মালের ভাগও নেবেন।

ইঙ্গ-ভারতীয়দের ত্রাস

ভারতের ব্রিটিশ সম্প্রদায় স্বভাবতই ভয়ার্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং একটি বিরাট জাতি পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র জাতি সম্পর্কে অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিলো না। এ জাতীয় আশঙ্কা ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা থাকলে তা যে কি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, জ্যামাইকার সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডেই তার প্রমাণ রয়েছে। ইংল্যান্ডে কয়েক ডজন পুলিশই যে বিক্ষোভের মোকাবিলা করতে পারে, সেই বিক্ষোভই ক্ষেত্রবিশেষে অতিশয় মারাত্মক আকার ধারণ

করতে পারে; বিশেষত যদি লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং হাজার হাজার মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কঠোর শৃঙ্খলার ওপর নির্ভর করে। বিক্ষোভকারীরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবে কিনা, সে প্রশ্ন এখানে আবন্তর। ভারতের ব্রিটিশ সম্প্রদায় ভালোভাবেই জানে যে, ইংল্যান্ড প্রতিশোধ নিতে পারে; কিন্তু একথাও তাদের অজানা নয় যে, ইংল্যান্ডের সাহায্য আসতে খুবই দেরি হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে যারা বাস করে, জ্যামাইকার শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণের মতো বিপদের অতিরঞ্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়; এবং জ্যামাইকার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মতো অকথ্য নির্যাতন চালানোও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস ও আতঙ্কের কবলিত হওয়ার যে প্রবণতা রয়েছে, তা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব সরকারের ওপরই ন্যস্ত থাকে এবং ভারত সরকার ও ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে পূর্ণ সমঝোতা সৃষ্টির পথে যে অসংখ্য স্থায়ী কারণ বাধা সৃষ্টি করে থাকে, তার মধ্যে এই কারণের ভূমিকাই এখন সবচেয়ে প্রবল। ভারত সরকার গোড়া থেকেই তাদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ছিলে; কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তারা এ ব্যাপারে বিপরীত প্রান্তেও উপনীত হয়েছেন; কারণ বাইরের লোকেরা যখন বিপদকে অতিরঞ্জিত করেছেন, সরকার তখন তাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করেছেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ও সরকার এই মনোভাব পোষণ করছিলেন এবং একজন সমসাময়িক লেখক উল্লেখ করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত যখন আঘাত হানা হলো, তখন বিদ্রোহীদের আশি মাইল এলাকার মধ্যে বারো শ' সৈনিককে দেখা গেল না।[৭০] পুরো পনেরো দিন যাবৎ সাঁওতালরা পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর সর্বত্র অগ্নিকাণ্ড, লুটতরাজ ও নরহত্যা চালিয়েছিলো। নেতারা আর শেষ পর্যন্ত এই সশস্ত্র সাঁওতালদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। জুলাই মাস শেষ হওয়ার আগেই বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়, হাজার হাজার গৃহপালিত পশু ইতস্তত বিতাড়িত হয়, আমাদের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে আসে এবং দু'জন ব্রিটিশ মহিলাসহ কয়েকজন ইংরেজ নিহত হন। ইংরেজদের বহু কারখানা ও ব্যবসাকেন্দ্র সাঁওতালদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিতে হয় এবং ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের নৃশংসতা যে ১৮৫৫ সালে অনুমান করা যায়নি, তার প্রধান কারণ হচ্ছে সাঁওতালদের নিরীহ প্রকৃতি, সুযোগের অভাব নয় এবং এই সময় একজন মাত্র সাঁওতাল নেতা, তাও স্বভাবত আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজদের ওপর হামলা করেছিলো। সরকার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলো বটে; কিন্তু তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এবং বেশকিছুদিন যাবৎ নদীপথে অগ্রসর হওয়ার কথা কারো পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব ছিলো না। বিদ্রোহ দমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণকারী জনৈক অফিসার লিখেছেন, 'আমার রেজিমেন্ট যখন ব্যারাকপুরে ছিলো, সেই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা কর্নেল আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং পাহাড়িরা বিদ্রোহ করায় পরদিন সকালে একদল সৈন্য নিয়ে আমাকে বীরভূম জেলার রানীগঞ্জে রওনা হয়ে যেতে আদেশ দিলেন। আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না; এ বিষয়ে সামরিক মহলে কখনো আলোচনা হয়েছে বলেও

৭০. বিবরণের এই অংশটি আমি প্রধানত সমসাময়িক সংবাদপত্র 'ফ্রেণ্ড অফ ইন্ডিয়া', 'দি ইংলিশম্যান', 'হরকরা' ও 'ক্যালকাটা রিভিউ' থেকে সংগ্রহ করেছি।

আমি শুনিনি। পরদিন খুব ভোরে চারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমি রওনা হয়ে গেলাম এবং সকালের নাশতার সময়ের মধ্যে ট্রেনযোগে বর্ধমান পৌছে গেলাম। সেখানে কমিশনার (প্রদেশের এই বিভাগের প্রধন বেসামরিক অফিসার) আমার কাছে এলেন এবং আশু হামলার উপক্রম দেখা দেয়ায় আমাকে সরাসরি বীরভূমের রাজধানী শিউড়ি রওনা হয়ে যেতে আদেশ দিলেন। শিউড়ির কাছাকাছি পৌছে আমরা দেখলাম, প্রত্যেকটি গ্রামে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। হিন্দুরা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে সজল চোখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো এবং আমার ক্লান্ত সেপাইদের মিঠাই ও চিড়া-মুড়ি দিতে লাগলো। আমরা সুরিতে পৌছে শোচনীয় অবস্থা দেখতে পেলাম। একজন অফিসার রাতদিন ঘোড়ায় মোতায়েন রয়েছে; জেলখানায় দ্রুত পাহারা বসানো হয়েছে এবং শুনতে পেলাম ট্রেজারির সমস্ত টাকা-পয়সা নাকি একটি পাতকুয়োর মধ্যে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে।'[৭১]

কেন্দ্রীয় নীরবতার আধিক্য

কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আতঙ্কের অস্তিত্ব স্বীকার করলেন না। কারণ তারা কেবলমাত্র সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই কাজ করতে পারেন এবং এই সাক্ষ্য প্রমাণ কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষই সরবরাহ করতে পারেন; কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে শীতল ছিলেন এবং আরও শীতল ভাষায় তথ্য সরবরাহ করছিলেন। প্রাদেশিক সরকারের নথিপত্র থেকে ঘটনা সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা খুবই অপর্যাপ্ত। কারণ ভারতীয় অফিসারগণ ত্রাস জড়ানো আদৌ পছন্দ করেন না এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত অফিসারগণ ঝড়ের ভয়াবহ সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই অনুমান করতে পারেননি; ফলে শেষ পর্যন্ত ঝড় যখন ভয়াবহ আকারেই দেখা দিল, তখন সকলের মধ্যেই তাকে ছোটো করে দেখানোর প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠলো। তবে সত্য গোপন করার কোনো ইচ্ছা তাদের ছিলো না এবং এমন কি তাদের রিপোর্টে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে পারে, সে ধারণাও তাদের ছিলো না। ঘটনার যেকোনো বিষয় সম্পর্কে তাদের নির্ভুলতা সন্দেহের অতীত; তবে এই ঘটনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময়ই তাদের ছোটো করে দেখানোর প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র কয়েক মাস আগে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, তাদের এলাকায় অপরাধ কমে গেছে, নতুন ও অধিক ক্রিয়াশীল পুলিশ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, জনসাধারণ আগের চেয়ে সুখে-শান্তিতে আছে এবং জেলায় আগের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধি এসেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে যারা এই রিপোট লিখেছিলেন, তাদের পক্ষে উপলব্ধি করতে সময় লেগেছিলো যে, জুলাই মাসে তাদের জেলায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে ঘরবাড়ির ওপর পাঁচ থেকে পঞ্চাশ জন লোকের রাত্রিকালীন হামলা এমন কিছু অভিনব ঘটনা নয়; ফলে এই জাতীয় ঘটনা যে কখন সাধারণ অপরাধ থেকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হয়, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বাঙালিদের একটি গ্রামে লুটতরাজ

৭১. মেজর বিনসেন্ট জার্ভিসের ব্যক্তিগত বিবরণ। অন্যান্য দলিলের সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপিটি আমি এই অধ্যায় রচনার সময় ব্যবহার করেছি। পাতকুয়ায় ট্রেজারির টাকা রাখার ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি সরকারি নথিপত্রে কোনো সমর্থন পাইনি।

সম্পর্কে বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছেন, 'সমগ্র তদন্ত থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে সচরাচর যা ঘটে থাকে এই ঘটনাটিও সেই জাতীয়; ডাকাতরা দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসী, বাঙালি গ্রামবাসী অসহায় ও কাপুরুষ এবং গ্রামের পাহারাদাররা ঘটনার সময় গরহাজির।'[৭২] এ ঘটনাটি সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হয়েতো সত্য হতে পারে; কিন্তু অনুরূপ বহু ঘটনার ক্ষেত্রে তিনি যে বিদ্রোহকে ডাকাতি বলে মনে করেছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটই যতোদিন সম্ভব অস্বীকার করে এসেছেন যে, তার জেলায় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা হয়েছে এবং বিদ্রোহী হিসেবে যাদের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিলো তাদের তিনি সিঁদেল চুরি, অথবা 'লুণ্ঠন ও গুরুতর শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মারমুখো অবস্থায় বেআইনিভাবে দলবদ্ধ' হওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছেন। বাইরে যখন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতো, আদালতে তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এই প্রহসন চলতো। কারণ জেলা অফিসারের পক্ষে একথা স্বীকার করা খুবই বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর যে, জনসাধারণ বিদ্রোহ করেছেন এবং তার হাত থেকে কর্তৃত্ব চলে গেছে। এই সকল রিপোর্ট পড়ার পর সরকারের তাই আতঙ্কিত না হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিলো। সরকার সেনাবাহিনী পাঠালো বটে; কিন্তু সামরিক আইনের তীব্রতা এড়ানোর জন্য গত শতাব্দীতে সীমান্ত জেলাগুলোর বিশৃঙ্খলা দমনের নজির অনুসারে সেনাবাহিনীকে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিলেন; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় তারা একটি বিষয় ভুলে গেলেন যে, ১৭৮৮ সালের মি. কিটিংয়ের মতো কালেক্টর আর ১৮৫৫ সালের একজন কালেক্টরের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। মি. কিটিং আইনশাস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানতেন না; কিন্তু কোন্ কোন্ ঘাট রক্ষা করা দরকার তা তিনি নিখুঁতভাবে বাছাই করেছিলেন, সেনাবাহিনীকে সেই অনুসারে ভাগ করেছিলেন এবং তাদের গতিবিধিও দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে ১৮৫৫ সালের কালেক্টর একজন পারদর্শী আইনবিদ, জেলার শাসনও অনেক সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে থাকেন; কিন্তু সামরিক কলাকৌশল সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না এবং এখন তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হলো, তা পলনের জন্য তার কোনো যোগ্যতা ছিলো না এবং আছে বলে তিনি কোনো ভাণও করলেন না। সামরিক বিজয়ে তার আচরণের জন্য তিনি তার অধীনে কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈনিকদের কাছে হাস্যস্পদ হয়ে উঠলেন; ফলে ব্রিটিশ শিবিরে মতভেদ দেখা দিলো এবং বিদ্রোহীরা মহানন্দে লুটতরাজ ও খুনখারাবি চালিয়ে যেতে লাগলো।

সামরিক বাহিনী নিয়োগ

সরকার উপলব্ধি করলেন যে, কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তাই জুলাই মাসের ২৫ তারিখের দিকে তারা বিদ্রোহ দমনের ভার একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির[৭৩] ওপর

৭২. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট প্রেরিত বীরভূমের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট; ৮ই নভেম্বর, ১৮৫৫। বীরভূম জুডিসিয়াল রেকর্ডস।

৭৩. জেনারেল লয়েড।

অর্পণ করলেন; এবং তাকে যে নির্দেশ দিলেন তা প্রকৃতপক্ষে উপদ্রুত জেলাগুলো সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেয়ারই শামিল; কিন্তু তারপরই সরকার কোমলতা অবলম্বন করলেন, আদেশ প্রত্যাহার করলেন, বা তার নতুন ব্যাখ্যা দিলেন; এবং সেনাপতির স্বাধীন ক্ষমতা প্রত্যাহার করলেন। সরকারি চিঠিতে লেখা হলোঃ 'সেনাবাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ছাড়াই স্বাধীনভাবে আমাদের নিজস্ব প্রজাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এমন কিছু আমরা আশা করতে পারি না; তবে বিদ্রোহ দমন করা এবং বিদ্রোহীদের আটক বা ছত্রভঙ্গ করার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সেনাপতির ওপরই ন্যস্ত থাকবে।[৭৪]

এই অসম্পূর্ণ ক্ষমতাও সৈনিকদের মনে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করলো এবং তারা উদ্দেশ্যসাধন করতে সক্ষম হবে বলে প্রতীয়মান হলো। সৈন্যরা দলে দলে পশ্চিম দিকে যেতে লাগলো, দেশভক্ত দেশীয় জমিদাররা তাদের ভাড়াটে সৈন্যদের হাতে অস্ত্র দিয়ে কুচকাওয়াজ করাতে লাগলেন;[৭৫] ইংরেজ নীলকররা সৈন্যদের যাওয়ার খরচ দিলেন;[৭৬] মুর্শিদাবাদের নওয়াব একটি সুদক্ষ হাতি দিলেন, তার যাবতীয় খরচ বহন করলেন;[৭৭] এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে একজন স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত করা হলো।[৭৮]

যে সীমান্ত যুদ্ধে শৃংখলাবদ্ধ সেনাবাহিনী স্বল্পমাত্র চাষীদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, তা বিস্তারিত বিবরণ এমনিতেই খুব উপাদেয় নয়; তদুপরি এই জাতীয় যুদ্ধে বিজয়ীদের খুব গৌরব নেই, আর সামরিক বিষয়েও কিছু শিক্ষণীয় নেই। সাঁওতাল দমনে যে সকল অফিসার সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তের বছর অতীত হওয়ার পর তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়ার আশা করাও বৃথা। তবে একজন অফিসার আমাকে বলেছেন, 'ওটা আসলে যুদ্ধ ছিলো না, আমরা যা করেছিলাম তা হচ্ছে হত্যাকাণ্ড। কোনো গ্রামে গাছপালার ওপর দিয়ে ধোঁয়া দেখা গেলেই আমাদের সেখানে যাওয়ার নির্দেশ ছিলো। ম্যাজিস্ট্রেটও আমাদের সঙ্গে যেতেন। আমি সেপাইদের নিয়ে গ্রাম ঘেরাও করতাম এবং ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বলতেন। একবার পঁয়তাল্লিশ জন সাঁওতাল একখানা মাটির ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলো। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন; কিন্তু তারা তার জবাবে আধ-খোলা দরজা দিয়ে এক ঝাঁক তীর ছুঁড়ে মারলো।

---

৭৪. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট প্রেরিত বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারির পত্র; তারিখ, ফোর্ট-উইলিয়াম, ৩০শে জুলাই, ১৮৫৫। বর্ধমান রেকর্ডস।

৭৫. বীরভূমের জমিদার বাবু বিপাচরণ চক্রবর্তীর নিকট প্রেরিত সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপক পত্র, ২রা অক্টোবর, ১৮৫৫। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৭৬. বীরভূমের অস্থায়ী কালেক্টরের নিকট প্রেরিত বর্ধমানের কমিশনারের পত্র; ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৭৭. সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত স্পেশাল কমিশনারের পত্র, তারিখ বহরমপুর, ২২শে আগস্ট, ১৮৫৫।

৭৮. ক্যাপ্টেন আর. ডি. ম্যাকডোনাল্ডের নিকট প্রেরিত স্পেশাল কমিশনারের পত্র; ২১শে আগস্ট, ১৮৫৫।

আমি বললাম; 'মি. ম্যাজিস্ট্রেট, আপনি সরে যান'; তারপর সেপাইদের নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। সেপাইরা দেয়াল কেটে একটা বড়ো ছিদ্র করলো আমি বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বললাম এবং জানিয়ে দিলাম যে, কথা না মানলে আমি ঘরের মধ্যে গুলো চালাবো। দরজাটা আরেকবার একটু খুলে গেলো এবং সেই ফাঁক দিয়ে এক ঝাঁক তীর তীব্রবেগে বেরিয়ে এলো। কয়েকজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে ছিদ্রপথে ঘরের মধ্যে গুলো চালিয়ে দিলো। আমি আবার তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললাম, আর এদিকে তখন সেপাইরা বন্দুকে গুলো ভরতে লাগলো। আবার দরজাটা একটু খুলে গেলো এবং আরেক ঝাঁক তীর বেরিয়ে এলো। কয়েকজন সেপাই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো; আমাদের চারদিকে সারাটা গ্রামই তখন আগুনে জ্বলছে; ফলে সেপাইদের আমি তাদের কর্তব্য করার আদেশ দিলাম। প্রত্যেক ঝাঁক তীরের জবাবে আমরা এক ঝাঁক করে বুলেট দিতে শুরু করলাম; তারপর শেষকালে যখন দরজাপথে তীরের প্রবাহ কমে গেলো, তখন আমি সম্ভব হলে দু-একজনকে জীবন্ত আটক করার আশায় ঘরে ঢুকে গেলাম। সেপাইরাও আমার সঙ্গে ঢুকলো। ভেতরে ঢুকে আমরা দেখতে পেলাম একজন মাত্র বুড়ো মানুষ লাশের গাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তার সমস্ত দেহ রক্তে ভিজে গেছে। একজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে তার অস্ত্র ফেলে দিতে বললো; কিন্তু বুড়ো বাঘের মতো লাফিয়ে এসে সেপাইটির ঘাড়ের ওপর পড়লো এবং কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে তাকে খতম করে ফেললো'।[৭৯]

তিনি আর বলেছেন, 'ওটা যুদ্ধ ছিলো না; সাঁওতালরা নতি স্বীকার করতে জানে না। যতোক্ষণ তাদের জাতীয় ঢাক-ঢোল বাজবে, ততোক্ষণ তারা খালি হাতে হলেও দাঁড়িয়ে থাকবে এবং নীরবে আমাদের গুলো খাবে। তাদের তীরে আমাদের সেপাইরা প্রায় মারা পড়তো, অতএব যতোক্ষণ তারা খাড়া থাকতো, ততোক্ষণ আমাদের গুলো চালাতে হতো। তাদের ঢাক-ঢোলের বাজনা থামলে তারা প্রায় সিকি মাইল মতো পিছিয়ে যেতো; কিন্তু আবার বাজনা বেজে উঠতো এবং আমরা এগিয়ে গিয়ে গুলো না চালানো পর্যন্ত তারা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতো। আমাদের মধ্যে এমন একজন সেপাইও ছিলো না যে সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের কাছেই লজ্জিত হয়নি। আমরা যাদের আটক করতে পেরেছিলাম, তাদের অধিকাংশ আহত হয়েছিলো। আমরা লড়াই করায় তারা আমাদের ভর্ৎসনা করতো। তারা বলতো যে, তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে লড়ছে; ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়। তারা আরও বলতো যে, তাদের অভাব-অভিযোগ বুঝতে পারে এমন একজন ইংরেজও যদি তাদের কাছে পাঠানো হতো এবং তিনি যদি তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করতেন তাহলে কোনোমতেই লড়াই হতো না। সাঁওতালরা বিষাক্ত তীর ব্যবহার করেছিলো বলে যে অভিযোগ করা হয়, তা আদৌ সত্য নয়। তাদের মতো সত্যবাদী মানুষ আমি জীবনে কখনো দেখিনি; তাদের সাহস অপূর্ব। আমার একজন লেফটেন্যান্ট পঁচাত্তর জন সাঁওতাল খতম করার পর তাদের বাজনা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলো; তারপর তারা পিছু হটে যায়।'

---

৭৯. মেজর জার্ভিসের ব্যক্তিগত বিবরণ।

সামরিক শান্তি

এই কঠোর ব্যবস্থার ফলে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিদ্রোহীরা সমতল ভূমি থেকে পালিয়ে যায়। ফলে একমাত্র নেতাদের ছাড়া অন্য সকলকে ক্ষমা করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে আংশিক ক্ষমতা দেয়া হলেও বেসামরিক অফিসারগণ বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারেননি; এখন তারা সুযোগ পেয়ে জানালেন যে, সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা রাখার আর প্রয়োজন নেই। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট লিখলেন 'গত সাত সপ্তাহ যাবৎ সমগ্র পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। গ্রামবাসীরা নিজ নিজ ঘরবাড়িতে ফিরে এসেছে এবং চাষীরা নিয়মিতভাবে চাষ-আবাদ শুরু করেছে। সাঁওতালদের আর এখন কোথাও দেখা যায় না ... তারা প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে আরেক জেলায় পালিয়ে গেছে।'[৮০] কিন্তু এই শান্তভাব সাময়িক মাত্র ছিলো এবং ঠিক এক মাস পরে একই অফিসার লিখেছেন যে, 'গত পনেরো দিনের মধ্যে বিদ্রোহীরা আশিখানিরও বেশি গ্রাম লুটতরাজ করেছে ও জ্বালিয়ে দিয়েছে।'[৮১] এছাড়া পথিমধ্যে ডাক আটকানো হয় এবং জেলার সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অংশ বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। তিন হাজার সাঁওতালদের একটি দল জেলার মধ্য দিয়ে এক পথে এবং সাত হাজার সাঁওতালের আরেকটি দল আরেক পথে সমস্ত কিছু তছনছ করতে করতে এগিয়ে আসে; বেসামরিক কর্তৃপক্ষ মফস্বল এলাকাগুলো থেকে পশ্চাদপসরণ করে, চাষীরা তাদের ঘরবাড়ি জমিজমা ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং সরকারের ক্ষমার ঘোষণা সাঁওতালদের কাছে উপহাস ও ব্যঙ্গর বস্তুতে পরিণত হয়। সাঁওতাল ও হিন্দুদের মাঝামাঝি স্থানীয় কয়েকটি আধা-উপজাতীয় সম্প্রদায় এবং খোদ হিন্দুদেরই কয়েকটি নিচু বর্ণের লোকেরাও এ সময় বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং অক্টোবর মাসের মহোৎসব[৮২] সম্পন্ন করার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এমন কি সাফল্যের সময়ও সাঁওতালদের মধ্যে বীরোচিত গুণের অভাব দেখা যায়নি; কারণ কোনো শহর লুট করার আগে তারা তাদের মতলবের কথা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ারি দিতো। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে (২২ বা ২৩ তারিখে) বীরভূমের রাজধানীতে এ ধরনের একটি হুঁশিয়ারি এসে পৌঁছায় এবং আশু লুটতরাজের আশঙ্কায় সমগ্র শহরে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এই সময় একদিন একজন ডাক-হরকরা এসে জানালো যে, সাঁওতালরা তাকে পথে আটক করে ডাকের থলি কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের জাতীয় গাছ শালের একটি শাখা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছে দেয়ার শর্তে তাকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট এই শালের শাখাটি পাওয়ার পর সরকারকে জানালেন যে,

---

৮০. কমিশনারের নিকট প্রেরিত পত্র, ২৪শে আগস্ট, ১৮৫৫, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। ইতোপূর্বে অন্যান্য উপদ্রুত জেলার অফিসারগণও অনুরূপ রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। এই সকল রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার স্থির করে যে, 'বিদ্রোহীরা বহুলাংশে আক্রমণ ত্যাগ করেছে' এবং তাদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের বিশেষ কিছুই আর করণীয় নেই। স্পেশাল কমিশনারের নিকট প্রেরিত ১৮০৮ নম্বর পত্র। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস ও ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

৮১. বর্ধমানের কমিশনারের নিকট প্রেরিত বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেটের পত্র; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫।

৮২. দুর্গা পূজা।

শাখাটিতে তিনটি মাত্র পাতা আছে, অর্থাৎ তাদের হামলার আর মাত্র তিন দিন বাকি আছে।'

এই সাধারণ বিপদের সময়ও সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ অব্যাহত রইলো।সেনাবাহিনীর প্রকৃত অভিযানের বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারের বাইরে ছিলো বটে; কিন্তু সামরিক আইন ঘোষিত না হওয়ায় প্রত্যেকটি সামরিক অফিসারই তার কাজের জন্য বেসামরিক অফিসারদের কাছে দায়ী ছিলেন। কিন্তু বেসামরিক অফিসারদের ক্ষমতা কখনো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি; ফলে প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতো এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে এ নিয়ে ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ হতো।

সামরিক আইন জারি : বিদ্রোহ দমন

পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে চার মাস যাবৎ লুটতরাজ চলার পর নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সরকার অনিচ্ছার সঙ্গে সামরিক আইন জারি করলেন। কোনো এলাকা সেনাবাহিনীর দখলে যাওয়ার পর সেখানকার অধিবাসীদের ওপর যে কঠোরতা আরোপ করা হয়, সরকার তা বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু সরকারের এই উদারতার ফলে আমাদের সেনাবাহিনীর বদলে বিদ্রোহীরাই জায়গা দখল করতে লাগলো। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে স্থানীয় অফিসারগণ প্রথমে সেনাবাহিনীকে নির্বিবাদে কাজ করতে দিয়েছিলেন; কিন্তু তারপরই সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ায় তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন এবং নানাভাবে তাদের ক্ষমতা খর্ব করে থাকেন; এই অবস্থার ফলে একদিন তারা দেখতে পেলেন যে, ক্ষমতা তাদের হাতেও নেই, সেনাবাহিনীর হাতেও নেই; সকল ক্ষমতা বিদ্রোহীরাই করায়ত্ত করে ফেলেছে। কিন্তু সামরিক আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হলো, অফিসারদের রেষারেষির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার ও কালেক্টরের মধ্যে একমাত্র রসদ সরবরাহের বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেলো। সেনাবাহিনী কয়েকটি ঘাঁটির সাহায্যে এক-একটি ব্যূহ রচনা করলো এবং কোনো কোনো ব্যূহে বারো থেকে চৌদ্দ হাজার সৈন্য[৮৩] সমাবেশ করলো। কয়েকদিনের মধ্যেই সাঁওতালরা সমতল ভূমি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়ে গেলো এবং ছয় সপ্তাহ সময়ের মধ্যে জঙ্গল থেকে আহত লোকদের কুড়িয়ে আনা ছাড়া আর কোনো কাজ রইলো না। ১৮৫৫-৫৬ সালের শীতকাল শেষ হওয়ার আগেই বিদ্রোহীরা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই হাজার হাজার সাঁওতালকে আবার নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে যোগ দিতে দেখা গেলো।

স্থানীয় অফিসারদের রিপোর্টে বিভ্রান্ত হওয়ায় এবং জনসাধারণের প্রতি উদার হওয়ার চিরন্তন নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় বিদ্রোহ দমনের ব্যাপার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলেও সরকার অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান এবং তা দূর করার চেষ্টা করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না। ইতোপূর্বে যে সস্তা ও বাস্তব শাসনের জয়গান শোনা যেতো, সরকার সেই শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কই ব্যাপক তদন্তের আদেশ দিলেন।

---

৮৩. বীরভূমের কালেক্টরের নিকট প্রেরিত বীরভূম ও বাঁকুড়া সীমান্ত বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার আর. এস. বার্ডের পত্র; ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৫৫। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

সাঁওতালরা আদালতগুলোর দূরত্ব সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলো; আর সরকারের নিজস্ব কর্মচারীরাই এখন রিপোর্ট দিলেন যে, সাঁওতাল সীমান্ত বরাবর এলাকায় 'ইংরেজ অফিসারের সংখ্যা খুবই কম এবং তারা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকেন; ফলে তাদের অধীনে যে বিরাট এলাকা রয়েছে, তা ভালোভাবে তদারক করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না'।[৮৪] একটি বিষয় খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থায় ব্যয় সংকোচের অর্থ ছিলো বিনিময়ে কিছু না দিয়েই খাজনা আদায় করা। এই ব্যয় সংকোচের ফলেই বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এই বিদ্রোহের জন্য মাত্র ছয় মাসে যে অর্থ ব্যয় হয়, তার সাহায্যে অন্ততপক্ষে দশ বছরকাল উন্নত ধরনের শাসনের ব্যয়নির্বাহ করা যেতো। শান্তি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন গভর্নর তার পূর্ববর্তী শাসকদের ভুল সংশোধনের কাজে হাত দিলেন। তিনি সাঁওতাল এলাকাটিকে একটি জেলায় পরিণত করলেন এবং আগের একজন অধস্তন কর্মচারীর স্থলে সিভিল সার্ভিসের একজন পারদর্শী শাসকের ওপর এই নতুন জেলার শাসনভার অর্পণ করলেন। আগের পুলিশ বাহিনী নিরীহ চাষীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করতো; ফলে তাদের প্রত্যাহার করে ইংরেজ অফিসার নিয়োগ করা হলো। এই ইংরেজ অফিসাররা জেলার প্রধান কেন্দ্রগুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়াও নিয়মিতভাবে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে অবস্থা তদারক করতে শুরু করলেন। সুবিচার সস্তা করা হলো এবং প্রত্যেকটি মানুষ প্রায় তার বাড়িতে বসেই সুবিচার পেতে লাগলো। সমসাময়িক লেখকগণ এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অভিযোগ করেছেন যে, বিদ্রোহীদের সকল দাবি মেনে নিয়ে সরকার প্রকারান্তরে বিদ্রোহটিই অনুমোদন করেছেন।

বাইরের লোকের মতামতের প্রতি বাংলা সরকারের চিরন্তন শীতলতার ফলে বিদ্রোহের গোড়ার দিকে অবিজ্ঞজনোচিত উদারতা প্রদর্শিত হলেও, শেষের দিকে তার ফলে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ প্রতিহত হয়েছিলো। যারা ছয় মাস যাবৎ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছে এবং কলকাতার একশ' মাইলের মধ্যে শহর জ্বালিয়েছে ও একাধিক জেলা দখল করেছে, তাদের জন্য জনসাধারণ কোনো শাস্তিকেই অতিরিক্ত নির্মম বলে মনে করে না। ঘটনার সমসাময়িক উত্তেজনার মধ্যে লেখা যে সকল প্রবন্ধ তখন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো, তা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব সঙ্গত হবে না; কিন্তু ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ যে কতো তীব্র ও গভীর ছিলো 'রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। প্রবন্ধটি সমস্ত উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর অবসর মুহূর্তে লেখা হয় এবং যে পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়, তার স্থান সুযোগ্য ভাগেই ভারতীয় সাময়িকীগুলোর শীর্ষদেশে। এই প্রবন্ধে বলা হয়, 'একজন বন্য বর্বরকে সহসা মানব সমাজে তার উচ্চতর সম্প্রদায়ের মর্যাদায় প্রবেশাধিকার দেয়া হলে, সদ্য জঙ্গল থেকে ধরে আনা একটি প্রাপ্তবয়স্ক বাঘের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না।' অর্থাৎ সাঁওতালদের অভাব-অভিযোগ বা তাদের শান্তিপূর্ণ পরিশ্রমী প্রকৃতি সম্পর্কে কেউ কিছুই জানতো না। সকলে 'প্রাপ্তবয়স্ক বাঘ' অথবা 'রক্তপিপাসু বর্বর' বলেই জানতো; প্রবন্ধ-লেখক তাই প্রকৃতবিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়ার প্রচলিত ব্যবস্থাকে অপর্যাপ্ত বলে অভিহিত করেছেন এবং দুই-একজন

৮৪. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট প্রেরিত বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের যুক্ত রিপোর্ট; নম্বর ১৪৫, তারিখ ২৮শে আগস্ট, ১৮৫৫। বীরভূম রেডিনিউ রেকর্ডস।

দলপতিকে নয়, উপদ্রুত জেলাগুলোর সমস্ত অধিবাসীকেই কালাপানিতে পাঠানোর প্রস্তাব করেছেন।[৮৫]

মুষ্টিমেয় ইংরেজ ভারতে যে মর্যাদা উপভোগ করছেন, এ জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এই মনোভাব ছড়া আর কি আশা করা যেতে পারে! তবে সুখের বিষয় তাদের মনোভাব সরকারের কার্যক্রম কোনোমতেই প্রভাবিত হয়নি। সাঁওতালরা নিয়মিত বিচারের সুযোগ পেয়েছিলো; এবং প্রকৃতপক্ষে যারা বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলো, কেবলমাত্র তারাই শাস্তিভোগ করেছিলো। বিচারের সময় তাদের প্রায় সকলেই অপূর্ব সাহসিকতার পরিচয় দেয় এবং গর্বের সঙ্গে নিজ নিজ কার্যকলাপের বিবরণ দিয়ে জানায় যে, সরকারের অজ্ঞতাই যুদ্ধের একমাত্র কারণ। বীরভূম জেলে তাদের একজন দলপতি বলে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা আমাদের বাধ্য করেছো। আমরা তোমাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত দাবিই করেছিলাম; কিন্তু তোমরা কোনো জবাব দাওনি। তারপর আমরা যখন অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিকার পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, তখন তোমরা আমাদের জঙ্গলের চিতাবাঘের মতো গুলো করে মেরেছো।'[৮৬]

দাসপ্রথা বিলোপ

প্রশাসনিক অকর্মণ্যতাই ছিলো সাঁওতালদের অভাব-অভিযোগের মূল উৎস; ফলে বিদ্রোহের পর উন্নত ধরনের শাসন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সকল অভিযোগের দ্রুত অবসান ঘটে। সুদে কারবারের ব্যাপারে অনিষ্টকর ও ক্রিয়াশীলতাহীন আইনের আশ্রয় না নিয়ে কারবারিদের আচরণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যার ফলে অতিরিক্ত সুদ বলপূর্বক টাকা আদায়ের অপরাধে পরিণত হয়ে পড়ে। হিন্দু মহাজন যতো 'খুশি বেশি সুদ দাবি করুক না, সে যাতে আগের মতো একই ঋণ দু'বার বা তিনবার আদায় না করতে পারে, সেজন্য কঠোর আইন চালু করা হয়; তাছাড়া ফাঁকিবাজ মহাজনদের প্রত্যেকটি টাকার জন্য রসিদ দিতে বাধ্য করারও ব্যবস্থা করা হয়। আদালত এখন অতি নিকটে অবস্থিত হওয়ায় এদিকে সাঁওতালরা যেমন মনোবল ফিরে পায়, অন্যদিকে মহাজনরাও তেমনি মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়ে। পুলিশ কঠোরভাবে পরীক্ষা করে ফাঁকিবাজি সের-বাটখারা আটক করতে থাকে এবং সাঁওতালরা জীবনে এইবারই সর্বপ্রথম প্রতারিত হওয়ার ভয় না করে নিশ্চিন্ত মনে খোলাবাজারে বেচাকেনা করতে সক্ষম হয়। সঙ্গে সঙ্গে দাসপ্রথাও লুপ্ত হয়ে যায়। আদালত দাসপ্রথা সম্পর্কিত ১৮৪৩ সালের আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন এবং ১৮৫৮ সালের মধ্যে সকলেই বুঝতে পারে যে, কোনো দাস পালিয়ে গেলে বা কাজ করতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে মহাজন আইন অনুসারে প্রকৃতপক্ষে কিছুই করতে পারে না। রেলপথের কাছে শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় মূলধনের সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক একেবারেই বদলে গেলো। কিছুদিন আগেও একজন সাঁওতালের পক্ষে দাস হওয়া বেশ ভালো কাজ বলেই পরিগণিত হতো; কিন্তু এখন সে স্বাধীন মানুষের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম। স্বাধীন শ্রমিকের মজুরির অভাবই দাসপ্রথার প্রধান ও স্বাভাবিক কারণ; এখন মজুরির অভাব না হওয়ায় দাসপ্রথা স্বভাবতই বিলুপ্ত হয়ে গেলো। ইংরেজরা যে দুনিয়ার দূরতম কোণেও কিভাবে বিরাট কাজ চালাতে পারে, ভারতীয় রেলওয়েকে প্রায়ই তার প্রমাণ হিসেবে

---

৮৫. 'ক্যালকাটা রিভিউ; মার্চ, ১৮৫৬।

৮৬. 'ট' পরিশিষ্টে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকারি কাগজপত্র দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই প্রমাণ নিঃসন্দেহে অখণ্ডনীয়; কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকেরা মনে করেন যে, রেলপথের সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ সম্প্রসারণ যতোখানি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে মূলধন ও শ্রমের ভারসাম্য রক্ষা এবং তার ফলে দাসপ্রথার অবসান।

চা-বাগানের কাজ

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে একটি নতুন পণ্য আবিষ্কৃত হয় এবং তার ফলে ভবিষ্যতে সাঁওতাল এবং পশ্চিমের অনুরূপ অন্যান্য জাতির অবস্থার আরও উন্নতি ঘটে। আসাম ও তার নিকটের এলাকাগুলোতে বনে জঙ্গলে প্রচুর চায়ের গাছ জন্মাতে দেখা যায়। চায়ের আবাদের প্রথম প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণ মুনাফা হয়; কিন্তু শ্রমিকের অভাবে ব্যাপক আকারে আবাদ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলটি বিশ্বের সর্বাধিক উর্বর এলাকা; অথচ তা অনাবাদী অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং সেখানে লোকজনও নেই। পুঁজিপতিদের সহসা পশ্চিমের জনবহুল পাহাড়ি এলাকার কথা মনে পড়লো। ফলে তারা সেখান থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। বহুসংখ্যক লোককে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হলে সর্বত্রই তদারকের দরকার হয়; কিন্তু ভারতের এই তদারক যদি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের না হয়; তাহলে বহু লোক মারা যায়। উপত্যকার স্থলপথে ও পূর্বাঞ্চলের নদীপথে সফরের বিপদ-আপদ সম্পর্কে পাহাড়িরা কিছুই জানতো না; যে সকল ঠিকাদার এই সফরের তদারক করতো তারাও তেমন কিছু জানতো না। কুলি সংগ্রহের কাজ যতোই বাড়তে লাগলো, তাদের নিয়ে যাওয়ার উপায়ও ততোই অপর্যাপ্ত হয়ে পড়তে লাগলো। বহু কুলি একত্রে ভিড় করে খোলা নৌকায় বা স্টিমারে রওনা হতো; কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা নিজেও যেমন সজাগ ছিলো না, তাদের ঠিকাদাররাও তেমনি নজর দিতো না। ফলে পথেই বহু লোক মারা যেতো। কয়েকটি যাত্রায় এতো বেশি লোক মারা গেল যে, শেষপর্যন্ত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার কুলি স্থানান্তরিত করার সমস্ত বিষয়টি সরকারি অফিসারদের তদারকের অধীন করে দিলেন। মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বা বাধ্য করে কোনো লোককে যাতে গ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া না যায়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হলো। প্রত্যেকটি কুলিকে জেলা ত্যাগ করার আগে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে হতো। তিনি তার সম্ভাব্য কাজের প্রকৃতি বুঝিয়ে দিতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন যে, সে যেতে ইচ্ছুক কিনা। ঠিকাদার যদি তাকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে এনে থাকে, তাহলে এখানে সে তা বুঝতে পারতো এবং এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যেতে পারতো। ম্যাজিস্ট্রেট ঠিকাদারের কাছ থেকে তার ফিরে যাওয়ার খরচও আদায় করে দিতেন। কুলিদের কাজের মেয়াদ পরে তিন বছর ধার্য করা হয় এবং চা-করার এই তিন বছরের সকল সময় তাদের কাজের নিশ্চয়তা দিতেন। তাদের মজুরি তাদের নিজস্ব এলাকার চেয়ে অন্ততপক্ষে দ্বিগুণ ছিলো। চা বাগানের মালিককে কুলির যাওয়ার ভাড়া, থাকার জায়গা, প্রথম দিকের খাওয়ার খরচ ও চিকিৎসার খরচ দিতে হতো। পরিবারের সকলেই কাজ পেতো; ফলে প্রত্যেকটি অতিরিক্ত সন্তান দারিদ্র্য না বাড়িয়ে আয়ের পথই বাড়িয়ে দিতো। চাষ-আবাদের কাজে শ্রমের ভারই সবচেয়ে হালকা এবং ছেলে হাঁটতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আয় করতে পারে।

অতএব পশ্চিমের পাহাড়িদের মধ্যে দেশত্যাগ করা সঙ্গত কারণেই অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। প্রতি মাসে হাজার হাজার পাহাড়ি তাদের নিজস্ব এলাকা ছেড়ে নতুন জীবনের আশায় দূরতম পূর্বাঞ্চলে রওনা হয়ে যেতো।[৮৭] চা-কররা প্রথম দিকে অভিযোগ করলেন যে, সরকার এতো খুঁটিনাটি বিষয়ে তদারক করেন যে, তা প্রায় অত্যাচারের শামিল। পরে কিছু কিছু পরিবর্তন করে শ্রমিক স্থানান্তরিত করার যে ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হলো, দক্ষতা ও মানুষের সুখ-সুবিধার দিক থেকে দুনিয়ার কোনো দেশেই তার তুলনা নেই। সাঁওতালরা উচ্চ সমতল ভূমির আসল পাহাড়িদের চেয়ে কম কষ্টসহিষ্ণু এবং আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন খাপ খাইয়ে নিতে তাদের কষ্ট হয়; ফলে এই নতুন ব্যবস্থায় অন্য উপজাতিদের যতোখানি উপকার হয়েছে, সাঁওতালদের ঠিক ততোখানি উপকার হয়নি। ঠিকাদারদের মধ্যে শঠ প্রকৃতির লোকেরা দলে দলে সাঁওতাল সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে চা বাগানে অন্য কোনো বেশি কষ্টসহিষ্ণু উপজাতির লোক বলে চালিয়ে দিয়ে থাকে।

এভাবে যারা চা বাগানে কাজ করতে যায় কয়েক বছরের মধ্যেই তারা সঙ্গতিপন্ন হয়ে ফিরে আসে। তাদের অনুপস্থিতির ফলে যারা চা বাগানে না গিয়ে দেশে থেকে যায়, তাদের জীবন সংগ্রামও অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে। একদল যখন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের চা-বাগানে কাজ করতে যায়, আরেকদল তখন কলকাতার পথে সমুদ্র পার হয়ে মরিসাস বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে চলে যায়। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই দূরবর্তী দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রত্যেকে গড়পড়তা কুড়ি পাউন্ড পরিমাণ জমানো টাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসে। নিজের গ্রামে একজন সঙ্গতিপন্ন লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য একজন সাঁওতালের পক্ষে এই টাকাই যথেষ্ট। যারা বেশি পরিশ্রম করতে পারে তারা আরও বেশি আয় করে থাকে এবং কোনো কোনো পরিবার দু'শ' পাউন্ড পর্যন্ত জমানো টাকা নিয়ে দেশে ফিরে থাকে। একজন ব্রিটিশ চাষীর কাছে পাঁচ হাজার পাউন্ড যতোখানি মূল্যবান, পশ্চিম বাংলার একজন পাহাড়ির কাছে দু'শ' পাউন্ডের দাম তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

সাঁওতালরা যে অনুপাতে আর্থিক সঙ্গতি লাভ করেছে সেই অনুপাতে সভ্য হয়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র উত্তরের খুঁটির বেড়ার মধ্যবর্তী আধা-হিন্দু এলাকাতেই তাদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চেষ্টা করা হয়; কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম ছিলো বাংলা ভাষা এবং সাঁওতালরা এই ভাষা আদৌ পছন্দ করতো না। আগ্রহ ও ধৈর্যের দ্বারা যা সম্ভব পাদ্রিরা মিশ্র সাঁওতালদের জন্য তা করেছেন এবং এজন্য সরকারও অর্থ সাহায্য করেছেন। কিন্তু সমগ্র সাঁওতাল জাতিকে সভ্য করে তুলতে হলে একমাত্র সাঁওতাল ভাষার স্কুলের মারফতই তা সম্ভব হতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলে একজন পণ্ডিত পাদ্রি সাঁওতাল ভাষাকে লিখিত রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শব্দসম্ভারসহ একখানি সাঁওতালী ব্যাকরণও প্রকাশ করেছেন এবং নিজের ছাপাখানা থেকে প্রতি মাসে একখানা সাঁওতালী পত্রিকাও প্রকাশ করে থাকেন। তার কাছাকাছি এলাকায় অনেকগুলো স্কুল

৮৭. আমার কাছে পূর্ণাঙ্গ হিসেবে নেই, তবে ১৮৬৫ সালে পদাধিকার বলে কুষ্টিয়ার শ্রমিক সরবরাহ বিষয়ক সুপারিনটেনডেন্ট থাকার সময় আমি হিসেব করেছিলাম যে প্রতি মাসে ৩ হাজার শ্রমিক দেশত্যাগ করে থাকে। জুলাই মাসে ৩৮২৭ জন এবং মে মাসে ৩২৩৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক দেশ ত্যাগ করে, শিশুদের ধরা হলে এই সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার হবে।

স্থাপিত হয়েছে এবং সাঁওতালরা দলে দলে সেখানে তাদের মাতৃভাষা শিখতে যায়। কিন্তু অর্থাভাবে তার কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে, সরকার যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য না করেন, তাহলে এ মহান প্রচেষ্টা আর সম্প্রসারিত হতে পারবে না।

অজ্ঞানতার বিপদ

বীরভূমের পাহাড়িদের সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি; কারণ প্রথমত, তাদের ভাষা ও রীতি-রেওয়াজ বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যকার অনার্য ভাবধারার ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে এবং দ্বিতীয়ত, তাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে আদিম উপজাতিদের সঙ্গে কাজ-কারবার করার উপযুক্ত পদ্ধতি জানতে পারা যায়। আমাদের সীমান্ত এলাকার সর্বত্র যে সকল আদিম জংলি জাতি বাস করে এবং সমতল ভূমির জনসংখ্যার সঙ্গে যাদের জাতিগত ভাবধারার সম্পর্ক রয়েছে, তাদের চরিত্র, প্রকৃতি, অবস্থা ও চাহিদা সম্পর্কে ভারত সরকারের আর অনবহিত থাকা সঙ্গত নয়। প্রাচীনকালে যখন যুদ্ধ ও মহামারীর ফলে তাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যেতো, তখন তাদের সম্পর্কে হয়তো উদাসীন থাকা চলতো; কিন্তু এখন কঠোরভাবে শান্তি বজায় রাখা হচ্ছে, টিকা দেয়া হচ্ছে ও মহামারী প্রতিরোধের জন্য বিজ্ঞানসম্মত সকল ব্যবস্থায়ই গ্রহণ করা হচ্ছে; ফলে জনসংখ্যা এখন এতো দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে যে, মুসলিম আমলের চেয়ে ব্রিটিশ আমলে জীবন সংগ্রামের কঠোরতা অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দাসপ্রথারও অবসান ঘটিয়েছি—কৃষক যখন তার পরিবারের জীবিকা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তখনই সে এই প্রথার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা খ্রিস্টান ধর্মের মানবতাবোধ ও আধুনিক সভ্যতার নীতি অনুসারে শাসন চালানোর চেষ্টা করছি; কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, এই ব্যবস্থায় জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায় এবং ভারতে জীবিকা নির্বাহের উপায় বেড়ে না গিয়ে স্থির হয়ে থাকে। অগ্রগতির সঙ্গে যে বিপদ আসে, স্থবির সমাজে তা একেবারেই অজ্ঞাত এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ধারণ ও তার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করার পরই আমদানি করা। সভ্যতা নিয়ে নিরাপদে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যেতে পারে। জনসংখ্যার চাপ নির্ধারণের উপায় উদ্ভাবন করা না হলে যেকোনো মুহূর্তে আমরা হয়তো দেখতে পাবো যে, ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদ অভিশাপে রূপান্তরিত হয়েছে এবং বিদ্রোহের আগের সাঁওতালদের মতো যুদ্ধ ও মহামারী থেকে মুক্তি জীবনসংগ্রামের কঠোরতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য সংখ্যা ও তথ্য অপরিহার্য; কিন্তু বাংলাদেশের কোনো জেলার লোকসংখ্যা বা তাদের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ নির্ধারণের কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় তখন আমাদের নেই; অথচ খাদ্যশস্যের মতো পণ্যের প্রাচুর্য একদিকে যেমন জনসাধারণকে সমৃদ্ধ ও রাজভক্ত করে তোলে, অন্যদিকে তেমনি তার ঘাটতির ফলে তারা ক্ষুধার্ত ও রাজদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভারতের আগামী পঞ্চাশ বছরকালের শাসকদের এই সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। তাদের পূর্ববর্তী শাসকরা ভারতকে সভ্যতা দিয়ে গেছেন; এখন এই সভ্যতা যাতে ভারতবাসীর পক্ষেও উপকারী হয়, আবার আমাদের নিজেদের জন্যও নিরাপদ হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই হবে তাদের প্রধান কর্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

পল্লী প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রচেষ্টা ১৭৬৫-১৭৯০

ক্লাইভের মুখোশী শাসন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এলাকাসমূহের সরকারে ঘন ঘন পরিবর্তনে অসন্তুষ্ট হয়ে এবং 'বিভিন্ন রাজা, জমিদার, সামন্ত ও অন্যান্য দেশীয় জমির মালিকদের' দুঃখকষ্টে ব্যথিত হয়ে পার্লামেন্ট ১৭৭৮[১] সালে 'দেশের প্রাচীন আইন ও রীতি-রেওয়াজের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থার স্থায়ী বিধি' প্রণয়নের নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ না দেশীয় অফিসার নিয়োগ করা হবে, সে সম্পর্কে কোর্ট অফ ডিরেক্টর ত্রিশ বছরের মধ্যে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। ১৭৬৭ সালে ক্লাইভ সিলেক্ট কমিটিকে লেখেন, 'কালেক্টর পদে কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগ করা, অথবা যে কাজ নবাবই করতে পারতে পারেন, সেই কাজ করার জন্য ব্রিটিশ শক্তি প্রয়োগ করার অর্থ হচ্ছে আমাদের মুখোশ খুলে ফেলা এবং কোম্পানিকে প্রবেশের সুবাহ (গভর্নর) বলে ঘোষণা করা'। অতএব, দিল্লির সম্রাট কোম্পানির ওপর বাংলাদেশের শাসনভার অর্পণ করার পর প্রথম চার বছর যাবৎ এই দ্বৈত শাসনই চালু রইলো এবং সরকার পরিচালনার দৈনন্দিন কাজ দেশীয় লোকদের হাতেই ন্যস্ত রইলো; কিন্তু কোম্পানির অভিজ্ঞ কর্মচারিগণ ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করলেন যে, এভাবে আমাদের দায়িত্ব পরিহার করা পুরুষোচিতও নয়, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসূচকও নয়। অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডে যারা জীবিত ছিলেন, তাদের মধ্যে প্রধান এবং অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস-লেখক মি. হলওয়েল বিষয়টি সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'দীর্ঘ আট বছর যাবৎ আমরা এই প্রদেশগুলোর ওপর ঠোকরা-ঠুকরি করেছি; কিন্তু বহু জায়গা দখল ও প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ হলেও আমাদের সাফল্যে কোম্পানির কি উপকার হয়েছে? ফাঁদে পড়ে খতম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা কি এভাবে টোপে ঠোকর মারতে থাকবো? .... আসুন, আমরা সাহস করে নিজেরাই সুবাহ হই।'[২]

সুপারভাইজার নিয়োগ, ১৭৬৯-১৭৭২

কিন্তু ১৭৬৯ সালের আগে প্রদেশের বড় বড় বিভাগে ইংরেজ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়নি। এই সুপারভাইজারদের সংখ্যা এতো কম ছিলো যে, একটিমাত্র দফতরের

১. ২৪ জিও ৩। সি-২৫, এস-৩৯।
২. মিঃ কে প্রণীত 'এডমিনিস্ট্রেশন অব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' থেকে উদ্ধৃত; ৭৯ পৃষ্ঠা, ১৮৫৩।

কাজের ওপর নিখুঁতভাবে চোখ বুলানোও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না; অথচ কাউন্সিল তাদের কাছ থেকে সমগ্র অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আশা করতেন। তাদের প্রধান কাজ ছিলো 'যারা খাজনা ধার্য করে, তাদের কুশাসন ও জোর করে টাকা আদায় করা এবং যারা খাজনা দেয়, তাদের খাজনা এড়িয়ে যাওয়ার শঠতামূলক প্রবণতা' প্রতিহত করা।[৩] আর্থিক বিষয়ের দায়িত্ব তাদের কাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ছিলো। প্রাচীন দ্রব্যের সংগ্রাহক, ইতিহাসবিদ ও পল্লী অঞ্চলের সংখ্যাতত্ত্ববিদ হিসেবে তাদের যে কাজ করতে হতো, রাজস্ব অফিসার হিসেবে তাদের কাজ তার চেয়ে অনেক কম ছিলো। সরকার প্রায়ই তাদের কাছে অসংখ্য রচনার শিরোনামা পাঠাতেন এবং তাদের সেই রচনাগুলো লিখে দিতে হতো। কয়েকটি শিরোনামা থেকে তাদের কাজের পরিমাণ বোঝা যাবে। 'বিভাগটির প্রাচীন ও বর্তমান গঠনতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা;' 'শাসক বা দখলকারীদের বিবরণ, কার পর কে শাসন করেছে, তাদের পারিবারিক বিবর্তন ও যোগসূত্র; শাসকরা জনসাধারণ যে সকল রীতি-রেওয়াজ ও সুযোগ সুবিধা উপভোগ বা চালু করেছে; অর্থাৎ তাদের উৎপত্তি ও অগ্রগতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অথবা বিভাগে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছে, এরূপ সমস্ত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।[৪] এই সহজ ঐতিহাসিক গবেষণা সমাপ্ত করার পর তাদের ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব সম্পর্ক তদন্তের কাজে হাত দিতে হতো; অর্থাৎ প্রচলিত সেস ও বেআইনিভাবে আদায় করা টাকার শ্রেণীবিভাগ; বিচার ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা পেশ; এলাকার উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন ও তার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বিশ্লেষণ; অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ এবং মুসলিম কুশাসনের আমলে পণ্য উৎপাদনকারী ও ক্রেতার মধ্যকার যে অসংখ্য বাধা শিল্প-প্রচেষ্টা ব্যাহত করেছিলো, তা অপসারণের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করতে হতো। এছাড়া অবসর সময়ে এবং কাউন্সিল মনে করতেন যে তাদের প্রচুর অবসর ছিলো—তাদের জনগণের মা-বাপের ভূমিকা পালন করতে হতো; বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে হতো; চাষীদের আবাদ উন্নয়নে সাহায্য করতে হতো; ব্যবসায়ীদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সহায়তা করতে হতো; পণ্য উৎপাদনকারীদের বেশি পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করতে হতো এবং সকল শ্রেণীর লোককে আগের চেয়ে বুদ্ধিমান ও উন্নত হওয়ার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করতে হতো। তাদের 'খুব জোরদার ও প্রত্যয় সৃষ্টিকারী পদ্ধতিতে' চাষীদের বুঝিয়ে দিতে হতো যে, কোম্পানি যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরই কল্যাণ সাধনা করা এবং কোম্পানির বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে 'তাদের নিজেদের হাতে শৃঙ্খল পরা এবং অত্যাচারীদের কাছে তাদের দাসত্ব ও নির্ভরশীলতা অনুমোদন করা।'[৫]

---

৩. 'লাইফ অব লর্ড টেইনমাইথ', তাহার পুত্র প্রণীত, প্রথম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা, ১৮৪৩।
৪. প্রেসিডেন্ট ও সিলেক্ট কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণ, ১৬ই আগস্ট, ১৭৬৯।
৫. প্রেসিডেন্ট ও সিলেক্ট কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণ, ১৬ই আগস্ট, ১৭৬৯। মিঃ কে প্রণীত এডমিনিস্ট্রেশন পুস্তকের ১৬৪ পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত।

হেস্টিংস পরিকল্পনা, ১৭৭২

অর্থাৎ সুপারভাইজারদের পক্ষে যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলো না, তারা সেই কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করবেন বলে আশা করা হতো; ফলে তারা যেটুকু করতে পারতেন, তার চেয়ে সম্ভবত অনেক কম করতেন। তাদের নিয়োগের প্রথম বছরে বাংলাদেশে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এই দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক বিবরণ পড়তে গেলে উপলব্ধি না করে উপায় থাকে না যে, ইংরেজদের মানবতাবোধ ও শাসনকার্যের পারদর্শিতার প্রভাব তখনও পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের ওপর পড়েনি। এক কোটি লোক যখন দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিলো, সুপারভাইজাররা তখন ঐতিহাসিক বা সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের মধ্যে তাদের সাহিত্য সাধনা অব্যাহত ছিলো, অল্প কয়েকজন ছাড়া আর কেউ তাকে সমসাময়িক জরুরি বিষয় বলে উল্লেখ করেননি; তারা এই ব্যাপক বিপদপাতকে রাজস্ব বা আবাদের অবস্থার সঙ্গে অথবা তাদের রচনার মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন মাত্র। কারণ, আরও দুই বছর যাবৎ ক্লাইভের 'দ্বৈত' শাসনের অধীনে দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকদের হাতে ন্যস্ত ছিলো।'কৃষ্ণকায় খাজনা আদায়কারীরা' চাষীদের ওপর নিস্পেষণ চালাতো এবং তালুকদারগণ একদিকে শঠতার আশ্রয় নিয়ে সরকাকে কম রাজস্ব দিয়ে ঠকাতো। এবং অন্যদিকে কামার কুমোর প্রভৃতি কারিগর ও চাষীদের কাজ থেকে ফন্দিফিকির করে নিত্যনতুন বেআইনি সেস আদায় করতো; কিন্তু ১৭৭২ সালের ১৩ই এপ্রিল জন কার্টিয়ার প্রদেশের দায়িত্ব ওয়ারেন হেস্টিংস[৬]-এর ওপর অর্পণ করেন এবং মাস শেষ হওয়ার আগেই একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। নতুন প্রেসিডেন্ট দৃঢ়তার সঙ্গে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৪ঠা মে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের শাসকে পরিণত হয়। কাউন্সিলের যোগ্যতম লোকদের নিয়ে গঠিত একাধিক সার্কিট কমিটি গরমকালের ভয়াবহ রোদ এবং বর্ষাকালের আরও ভয়াবহ ম্যালেরিয়া উপেক্ষা করে জেলায় জেলায় ভ্রমণ করেন এবং ঘটনাস্থলে হাজির থেকে প্রত্যেকটি বিভাগের সঙ্গতি ও চাহিদা সম্পর্কে তদন্ত করেন, রাজস্ব ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অতীত ভুলের সংশোধন করেন। কমিশনারগণ রাজধানীতে ফিরে এসে তাদের পরিশ্রমের ফলাফল তুলনা করে দেখতে পেলেন যে, যে কাজের জন্য সুপারভাইজারদের নিয়োগ করা হয়েছিলো, তা সম্পাদন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। প্রায় একই সময় কোর্ট অফ ডিরেক্টর একখানি পত্র লিখে অসন্তোষের সঙ্গে অভিযোগ করেন যে, সুপারভাইজারগণ প্রদেশের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ করে ফেলেছেন। এই পত্রখানি ভারতে আসার আগেই অবশ্য তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিলো।

১৭২২ সালে করদাতা ও সুপারভাইজারদের মধ্যবর্তী 'কৃষ্ণকায় খাজনা আদায়কারীর' পদ বিলোপ করা হয় এবং সুপারভাইজারগণকে তাদের নিজ নিজ জেলায়

৬. কোর্ট অফ ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র, ১৩ই এপ্রিল, ১৭৭২ ৯ অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

সিভিল জজের ক্ষমতাসহ রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করা হয়; তাছাড়া যে সকল দেশীয় কর্মচারী তখনও ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্যও তাদের হাতে কিছু কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়।[৭] কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই আবার পুরোনো ব্যবস্থা চালু করা হয়; ইংরেজ কালেক্টরদের প্রত্যাহার করা হয় ও তাদের কাজ দেশীয় লোকদের ওপর অর্পণ করা হয় এবং পুলিশ বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব বংশানুক্রমিক ফৌজদারদের হাতে ন্যস্ত করা হয়।[৮] কিন্তু ১৭৭৫ সালে পুনর্বহাল করা হলেও ১৭৮১ সালে আবার ফৌজদার ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং তাদের দায়িত্ব বিভাগীয় সেক্রেটারির খেয়ালখুশি অনুসারে সিভিল জজ বা এলাকার প্রধান জমিদারের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ শাসন-সংস্কারের বদলে অন্য বিষয় চিন্তা করছিলেন; কোথাও কোনো নিয়ম-কানুন ছিলো না, ফলে পরের বছর আগের মতোই আরেকবার পরিবর্তন এলো।[৯] অবশেষে জনসাধারণের অভিযোগ পার্লামেন্টের কাছে পৌঁছালো এবং তার ফলে ১৭৮৪ সালের আইন পাস হয়ে গেলো।[১০]

অস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৮৬-৯০

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শাসনের জন্য একটি স্থায়ী বিধি প্রণয়ন করা এতো জরুরি হয়ে পড়েছিলো এবং বিরোধীদল এ ব্যাপারে এতো অধিক সহযোগিতা করতে ওয়াদা করেছিলো যে, এই কাজের দায়িত্ব লর্ডসভার একজন সদস্যের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ১৭৮৬ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ বলা হয়; রাইট অনারেবল দি আর্ল অফ কর্নওয়ালিস গত সোমবার গদিতে প্রবেশ করেন এবং মঙ্গলবার উপকূলে উপনীত হন। এই নয়া গভর্নর-জেনারেলের ওপর দেশের প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ অনুসারে একটি শাসনপদ্ধতি প্রণয়নের নির্দেশ ছিলো; কিন্তু তিনি শিগগিরই বুঝতে পারলেন যে, এই কাজ করতে হলে প্রথমে রীতি-রেওয়াজগুলো যে আসলে কি তা নির্ধারণ করা দরকার; তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে, ভালোভাবে না জেনে-শুনে তাড়াতাড়ি একটির পর আরেকটি ব্যবস্থা চালু করার ফলে গত বিশ বছর বহু অনিষ্টকর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; কিন্তু কাদের সাহায্যে দেশ শাসন করতে হবে, সে সম্পর্কে লর্ড কর্নওয়ালিসের মনে এতোটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ছিলো না। তিনি স্থির করলেন যে, রাজধানীতে ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানে প্রত্যেকটি দফতরের প্রধান কর্মকর্তা হবেন একজন ইংরেজ অফিসার এবং দেশীয় কর্মচারীদের ওপর যতোটুকু কঠোর দৃষ্টি রাখা

---

৭. ওয়ারেন হেস্টিংসের ১৭৭২ সালের পরিকল্পনা (২১শে আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়), ১ ও ২ নং ধারা।

৮. কমন্সসভার সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্ট, ৬ পৃষ্ঠা, ১৮১২।

৯. জন্, এইচ. মোর্লে, ব্যারিস্টার এট-ল প্রণীত 'দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ৫২ পৃষ্ঠা; ১৮৫৮।

১০. এই দ্রুত পরিবর্তনের আমল সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আবার স্বভাবসিদ্ধরূপে প্রসন্ন, মিল কলডাটে এবং মোর্লে সঠিকভাবে নিখুঁত।

সম্ভব, ততোটুকুই তাদের বিশ্বাস করা যেতে পারে।[১১] ভবিষ্যতে একটি স্থায়ী শাসনপদ্ধতি প্রণয়নের জন্য তার শাসনকালের প্রথম তিন বছর তিনি তথ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভাগগুলো পুনর্গঠন করলেন, প্রত্যেকটি জেলার দায়িত্ব একেকজন অভিজ্ঞ ইংরেজ অফিসারের ওপর অর্পণ করা হলো এবং তার হাতে আর্থিক, দেওয়ানি, ফৌজদারি, পুলিশ প্রভৃতি সরকারের সমগ্র কাজই কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হলো।[১২]

এই পুনর্গঠনের ফলেই বীরভূম একটি পৃথক জেলায় পরিণত হয়। মি. ক্রিস্টোফার কিটিং কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট ও সিভিল জজ হিসেবে এই জেলার সাড়ে সাত হাজার বর্গমাইল।[১৩] এলাকার ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালনা করেন এবং তার কার্যক্রমের প্রভাব তার সীমান্তের বাইরে কয়েকদিনের পথের দূরত্বে বসবাসকারী পাহাড়িদের এলাকায় পৌঁছে দেন। জেলাটি স্বভাবতই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলো। অজয় নদীর উত্তরে বীরভূমের রাজার এলাকা এবং দক্ষিণে বিষ্ণুপুরের রাজার এলাকা।[১৪] মি. কিটিং সেনাবাহিনীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতেন, চাষীদের কাছ থেকে খাজনা নিতেন, দেওয়ানি মামলার বিচার করতেন, তার জেলার মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী সৈন্যদলের রসদ সরবরাহ করতেন, ছোটোখাটো ফৌজদারি মামলায় অপরাধীদের শাস্তি দিতেন, গুরুতর মামলার আসামিদের গ্রেফতার করে মুসলিম আইন অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং বিরাট সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করতেন। এক হাতে ওলন ও আরেক হাতে তরবারি নিয়ে যারা দেয়াল নির্মাণ করেছে, তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সৌকর্য আশা করা সঙ্গত নয় এবং কিটিংয়ের মতো লোকদের শাসন যদি মোটামুটিভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে, তাহলে তাই যথেষ্ট; ভবিষ্যতে যারা বেশি অবসর ও বেশি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করবে, তাদের এর চেয়ে বেশি আশা করার অধিকার নেই।

এ ব্যবস্থার অসারতা

রাজস্ব আদায় করাই ছিলো কালেক্টরের প্রধান কাজ এবং এই কাজে সাফল্যের ওপরই অফিসার হিসেবে তার সুনাম নির্ভর করতো, জনসাধারণের সমৃদ্ধির ওপর নয়। এই

---

১১. মনে রাখা দরকার যে, প্রধানত বেতন না পাওয়ার ফলেই মুসলমান আমলের বাঙালি কর্মচারীর দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিলো এবং অত্যাচার চালিয়ে জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

১২. কলকাতার রাজস্ব বোর্ডের দলিল-দস্তাবেজ। ক্যালকাটা গেজেট (১৭৮৬), প্রথম বর্ষ, ১৮৫ ও ১৮৬ পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ এবং মোর্লের পুস্তক, ৫৩ ও ৫৪ পৃষ্ঠা। কেবলমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ বিষয়ক কাজের ব্যাপারেই কালেক্টরের ক্ষমতার ওপর কিছু বিধিনিষেধ ছিলো । পরে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হবে।

১৩. জরিপ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হয়েছে।

১৪. বীরভূম ও তার সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকার দৈর্ঘ্য ১৩০ মাইল ও প্রস্থ ৪০ মাইল; অর্থাৎ আয়তন ৫২০০ বর্গমাইল; পাহাড়ি এলাকা তখন সাঁওতাল পরগনার অন্তর্ভুক্ত। বিষ্ণুপুরের আয়তন ২৩০০ বর্গমাইল; বিষ্ণুপুর এখন বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত। সংযুক্ত জেলাটির আয়তন ৭৫০০ বর্গমাইল।

সময়ও কাউন্সিল প্রায় মনে করতেন যে, বাংলাদেশ যেনো এমন একটি বড় জমিদারি যেখান থেকে প্রচুর খাজনা পাওয়া যায়; কিন্তু শাসনের কোনো দায়িত্ব পালন করতে হয় না;আর পল্লী অঞ্চলের শাসকরা যেনো পাইক-বরকন্দাজ মাত্র, সরকারি রাজস্ব আদায় ও পুনর্বন্টনের মাধ্যমে নয়। অতএব, প্রত্যেকটি জেলা থেকে যথাসম্ভব বেশি টাকা আদায় করা এবং জেলার উন্নতির জন্য যথাসম্ভব কম খরচ করাই ছিলো সবচেয়ে প্রশংসনীয় কাজ। ১৭৮৮ সালে বীরভূম ও বিষ্ণুপুর শাসনের জন্য ৫৪০০ স্টার্লিং[১৫] অর্থাৎ বর্গমাইল প্রতি সাড়ে চৌদ্দ শিলিং খরচ হয়। বর্তমানে জেলাটির আয়তন কমিয়ে এক-তৃতীয়াংশের[১৬] চেয়েও ছোটো করে ফেলা হয়েছে, অথচ শাসনের খরচ বেড়ে গিয়ে ২৪,৮৬৯ স্টার্লিং[১৭] অর্থাৎ বর্গমাইল প্রতি ১০ পাউন্ড সাড়ে ১৩ শিলিং হয়েছে। খরচের দফা বিশ্লেষণ করলে পল্লী অঞ্চলের শাসক হিসেবে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে পুরোনো ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আরও ভালোভাবে ধরা পড়বে। ১৭৮৮ সালে খাজনা আদায়ে জন্য খরচ হয় ৪৫০০ পাউন্ড স্টার্লিং[১৮]; ১৮৬৪ সালে এই খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩৫৫০ স্টার্লিং; ১৭৮৮ সালে দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য ৭০৮ পাউন্ড স্টার্লিং খরচ হয়; এখন এই খরচের পরিমাণ ৭১৬০ পাউন্ড।[১৯] ১৭৮৮ সালে ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য মাত্র ৩১৮ পাউন্ড[২০] খরচ হয়; আর ১৮৬৪ সালে খরচ হয় ১৯২০ পাউন্ড।[২১] খাজনা আদায় সংক্রান্ত সকল বিষয়ে খরচ কমে গেছে; কারণ জনসাধারণের ওপর কম চাপ পড়ায় অনেক সহজে খাজনা আদায় হয়েছে। প্রজার নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে দশ থেকে ত্রিশ গুণ পর্যন্ত খরচ বেড়ে গেছে। ইংরেজ আর আগের মতো 'পাবলিকানি' নয়, তারা এখন শাসক হয়েছে।

১৭৯৩ সালের আগের খাজনা

বীরভূমের রাজা অজয় নদীর উত্তরের এলাকার জন্য বার্ষিক ৬৫,০০০ পাউন্ড,[২২] অর্থাৎ জঙ্গল ও পাহাড়সমেত প্রতি বর্গমাইলের জন্য ১২ পাউন্ড খাজনা দিতেন। এলাকাটির অর্ধেক অংশে জঙ্গল ও পাহাড় থাকায় আবাদযোগ্য জমির সরকারি খাজনা ছিলো একর

---

১৫. নির্ধারিত মাসিক খরচ ছিলো ৪৩৯৪ সিক্কা টাকা, অর্থাৎ চলতি টাকায় বার্ষিক প্রায় ৫৪০০ টাকা। 'ঠ' পরিশিষ্টে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ব্যয় শিরোনামার খরচের দফা দ্রষ্টব্য।

১৬. বিষ্ণুপুর ও পাহাড়ি পরগনাগুলো বীরভূম থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ায় বর্তমান এলাকায় আয়তন ২৩৩০ বর্গমাইল। বর্ধমান বিভাগের ১৮৬৩ সালের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে কমিশনার সি. এফ. মন্ত্রিসর, এস্কোয়ারের রিপোর্ট, ১৭ পৃষ্ঠা। বর্ধমান রেকর্ডস।

১৭. ১৮৬৪-৬৫ সালের বাজেট বরাদ্দ। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৮. মাসিক ৩৫৮৫ সিক্কা টাকা। ১৭৮৮-৮০ সালের কালেক্টরের বিল। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৯. মাসিক ৫৫৬ সিক্কা টাকা। ১৭৮৮-৮৯ সালের মাসিক বিল। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

২০. মাসিক ৩৫০ সিক্কা টাকা। সিক্কা টাকার দাম ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছিলো বলে আমি ব্রিটিশ মুদ্রায় সঠিক মূল্য উল্লেখ করার চেষ্টা করিনি। উপরের অংকগুলো মোটামুটি এক পাউন্ডের সমান।

২১. ১৮৬৪-৬৫ সালের খরচের জন্য 'ড' পরিশিষ্টে 'বীরভূমের বর্তমান শাসনের ব্যয়' দ্রষ্টব্য। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

২২. ৬১১, ৩২১ সিক্কা টাকা, ১৭৮৮-৮৯ সালের জমা-ওয়াসিল-বাকি, ১৭৮৯ সালে ১লা মে রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

প্রতি মাত্র ৯ পেন্স। আদজি নদীর দক্ষিণে বিষ্ণুপুরের রাজার এলাকার বার্ষিক খাজনা ধার্য করা হয়েছিলো ৪০,০০০ পাউন্ড[২৩] অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলের জন্য ১৭ পাউন্ড ৮ শিলিং এবং পতিত জমি বাদ দিয়ে আবাদযোগ্য জমির একরপ্রতি সরকারি খাজনা ছিলো মাত্র এক শিলিং। চাষীদের অসংখ্য ছোটোখাটো খণ্ড জমির কোনটির খাজনা কতো হবে, তা রাজা ও চাষীদের মধ্যে দরকষাকষি করে ঠিক হতো; রাজা যতোদিন যথাসময়ে ও নিয়মিতভাবে সরকারি পাওনা পরিশোধ করতেন, সরকার ততোদিন এ ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করতেন না; কিন্তু নিয়মিতভাবে বা যথাসময়ে পরিশোধ করা তো দূরের কথা, অধিকাংশ বছরই তারা মোট পাওনা টাকার একটি বিরাট অংশই শোধ করতে পারতেন না এবং প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়, বা চাষীদের সশস্ত্র বিরোধিতা দমন করার জন্য কালেক্টরকে প্রায়ই তাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হতো।[২৪] রাজস্বের পরিমাণে প্রতি বছর[২৫] তারতম্য ঘটতো এবং জমিদাররা সামান্যতম রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাতেও তাদের অধীনস্থ প্রজাদের খাজনা বাড়িয়ে দিতেন। প্রজারা অভিযোগ করতো যে, ধান কাটার সময় যে তাদের কাছ থেকে কত খাজনা আদায় করা হবে, তা বীজ বপনের সময় তারা জানতে পারতো না; কারণ চাষীরা ভালোভাবে আবাদ শুরু না করা পর্যন্ত জমিদাররা খাজনা বাড়ানোর কথা গোপন রাখতো। ১৭৮৮-৮৯ সালে এই ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিলো। সরকার রাজস্বের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, ফলে খাজনাও অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। চাষীরা অতিরিক্ত খাজনা দিতে রাজি হলো না; তারা বললো, বীজ বপনের আগে তাদের এই খাজনা বাড়ানোর কথা জানানো হয়নি। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এতোদূর গড়ালো যে, কালেক্টর রিপোর্ট দিলেন, খাজনা বাড়ানোর বিরুদ্ধে সমগ্র জেলার প্রজারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।[২৬] মি. কিটিংয়ের সেনাবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলো এবং জেলার সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী কৃষকদের শায়েস্তা করে দিলো,[২৭] যে সকল কৃষক এই জেলার বাইরে অন্যান্য জেলায় চলে গেলো, সেই জেলার কালেক্টরদের মারফত তাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করা হলো; কারণ তখনকার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এক জেলার কর্তৃপক্ষ সরাসরি অন্য জেলার বাসিন্দাদের মাল ক্রোক করতে পারতেন না। প্রতিবেশী জেলাগুলোর কালেক্টরগণ কিন্তু ১৭৬৯ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে তাদের জেলার জনশূন্য এলাকাগুলোতে কৃষক বসাতে খুবই আগ্রহশীল ছিলেন। পরোয়ানার হাত থেকে রেহাই দেয়ার ওয়াদাকে তারা কৃষক আকৃষ্ট করার টোপ হিসেবে

---

২৩. ৩৬০, ৭০৭ সিক্কা টাকা, ১৭৮৮-৮৯ সালের জমা-ওয়াসিল-বাকি।

২৪. রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জন শোর, এক্সোয়ার ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৯। রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের ১৭৯০ সালের ১৪ই এপ্রিল ও ২৫শে অক্টোবরের পত্র এবং অন্য বহু চিঠিপত্র। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

২৫. রাজস্ব বোর্ডের বার্ষিক বন্দোবস্ত ও হস্তাবুদ। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

২৬. রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জন শোর ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

২৭. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২৫শে অক্টোবর, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

ব্যবহার করতেন। অতএব, তারা মি. কিটিংয়ের সমন বা পরোয়ানার হাত থেকে রেহাই দেয়ার ওয়াদাকে তারা কৃষক আকৃষ্ট করার টোপ হিসেবে ব্যবহার করতেন। অতএব, তারা মি. কিটিংয়ের সমন বা পরোয়ানা জারি করতে অস্বীকার করলেন বা বিলম্ব করলেন। ফলে ক্রুদ্ধ পত্র-বিনিময়ের পর বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সরকারের নজরে গেলো এবং স্থির হলো যে, বিরুদ্ধমতের কালেক্টরদের হেড অ্যাসিসট্যান্টগণ তাদের স্ব স্ব জেলার সীমান্তে গিয়ে প্রশ্নটির মীমাংসা করবেন।[২৮] কয়েক সপ্তাহ যাবৎ একত্রে শিকার করার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আবাদ শুরু হওয়ার আগে খাজনা বাড়ানোর কথা কৃষকদের গোচরীভূত করা হয়নি এবং বীজ বপনের আগে তারা একথা জানতে পারেননি বলে বছরের পরবর্তীকালীন অতিরিক্ত খাজনা পরিশোধের জন্য তাদের দায়ী করা যেতে পারে না। এই সিদ্ধান্তের পর কালেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রীতিকর হবে না বলে বুঝতে পেরে বীরভূমের হেড অ্যাসিসট্যান্ট মি. আরবুথনট সদরে না ফিরে মফস্বলে তাঁবুতেই থেকে গেলেন এবং বাঘ শিকার করে দিন কাটাতে লাগলেন। এভাবে তাঁবুতে থাকতে থাকতেই তিনি অন্য জেলায় বদলির আদেশ সংগ্রহ করে ফেললেন এবং মি. কিটিংকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য সদরে না গিয়েই শপথ নেয়ার জন্য তাড়াতাড়ি কলকাতায় চলে গেলেন।[২৯]

খাজনা বণ্টন ও আদায় সম্পর্কে আমি আমার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সরকারি পাওনা আদায় হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ কখনই খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কোনো ক্ষেত্রে বড়ো রকমের ঘাটতি হলে কালেক্টর জমিদারকে জেলে দিতেন এবং নিজেই জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ ঘাটতি পড়াই অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিলো; ফলে নাবালক বা বিকৃতমস্তিষ্ক না হলে কোনো জমিদার যে কতোদিন জেলের বাইরে থাকতে পারবেন, তা তারা নিজেরাও সঠিকভাবে বলতে পারতেন না। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, বীরভূমের সবচেয়ে পুরনো সরকারি নথি থেকে জানা যায় যে, বিষ্ণুপুরের রাজা জেলে ছিলেন[৩০] এবং বীরভূমের তরুণ রাজারও সাবালক হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই একই দশা হিয়েছিলো।[৩১]

১৭৯৩ সালের আগের আবগারি শুল্ক

কালেক্টরগণ ভূমি রাজস্ব ছাড়া আরও দুই রকমের রাজস্ব আদায় করতেন, যথা—আবগারি শুল্ক ও মন্দির শুল্ক।[৩২] ১৭৯০ সালে কালেক্টরগণকে তাদের স্ব স্ব জেরার মত

---

২৮. কালেক্টরের নিকট প্রেরিত রাজস্ব বোর্ডের পত্র; ১০ই মে, ১৭৯০। বৈঠকের স্থান ঢাকা বাড়ি নির্ধারিত হয়। বীরভূম রেভিনিউ রেভর্কস।

২৯. মিঃ জর্জ আরবুথনট কর্তৃক ঢাকা বাড়ি হতে কালেক্টরের নিকট প্রেরিত পত্র; ৩০শে জুন ও ১২ই জুলাই, ১৭৯০ এবং অন্যান্য চিঠিপত্র। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৩০. রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মিঃ জন শোর ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৩১. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ১২ই জানুয়ারি ও ১ লা নভেম্বর, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৩২. 'সয়্যার' নামে পরিচিত পাওনা বা কর আদায়ের জন্য সাময়িকভাবে যে আদেশ দেয়া হয়, তা বীরভূমে কার্যকরী করা হয়নি।

সংক্রান্ত শুল্কের দায়িত্ব গ্রহণ করার এবং মদ খাওয়ার পরিমাণ সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়ার আদেশ দেয়া হয়।[৩৩] এতোদিন যাবৎ কখনো জমিদার কখনো কালেক্টর এবং কখনো উভয়েই এই শুল্ক ধার্য ও আদায় করতেন।[৩৪] মদের শুল্ক আদৌ ধার্য করাই কঠিন ছিলো। কারণ, মদ চোলাইয়ের দেশী কারখানা বলতে কয়েকটি মাটির পাত্র ও একটি বাঁশের নল মাত্র বুঝায় এবং তার মোট দাম বড়জোর এক ফার্দিং হতে পারে; তাছাড়া সন্ধ্যার পর জঙ্গলের মধ্যে এই কারখানা স্থাপন করা হয়, সারা রাত চালু থাকে এবং সকাল হওয়ার আগেই সব ভেঙেচুরে ফেলা হয়। ১৭৮৭ সালে সরকারের পক্ষ থেকে মি. শেরবোর্ন জেলার সদর দফতরে অবস্থিত প্রত্যেকটি মদের দোকানের ওপর এক পাউন্ড এবং মফস্বলে অবস্থিত দোকানের ওপর আট শিলিং হারে কর ধার্য করেন। এই কর পরিশোধ করলে দোকানদাররা যতো ইচ্ছে মদ চোলাইও বিক্রি করতে পারতো। বিষ্ণুপুরের রাজা তার জমিদারির প্রত্যেকটি মদের দোকানের ওপর দুই থেকে চার শিলিং পর্যন্ত কর ধার্য করতেন এবং বীরভূমের রাজা পবিত্র রমজান মাসে গোপনে মদ বিক্রি করার পারমিটের দাম হিসেবে প্রচুর টাকা আদায় করতেন।[৩৫] যে সকল দোকানদার বেশি টাকা দিতে চাইতো না এবং বিনা পারমিটে মদ বিক্রি করতো, তাদের মুসলমান আইন অফিসার বা কাজীর কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে পায়ের তলায় বেত মারা হতো বা অনেক টাকা জরিমানা করা হতো।

১৭৮৯ ও ১৮৬৫ সালের আবগারি শুল্ক

বহু লোকের ওপর কর ধার্য করা হলেও আবগারি খাতে স্বল্প পরিমাণ রাজস্ব আদায় হওয়ায় স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শাসন ব্যবস্থা তখন ঢিলে-ঢালা ও ত্রুটিপূর্ণ ছিলো। ১৭৮৯ সালে জেলার আয়তন যখন বর্তমান আয়তনের তিনগুণ ছিলো তখন আবগারি শুল্ক মাত্র ৩৩০ পাউন্ড আদায় হতো[৩৬] ১৮৬৪-৬৫ সালে এই পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ৫২৯৪ পাউন্ড, অর্থাৎ আগের চেয়ে প্রায় কুড়ি গুণ বেশি হয়।[৩৭] এই শুল্ক বৃদ্ধি মদ খাওয়া বেড়ে যাওয়ার চেয়ে ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে কড়াকড়ির ফলেই সম্ভব হয়েছে।

---

৩৩. রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলার আদেশ, ১৯শে এপ্রিল, ১৭৯০। মূল চিঠিখানি হারিয়ে গেছে, তবে কালেক্টরের জবাবে তার তারিখ ১৯শে এপ্রিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য বহু মূল্যবান চিঠির মতো এই চিঠিখানিও 'বোর্ডস সার্কুলার অর্ডাস' (পিটার্স সংস্করণ সরকার কর্তৃক ১৮৩৮ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত) পুস্তকে নেই।

৩৪. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২২শে মে, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৩৫. এই করের নাম ছিলো 'সুড়ি-মুচি-খুচি-রমজান-সালামী'। ১৭৯০ সালের জুন মাসের সয়্যার 'সম্পর্কিত একটি রিপোর্টে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই রিপোর্ট ও উপরে উল্লিখিত ২২শে মের চিঠি থেকেই আমি প্রধানত আবগারি সম্পর্কিত এই বিবরণের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছি। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৩৬. ৩১৫৪ সিক্কা টাকা।

৩৭. ১৮৬৪-৬৫ সালের বাজেটে আয়ের হিসাব :
আবগারি ... ৪৫,৯২৯ চলতি টাকা।
আফিস ... ৭,০১৮
মোট ৫২, ৯৪৭ চলতি টাকা। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

আমরা যখন জেলার শাসনভার গ্রহণ করি, তখন নিচু জাতের লোকদের মধ্যে মদের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। অতিরিক্ত রকমের সস্তা হওয়ায় মদ খাওয়ার স্পৃহা সকলের মধ্যেই তীব্র আকার ধারণ করেছিলো; তাছাড়া বীরভূমের আধা-উপজাতীয় অধিবাসীদের মতো লোকের মধ্যে এই স্পৃহা স্বভাবতই সর্বদা তীব্র থাকে। প্রকৃতপক্ষে মদ খাওয়ার অভ্যাস বাঙালি চরিত্রের এমন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো যে, প্রাচীনকালের চুক্তিপত্রে এবং সমসাময়িক পর্যটকদের চিঠিপত্রে ও ডায়রিতেও এই অভ্যাসের উল্লেখ দেখা যায়।[৩৮] বীরভূমের প্রথম আমলের ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে একজন কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, জেলার প্রায় সমস্ত গুরুতর অপরাধের মূল কারণই হচ্ছে মদ। তখনকার দিনে সবচেয়ে কড়া ও সবচেয়ে অনিষ্টকর মদই চোলাই করা হতো এবং মাত্র আধা-পেনি মূল্যে দুই-পাঁইট বোতলের ছয় বোতল মদ কেনা যেতো। পাহাড়িয়া ও জংলিরা এমনিতেই অর্ধাহারে দিন কাটাতো; তার ওপর এই মদ খেলে তারা পুরো মাতাল হয়ে যেতো এবং যেকোনো রকমের দুঃসাহসী কাজ করে ফেলতে পারতো। বীরভূমে আবগারি শুল্কের নিয়ম-কানুন কড়াকড়িভাবে কার্যকর করার ফলে সাধারণ মদের দাম ছয় গুণ বেড়ে যায় এবং নরম জাতীয় মদের ব্যাপক প্রচলন হয়; বীরভূম যখন ব্রিটিশ শাসনাধীন আসে, তখন নরম মদের প্রায় অস্তিত্বই ছিলো না। জনসাধারণ বাধ্য হয়েই সুরাপানের অভ্যাস কমিয়ে দেয় এবং আধা-উপজাতীয় লোকদের মধ্যে ছাড়া মাতলামি একদম বন্ধ হয়ে যায়। নিচের তালিকায় ১৭৯০ ও ১৮৬৬ সালে বীরভূম জেলায় বিভিন্ন শ্রেণী মদের খুচরা দাম উল্লেখ করা হলো :

দেশীয় নাম	বিবরণ	১৭৯০ সালের দাম	১৮৬৬ সালের দাম
মহুয়া কা শরাব	মনাক্কা জাতীয় মদ	প্রচলন ছিলো না	দুই পাঁইট ৬ পেন্স
তাড়ি	খেজুরের রস থেকে চোলাই করা নরম মদ	প্রচলন ছিলো না	দুই পাঁইট $\frac{৩}{৪}$ পেন্স
পাক্কিসরেস বা ১ নং	ভাত থেকে চোলাই করা পরিশ্রুত মদ	দুই পাইট ১$\frac{১}{২}$ পেন্স	দুই পাঁইট ৫ পেন্স
পাক্কি, নিরেস বা ২ নং	ঐ	দুই পাঁইট $\frac{৩}{৪}$ পেন্স	দুই পাঁইট ৪ পেন্স
পচোয়াই	ভাত থেকে চোলাই করা মদ	প্রতি গ্যালন $\frac{১}{২}$ পেন্স	প্রতি গ্যালন ৩ পেন্স

৩৮. উদাহরণস্বরূপ, মিসেস কে মাত্র কয়েকদিন কলকাতায় অবস্থান করার পর (১৭৮০) এদেশের লোকদের অতিরিক্ত সুরাসক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। অরিজিনাল লেটার্স ফ্রম ইন্ডিয়া, ২৩০ পৃষ্ঠা, কলকাতা, ১৮১৭। মঞ্জুরিকৃত জমির জন্য মীর জাফরের পরোয়ানা, ১৭৫৭। কোম্পানির জমিদারি সনদ প্রভৃতি।

সুরাসক্তি কমে গেছে

মি. কিটিং উল্লেখ করেছেন যে, পচোয়াই মদই সবচেয়ে অনিষ্টকর ছিলো।[৩৯] তিনি লিখেছেন, 'প্রতিদিন যে অসংখ্য ডাকাতি ও লুটতরাজ হয়ে থাকে, পচোয়াই মদ খুব সস্তা হওয়াই তার মূল কারণ। ফৌজদারি আদালতের নথিতে দেখা যায় যে, এই সকল অপরাধের নায়করা প্রথমে এ জাতীয় মদ ও ভাং খেয়ে নিজেদের তৈরি করে নেয়।' অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও কাপুরুষ জাতীয় সিঁদেল চোররা কৃত্রিম সাহস অর্জনের জন্য উত্তেজক পদার্থ ভক্ষণ করে থাকে; তবে বাংলাদেশে এখন আর সুরাপান অপরাধজনক কাজের উর্বর উৎস বলে পরিগণিত হয় না। বীরভূমে তিন বছর (১৮৬৩-৬৬) অবস্থানকালে এমন একটিমাত্র ফৌজদারি মামলা আমার এজলাসে এসেছিলো, যে মামলার অপরাধের সঙ্গে অতিরিক্ত সুরাপানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসূত্র ছিলো এবং আমার মনে হয়, সমগ্র বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেটগণ জনসাধারণের সুরাপানের অভ্যাস কমে যাওয়া সম্পর্কে একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করবেন। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিকরাও দিনের কাজ শেষ হওয়ার পর সুড়িখানায় গিয়ে একটু ফুর্তিফার্তি করে; কিন্তু খুব বেশি মাতলামি করলেও তারা বড়োজোর বাড়ি ফেরার পথে যার সঙ্গেই দেখা হয়, তাকেই গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অভিবাদন করে থাকে। উঁচু শ্রেণীর কিছু কিছু লোক যারা হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধ মানে না, তারা গোপনে গোপনে ব্রিটিশ মদ খায় বলে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের ঘটনা অবশ্য আদালত পর্যন্ত গড়ায় না এবং আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, কোনো ইউরোপীয় দেশ সম্পর্কে যা বলা যায় না, বাংলাদেশ সম্পর্কে তা অনায়াসে বলা যেতে পারে; অর্থাৎ বাংলাদেশে মাতলামি অপরাধের নিয়মিত সহচর নয়। ফিশারি, সীমানা, খান ও ধর্মীয় শোভাযাত্রা সম্পর্কিত বিরোধের ফলে অসংখ্য অসদাচরণের ঘটনা ঘটে থাকে; কিন্তু জেলার দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ অপরাধই মারামারি ও অনুরূপ ছোটোখাটো বলপ্রয়োগ সম্পর্কিত ঘটনা হলেও মাতলামির ফলে কখনো শান্তিভঙ্গ হয়েছে বলে দেখা যায় না। এই উন্নতির অধিকাংশই আবগারি শুল্ক সম্পর্কিত সুশাসনের ফলে সম্ভব হয়েছে। সরকার আগে প্রত্যেকটি মদের দোকানের ওপর আট শিলিং হারে কর ধার্য করেই সন্তুষ্ট থাকতেন; কিন্তু তা আদায় করার ব্যাপারেও কড়াকড়ি করতেন না; কিন্তু এখন প্রত্যেকটি মদ চোলাইয়ের কারখানার জন্য বিপুল পরিমাণ শুল্ক দিতে হয় এবং মদ চোলাই ও বিক্রির প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্স নিতে হয় ও কর দিতে হয়। মাঝে মধ্যে অভিযোগ শোনা যায় যে, অতি-উৎসাহী অধস্তন অফিসারদের মধ্যে অনেকে জনসাধরণের মধ্যে সুরাপানের অভ্যাস বাড়িয়ে দিয়ে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে থাকেন; কিন্তু চোরাচালান বন্ধ করা ও মদের সর্বোচ্চ দাম বজায় রাখার প্রচেষ্টায় সামগ্রিকভাবে খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে। অন্তত পক্ষে বীরভূমে আবগারি ব্যবস্থার সঙ্গত উদ্দেশ্যসাধন করা সম্ভব হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজস্ব অফিসারদের প্রতি বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশের ভাষায় 'সুরাপানের ব্যাপারে সর্বাধিক

৩৯. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২২শে মে, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

পরিমাণ নিরুৎসাহ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মদ থেকে যথাসম্ভব বেশি রাজস্ব আদায় করা।'[৪০]

মন্দির তত্ত্ব

প্রথম ব্রিটিশ শাসকগণ বীরভূমে রাজস্বের আর যে একটিমাত্র উৎস আবিষ্কার করেছিলেন, তা ভূমি রাজস্বের তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও তখনকার দিনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে দলিল দস্তাবেজের বহু পৃষ্ঠা অধিকার করে রয়েছে। জেলার পশ্চিম সীমান্তের পাহাড়ি নির্জনতায় মহাদেবের প্রাচীন মন্দিরসহ একটি পবিত্র শহর[৪১] রয়েছে এবং প্রতি বছর অসংখ্য তীর্থযাত্রী সেখানে পুণ্য অর্জন কতে যায়। মুসলমান শাসকরা এ জাতীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রচুর রাজস্ব আদায় করেছেন এবং তাদের ইতিহাসবিদরা উড়িষ্যার বিখ্যাত মন্দিরের প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য ধার্মিক মূর্তদের প্রশংসা করেছেন। কারণ তিনি এই মন্দির থেকে প্রদেশের বার্ষিক রাজস্ব এক লক্ষ স্টার্লিং বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪২] বীরভূমের রাজাগণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা নিয়ে দেওঘরের সমস্ত দায়িত্ব প্রধান পুরোহিতের হাতে ছেড়ে দিতেন এবং তিনি তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে তার খুশিমতো টাকা আদায় করতেন। ব্রিটিশ শাসকরা মনে করলেন যে, নিজেরা পরিচলনা করলে তারা মন্দির থেকে অনেক বেশি আয় করতে পারবেন। ১৭৮৮ সালে হেড অ্যাসিসট্যান্ট মি. হেসিলরিজের ওপর মন্দিরের দায়িত্ব অপর্ণ করা হলো এবং তিনি দেওঘর গিয়ে সরকারি খরচে পুরোহিত, আদায়কারী ও প্রহরীদের এক বিরাট বাহিনী নিয়োগ করলেন।[৪৩] কিন্তু সরকারি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর দেখা গেলো যে, হয় তীর্থযাত্রীদের ভক্তি শ্রদ্ধা কমে গেছে, আর না হয় পুরোহিতরা তহবিল তছরুপ করছে। রাজস্ব অনেক কমে গেলো; কিন্তু কর্মচারীদের ওপর কড়া নজর রাখার জন্য আরও নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা হলো। কালেক্টর তথাপি অভিযোগ করতে লাগলেন যে, মন্দিরে যাওয়ার 'প্রত্যেকটি রাস্তার লোক পাঠিয়ে আগে কে টাকা আদায় করে নিয়ে' প্রধান পুরোহিত তার সকল সতর্কতা ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। বিষয়টি মি. কিটিংয়ের বৈষয়িক মনে এমন অশান্তির সৃষ্টি করতে লাগলো যে, শেষ পর্যন্ত তিনি তীর্থযাত্রীদের ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি ও পুরোহিতদের তছরুপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের জন্য দেওঘর সফরে যাওয়ার সংকল্প করলেন।[৪৪]

---

৪০. নিম্ন প্রদেশসমূহের রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত 'আবগারী নিয়ন্ত্রণ বিধি'; ১নং বিধি। নাগরির জমিদার বাবু কিনারাম ঘোষ আমাকে উপরের তালিকায় উল্লিখিত মদের মূল্য সরবরাহ করেছেন এবং পরে আমি মদ-বিক্রেতা ও পাল্‌কি-বাহকদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তা মিলিয়ে নিয়েছি।

৪১. দেওঘর–আক্ষরিক অর্থ স্বর্গীয় শহর বা গৃহ।

৪২. নয় লক্ষ সিক্কা টাকা। স্টুয়ার্ট প্রণীত হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২৬৭ পৃষ্ঠা।

৪৩. রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনারেবল চার্লস স্টুয়ার্ট ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের রিপোর্ট, ৩০শে মে, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৪৪. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ১১ই জানুয়ারি ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

এই সংকল্প অনুসারে কালেক্টর মি. কিটিং পঁয়ত্রিশ জন সৈনিককে প্রহরী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে ১৭৯১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি সাধারণত রাজকীয় মন্থরতার সঙ্গে চলাফেরা করতেন; ফলে প্রায় এক সপ্তাহ পরে তিনি দেওঘর পৌঁছলেন।[৪৫] তিনি লিখেছেন, "মন্দিরের যথাসম্ভব নিকটে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আমি আমার তাঁবু খাটালাম। প্রত্যেকদিন আমি মন্দিরে যেতাম এবং হই-হল্লা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে যতোখানি সম্ভব সমস্ত হিন্দু নিজের চোখে দেখতাম।[৪৬] একটি নির্দিষ্ট সময়ে মন্দিরের দরজাগুলো[৪৭] খুলে দেয়া হয় এবং ভক্তরা কেউ গান গাইতে গাইতে, কেউ নাচতে নাচতে এবং কেউ বা প্রণাম করতে করতে বিরাট হই-হল্লা করে প্রবেশ করে। চারদিকে শুধু হই-হল্লা আর বিশৃঙ্খলা। এই সময় দেবমূর্তি বৃজনাউথের সামনে সোনার তাল, গহনাপত্র, টাকাপয়সা প্রভৃতি ছুড়ে দেয়া হয়; ফলে যে সকল ব্রাহ্মণ এগুলো কুড়িয়ে থাকে, তারা ধরা পড়ার কোনোরকম ভয় না করেই যা খুশি আত্মসাৎ করতে পারে।' এই সময়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে দেবতার মাথায় গঙ্গা নদী থেকে আনা পবিত্র পানি ঢেলে দেয়া। ভক্তদের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহের আতিশয্য আছে বটে, 'কিন্তু তারা খুব সঙ্গতিপন্ন বলে মনে হয় না। যে সকল পরিবার নিজস্ব গাড়িতে এসেছে বা ভাড়ার বাড়িতে অবস্থান করছে, তাদের সংখ্যা পাঁচের বেশি হবে না। প্রায় একশ' পরিবার বাঁশের আড়ার ওপর কাপড় বা কম্বল টাঙিয়ে তার নিচে অবস্থান করছে' এবং মৌসুম অনুসারে অবশিষ্ট পনেরো থেকে পঞ্চাশ হাজার লোক 'নিকটবর্তী গাছগুলোর তলায় বাস করছে; স্পষ্টতই অন্য কোনরকম সুযোগ-সুবিধা তারা করতে পারে না। দারিদ্র্যের পরিবেশ এতো প্রকট যে, ভক্তদের দান থেকে মন্দিরের খুব মুনাফা হয় বলে মন হয় না; তাছাড়া জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে যারা বঞ্চিত তাদের কাছ থেকে বেশি কিছু আশাও করা যায় না।'[৪৮] কিন্তু তথাপি এই দরিদ্র জনতার কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায়ের সংকল্প সরকারের পুরোপুরিই ছিলো। ফলে মি. কিটিং পনের জন অফিসারসহ একশ' বিশ জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়োগ করলেন।[৪৯] কিন্তু এই পুলিশ বাহিনী তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করতো বলে মনে করা হবে ভুল হবে। মন্দিরে আসার পথগুলো নির্জন পাহাড়ের চারদিকে ঘুরে মাইলের পর মাইল ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে; মাঝে মধ্যে গভীর খাদ আছে এবং খাদের গুহায় গুহায় ডাকাত বা হিংস্র বন্য জন্তু লুকিয়ে থাকে। দস্যু ও ডাকাতরা রাস্তা একেবারে বন্ধ না করে দেয়া

---

৪৫. 'সামরিক চিঠিপত্র' শিরোনামার পাণ্ডুলিপি ১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠা; বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস। প্রহরীদের মধ্যে ত্রিশ জন সেপাই, একজন জমাদার, দু'জন হাবিলদার ও দু'জন নায়েক ছিলো। সুরি থেকে দেওঘরের দূরত্ব প্রায় আশি মাইল।

৪৬. রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনারেবল চার্লস স্টুয়ার্ট, ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২৮শে মার্চ, ১৭৯১।

৪৭. এই তথ্যটি ভুল, সম্ভবত নকল করার সময় ভুল হয়েছে; ভক্তদের প্রবেশ করার জন্য মন্দিরে তখন একটিমাত্র ছোটো দরজা ছিলো।

৪৮. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২৮শে মার্চ, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৪৯. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ৩০শে মে, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কোনোরকম হস্তক্ষেপের ভয় না করেই লুটতরাজ চালিয়ে যেতো। তীর্থযাত্রীদের বিপদ ক্রমে এতো বেড়ে গেলো যে, মন্দিরে লোকজন আসা যথেষ্ট কমে গেলো এবং যে অল্পসংখ্যক লোক আসতো তারাও ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচিয়ে মন্দিরে দেয়ার জন্য বিশেষ কিছু আনতে পারতো না; বিষয়টি এভাবে রাজস্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ায় মি. কিটিং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং ডাকাত দমনের জন্য দেশীয় পদাতিক বাহিনীর একটি দলকে দেওঘর পাঠিয়ে দিলেন। এই ডাকাতদলে 'নাকি তিন শ' লোক রয়েছে'—তারা একদল তীর্থযাত্রীর ওপর লুটতরাজ চালায়, পাঁচজনকে খুন করে এবং 'রাস্তাটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়।'[৫০] পাহাড় ও জঙ্গলের পরিবেশ সেনাবাহিনীর অভিযানকে ব্যাহত করে তোলে এবং 'জঙ্গলকে ডাকাতমুক্ত করার জন্য' সেনাপতিকে 'দলের মধ্য থেকে যতো বেশি সম্ভব সৈন্য' পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়; কিন্তু ভক্তরা পথের ডাকাত ও বন্য জন্তুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে কোনোরকমে মন্দিরে পৌঁছলেও কালেক্টরের শকুনদের হাত থেকে রেহাই পেতো না; সৈন্যরা ছলে-বলে-কলে-কৌশলে তাদের কাছ থেকে শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত হাতিয়ে নিতো। তারপর ঠাণ্ডার মধ্যে উদ্বেগের সঙ্গে কয়েক রাত অতিবাহিত করার পরও তারা হয়তো তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য সফল করতে পাতো না। পবিত্র রাত্রে[৫১] দেবদর্শন করাই তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য এবং 'এই উদ্দেশ্য সফল না হলে তাদের সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং হাজার হাজার লোক ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়।' অথচ মন্দিরে প্রবেশের জন্য তখন চার ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট লম্বা একটিমাত্র ছোট দরজা ছিলো। কালেক্টর লিখেছেন যে, দেবদর্শন না হলেও 'চলে যাওয়ার আগে ভক্তরা যাতে নৈবেদ্য দিয়ে যায়, সেজন্য ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।' কারণ, 'পবিত্র রাত্রির দুই দিন পর একজন লোকও আর সেখানে দেখতে পাওয়া যায় না।'[৫২]

বীরভূমের মুসলমান রাজাগণ দেওঘর মন্দিরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করতেন এবং তখন প্রতিবছর চল্লিশ হাজার থেকে এক লক্ষ তীর্থযাত্রী মন্দিরে সমবেত হতো। তারা যে মন্দির-শুল্ক ধার্য করতেন, তার পরিমাণও ছিলো কম এবং মি. কিটিংয়ের মতো তারা মন্দিরের ধর্মীয় রহস্যেও অশোভন হস্তক্ষেপ করতেন না। ১৭৮৯ সালে মি. কিটিংয়ের কালেক্টর হওয়ার প্রথম বছরে পঞ্চাশ হাজার তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে মাত্র ৪৩০ পাউন্ড[৫৩] আদায় হয়। ১৭৯০ সালের মি. কিটিংয়ের উন্নত ব্যবস্থার ফলে ৯০০ পাউন্ড[৫৪] এবং তিনটি ঘোড়ার দাম আয় হয়। ভক্তরা এই টাট্টু ঘোড়া তিনটি দান

---

৫০. 'সামরিক চিঠিপত্র' শিরোনামার পাণ্ডুলিপির ১৪৪ পৃষ্ঠা; বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৫১. শিব-রাত্রি, মিঃ কিটিং শিযান-রাউত্ত বলে বানান করেছেন। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রে এই উৎসব হয়। মিঃ কিটিং-এর সফরের সময় (১৭৯১) ২২শে ফাল্গুন এই উৎসব হয়েছিলো।

৫২. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ৩১শে জুলাই, ১৭৯০ ও ২৮শে মার্চ, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৫৩. সিক্কা ৪০৮৪ টাকা ৭ আনা।

৫৪. সিক্কা ৮৪৬৩ টাকা ৬ আনা ২ গণ্ডা। রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ৩০শে মে ও ৩১শে জুলাই, ১৯৭০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

করেছিলো এবং মি. কিটিং আবার ভক্তদের মধ্যেই তা বেশি দামে বিক্রি করেছিলেন। ক্রেতারা সম্ভবত মন্দিরের ঘোড়া বলেই অতিরিক্ত দাম দিয়েছিলো। এই ঘোড়া বিক্রির ঘটনার মধ্যে আমাদের তৎকালীন শাসন ব্যবস্থার খুব কৃতিত্বপূর্ণ না হলেও একটি মজাদার বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মি. কিটিং একখানি চিঠিতে বলেছেন যে, ঘোড়াগুলো ছোট আকারের, জীর্ণ-শীর্ণ ও বুড়ো; এমন কি পয়সা খরচ করে জেলা সদরে আনারও যোগ্য নয় এবং বিক্রি করা হলে ঘোড়াপ্রতি বড়োজোর এক পাউন্ড থেকে দেড় পাউন্ড পর্যন্ত আয় হতে পারে; কিন্তু কলকাতায় সরকারের কাছে লেখা আর একখানি চিঠিতে কেমন করে তিনি ঘোড়া তিনটি চৌদ্দ পাউন্ডে বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছেন, বিজগর্বে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।[৫৫] এই বৈষয়িক উৎসাহ অবশ্য বেশিদিন তাজা রইলো না। ১৭৯১ সালে কালেক্টর মন্দির-শুল্কের আয় আরও বাড়ানোর সংকল্প করলেন এবং নিজে নৈবদ্য সংগ্রহের তদারক করলেন। সে বছর মাত্র পনেরো হাজার ভক্ত তীর্থ করেছিলো; কিন্তু মি. কিটিং সরকারের কাছে রিপোর্ট না দিয়ে সযত্নে গোপন করে গেলেন যে, তিনি যে বছর মন্দির সফর করেছেন, সেই বছর মন্দির-শুল্কের আয় অনেক কমে গেছে। এই বছর কাপড়-চোপড়, পাগড়ি ও চাল[৫৬] ছাড়া সোনা-রুপায় মাত্র ৮৬০ পাউন্ড[৫৭] আদায় হয় এবং তাও প্রায় জোর করে আদায় করা হয়। মোট আয় সম্ভবত ১২০০ পাউন্ড হতো; কিন্তু কালেক্টর জানান যে, ভক্তদের কাছ থেকে যা আদায় হয়েছে, তার অর্ধেকও তার কাছে পৌঁছায়নি। যদি ধরে নেয়া যায় যে, মোট ১৫০০ পাউন্ড আয় হয়েছে, তাহলে দেখা যায় যে, মাথাপ্রতি এক টাকা হারে, অর্থাৎ একজন মানুষের এক মাসের খোরাক-পোশাকের খরচ কর হিসেবে ধার্য করা হয়েছে এবং এই করও এমন পনেরো হাজার জরাজীর্ণ দরিদ্র লোকের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে, যাদের মধ্যে মাত্র একশ' পাঁচ জনের মাথার ওপর আশ্রয়ের আবরণ আছে।[৫৮]

জন শোর ১৮০৪ সালে ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটর প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে মত ব্যক্ত করতেন, ১৭৮৯ সালে রাজস্ব বোর্ডের প্রধান হিসেবে ঠিক সেই মতপোষণ না করলেও কালেক্টর ও পুরোহিতদের মধ্যে এই ক্রমাগত বিভেদের বিষয়টি তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন যে, পূজা সিদ্ধ করার জন্য ভক্তরা যে নৈবেদ্য দেয়, তাতে সরকারের ভাগ যথাসম্ভব কম থাকা উচিত। মি. কিটিং দেখলেন যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার উৎসাহে সাড়া দিলেন না এবং যেকোনো উৎস থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বিচক্ষণতার অভাব থাকায় তিনি সুপারিশ করলেন যে, মন্দির-শুল্কের ব্যাপারটি প্রধান পুরোহিতের কাছে পাট্টা দেয়া হোক। তিনি আরও বললেন, 'সরকারি

---

৫৫. এই ঘোড়াগুলোর বিষয় অন্তত আধা-ডজন চিঠিতে উল্লেখিত হয়েছে। রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনারেবল চার্লস স্টুয়ার্ট ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২৫শে জুন ও ১৮ই জুলাই, ১৭৯০ প্রভৃতি। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৫৬. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২৮শে মার্চ, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ড।

৫৭. সিক্কা ৮০০০ টাকা।

৫৮. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২৮শে মার্চ, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

হস্তক্ষেপ না থাকলে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা কি বেড়ে যাবে না?'[৫৯] আরেকটি কারণে তিনি পরিকল্পনাটি জোরে-শোরে সুপারিশ করেন; তিনি বলেন যে, সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকলে 'নানারকমের ধর্মীয় ভোজবাজি চালু হয়ে যাবে এবং তার ফলে মন্দিরের সুনাম বেড়ে যাবে।'[৬০] লর্ড কর্নওয়ালিস জন শোরের সঙ্গে একমত ছিলেন এবং পূর্ববর্তী মতবিরোধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই মত কাজে পরিণত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে মি. কিটিং মন্দিরটি প্রধান পুরোহিতের কাছে পাট্টা দেয়ার জন্য দ্রুত গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন পেলেন[৬১] এবং ১৭৯২ সাল শুরু হওয়ার আগেই জনসাধারণের কুসংস্কার থেকে আমাদের আয়ের রূপ বদলে গেলো। আগে আমাদের এই আয় দেবতাকে প্রদত্ত জনসাধারণের নৈবেদ্য সরাসরি লুণ্ঠনস্বরূপ ছিলো। পুরোহিতদের দখলে প্রচুর চারণভূমিসহ বত্রিশটি গ্রাম ছিলো; তার খাজনা মওকুফ করে মন্দির সংলগ্ন জমি এবং ধরতে গেলে প্রকৃতপক্ষে মূল মন্দিরের জন্য নামমাত্র খাজনা ধার্য করা হলো।[৬২]

পোকায় খাওয়া পুরনো পাণ্ডুলিপির মধ্য থেকে একটি ভুলে যাওয়া জগৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে। দস্যুদের ভয় অগ্রাহ্য করে মন্দিরে যাওয়ার ধর্মীয় আগ্রহ, পাহাড়ি এলাকায় শীতের রাতে খোলা জায়গায় পড়ে থাকা, সারকারের অশোভন আচরণ ও অত্যাচার আজকাল বীরভূমের হিন্দুদের কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। তীর্থযাত্রার বহু জায়গা এখনো রয়েছে; কিন্তু জনসাধারণ আজকাল আর দেবমন্দিরে যাওয়ার মতো করে যায় না, হাটবাজারে বা মেলায় মতো করে যায়। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এবং এখনকার তরুণ সমাজে যারা সবচেয়ে গোঁড়া তারা বড়োজোর সর্বসমক্ষে অবিশ্বাস বা উন্নাসিকতা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে মাত্র। হিন্দুরা এখন সম্ভবত প্রত্যেকটি মহান প্রাচীন ধর্ম ও খ্রিষ্টানধর্মের যে প্রদীপের আলোকে যুগ যুগ ধরে পথ চলেছেন, তা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে এবং আগামী দিনের শ্রেষ্ঠতর আলোকের কিরণমালা এখনো তাদের উদ্ভাসিত করে তোলেনি।

সরকারি রাজস্বের এই সকল দফা ছাড়াও জমিদাররা নিজেরাই ছাব্বিশ রকমের কর বা শুল্ক আদায় করতেন এবং এই ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে প্রচলিত রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।[৬৩] সমুদ্রের নিকটবর্তী জেলাগুলোতে একটি পৃথক দফতরের মারফত

৫৯. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র,; ৩০শে মে, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৬০. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২৮শে মার্চ, ১৭৯১।

৬১. কালেক্টরের নিকট প্রেরিত রাজস্ব বোর্ডের পত্রে উদ্ধৃত; ১৮ই জুলাই, ১৭৯১।

৬২. রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম কাউপার ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ২৭শে অক্টোবর, ১৭৯১। এই তারিখে লিখিত দু'খানি পত্রের দ্বিতীয়খানি। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৬৩. ১৭৯০ সালের জুন মাসের সয়্যার সম্পর্কিত রিপোর্টে পঁচিশটির তালিকা দেয়া হয়েছে; অপর একটির বিষয় রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম কাউপার ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, পত্রখানির তারিখ ৭ই আগস্ট, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

লবণ-শুল্ক তদারক করা হতো এবং লবণ জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর আগেই শুল্ক আদায় করা হতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগেই স্থানীয় দলিলপত্রে এ সম্পর্কে একটিমাত্র উল্লেখ দেখা যায়; সেখানে লবণ শুল্ক দফতরের একজন দেশীয় অফিসার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জেলার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি লবণ বিক্রেতার কাছে থেকে প্রচুর ঘুস আদায় করেছিলেন।

জেলার সরকারি ব্যাংকে

যথাসময়ে ভূমি রাজস্ব আদায় করাই ছিলো কালেক্টরের প্রথম ও প্রধান কাজ। তারপরই যে কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, তা হচ্ছে জেলার মধ্যে অবস্থিত কোম্পানির সওদাগরী বিষয়সমূহের অর্থদফতরের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করা। মি. কিটিং ছিলেন খাজাঞ্চি, আর একটি জেলা ব্যাংক ছিলো তার খাজাঞ্চিখানা; একজন কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট তার সমস্ত হিসাবপত্র রাখতেন। জেলার মোট রাজস্ব এক লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং-এরও বেশি ছিলো[৬৪] এবং সরকারের পাঁচ হাজার পাউন্ড স্টার্লিংও খরচ হতো কিনা সন্দেহ। অবশিষ্ট ৯৫ হাজার পাউন্ডের মধ্যে কিছু কলকাতায় বা অন্যান্য ট্রেজারিতে পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং কিছু কোম্পানির পণ্য উৎপাদন চালু রাখার জন্য জেলায় রেখে দেয়া হতো। এখনকার মতো তখনো জেলা ট্রেজারিতে যথাসম্ভব কম অনাবশ্যক টাকা রাখার ব্যবস্থা ছিলো। বর্তমানে উন্নত পদ্ধতির ফলে এই ব্যবস্থা খুব সহজ হয়ে পড়েছে; কিন্তু তখনকার দিনে কালেক্টরকে কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের যেকোনো সময় টাকা দিতে হতো বলে ব্যবস্থাটি বেশ জটিল ও অসুবিধাসাপেক্ষ ছিলো। কলকাতার কর্তৃপক্ষ সম্ভব হলে তাদের চাহিদা সম্পর্কে যথাসময়ে নোটিশ দিতেন; কিন্তু তথাপি প্রচুর পরিমাণ টাকা জেলার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির চেক ফেরত না দেয়ার মতো পর্যাপ্ত টাকা হাতে রাখার জন্য কালেক্টরের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন হতো। ট্রেজারিতে সাধারণত ৭ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত রাখা হতো এবং ১০ হাজার পাউন্ড পুরে গেলেই অতিরিক্ত টাকা কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হতো। মি. কিটিং রাজস্ব অফিসার হিসেবে যতোখানি পারদর্শী ছিলেন, সওদাগরী খাজাঞ্চি হিসেবে সম্ভবত ততোখানি পারদর্শী ছিলেন না। প্রায় প্রত্যেক মাসের শেষে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের কাছ থেকে ভর্ৎসনাপূর্ণ চিঠি আসতো এবং তার সঙ্গত কারণও ছিলো। মারাঠা যুদ্ধ চালানোর জন্য কলকাতার

---

৬৪. বীরভূমের ভূমি রাজস্ব ... ৬১১,৩২১।। ১৬ গণ্ডা (সিক্কা টাকা)
বিষ্ণুপুরের ভূমি রাজস্ব ... ৩৮৬,৭০৭।। ৭ গণ্ডা (সিক্কা টাকা)

মোট ৯৯৭,০২৯ ৩ গণ্ডা (সিক্কা টাকা)

এই টাকার মধ্যে প্রায় ৯৫০,০০০ সিক্কা টাকা বা এক লক্ষ পাউন্ড সাধারণত আদায় হতো। ১৭৮৮-৮৯ সালের জমা ওয়াসিল বাকি। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস ও ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

ট্রেজারি যখন শূন্য হয়ে গেছে এবং কোম্পানি যখন অতিরিক্ত সুদে টাকা ধার নিয়েও ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হচ্ছে; ঠিক সেই সময় মি. কিটিং তার ট্রেজারিতে ১৯ হাজার পাউন্ড[৬৫] অনাবশ্যক টাকা নিয়ে চুপ করে বসে থেকেছেন। জেলার সরকারি ব্যাংক এভাবে পরিচালিত হতো : আগামী ছয় মাসে জেলা-ব্যাংক থেকে যে টাকা নেয়া হবে, ট্রেড বোর্ড তার একটি হিসাব পাঠিয়ে দিতেন এবং উদ্বৃত্ত টাকা কোন্ ট্রেজারিতে পাঠাতে হবে রাজস্ব বোর্ড তা বলে দিতেন। প্রত্যেক মাসের শেষদিনে কালেক্টর একটি হিসাব পাঠাতেন; এই হিসাবে নগদ টাকার মোট পরিমাণ এবং তা খরচ করার দফার বিবরণ থাকতো। কবে কত টাকা পাঠাতে হবে, তা কালেক্টরই স্থির করতেন; এখন এই পরিমাণ ও তারিখ কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করে দিয়ে থাকেন।

মি. কিটিং টাকার পরিমাণ ও পাঠানোর তারিখ স্থির করার ব্যাপারেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি। একবার দেখা গেলো তিনি কোম্পানির ৮ হাজার পাউন্ডের একখানি চেকের টাকা দিতে পারছেন না, কারণ তিনি অতো টাকা ট্রেজারিতে জমা রাখেননি।[৬৬] আর একবার দেখা গেলো যে, টাকার অভাবে ট্রেজারি থেকে সকল প্রকার টাকা দেয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমগ্র জেলায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ১৭৯০ সালের শেষভাগে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে কোম্পানির সমস্ত টাকা ফুরিয়ে যায় এবং দক্ষিণ ভারতে ফসল মারা যাওয়ায় সমস্ত ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব বাংলাদেশের ওপর পড়ে।[৬৭] কালেক্টরদের প্রতি প্রত্যেকটি টাকা কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়; নবাবের কাছ থেকে প্রায় জোর করেই একটি মোটা অংকের ঋণ নেয়া হয়[৬৮] এবং ১৫ই নভেম্বর অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অন্য সমস্ত খাতে টাকা দেয়া বন্ধ রাখার আদেশ দেন। দশদিন পর টাকা পাঠানোর জন্য আবার জরুরি চিঠি এলো। সারা শীতকালই এভাবে টাকার জন্য চিঠি আসতে লাগলো এবং তার ফলে টাকা শেষ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের সমস্ত জেলা ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেলো।[৬৯] তারপর যে অচলাবস্থা ও সঙ্কট দেখা দিলো, তা উপলব্ধি করতে হলে পল্লীবাংলার অর্থনীতি সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা দরকার। কোম্পানির বহু কারখানা ছিলো; কিন্তু ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো অচল হয়ে গেলো এবং শীতকালের মাঝামাঝি হাজার হাজার পরিবার বেকার হয়ে পড়লো। প্রদেশের সমস্ত টাকা অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে প্রচলিত মুদ্রার অভাব

---

৬৫. রাজস্ব বোর্ডের অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ কাভেকট ১৭৯০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর কৈফিয়ত তলব করেছিলেন।

৬৬. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র, ১৯শে এপ্রিল, ১৭৮৯; সুরুলের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট মিঃ জন চিপের পত্র ও তার জবাব। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৬৭. 'ক্যালকাটা গেজেট', ১৮ই নভেম্বর, ১৭৯০; দ্বিতীয় বর্ষ, ২৮০ পৃষ্ঠা। অন্য বহু স্থানেও এই দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে; কয়েক মাস আগে মাদ্রাজকেও বাধ্য হয়ে কলকাতার কেন্দ্রীয় ট্রেজারি থেকে ২১ হাজার পাউন্ড নিতে হয়েছিলো। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

৬৮. 'ক্যালকাটা গেজেট', ১৮ই নভেম্বর, ১৭৯০; দ্বিতীয় বর্ষ, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

৬৯. কালেক্টরের নিকট প্রেরিত অস্থায়ী অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল মিঃ এ. কাভেকটের পত্র, ১৫ই নভেম্বর ও ২৫শে নভেম্বর, ১৭৯০ এবং ৭ই জানুয়ারি, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

দেখা দিলো। একমাত্র এই মুদ্রাতেই চাষীরা তাদের খাজনা দিতো এবং কারিগররা কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের কাছে মাল দিয়ে দাম নিতো। অনাহারক্লিষ্ট জনতা হিংস্র হয়ে এসে ট্রেজারি ঘেরাও করলো। বছরের পর বছর খারাপ ফসল হওয়ার ফলে মানুষের যে দুর্দশা হয়েছে, সরকারের এই একটিমাত্র আদেশের ফলে তার চেয়ে বেশি দুর্গতি দেখা দিলো। ভারতে আমাদের বিজয় কেতন সেখানকার মানুষের যে অপরিসীম অলিখিত দুঃখ-দুর্গতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে এই সরকারি আদেশের অবদানও নিতান্ত কম নয়। সেই শীতকালে তাঁতিদের অনাহার এবং কোম্পানির দিন ফুরিয়ে এসেছে বলে সকলের সাধারণ বিশ্বাসের কথা বীরভূমের লোকদের অনেকদিন মনে ছিলো।[৭০]

টাকার বাক্স পাহারা

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পয়সা নিয়ে যেতে হলে সতর্ক পাহারার দরকার হতো। পল্লী অঞ্চলের পথঘাট এমন বিপদসঙ্কুল ছিলো যে, দলবদ্ধ না হয়ে বা সশস্ত্র প্রহরী না নিয়ে কেউ চলাফেরা করতো না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের বেতনভুক লেঠেল সঙ্গে না নিয়ে পথে বেরুতেন না। দেশীয় বিত্তশালী লোকেরা পর্যাপ্তসংখ্যক প্রহরী সঙ্গে না থাকার ফলে জেলা অতিক্রম করতে অক্ষম হলে কালেক্টরের শরণাপন্ন হতেন এবং কালেক্টর এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে সশস্ত্র পদাতিক সৈন্য দেয়ার জন্য একাধিকবার সেনাপতিকে অনুরোধ করেছেন।[৭১] পথ চলার সময় যারা নিজেদের বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন করতে চাইতেন, তাদের পক্ষে সশস্ত্র প্রহরী অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। বেসামরিক লোকদের জীবন এখনকার মতো তখনো নিরাপদ ছিলো। সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কমার্শিয়াল এজেন্টরা নির্ভয়ে ডাকাত উপদ্রুত এলাকায় তাঁবু খাটিয়ে শিকার করতেন; কিন্তু কালেক্টর জেলার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন বলে একটু জাঁকজমক করতে চাইতেন এবং সশস্ত্র সেপাইদের না নিয়ে কখনো সুরির বাইরে যেতেন না। মি. কিটিংয়ের বীরভূমে আসার কয়েক সপ্তাহ আগে সরকারি টাকাপয়সা বহনকারী একটি দল ডাকাতদের কবলে পড়ে এবং তিন হাজার পাউন্ড লুট হয়ে যায়। নতুন কালেক্টর মি. কিটিং এই ঘটনার কথা শুনে স্থির করলেন যে, সেনাবাহিনীর কোনো ওজর-আপত্তির জন্য এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেয়া যাবে না; যেমন করেই হোক সশস্ত্র সৈন্যের ব্যবস্থা করতে হবে। তার কোনো কোনো দাবি আমাদের আমলের অফিসারদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। একবার বর্ষাকালে তিনি মাত্র দুশ পাউন্ড মুর্শিদাবাদে পাঠানোর জন্য পাহারা চেয়ে পাঠালেন[৭২] এবং একজন অফিসার ও পাঁচজন

---

৭০. সকল প্রকার টাকা দেয়া বন্ধ করা হলেও বীরভূমে বাঘ শিকারের পুরস্কার বন্ধ করা হয়নি; পরে কয়েদিদের খাবার খরচ দেয়ারও অনুমতি দেয়া হয়। যে সকল জেলায় লবণ ও আফিম উৎপন্ন হতো, সেই সকল জেলায় এই রাজস্বদাতা পণ্যের জন্য অগ্রিম টাকা দেয়াও বন্ধ করা হয়নি। বীরভূম রেভেনিউ রেকর্ডস।

৭১ 'সামরিক চিঠিপত্র' শিরোনামার পাণ্ডুলিপি। একবার চিত্রার রাজার প্রতিনিধির প্রহরী প্রয়োজন হয়েছিলো; আর একবার বর্ধমানের একজন দেশীয় বিত্তশালী ভদ্রলোক প্রহরী চেয়েছিলেন।

৭২. 'সামরিক চিঠিপত্র' শিরোনামের পাণ্ডুলিপি, ১২৮ পৃষ্ঠা।

সৈনিককে এই কাজে নিয়োগ করা হলো, কারণ এর চেয়ে কম লোক জঙ্গলের পথ অতিক্রম করতে সাহস করতো না। মুর্শিদাবাদে টাকা পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে এই দলের পনেরো দিন সময় লেগেছিলো। একজন সেপাইয়ের মাসিক বেতন ছিলো দশ শিলিং, আর একজন অফিসারের বেতন ছিলো প্রায় এক পাউন্ড; অতএব যে পথ অতিক্রম করতে এখন মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে, সেই পথের দূরত্বে টাকা পাঠানোর জন্য তখন পাঠানো টাকার শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ পাহারা বাবদ খরচ হতো। আর একবার কয়েকদিনের ব্যবধানে দুই দফায় মুর্শিদাবাদের টাকা পাঠানের জন্য কালেক্টর দুই দল সৈন্য চেয়ে পাঠালেন; কিন্তু সেনাপতি তখন একটি লোকও ছাড়তে পারলেন না। ফলে ট্রেজারির পাহারাদারদের মধ্য থেকে কিছু লোককে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এভাবে ট্রেজারির পাহারাদারের সংখ্যা প্রায়ই কমিয়ে দেয়া হতো। প্রতি বছর বড়োজোর ৪০ হাজার পাউন্ড পাঠানোর জন্য মাসিক ৫২ পাউন্ড অর্থাৎ বার্ষিক ৬২৪ পাউন্ড খরচ করে গড়পড়তা ৬০ জন সেপাই ও ৯ জন অফিসারকে পাহারার কাজে নিয়োগ করতে হতো।[৭৩] ১৮৬৪ সালে মোট ৫৯,৬০০ পাউন্ড পাঠানো হয় এবং এজন্য পাহারা বাবদ খরচ হয় মাত্র বিশ পাউন্ড।[৭৪] অর্থাৎ ১৭৮৯ সালে ৪০ হাজার পাউন্ড পাঠানোর জন্য যে খরচ হয়, ১৮৬৪ সালে ৫৯ হাজার পাউন্ড পাঠানোর জন্য তার দশ ভাগের এক ভাগও খরচ হয়নি।[৭৫]

মুদ্রা পরিস্থিতি

সরকারি ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে কালেক্টরকে জেলার মুদ্রা পরিস্থিতির ওপরও নজর রাখতে হতো। ঋণের জন্য কোম্পানিকে উচ্চহারে সুদ দিতে হতো; ফলে বাজারে যথাসম্ভব বেশি কোম্পানির নোট চালু করার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত ছিলো না। এই

---

৭৩. তিনজন অফিসার ও বিশজন সেপাইয়ের বেতন বাবদ মাসিক খরচ নিম্নরূপ ছিলো :

১ জন জমাদার	: মাসিক বেতন	১৩ সিক্কা টাকা	=	১৩	সিক্কা টাকা
১ জন হাবিলদার	: মাসিক বেতন	৯ সিক্কা টাকা	=	৯	সিক্কা টাকা
১ জন নায়েক	: মাসিক বেতন	৭ সিক্কা টাকা	=	৭	সিক্কা টাকা
২০ জন সেপাই	: মাথাপ্রতি মাসিক বেতন	৫ সিক্কা টাকা	=	১০০	সিক্কা টাকা
ভালো কাজ করার ভাতা (গুড সার্ভিস অ্যালাউন্স)			=	৬	সিক্কা টাকা
		মাসিক মোট		১৩৫	সিক্কা টাকা

অর্থাৎ প্রায় ১৪ পাউন্ড। কালেক্টরের নিকট লিখিত আপ-কান্ট্রি গ্যারিসনের পে-মাস্টার মিঃ জর্জ চিপের পত্র; তারিখ, কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল, ১৭৮৯।

৭৪. জেলা পুলিশ সুপারের অফিস থেকে এই হিসেব পাওয়া গেছে। দুই ছয় মাসের (অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস ও ১৮৬৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাস প্রতি একশ' টাকা, বা বছরে ২০ পাউন্ড।

৭৫. ১৮৬৪-৬৫ সালের আর্থিক বছরে পাঠানো টাকার মধ্যে ৫০ হাজার পাউন্ড ছিলো মুদ্রা এবং ৯৬০০ পাউন্ড ছিলো নোট। পাঠানো ও পাহারা মোট খরচ ছিলো ৭৬০১ পাউন্ড বা ৭৬ পাউন্ড ১ শিলিং ৮পেন্স; অর্থাৎ পাঠানো টাকার শতকরা দশ ভাগের এক ভাগের কিছু বেশি। যে সকল ট্রেজারিতে টাকা পাঠানো হতো, তার গড়পড়তা দূরত্ব ছিলো ১৫০ মাইল অর্থাৎ ১৭৮৯ সালের গড় দূরত্বের চেয়ে তিন গুণ বেশি।

উদ্দেশ্যে বহু জটিল ও বিরক্তিকর নিয়ম চালু করা হয়েছিলো। বার্ষিক ১২০০ পাউন্ডের অধিক সমস্ত বেতন বা অন্যান্য দেনা অর্ধেক নোটে এবং অর্ধেক মুদ্রায় পরিশোধ করা হতো।[৭৬] এই ব্যবস্থায় পল্লী অঞ্চলের লোকদের ভীষণ অসুবিধে হতো, কারণ লোকসান না দিয়ে কোম্পানির কাগজ বাজারে চালানো যেতো না।[৭৭] কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য প্রায়ই ট্রেজারিতে কাগজের নোট ছাড়া কিছুই থাকতো না এবং একবার একখানি সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্রে ফলাও করে ঘোষণা করা হয় যে, কলকাতার কর্মচারীরা মাসের বেতন রৌপ্য মুদ্রায় পাবে। সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে দেয়ার জন্য কাগজের নোটকে পরিশোধের সময় জনসাধারণ অধিকারগতভাবে কাগজের টাকা দিতে পারতো কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ মি. কিটিং একবার রাজস্ব বোর্ডকে লিখেছিলেন, জনসাধারণ ভূমি রাজস্ব কাগজের টাকায় পরিশোধ করতে চাচ্ছে; এই টাকা তিনি গ্রহণ করবেন কিনা; সে সম্পর্কে চিঠিতে তিনি বোর্ডের নির্দেশ চেয়েছেন।[৭৮]

মুদ্রা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার ফলে জনসাধারণকে যে দুর্দশায় পড়তে হয়, প্রত্যেকটি দলিলে তার নির্দশন রয়েছে। চারশ' বছর সময়ের মধ্যে হিন্দুরা যতো রকমের অপকৌশল আয়ত্ত করেছে, তার সমস্তগুলো প্রয়োগ করে তারা প্রচলিত প্রত্যেকটি মুদ্রা কেটে, ঘষে বা ফুটো করে ধাতু নিয়ে নিতো, অথবা জোর করে তার আসল দাম কমিয়ে দিতো; অথচ কুড়িটি রাজবংশের শাসনকাল যাবৎ এই মুদ্রা চালু থেকেছে। লিখিত মূল্য থেকে কতো বাদ যাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত হিসাব না হয়ে ক্ষুদ্রতম মুদ্রাটিও হাতবদল হতো না এবং বলাবাহুল্য এই হিসেবে শক্তিশালী পক্ষই সব সময় লাভবান হতো। ট্রেজারি অফিসাররাও এই মুদ্রার জন্য জমিদারদের কাছ থেকে বাটা আদায় করতেন। বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসন চালু হওয়ার সময় কাটা-ঘষা হোক বা না হোক এক বছরের পুরোনো মুদ্রার জন্য শতকরা ৩ টাকা এবং দুই বছরের পুরোনো মুদ্রার জন্য শতকরা ৫ টাকা হারে বাটা আদায় করা হতো।[৭৯] জমিদার তার অধীনস্থ তালুকদারের কাছ থেকে এই হারের দ্বিগুণ এবং তালুকাদার চাষীর কাছ থেকে চার গুণ বাটা আদায় করতেন। চাষীদের কাছ থেকে জমিদাররা যে সকল বেআইনি সেস বা আবওয়াব আদায় করতেন,

---

৭৬. গভর্নর-জেনালের-ইন-কউন্সিলের সিদ্ধান্ত, ২৭শে মে, ১৭৮৯। এই সিদ্ধান্তে যে নোটের কথা বলা হয়েছে, তার জন্য সুদ দিতে হতো কিনা তা সঠিকভাবে বুঝা যায় না; তবে ট্রেজারির নথিপত্র থেকে দেখা যায়, এমন এক ধরনের নোট ছিলো, জনসাধারণ যা আদৌ নিতে চাইতো না; ফলে সেগুলো জোর করে চালাতে হতো। ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস। স্যার জেমস স্টিউয়ার্ট প্রণীত 'প্রোপোজাল ফর দি এক্সটেনশন অব পেপার ক্রেডিট ইন বেঙ্গল' (১৭৭২) দ্রষ্টব্য। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

৭৭. ১৭৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি সার্টিফিকেট (নোট) শতকরা ৭ টাকা কম দামে চলতো। ১৭৮৫ সালে শতকরা ১৪ টাকা কম ছিলো।—'ক্যালকাটা গেজেট' ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৭। ইন্ডিয়া অফিস পাইব্রেরি।

৭৮. রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জন শোর ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ১১ই এপ্রিল, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৭৯. স্যার জেমস স্টিউয়ার্ট, ব্যারোনেট, প্রণীত 'প্রিন্সিপল্‌স অব মানি ইমপ্লায়েড টু দি প্রেজেন্ট স্টেট অব কয়েন ইন বেঙ্গল, কম্পোজড ফরদি ইউজ অব দি অনারেব্‌ল দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'; ১৬ পৃষ্ঠা। কোম্পানির জন্য ১৭৭২ সালে মুদ্রিত। গ্রান্ট প্রণীত 'এপিডিয়েন্সি মেইনটেইন্ড' ২৩, পৃষ্ঠা, ১৮১৩। 'ইসাইস সুর ল্য হিস্টোরি ইকোনমিক দ্য ল। তুর্কী' ১০৯ পৃষ্ঠা, প্যারিস, ১৮৬৫।

সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মি. কিটিং একখানি চিঠিতে 'বাট্টা' বা পুরনো মুদ্রার বিনিময় মূল্যকে সবচেয়ে নির্মম বলে উল্লেখ করেছেন; কারণ এর কোন নির্দিষ্ট হার বা নিয়ম নেই।[৮০] কোন নির্ধারিত হার ছিলো না বলে ট্রেজারি অফিসার যে হারে খুশি বাটা আদায় করতেন; তাদের বাধা দেয়ারও কোনো উপায় ছিলো না। সরকার তাদের রাজস্বের নিট পরিমাণ টাকা পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু ওজনের সম্ভাব্য ঘাটতি পূরণের জন্য কোন্ মুদ্রা থেকে কতো বাটা আদায় করতে হবে তা নির্ধারণের জন্য তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিলো। তাছাড়া বহু রকমের মুদ্রা প্রচলিত থাকায় কোন্ ধরনের মুদ্রা নেয়া হবে, আর কোন্ ধরনের মুদ্রা আদৌ নেয়া হবে না, তা নির্ধারণের জন্যও তারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দাবি করেছিলেন। তখনকার দিনে নিম্নলিখিত শ্রেণীর মুদ্রা চালু ছিলো—কড়ি; সকল মূল্যমানের তামার মুদ্রা; নির্ধারিত মূল্যমানবিহীন তামার পাত; পিতলের রঙ ধরানো লোহার খণ্ড; পুরো সিক্কা থেকে উজিরী[৮১] পর্যন্ত বত্রিশ রকমের টাকা (উজিরী টাকা দাম অর্ধেক ছিলো); প্যাগোডা[৮২] নামক বিভিন্ন ওজনের প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা; বিভিন্ন ধরনের বিশুদ্ধতা সংবলিত ডলার[৮৩] ; পঁচিশ থেকে বত্রিশ শিলিং দামের নানা রকমের সোনার মোহর[৮৪] এবং এশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য বহু জাতীয় মুদ্রা, যার নামই এখন আর কারো মনে নেই।[৮৫] কোনো কোনো ট্রেজারিতে কড়ি নেয়া হতো, আবার কোনো কোনো ট্রেজারিতে নেয়া হতো না।[৮৬] কোনো কোনো কালেক্টর সোনার দাম নিতেন; অনেকে আবার সোনা নিতেন না; কেউ কেউ আবার নেবেন, কি নেবেন না ঠিক করতে পারতেন না।[৮৭] আর হতভাগ্য চাষী কখনই জানতে পারতো না যে, ফসল বেচে সে যে মুদ্রা পেয়েছে, তা খাজনা দেয়ার সময় চলবে কিনা।

---

৮০. দশ সালা বন্দোবস্ত চালু করার জন্য রাজস্ব বোর্ডে যে নির্দেশ দেন, তার জবাবে কালেক্টর কর্তৃক রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনারেবল চার্লস স্টুয়ার্ট, ও সদস্যদের নিকট লিখিত পত্র; এপ্রিল, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৮১. 'ক্যালকাটা গেজেট', ১লা নভেম্বর, ১৭৯২। মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকার সিক্কা টাকার তুলনায় উজিরী টাকার দাম শতকরা ৩৭ ভাগ কম ছিলো। 'ঢ' পরিশিষ্টে প্রচলিত টাকা ও তার দামের তালিকা দ্রষ্টব্য।

৮২. ওজন ও বিনিময়ের প্রচলিত হার অনুসারে প্যাগোডার মূল্য ৬ শিলিং ৮ পেন্স থেকে সাড়ে ৮ শিলিং পর্যন্ত।

৮৩. 'ক্যালকাটা গেজেট', ১৪ই জানুয়ারি, ১৭৯০।

৮৪. স্যার জেমস স্টিউয়ার্ট প্রণীত 'প্রিন্সিপ্‌লস অব মানি', ২৬ পৃষ্ঠা, ১৭৭২।

৮৫. 'ণ' পরিশিষ্টে প্রণীত ১৭৬৩ সালে ছয়টি ভারতীয় বন্দরে প্রচলিত মুদ্রার তালিকা দ্রষ্টব্য।

৮৬. সিলেট ট্রেজারিতে কড়ি নেয়া হতো; কিন্তু পরে তা হস্তান্তর করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। 'ক্যালকাটা গেজেট' ৬ই অক্টোবর, ১৭৯১। লর্ড লিণ্ডসে প্রণীত 'লাইভস্ অব দি লিণ্ডসেজ' তৃতীয় খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা। বীরভূম ট্রেজারিতে কড়ি নেয়া হতো না। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৮৭. মিঃ কিটিং বীরভূমে আসার পরই জমিদাররা তাকে স্বর্ণমুদ্রায় তুষি রাজস্ব দেন; কিন্তু তিনি স্বর্ণমুদ্রা নেবেন কিনা স্থির করতে না পেরে রাজস্ব বোর্ডের কাছে চিঠি লেখেন; জবাবে বোর্ড তাঁকে স্বর্ণমুদ্রা নিতে অনুমতি দেন। রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জন সোর ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ১১ই এপ্রিল, ১৭৮৯ ও তার জবাব। পক্ষান্তরে 'কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ভদ্রলোক স্বর্ণমুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করার অনুমতি প্রার্থনা করে' দরখাস্ত করেছিলেন; ১৭৮৮ সালের ১৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবারের 'ক্যালকাটা গেজেটে' এই দরখাস্তের বিষয় উল্লেখ করা হয়। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

কিন্তু টাকা নেয়ার সময় ট্রেজারিতে নির্যাতনমূলক সাবধানতা অবলম্বন করা হলেও সদরে পাঠানো টাকার মধ্যে এতো বেশি অচল টাকা পাওয়া যেতো যে, আজকাল তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। একবার ৪০,৭৩৮ টাকার (৪১,০০০ পাউন্ড) এক চালানের মধ্যে ৭৩৮টি অচল টাকা পাওয়া যায়।[৮৮] আজকাল এক লক্ষ টাকার চালানেও গড়পড়তা পাঁচটি অচল টাকাও থাকে না। সংখ্যার দিকে থেকে প্রচলিত মুদ্রা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অপর্যাপ্ত ছিলো এবং সরকারের অদূরদর্শী হস্তক্ষেপের ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। সরকার সমসাময়িক বুলির পুনরাবৃত্তি করে বলতেন যে, 'বাট্টা নেয়ার কৌশল', 'মহাজনদের অতিরিক্ত হারে সুদ আদায়' অথবা 'বিত্তশালী লোকদের ষড়যন্ত্রের' ফলেই মুদ্রার অভাব দেখা দিয়েছে[৮৯] অর্থাৎ আসল কারণটি বাদ দিয়ে সরকার অন্য সমস্ত কারণই বর্ণনা করতেন; কিন্তু দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মুদ্রা যে নেই, তা একবারও উপলব্ধি করতেন না। ক্রমে ক্রমে সোনা, রুপা, তামা ও কাগজের নোট—এই চার রকমের মুদ্রা চালু করা হলো; কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে যে অসুবিধা হতে পারে, তা বন্ধ করার জন্য কোনো নিয়ম করা হলো না। তবে খেয়ালখুশিমতো নিয়ম-কানুন প্রণয়নের ব্যাপারে কিন্তু সরকারে ক্লান্তি ছিলো না। সরকার মাঝে মধ্যে খুশিমতো সোনার দাম বেঁধে দিতেন এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো তা অন্ধভাবে সমর্থন করতো। একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিলো বটে, কিন্তু বলাবাহুল্য, তারা কোনোরকম উন্নতি করতে পারেননি। ১৭৮৮ সালে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর সম্পাদক লেখেন, 'সোনার মোহরের বাটা এখনো খুব বেশি দিতে হচ্ছে; ফলে গরিব লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। বর্ধমান ও অন্যান্য জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণ রুপা কলকাতায় আমদানি করার পরও এই সমস্যা শুধু যে অব্যাহত রয়েছে তাই নয়, বরং বেড়েই গেছে; ফলে এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কতিপয় অর্থগৃধ্নু বিত্তশালী লোকের ষড়যন্ত্রের ফলেই এই অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আগামী মৌসুম পর্যন্ত তারা যদি এই কাজ চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে আমরা সাগ্রহে আশা করি যে, জুরির সামনে তাদের কাছে থেকে তাদের বেআইনি কাজের কৈফিয়ত তলব করা হবে এং যে আইনে দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করা হয়েছে, সেই আইন অনুসারে তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। মুদ্রায় পরিবর্তিত রুপায় এমন একটি বস্তু যার দাম সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং এই বস্তু কেউ বিপুল পরিমাণে হস্তগত করলে, অথবা বেআইনিভাবে কেউ তার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে, অতি সহজেই তা নিখুঁতভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে।' এক পক্ষকাল পরে তিনি আবার লিখেছেন, 'আমরা গভীরভাবে আশা করি যে, সমগ্র সমাজে যে সঙ্কট তীব্রভাবে

৮৮. বীরভূমের কালেক্টর সি. কিটিং-এর নিকট প্রেরিত মুর্শিদাবাদের কালেক্টর জে.ই. হ্যারিংটনের পত্র; ২৭শে সেপ্টেম্বের, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৮৯. 'ক্যালকাটা গেজেট', ২৮শে ফেব্রুয়ারি ও ১০ই এপ্রিল, ১৭৮৮। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

অনুভূত হচ্ছে, তার অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; অন্য পথে সুদে কারবারের বন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য ডুবে যাবে।' কিন্তু যে সময় উচ্চঃস্বরে আদালতের সাহায্য কামনা করা হচ্ছিলো, ঠিক সেই সময় আইন পরিষদ মুদ্রার বিশুদ্ধতা রক্ষায় জন্য কোনোরকম ব্যবস্থা করতে ভুলে গেলেন। আইনের মারফত যতোটুকু সম্ভব, তারতের ব্রিটিশ সম্প্রদায় তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ, হস্তক্ষেপ ও শাস্তি দাবি করেছিলেন; কিন্তু আদালত যে ক্ষমতা ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারে, ভারতের ব্রিটিশ সরকার সেই ক্ষমতাটুকুও আদালতকে তখনো দেননি। মুদ্রা সম্পর্কিত একটি মামলায় কলকাতায় গ্রান্ড জুরিকে বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেয়ার সময় বিচারক স্যার উইলিয়াম জানকিন্‌স দুঃখ করে বলেছেন, আইনে বিধান না থাকায় মুদ্রা থেকে ধাতু কেটে নেয়া, মুদ্রা জাল করা এবং মুদ্রা সম্পর্কিত অনুরূপ অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রতারণার অপরাধের চেয়ে বেশি দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না, বা বেশি দণ্ড দেয়া যায় না।[১০]

পল্লী অঞ্চলে মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস ও অপর্যাপ্ততার পেছনে দুই প্রকার কারণ বিদ্যমান ছিলো—একপ্রকারের কারণ, ইংরেজদের আসার আগে থেকেই সক্রিয় ছিলো এবং অন্য প্রকারের কারণের গোড়াপত্তন হয়েছিলো ইংরেজদের সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত; কিন্তু অদূরদর্শী মুদ্রা সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে। মুসলমান শাসকগণ একমাত্র রুপাকেই মুদ্রার বিষয়বস্তু বা মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করতেন। সোনার মুদ্রাও তৈরি করা হতো; কিন্তু তার কোনো 'নির্দিষ্ট দাম বেঁধে দেয়া হতো না।'[১১] অর্থাৎ সোনাকে সব সময় সোনার তাল হিসেবেই গণ্য করা হতো; মোহর নামে পরিচিত টাকশালের সীল মারা মুদ্রাও আসলে সোনার খণ্ড বলেই গণ্য হতো এবং সোনার বাজারদর অনুসারেই তার দাম নির্ধারিত হতো। দিল্লির মোহরের ওজন ও সৌকর্য, রুপার টাকার ওজন ও সৌকর্যের মতো একই ধরনের ছিলো; কিন্তু দিল্লির মোহর সোনার বাজারদর অনুসারে কখনো বারো, কখনো তেরো, চৌদ্দ বা পনেরো সিক্কা টাকায় বিক্রি হতো।[১২] প্রচুর পরিমাণ তামার মুদ্রা হাতবদলের সময়ও ঠিক একই উপায়ে বিক্রি হয়ে থাকে; অর্থাৎ লিখিত দামের চেয়ে কম দামে বিক্রি হয়। লিখিত দামের চেয়ে এই দাম কতো কম হবে তা এলাকা এবং রুপা ও তামার মুদ্রার তুলনামূলক চাহিদার ওপর নির্ভর করে। এই ব্যবস্থা আগের মতো এখনো চালু আছে। মাঝে মধ্যে জেলা ট্রেজারিগুলোতে প্রচুর পরিমাণ তামার মুদ্রা জমা হয়ে যায়; ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে এ বিষয়ে পত্রালাপও হতে দেখা যায়। এই তামার পয়সা টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য মিউনিসিপ্যাল পুলিশের করের মতো ক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গার কালেক্টরদের শতকরা কয়েক ভাগ হারে রেহাই দেয়া হতো।

---

১০. 'ক্যালকাটা গেজেট' ১৮ই জুন, ১৭৯৫। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি।
১১. স্যার জেমস্ স্টিউয়ার্ট প্রণীত 'প্রিন্সিপল্‌স অব মানি', ২৫ পৃষ্ঠা, ১৭৭২।
১২. স্যার জেমস স্টিউয়ার্ট প্রণীত 'প্রিন্সিপলস অব মানি', ২৬ পৃষ্ঠা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রুপার টাকাই বিনিময়ের একমাত্র স্বীকৃত মাধ্যম ছিলো; দেশীয় সরকারগুলো এই মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সফল হতে পারেননি।[৯৩] প্রথমত, তখন একাধিক টাকশাল ছিলো এবং কোনো টাকশালেই নির্ধারিত মান অনুসারে টাকা তৈরি হতো না। কয়েকটি টাকশালে এই মান অনুসরণ করার চেষ্টাও করা হতো না। দ্বিতীয়ত, টাকা তৈরি করা হচ্ছে রাজশক্তির অন্যতম বহুবাঞ্ছিত নিদর্শন; ফলে যে সকল ছোটোখাটো রাজা-মহারাজা অন্য সকল বিষয়ে দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করতো, তারাও টাকা তৈরির অধিকার নিজেদের হাত রাখতো। পতনশীল রাজবংশ যেমন রাজশক্তির শেষ নির্দশন হিসেবে এই অধিকার আঁকড়ে থাকতো, উচ্চাভিলাষী সামরিক সামন্তরাও তেমনি ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর সর্বপ্রথম এই অধিকার কাজে লাগাতো। মারাঠারা যখন পাহাড়ি দস্যু ছিলো তখনই তারা একটি টাকশাল বসিয়েছিলো; আর ১৬৮৫ সালে বাংলাদেশে মাত্র কয়েকখানি বাড়ি ও বাগানের মালিক হওয়ার পরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা নিজস্ব মুদ্রা তৈরির কথা ভাবছিলেন। এভাবে যে সকল রুপার টাকা তৈরি হতো, তা সওদাগরদের হাতে হাতে বা নজরানা হিসেবে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে চলে যেতো; ফলে এই সকল টাকার মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মান স্থির করার প্রয়োজন ছিলো।[৯৪] দুই টাকশালের টাকা ওজন বা বিশুদ্ধতার দিক থেকে কখনোই সমান হতো না এবং এমন কি কোনো কোনো টাকশালে তাদের নিজস্ব মানও অনুসরণ করা হতো না। ফলে জনসাধারণের হাতে যাওয়ার পর এই টাকার দাম বিভিন্ন হারে কমে যেতো। এই অবস্থায় কোনো টাকশালের মুদ্রাকেই নির্ধারিত মান হিসেবে মনোনীত করা সম্ভব ছিলো না; কারণ প্রথমত, কোনো টাকশালের টাকাকেই খাঁটি বলে বিশ্বাস করা যেতো না এবং দ্বিতীয়ত প্রচলিত কোনো মুদ্রাকে মান হিসেবে মনোনীত করা হলে, নকল ও জালিয়াতির মাত্রা বেড়ে যেতো। এই অসুবিধে এড়ানোর জন্য একটি নতুন আদর্শ মুদ্রা উদ্ভাবন করা হয়। এই মুদ্রার সাহায্যে অন্য সকল প্রকার টাকার মূল্য নির্ণয় করা যেতো। কোম্পানির প্রথম আমলের একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এই মূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, 'শ্রোফের কাছে (ব্যাংকার বা টাকা বদলকারী) টাকা আনা হলে তিনি প্রত্যেকটি টাকা আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করে প্রথমে বিশুদ্ধতা অনুসারে এবং তারপর ওজন অনুসারে তার শ্রেণীবিভাগ করেন। তারপর সিক্কা ও সুনাত থেকে বিভিন্ন বৈধ বাটা বাদ দিয়ে তিনি চলতি টাকার হিসাবে টাকাগুলোর

---

৯৩. নিয়ম অনুসারে একটি টাকার নির্ধারিত ওজন এক সিক্কা, অর্থাৎ ১৭৯.৫৫১১ গ্রেন (স্বর্ণকারের ওজন) এবং নির্ধারিত ওজন এক বিশুদ্ধতা $\frac{৯৮}{১০০}$ বিশুদ্ধ রুপা।

৯৪. তুরস্কের মুসলমান শাসকগণ মূলত একই কারণে একই উপায় অবলম্বন করেছিলেন। কনস্টান্টিনোপাল সম্রাটের সেক্রেটারি ইন্টারপেটার এম. বেলিন প্রণীত 'এসাইস সুর ল্য হিস্টোরি ইকোনমিক দ্য লা তার্কি' (ইম্পরিয়াল প্রেস, ১৮৬৫) দ্রষ্টব্য।

মূল্য নির্ণয় করেন। অতএব, চলতি টাকাই হচ্ছে এখন একমাত্র মুদ্রা, যার সাহায্যে অন্য সকল মুদ্রার মূল্য নির্ণয় করা হয়; কারণ 'চলতি টাকা' আসলে কোনো মুদ্রা নয়, একটি মূল্যমান মাত্র'; অতএব তা জালও করা যাবে না, আর ক্ষয়েও যাবে না।[১৫]

এই পদ্ধতি ব্যাংকার বা ট্রেজারি অফিসারের জন্য সহজ এবং নিঃসন্দেহে লাভজনক হলেও গরিব চাষীর কাছে তা কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিলো। পল্লী অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীই ফসল বেচে যে মুদ্রা পেতো, তার আসল মূল্য তারা বুঝতে পারতো না এবং খাজনা ও কর দেয়ার সময় যে হিসেবে তাদের কাছ থেকে এই মুদ্রা নেয়া হতো, তাও তারা বুঝতে পারতো না। যে গভীর এবং প্রায় ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভারতের কৃষকরা দীর্ঘদিন যাবৎ টোডরমলের কথা মনে রেখেছে, এমন কি আজও তার উষ্ণতা অনুভব করা সম্ভবত আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। ধনকুবের টোডরমলের ওপর যখন রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিলো, তখন তিনি চাষীদের খুশিমতো টাকায় বা ফসলে রাজস্ব পরিশোধের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করেছিলেন।

১৭৬৬ সালের মুদ্রা সংস্কার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন নিম্নবাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন এই ছিলো সেখানকার অবস্থা। ট্রেজারিতে জমা করা টাকার সংখ্যা থেকে তাদের আর্থিক সঙ্গতি উপলব্ধি করার উপায় ছিলো না এবং শেষ পর্যন্ত যদিও চলতি টাকায় হিসাব রাখার ফলে এই অসুবিধা অনেকখানি দূর হয়েছিলো, তথাপি প্রকৃত মুদ্রার মূল্য চলতি টাকায় প্রকাশ করার কাজ অতিশয় পরিশ্রমসাপেক্ষ ছিলো এবং এই পরিশ্রমের পরও নিখুঁতভাবে হিসাব মেলানো দুরূহ ছিলো। ওজনের অসংখ্য তারতম্যের কথা বাদ দিলেও বছরের এমন কি দুই চালানের টাকাও একই ধরনের বিশুদ্ধতা সংবলিত মুদ্রায় পাঠানো যেতো কিনা সন্দেহ। ১৭৬৪ থেকে ১৭৬৯ সাল (উভয় বছরসহ) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মোট যে আটাশটি বড়ো চালান পাঠানো হয়, সে সম্পর্কে আমাদের কাছে মূল দলিল আছে।[১৬] এই আটাশ চালানের মধ্যে মাত্র তিন চালানের টাকার ধাতু সঠিকভাবে বিশুদ্ধ ছিলো; অবশিষ্ট পঁচিশটি চালানের সমস্ত টাকা গালিয়ে, ওজন করে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত তার মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিলো সমস্ত পুরোনো মুদ্রা বাতিল করে দিয়ে নির্দিষ্ট ওজন ও বিশুদ্ধতার একটি নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা এবং বাংলাদেশের প্রথম ব্রিটিশ শাসকরা আগ্রহের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারলেন যে, ব্যাপারটিকে তারা প্রথমে যতোখানি সহজ বলে মনে করেছিলেন, আসলে তা ততোখানি সহজ নয়। নতুন মুদ্রার জন্য বেশি দাম দিতে হয় বলে জনসাধারণ তাদের পুরনো মুদ্রা টাকশালে আনতে চায় না। তারা যা দিতো, ফেরত পাওয়ার সময় বড়োজোর তার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ

---

১৫. স্যার জেমস স্টিউয়ার্ট প্রণীত 'প্রিন্সিপলস অব মানি', ১৭ পৃষ্ঠা, ১৭৭২।
১৬. স্যার জেমস স্টিউয়ার্ট প্রণীত 'প্রিন্সিপলস অব মানি' ১৮-২১ পৃষ্ঠা।

পেতো। অংশত এই কারণে এবং অংশত নতুন টাকা বাজারে ছাড়ায় ব্যাপারে দেরি হওয়ার ফলে সারা প্রদেশে মুদ্রার নিদারুণ অভাব দেখা দিলো। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলো; ধনী সওদাগরদের হাতেও মালপত্র কেনার টাকা থাকলো না এবং কেউ ধারেও দিতে চাইলো না; কারণ তারা জানতো যে ধারে জিনিস দিলে দাম পরিশোধের সময় মুদ্রা পাওয়া যাবে না। এই সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য কলকাতার কাউন্সিল সোনার টাকা চালু করবেন বলে স্থির করলেন। তারা আরও স্থির করলেন যে, এই সোনার টাকার একটি নির্ধারিত লিখিত মূল্যও থাকবে, আবার রুপার বাজারদরের ভিত্তিতেও মোহরের সোনাও বিক্রি করা যাবে; তবে এই দুই রকমের দাম সমান হবে। কাউন্সিলের হাতে তখন কাজ শুরু করার মতো সোনা ছিলো না; তাই ইচ্ছেমতো নতুন সোনার মোহর তৈরি করতে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। আইন অনুসারে নতুন মোহরের দাম এমনভাবে ঠিক করা হলো যে, মোহরের সোনা বিক্রি করলে যে পরিমাণ রুপা পাওয়া যাবে, সেই রুপার দামের চেয়ে মোহরের লিখিত দাম শতকরা সাড়ে সতেরো ভাগ বেশি। ফলে মোহর বানানোর জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার লোক সোনা নিয়ে এসে টাকশালে ভিড় করতে লাগলো; কিন্তু কাউন্সিল যতোই মোহর ছাড়তে লাগলেন, বাজারে ততোই মুদ্রার অভাব দেখা দিতে লাগলেন এবং এই সমস্যার কোনো সঙ্গত কারণও খুঁজে পাওয়া গেলো না। দীর্ঘ ছয় বছর পর এই কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সোনার প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে রুপার বাজারে নিরুৎসাহ দেখা দেয়। কাউন্সিল খেয়ালখুশিমতো নতুন মোহরের যে দাম স্থির করেছিলেন, তার ফলে সোনায় মূল্য পরিশোধ শতকরা করা ১৭$\frac{1}{2}$ ভাগ হারে লাভজনক ছিলো বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার রুপায় পরিশোধ করা একই হারে লোকসানজনক হয়ে পড়েছিলো। সোনা ওয়ালা অভাগ্যবানদের তুলনায় রুপাওয়ালা হতভাগ্যদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিলো; কিন্তু ভাগ্যবানরা যে পরিমাণে লাভবান হলেন, হতভাগ্যদের তার হাজার গুণ লোকসান দিতে হলো। শেষ পর্যন্ত লোকে দেশে রুপার ব্যবহার বন্ধ করে দিয়ে সোনা কেনার জন্য বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমস্ত রুপা বাইরে চালান করতে লাগলো। খোদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই সওদাগরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর আড়াই লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যের রুপা চীনে চালান দিতে শুরু করলেন।[১৭] মাদ্রাজে কোম্পানির ব্যবসা চালানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে রুপা পাঠাতে হতো; বোম্বাইয়ের রাজস্ব থেকে শাসন ব্যবস্থার ব্যয় সংকুলান হতো না বলে সেখানেও বাংলাদেশের রুপা পাঠাতে হতো।[১৮] এই স্মরণীয়

---

১৭. 'প্রিন্সিপল্‌স অব মানি' ২৬, ৩২ ও ৫৭ পৃষ্ঠা।

১৮. আদিকাল থেকেই অন্যান্য প্রদেশগুলো নিজেদের ঘাটতি পূরণের জন্য বাংলাদেশকে দোহন করেছে। ভারতের গত শতাব্দীর দলিলপত্র থেকে এ বিষয়ে শত শত উদাহরণ দেয়া যায়। যথা—কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত বঙ্গীয় প্রেসিডেন্ট এন্ড কাউন্সিলের পত্র, ২৫শে আগস্ট, ১৭৭০; ২৬ ও ৩০ অনুচ্ছেদ; ১৭৭২ সালের ৯ই মার্চের পত্র, ২২ অনুচ্ছেদ; এই পত্রে কাউন্সিল অভিযোগ করেছেন যে, অন্যান্য প্রেসিডেন্সিতে টাকা পাঠাতে পাঠাতে বাংলাদেশের ট্রেজারিগুলো শূন্য হয়ে গেছে; হিকির 'বেঙ্গল গেজেট; ২৯শে এপ্রিল, ১৭৮০; 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত অসংখ্য নোটিশ (১৭৮০—১৮০৪)। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস, ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি। মার্শম্যান প্রণীত 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' পুস্তকও দ্রষ্টব্য; প্রথম খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা (১৭৫৮) এবং ৩২৮ পৃষ্ঠা (১৭৬৭)। লংম্যানস, ১৮৬৭।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরের বছর কাউন্সিল ক্রমাগত অভিযোগ করতে থাকেন যে, অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর জন্য যখন মুদ্রা নেই, তখন বিপুল পরিমাণ রুপা বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিনের মধ্যে আরেকটি ঘটনা সংকট আরও বাড়িয়ে দিলো। বিদেশ থেকে সোনা ও রুপা আমদানির জন্য ভারতবর্ষকে সব সময়ই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আসবাবপত্রের সাজসজ্জা ও গহনাপত্রের জন্য ভারতে বিপুল পরিমাণ রুপা খরচ হতো। রোম, ভেনিস, পর্তুগাল, হল্যান্ড ও ব্রিটেনের অধিবাসীরই পর পর দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, প্রাচ্যের বিলাসদ্রব্য আমদানির জন্য তাদের জাতীয় মুদ্রা ভারতে চালান হয়ে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে পারস্য উপসাগরের পথে পশ্চিম ভারতের একটিমাত্র বন্দরেই (সুরাট) প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ স্টার্লিং মূল্যের সোনা ও রুপা মুদ্রা আমদানি হতো। ইংল্যান্ড থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মারফরত যে সোনা-রুপা বাইরে চলে যেতো, তার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হতো। কি পরিমাণ সোনা-রুপা বিদেশে চালান হবে, তা পার্লামেন্টে স্থির হতো; ফলে বহু দেশদরদী পুস্তিকা প্রচার করে এই ব্যবস্থার নিন্দা করতেন। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবসা ছিলো ব্রিটেন থেকে ভারতে রুপা পাঠানো এবং বিনিময়ে ভারতীয় পণ্য ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া; কিন্তু ১৭৬৫ সালে নিম্নবাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর কোম্পানির কাছে প্রতিবছর এতো উদ্বৃত্ত টাকা থাকতো যে, মূলধনের জন্য আর বিলেত থেকে রৌপ্যমুদ্রা আমদানি করতে হতো না।[১৯] কোনো জেলায় (যেমন বীরভূম) যদি ৯০ হাজার পাউন্ড রাজস্ব আদায় হতো;, তাহলে কাউন্সিল কড়া নজর রাখতেন যেনো সেই জেলার শাসনকার্যের জন্য কোনোমতেই পাঁচ বা ছয় হাজার পাউন্ডের বেশি খরচ না হয়। অবশিষ্ট টাকার মধ্য থেকে দশ হাজারের মতো সাধারণ বেসামরিক ব্যয় এবং আরও দশ হজার সেনাবাহিনীর ব্যয় বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত (ধরা থাক) ৬০ হাজার পাউন্ডের সাহায্যে রেশম, মসলিন, সুতিবস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য কেনা হতো। পরে কর্তৃপক্ষ এই সকল পণ্য বিলেতে নিয়ে গিয়ে লিডেনহল স্ট্রিটে বিক্রি করতেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজস্ব থেকেই কোম্পানির বাংলাদেশে নিয়োগের মূলধন হয়ে যেতো; ফলে বিলেত থেকে প্রতি বছর সোনা-রুপা আসা বন্ধ হয়ে গেলো; কিন্তু বাংলাদেশে এই দুই ধাতুর চাহিদা আগের মতোই থেকে গেলো। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর যে বিপুল পরিমাণ মুদ্রা বাইরে চলে যেতো, বিলেত থেকে মুদ্রা আসার ফলে তার ঘাটতি পূরণ হয়ে যেতো। আমরা আরো জানতে পেরেছি যে, বিলেত থেকে চালান না এলে কোম্পানির চীন, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শাখায় সোনা-রুপা পাঠানো তো দূরে কথা, এমন কি দিল্লির নজরানা পাঠানোও সম্ভব হয়ে উঠতো না। ১৭৫০ সালে মান্ডেভিল লিখেছেন, 'বাংলাদেশে যতো রুপা আমদানি হয়, মুদ্রাই হোক আর খণ্ডই হোক, সম্রাটের রাজস্ব দিতে গিয়ে তার সমস্তই ফুরিয়ে যায়। এই রুপা দিল্লি চলে যায় এবং সেখান থেকে আর (নিম্ন) বাংলায় ফিরে আসে না। ফলে এই সম্পদ মুর্শিদাবাদ থেকে

১৯. 'প্রিন্সিপ্‌লস অব মানি' ৫৬ পৃষ্ঠা।

চলে যাওয়ার পর বিলেত থেকে পরবর্তী জাহাজে রুপার নতুন চালান না আসা পর্যন্ত ব্যবসা-বণিজ্য চালানো অথবা এমনকি বাজারে গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার জন্যও বাংলাদেশের পর্যাপ্ত পরিমাণ মুদ্রা থাকে না।'[১০০]

অতএব, ১৭৬৫ সালেই বিলাত থেকে রুপার চালান আসা বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ১৭৬৬ সালে যে সোনার মোহর উদ্ভাবন করা হয়, তার ফলে সঙ্কট আরও বেড়ে যায়। পরের দুই বছরের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক লেনদেন একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দেশীয় ও ইংরেজ মিলে সমগ্র জনসংখ্যা কিছু একটা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন জানায়। ১৭৬৯ সালে ইংরেজ বাসিন্দাগণ লেখেন, 'বর্তমানে অবস্থা এমন গুরুতর হয়ে পড়েছে যে, কলকাতার প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীরা দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম দেখা দিয়েছে, অথবা তার মালপত্র ক্রোক হয়ে ধ্বংসের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসা শুরু করার বা চালু রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মুদ্রা নেই। খাতকদের কাছ থেকে পাওনা আদায় হচ্ছে না এবং দেনাও পরিশোধ করা যাচ্ছে না; ফলে সৎ-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রায়ই আদালতে মামলা হচ্ছে। পাওনাদারদের দাবি যুক্তিসঙ্গত বলে জানা সত্ত্বেও এবং দেনা পরিশোধের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা আদালতে হাজির হয়ে মামলায় প্রতিযোগিতা করছে; কারণ তারা আশা করছে যে, রায় হওয়ার আগে এভাবে যে সময় পাওয়া যাবে, সেই সময়ের মধ্যে তাদের খাতকরা টাকা পরিশোধ করে দিতে পারবে এবং তার ফলে তারা মামলার দাবি মিটিয়ে দিতে সক্ষম হবে; যদিও তারা ভালোভাবেই জানে যে, খাতকদেরও টাকা পরিশোধের পুরো সদিচ্ছা রয়েছে; কিন্তু মুদ্রার অভাবে তারা পরিশোধ করতে পারছে না। এভাবে তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা মাটি হয়ে যাচ্ছে এবং তারা অবর্ণনীয় দুর্গতির সম্মুখীন হচ্ছে।'[১০১] 'কলকাতার আর্মেনীয় বণিকদের সবিনয় দরখাস্তে' বিষয়টি আরও জোরদার করে বলা হয়েছে, 'এই রাজধানীতে মুদ্রার তীব্র অভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি বণিক এমন দুর্গতিতেই পড়েছে যে, সওদাগরী মালমাত্তায় গুদাম বোঝাই থাকা সত্ত্বেও তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারছে না; ফলে সকলের শুধু দেউলিয়া হওয়ারই আশঙ্কা দেখা দেয়নি, বরং সম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে সত্য সত্যই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে।'

১৭৬৯ সালের সোনার টাকা

এই সঙ্কটের অবসান ঘটানোর জন্য ইংরেজ বণিকরা প্রস্তাব করলেন, যাদের ঘরে রুপা আছে, অথচ আইন দ্বারা নির্ধারিত হারে সোনার মোহরের বিনিময়ের তা বাজারে ছাড়ছে না, তাদের সকলকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করা হোক। আর্মেনীয় বণিকরা কিন্তু

---

১০০. ১৭৫০ সালের ২৭শে নভেম্বরের পত্র; কোম্পানি কর্তৃক ১৭৭১ সালে মুদ্রিত। ১৭৬৯ সালের ২০শে মার্চের অর্থ বিষয়ক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

১০১. অনারেবল হ্যারি ভেরেলেস্টের নিকট প্রেরিত কলকাতার মেয়র্স কোর্টের দরখাস্ত'; তারিখ টাউন হল, ১৪ই মার্চ, ১৭৬৯; রেজিস্ট্রার জন হোমস কর্তৃক স্বাক্ষরিত। 'ক্যালকাটা রিভিউ' (৩৫—২৯) হইতে উদ্ধৃত।

সমস্যাটি আরও তলিয়ে দেখলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে, এমন একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যা কেবলমাত্র আইনের সাহায্যে পূরণ করা যাবে না; তাই তারা দেশের সমস্ত সোনাকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করলেন। রুপা পাওয়ার উপায় ছিলো না, কিন্তু বহু পুঁজিপতির কাছে সোনা জমা ছিলো; তাই তারা আরও প্রস্তাব করলেন যে, সমস্ত সোনা এক জায়গায় জড়ো করে আট শিলিং থেকে বত্রিশ শিলিং পর্যন্ত বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা প্রস্তুত করা হোক। এই মুদ্রা ব্যবস্থা যে খুব সুবিধাজনক হবে তা নয়, তবে কিনা 'নেই মুদ্রার চেয়ে যেকোনো মুদ্রাই ভালো।'[১০২]

অনারেবল হ্যারি ভেরেস্ট এই বিচক্ষণ আর্মেনীয় ভদ্রলোকের পরামর্শ মেনে নিলেন। তিনি লিখেছেন, 'নিখুঁত নিরপেক্ষ তদন্তের ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুদ্রার অভাব একটি আকস্মিক বা আনুমানিক ঘটনা নয় এবং শুধু কলকাতার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। এখানকার বণিকরা যে তীব্র অভাব অনুভব করছে, সমগ্র দেশেও ঠিক তেমনি অভাব বিরাজ করছে।' তিনি আশঙ্কা করেন যে, 'মুদ্রার অভাবের জন্য হয় কম রাজস্ব আদায় হবে, আর না হয় ফসলের আকারে রাজস্ব নিতে হবে।' সকল বিষয় বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত তিনি আর এক দফা সোনার মুদ্রা প্রস্তুত করার আদেশ দেন; কিন্তু মুদ্রা সংস্কার ব্যবস্থা সফল করতে হলে যে তত্ত্ব-তথ্যের প্রয়োজন, বাংলাদেশের ব্রিটিশ শাসকদের কাছে তা ছিলো না এবং মি. ভেরেস্ট ১৭৬৬ সালের মতো নতুন মুদ্রার লিখিত মূল্য বাজারদরের চেয়ে অতো বেশি নির্ধারণ না করলেও শতকরা ৫$\frac{১}{৪}$ ভাগ বেশি করলেন। ফলে ১৭৬৬ সালের ঘটনাবলিই আবার অপেক্ষাকৃত কম তীব্রতার সঙ্গে পুনরাবৃত্তি হলো। জনসাধারণ প্রথমে মুদ্রা তৈরি করে লাভবান হওয়ার জন্য সোনা নিয়ে টাকশালে আসতো এবং কাউন্সিল স্বীয় সফলতায় গর্ববোধ করতেন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই লোকে বুঝতে পারলো যে, সোনার মোহরের দাম কৃত্রিম উপায়ে শতকরা ৫$\frac{১}{৪}$ ভাগ বাড়িয়ে দেয়া হলেও রুপার টাকার দাম ঠিক সেই অনুপাতে কমে গেছে। ফলে তারা তাদের সমস্ত রুপার টাকা বাজার থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করলো এবং টাকশাল থেকে যথেষ্ট সোনার মোহর বাজারে ছাড়া সত্ত্বেও তা জাতীয় মুদ্রার স্থান অধিকার করতে সক্ষম হলো না। ১৭৬৬ সালের লোকসান থেকে শিক্ষা পাওয়ায় দেশীয় ব্যাংকাররা এবার সরকারের আগেই কাজ শুরু করলো এবং কয়েক মাস পরে কল্পিত দামের সোনার মোহরে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় রুপার টাকায় ঋণ দেয়া বন্ধ করে দিলো। বছর শেষ হওয়ার আগেই কাউন্সিল দেখলো যে, তাদের ট্রেজারি শূন্য এবং তারা অভিযোগ করলেন যে, বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জন করে 'তাদের সমস্ত টাকা বাক্সবন্দি করে ফেলছে।'[১০৩]

এমন কি যাদের হাতে সোনা ছিলো তারাও স্বর্ণমুদ্রা চালু করার ব্যাপারে কোম্পানির প্রচেষ্টায় সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলো। ১৭৬৬ সালের বিধি অনুসারে একটি মোহরে ১৪৯.৭২ গ্রেন বিশুদ্ধ সোনা থাকলে তা চৌদ্দ টাকায় বিক্রি হতো, অর্থাৎ ১০.৬৯৪ গ্রেন

---

১০২. আর্মেনীয় বণিকদের দরখাস্ত, ১৭৬৯; 'ক্যালকাটা রিভিউ' (৩৫-২৮) থেকে উদ্ধৃত।

১০৩. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র; ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯; ৩৯ অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস।

সোনার বিনিময়ে এক টাকা পাওয়া যেতো; কিন্তু ১৭৬৯ সালের বিধি অনুসারে মোহরে ১৯০.০৮৬ গ্রেন বিশুদ্ধ সোনা থাকতো এবং তা ষোল টাকায় বিক্রি হতো, অর্থাৎ ১১.৮৮ গ্রেন সোনার বিনিময়ে এক টাকা পাওয়া যেতো। দেশীয় টাকা বদলকারীরা এই কারচুপি ধরে ফেললো এবং কোম্পানির টাকশালে সোনা নিয়ে গিয়ে মোহর বানানো বন্ধ করে দিলো। কারণ তারা জানতো যে, কাঁচা সোনা হাতে থাকলে সবসময়ই বাজারদরে দাম পাওয়া যাবে; কিন্তু কোম্পানি যে কখন কোন্ মোহরের মধ্যে কতোটুকু খাদ মিশিয়ে দেবে তার ঠিক কি!

পরবর্তী বিশ বছর যাবৎ যে সীমাহীন দুর্গতি বিরাজ করেছিলো তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে হলে ব্যাপক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। ডিরেক্টরগণ মর্মপীড়ার সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, ১৭৬৯ সালে মহাদুর্ভিক্ষ জনসাধারণের সীমাহীন দুঃখ-দুর্গতিকে চরমে পৌঁছে দিয়েছে এবং পল্লীবাংলার ইতিহাস অনশন-ক্লিষ্ট জনশূন্য প্রদেশ থেকে ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায়ের বর্বরতার বিবরণে পরিণত হয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস মানুষের দেহ ও সম্পত্তির জন্য যে নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন, মুসলমান লুণ্ঠনকারীরা হিন্দুস্থানে আসার পর তেমন নিরাপত্তা কখনো দেখা যায়নি। তিনি সকলের জন্য সমান আইন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বাঙালিদের তিনি ভালোভাবে বুঝতেন, তাদের চাহিদা পরীক্ষা বা চরিত্র বিশ্লেষণের সকল প্রচেষ্টায় সহায়তা করতেন, তাদের প্রশংসা অর্জনের জন্য যথাসময়ে ও যথারীতি উদারতা দেখাতেন এবং দীর্ঘ নির্যাতনের ফলে আত্মমর্যাদাহীন বাঙালি জাতিকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য সুপরিকল্পিত উপায়ে তার প্রত্যেকটি প্রকাশ আচরণে ত্বরিত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতেন; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, এদেশের লোকদের তিনি ভালোবাসতেন এবং বিনিময়ে তারা তাঁকে যেমন গভীরভাবে ভালোবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো, তেমন ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা ওয়ারেন হেস্টিংসের আগে বা পরে আর কোনো ইংরেজ এ দেশবাসীর কাছ থেকে পায়নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর এশীয় নরপতি; এক শতাব্দী আগে হলে তিনি এমন একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, যে সাম্রাজ্যের পরবর্তী বিশ জন সম্রাটের গৌরবও তার শাসন ও চরিত্র গৌরবের কাছে ম্লান হয়ে যেতো; কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে তার অন্তর ছিলো পাথরের মতো কঠিন। হিন্দুস্থানের রাজা-উপরাজাদের উৎপাত, মারাঠাদের হামলা, প্রভাবশালী হিন্দুদের ষড়যন্ত্র, সৈন্যদের বিদ্রোহ ও কাউন্সিলে সহযোগীদের তীব্র সমালোচনার মধ্যে তিনি উপলব্ধি করতেন যে, টাকার ওপর কর্তৃত্বই তার শক্তির একমাত্র উৎস। টাকাই স্বদেশে কোর্ট অফ ডিরেক্টরের সঙ্গে তার যোগসূত্র মজবুত করে রাখতে পারে; টাকাই বাংলাদেশে তাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পারে; আর সমগ্র ভারতের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আর্থিক ব্যাপারে যেকোনো রকমের কঠোরতা তার কাছে খুব উচ্চমূল্য বলে মনে হতো না। তার মতো একজন শাসক তাই মুদ্রা ব্যবস্থার মারফত পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবেন বলে আশা করা যেতো না; কারণ মুদ্রা ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত যতো সুবিধাই হোক না কেন, ততোদূর পৌঁছতে পৌঁছতে ব্যাপক ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ার পূর্ণ আশঙ্কা বিদ্যমান ছিলো। মূল্যমানবিহীন ও অপর্যাপ্ত মুদ্রার ফলে যে দুর্গতি দেখা দিয়েছিলো,

মাঝে মধ্যে তার বিবরণ তার কানে এলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার একটা কিছু সাময়িক প্রতিকার করতেন; কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি যে মৌলিক সংস্কারসাধন করেছিলেন, তা তার ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বছরেই সম্পন্ন হয়েছিলো।

১৭৭৩ সালের টাকশাল সংস্কার

দেশীয় শাসন ব্যবস্থায় টাকশাল রাজস্বের একটি অন্যতম উৎস ছিলো।[১০৪] মুদ্রা তৈরি করার জন্য উচ্চহারে মজুরি আদায় করা হতো এবং জনসাধারণ মোহর তৈরির জন্য যে সোনা আনতো, প্রয়োজনবোধে অফিসারগণ তার মূল্যমান কমিয়ে দিতেন। তাছাড়া টাকশালের কাজ চালু রাখার জন্য এমন একটি উদ্ভট পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছিলো, যার ফলে জনসাধারণকে প্রতি বছর পুরনো মোহরকে নতুন মোহরে রূপান্তরিত করতে বাধ্য করা হতো। কারণ মোহরের ওপর মুদ্রিত তারিখ থেকে এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেই আসলে কোনো ক্ষয় হোক আর না হোক শতকরা উচ্চাহারে বাটা বাদ দেয়া হতো। ওজন বা বিশুদ্ধতা না হ্রাস পেলেও এক বছর চালু থাকার পর মোহরের দাম শতকরা তিন ভাগ এবং দুই বছর চালু থাকার পর শতকরা পাঁচ ভাগ কমে যেতো। এই মূল্য হ্রাসের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পুঁজিপতিরা প্রত্যেক বছর বা দ্বিতীয় বছরের শেষে তাদের সমস্ত মুদ্রা আবার টাকশালে নিয়ে আসতো এবং এভাবে জনসাধারণের দুর্গতির বিনিময়ে টাকশালের কাজ চালু থাকতো। বঙ্গীয় কাউন্সিল ১৭৭১ সালেই এ অব্যবস্থার একটি প্রতিকার সুপারিশ করেছিলেন,[১০৫] কিন্তু মি. কার্টিয়ারের দুর্বল শাসনের আমলে তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ওয়ারেন হেস্টিংস কোনো কাজ কখনো অর্ধেক করে ছেড়ে দিতেন না; তাই ১৭৭৩ সালে তিনি এই সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি আইন চালু করেন যে, মুদ্রা যতো পুরনোই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত না হলে তার দাম কোনোমতেই কমানো যাবে না। এই বিধান যাতে লঙ্ঘন না হয়, সেজন্য তিনি নির্দেশ দিলেন যে, ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রার ওপরই একই তারিখ, অর্থাৎ ১৭৭৩ সাল মুদ্রিত থাকবে; টাকার ওপর তাই শাহ আলমের 'সুশাসনের ১৯তম বছর' মুদ্রিত হতে লাগলো। এই সিদ্ধান্তই কোম্পানির প্রথম সংক্ষেপ ছিলো; কিন্তু এর ফলে এতো বেশি বিরোধ দেখা দেলো যে, ওয়ারেন হিস্টিংস আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস করলেন না। তখনকার আমলের প্রত্যেকটি দলিলপত্রে জনসাধারণের সীমাহীন দুর্গতির জ্বলন্ত নির্দশন রয়েছে। মুদ্রার মূলমান হ্রাসের ফলে যে ধ্বংস নেমে এসেছিলো ও মানুষে মানুষে যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিলো সরকারি নথিপত্রে কয়েক পৃষ্ঠা পরপরই তার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এ সম্পর্কে কলকাতার প্রথম সংবাদপত্র থেকে দু'টি নজির উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৮০ সালের মে মাসে সিক্কা টাকার দাম সম্পর্কে মতবিরোধ হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার এই প্রধান শহরের সমস্ত

---

১০৪. 'প্রিন্সিপলস অব মানি', ৩ পৃষ্ঠা।

১০৫. কোর্ট অব ডিরেক্টরের পত্র, ৩০শে আগস্ট, ১৭৭১।

দোকানপাট কয়েকদিন যাবৎ বন্ধ ছিলো।[১০৬] অবশেষে সরকার জনসাধারণের মত মেনে নেয়ার পর দোকানপাট পুনরায় চালু হয়। কিছুদিন পরই এক ব্যক্তি 'অনেস্টাস' ছদ্মনামে অভিযোগ করেন যে, স্থানীয় ও সরকারি মুদ্রার বিনিময় মূল্যের অনিষ্টকর ও অবিরাম তারতম্যের ফলে মধ্যবাংলার সওদাগরী রাজধানী পাটনার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়েছে।[১০৭]

১৭৯০ সালের মুদ্রা সংস্কার

১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস যখন প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন মুদ্রার অনিশ্চিত মূল্যমান ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে এ জাতীয় শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করছিলো। শাসনভার গ্রহণের পর প্রথম তিন বছর তিনি বিচার বিভাগীয় ও অর্থনৈতিক সংস্কারেই তার সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। কলকাতার সংবাদপত্রটির সমালোচনা এবং পল্লীবাসীদের মর্মস্পর্শী আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও তিনি তখন মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেননি; কিন্তু জন শোরের মধ্যে তিনি এমন একজন উপদেষ্টা পেয়েছিলেন, যিনি সমস্যাটির ব্যাপকতা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন। তাই চিরতরে সমস্যাটির মূলোৎপাটনের জন্য ১৭৮৯ সাল শেষ হওয়ার আগেই দুই বন্ধু একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করলেন। তারপর সহসা একদিন আদেশ জারি হলো যে, ওজনে কম হওয়ার দরুন ট্রেজারি অফিসাররা আর কোনো মুদ্রা নিতে অস্বীকার করতে পারবে না। কালেক্টরদের অফিসে অফিসে নির্ধারিত হারে তালিকা টাঙিয়ে দেয়া হলো; নির্দেশ দেয়া হলো যে, টাকা যদি কোনো স্বীকৃত টাকশালে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে তা ক্ষয়েই যাক, কেটেই নেয়া হোক, আর ছিদ্রই হোক, ট্রেজারি অফিসারদের তা ওজন করে ফেরত নিতে হবে এবং নির্ধারিত তালিকা অনুসারে তার দাম দিতে হবে। প্রদেশের ট্রেজারিগুলোতে স্মরণাতীতকাল থেকে একমাত্র চলতি সালের সিক্কা টাকা ছাড়া সকল প্রকার মুদ্রার ওপর খেয়ালখুশিমতো যে বাটা আদায় করা হতো, এই ব্যবস্থার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলো। ট্রেজারি অফিসারগণ এই আদেশের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই আর একটি আদেশ এসে হাজির হলো। যে টাকা তারা গ্রহণ করবে, কেবলমাত্র তার মোট অংশেরই নয়, যে সকল মুদ্রায় তা পরিশোধ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির জন্যও তাদের হিসাব দিতে হবে। এই আদেশের ফলে ট্রেজারি অফিসারদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই বিস্তর তদবির-তদারক করে ও ঘুসের আকারে ততোধিক মূলধন নিয়োগ করে ট্রেজারারের পদ লাভ করেছে। তখনকার দিনে এই পদের বেতন ছিলো বছরে মাত্র ৪০ পাউন্ড; কিন্তু তালেবের লোকদের জন্য আরও কমপক্ষে চার হাজার পাউন্ড কামানোর সুযোগ ছিলো। জমা টাকার মধ্যে পাঁচ থেকে ত্রিশ হাজার পাউন্ড হাতসাফাই করা ছাড়াও ট্রেজারিতে আগত প্রত্যেকটি টাকা থেকে তারা 'ভাতা' কেটে নিতেন; তারপর সেই টাকাই আবার

১০৬. হিকির 'বেঙ্গল গেজেট', ২০শে মে ১৭৮০।
১০৭. হিকির 'বেঙ্গল গেজেট', ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮০।

কোম্পানিকে দেয়ার সময় তারা নিজেরাই তার মূল্য স্থির করে দিতেন; কিন্তু এখন এই লাভজনক প্রক্রিয়া সহসা বন্ধ হয়ে গেলো। লর্ড কর্নওয়ালিস মুদ্রাকে দুইভাগে ভাগ করেছিলেন, যথা—সরকারি মুদ্রা, এই মুদ্রা পুরো লিখিত দামে নিতে হবে এবং পুরনো বা ক্ষয়ে যাওয়া মুদ্রা, এই মুদ্রা তালিকায় নির্ধারিত দামে নিতে হবে এবং প্রত্যেক মাসের শেষে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হবে। লর্ড কর্নওয়ালিস মনে করতেন যে, কোনো টাকা লিখিত মূল্য থেকে কিছু পরিমাণ বাদ দেয়ার প্রয়োজনের একমাত্র অর্থ হচ্ছে এই যে, টাকাটি বাজারে চালু থাকার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তিনি তাই নির্দেশ দিলেন যে, এইরূপ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে টাকাটি কি দামে দেয়া হয়েছে, তা একখানি কাগজে লিখে টাকাটির সঙ্গে কাগজখানিও প্রেসিডেন্সি টাকশালে পাঠিয়ে দিতে হবে।[১০৮]

ট্রেজারি অফিসাররা ঘ্যান ঘ্যান করলেন, বিড়বিড় করলেন, ওজর-আপত্তি করলেন এবং এমন কি আদেশ লঙ্ঘনও করলেন। শাসন সংস্কারের প্রাথমিক উৎসাহে ওয়ারেন হেস্টিংস একটি আদেশ জারি করেছিলেন এবং তখন তারা কোনোমতে সেটি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু প্রজ্ঞাময় হলেও অসংবদ্ধ স্বৈরতন্ত্র এবং সুগঠিত কেন্দ্রীয় সরকারে সদাসতর্কতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এবং তাদের এই পার্থক্য উপলব্ধি করার সময় এসেছিলো। লর্ড কর্নওয়ালিস দীর্ঘ চার বছর যাবৎ কঠোর সহিষ্ণুতার সঙ্গে স্থানীয় অফিসারদের জন্য বহুসংখ্যক বাধা ও প্রতিবন্ধকতাময় বিধি প্রণয়ন করেছিলেন; এই বিধি এখনো ভারতের শাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। ১৭৮৯ সাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত সমস্ত দেশীয় লোকের নাম-ধামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন[১০৯] এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিবাদমুখর ট্রেজারি অফিসাররা বুঝতে পারেন যে, তারা তাদের কাছ থেকেই কৌশলে আদায় করা অসংখ্য বিবৃতি ভাউচার ও মাসিক হিসাব শক্ত জালে আটকে গিয়েছেন। লর্ড কর্নওয়ালিস ক্রুদ্ধ হয়ে যেখানে হাত দিতেন সে জায়গা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো; আর অপরাধীকে ধরার জন্য জন শোর তাকে একটি অব্যর্থ প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে কখনো ট্রেজারি অফিসারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতেন না; কিন্তু যে সকল ইংরেজ কালেক্টর তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের অপরাধ দেখেও দেখতেন না বা উপেক্ষা করতেন, তাদের তিনি জরিমানা করতে শুরু করলেন। এই জরিমানা কোনোমতেই মওকুফ করা হতো না। এমন কি মি. কিটিংও তার অর্থ সংগ্রহের পারদর্শিতার খ্যাতির বদৌলতে এই জরিমানা থেকে রেহাই পেলেন না এবং লর্ড কর্নওয়ালিস যখন দেখলেন যে, ট্রেজারাররা তার মুদ্রা সংস্কার বিধি যথানিয়মে পালন করছে না, তখন তিনি হিসাব বা রিটার্ন পাঠানোর ব্যাপারে সকল প্রকার অনিয়ম এবং আনুষ্ঠানিকতার সকল ত্রুটিকেই জরিমানাযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন।[১১০] ইতোপূর্বে কেবলমাত্র যথাসময়ে টাকার চালান না পাঠানো হলেই জরিমানা করা হতো।

---

১০৮. ১৭৯০ সালের ২৩শে জুনের আদেশ, রাজস্ব বোর্ডের ৩০শে জুনের পত্রের সহিত বীরভূমের কালেক্টরের নিকট প্রেরিত। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১০৯. বীরভূমের কালেক্টরের নিকট প্রেরিত রাজস্ব বোর্ডের পত্র; ৭ই এপ্রিল, ১৭৮৯। ১৭৮৭ সালের ৮ই জুনের বিধি, ১৮ ধারা। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস ও ক্যালকাটা অফিস রেকর্ডস।

১১০. রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলার ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

এভাবে জরিমানা দিতে ও অপদস্থ হতে হওয়ায় কালেক্টরগণ তাদের অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে লাগলেন; কারণ প্রকৃতপক্ষে এই সকল অধস্তন কর্মচারীর অপরাধের জন্যই তাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। ফলে দেখা গেলো যে, মাসে মাসে পুরনো ও ক্ষয়ে যাওয়া মুদ্রা পাঠানোর ব্যাপারটি প্রশ্নাতীত ও অলঙ্ঘনীয় নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে।

কিন্তু ট্রেজারারদের বাধা অপসারিত হলেও আরেকটি বৃহত্তর ও মারাত্মক বাধা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। প্রদেশের মোট মুদ্রাসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগই ছিলো এই সকল মূল্যমানহীন মুদ্রা এবং তা প্রত্যাহার করার কাজে সফলতা দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের হাতে আর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনারও মুদ্রা রইলো না। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের দাম দ্রুত পড়ে গিয়ে নামমাত্র মূল্যে বেচাকেনা হতে লাগলো। আসলে কিন্তু ফসল আদৌ সস্তা ছিলো না, টাকার অভাবেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। যে মহাজন বসন্তকালে চাষীকে এক বা দেড় পাউন্ড দাদন দিয়েছিলো, ফসল কাটার সময় হিসাব মিটানোর জন্য সে চাষীর সমস্ত ফসলই নিয়ে গেলো। বড়ো বড়ো শহরগুলোতে নতুন সরকারি টাকাই বেশি চালু ছিলো; অতএব পুরোনো টাকা প্রত্যাহারের ফলে সেখানে দ্রব্যমূল্যে তারতম্য দেখা দিলো না। ধান-চালের ব্যবসায়ীরা দেশের সমস্ত ধান, চাল ও রবিশস্য পল্লী অঞ্চল থেকে নামমাত্র মূল্যে কিনে বেশি দামে বেচার জন্য তা রফতানি করার জন্য শহরে নিয়ে এলো এবং হতভাগ্য কৃষক সমাজে প্রচুর পরিমাণ ফসল পাওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়ে পড়লো।

এই সময় টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালু রাখার জন্য টাকার জরুরি দরকার দেখা দেয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠলো। একদিকে যেমন সমস্ত পুরনো টাকা গালিয়ে ফেলার জন্য কলকাতায় পাঠানো হলো, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত নতুন টাকা মাদ্রাজে পাঠানোর জন্য কলকাতায় পাঠানো হলো। ট্রেজারি অফিসারদের বিজয়ের দিন আসন্ন হয়ে উঠেছিলো; কারণ, তারা যুক্তি দেখালো যে, কোনো সরকারই দেশকে সম্পূর্ণরূপে মুদ্রাশূন্য করতে সাহস করবে না এবং ১৭৭২ সালের মুদ্রা সংস্কারের মতো ১৭৯০ সালের মুদ্রা সংস্কারেরও একই পরিণতি হবে—অর্থাৎ প্রথমে সীমাহীন দুর্দশা সৃষ্টি হবে এবং তারপর সংস্কারের পরিকল্পনাই পরিত্যক্ত হবে। কিছুদিনের জন্য পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সত্য সত্যই অনিশ্চিত হয়ে রইলো। এদিকে যখন এই সঙ্কট শুরু হয়েছে, লর্ড কর্নওয়ালিস তখন আরও বহুবিধ সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছেন। বিচার বিভাগ ও আর্থিক বিষয়ে নতুন ব্যবস্থা চালু করার কাজ অর্ধেক মাত্র সমাপ্ত হয়েছে, ফলে সমস্ত বিষয়টি তখন অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে; মাদ্রাজে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা ভারতে ইংরেজদের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছে; ব্যাপক দুর্ভিক্ষে সমগ্র দাক্ষিণাত্য জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে; এই অবস্থায় যে এলাকা অক্ষত রয়েছে, সেই বাংলাদেশে কি তিনি কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করবেন? কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিস দেখলেন যে, বিষয়টি আসলে দু'টি অমঙ্গলের মধ্যে বাছাই করার প্রশ্ন। মুদ্রা সংস্কারের ফলে যে দুর্ভোগ হবে বলে আশঙ্কা করা গিয়েছিলো, তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভোগ হয়েছে বটে; কিন্তু তার অর্ধেকটাই এখন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পিছিয়ে আসার অর্থ হবে মূল্যমানহীন মুদ্রা

ব্যবস্থায় দুঃখ-কষ্টময় একটি অনির্দিষ্টকালে ফিরে যাওয়া। তাছাড়া আবার যখন সংস্কারের চেষ্টা হবে, তখন আরেকবার নতুন করে দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলাদেশের জনসাধরণের তীব্র আর্তনাদ শুনে দরদের সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করলেন।

১৭৯০-৯১ সালের মুদ্রা সঙ্কট

১৭৯০-৯১ সালের শীতকাল পার হয়ে গেলো; কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভোগের অবসান হলো না। পুরোনো টাকা প্রত্যাহারের সময় সরকার স্থির করেছিলো যে, এই ধাতুর সাহায্যে নতুন টাকা তৈরি হওয়ার পর তা বাজারে ছাড়া হবে; কিন্তু দেখা গেলো নতুন টাকা জনসাধারণের হাতে পৌঁছায়নি। কলকাতার পুরনো টাকশালে পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গেলো এবং একটি টাকশালে কুলাবে না বলে তিনটি বড়ো শহরে[১১১] নতুন টাকশাল বসানো হলো। প্রত্যেকটি জেলার কালেক্টরকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তার কাছে যতো মুদ্রা পাঠানো হবে তার সমস্তই তিনি যেনো বাজারদরে নিয়ে নেন এবং তার দাম যেনো সরকারি মুদ্রায় পরিশোধ করেন।[১১২] প্রথমদিকে জনসাধারণ তাদের পুরনো টাকার বিনিময়ে নতুন টাকা নিয়ে যেতে লাগলো; কিন্তু কিছুদিন পরই কালেক্টরগণ দেখতে পেলেন যে, তাদের বৈধ টাকার চালান শেষ হয়ে গেছে; অতএব হয় তাদের স্থানীয় টাকা নিতে অস্বীকার করতে হয়, আর না হয় তা ধারে নিতে হয়। ঠিক এই সময় যুদ্ধের খরচের চাপ এসে পড়লো এবং কালেক্টরদের ওপর বারবার আদেশ জারি হতে লাগলো যে, কেবলমাত্র কয়েদিদের খাবার, আর বাঘ মারার[১১৩] পুরস্কারের টাকা ছাড়া জেলা ট্রেজারি থেকে অন্য সকল প্রকার খরচ বন্ধ রাখতে হবে। দরিদ্র জনসাধারণ তাদের সমস্ত পুরনো টাকা ট্রেজারিতে জমা দিয়েছিলো; এখন তার বদলে তারা নতুন টাকা চাইলো; কিন্তু কালেক্টরকে অতিশয় কুণ্ঠার সঙ্গে বলতে হলো যে, ট্রেজারি থেকে টাকা দেয়া উপরের হুকুমে বন্ধ রয়েছে।

১৭৯১ সালে পয়লা জানুয়ারি রাজনৈতিক আকাশে সাময়িক হলেও একটি উজ্জ্বল আলোকরেখা দেখা গেলো। গলানো, পরীক্ষা করা ও টাকা তৈরির মন্থর প্রক্রিয়ার একটি দর্শনযোগ্য সুফল অবশেষে দেখা গেলো এবং বছরের প্রথম দিন চারটি টাকশাল থেকে একযোগে 'নতুন তৈরি টাকা' ছাড়া হলো; কিন্তু এই সুসংবাদ পল্লী অঞ্চলে পৌঁছানোর আগেই আরেকটি আদেশ জারি করে ট্রেজারি থেকে টাকা দেয়ার পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা আরও মজবুত করে দেয়া হলো। জনসাধারণ অন্তত এটুকু জেনে সান্ত্বনা পেলো যে, তাদের পুরোনো টাকা থেকে নতুন টাকা তৈরি হয়েছে বটে। তবে যুদ্ধের খরচের জন্য তা মাদ্রাজে চলে যাচ্ছে।

---

১১১. ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা।

১১২. রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলার অর্ডার, ২রা আগস্ট, ১৭৯০। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১১৩. কালেক্টরের নিকট প্রেরিত অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের পত্র; ১৫ই নভেম্বর ও ২১শে ডিসেম্বর, ১৭৯০ এবং ২৮শে জানুয়ারি, ১৭৯১। লবণ ও আফিম উৎপন্নকারী জেলাগুলোতে এই দু'টি পণ্যের জন্য অগ্রিম টাকা দেয়ার ব্যবস্থাও বহাল ছিলো। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

সংকটের অবসান

বসন্তকালের গোড়ার দিকে সঙ্কট অনেকখানি কমে গেলো। মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ডিসেম্বর মাসে যে ধান-চাল শহরে পাঠিয়েছিলো বা মদ্রাজে রফতানি করেছিলো, এখন তার দাম পরিশোধ হতে লাগলো এবং এই দাম 'নতুন তৈরি টাকার' আকারে জেলায় জেলায় ফিরে যেতে শুরু করলো। শীতকালীন ফসলের ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা হওয়ায় মহাজন ও ব্যবসায়ীরা প্রচুর টাকা ধার দিলো এবং চাষীরাও ধার পেয়ে উপকৃত হলো। কোনো চাষী বসন্তকালীন ফসলের জন্য দাদন চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা পেয়ে যেতো। সঙ্কট প্রকৃতপক্ষে শেষ হয়ে গিয়েছিলো। বিচক্ষণ ইংরেজ প্রধানের ভাবাবেগহীন সিদ্ধান্ত কাউন্সেলেও জয়ী হলো, কার্যক্ষেত্রেও জয়লাভ করলো। শতকরা বারো টাকা হারের সুদে সরকার সাময়িকভাবে যে টাকা ধার করেছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই তা পরিশোধ হয়ে গেলো, ট্রেজারি থেকে আবার টাকা দেয়া শুরু হলো এবং গ্রামের মুরুব্বিগণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে হুঁকো টানতে টানতে বলাবলি করতে লাগলেন যে, কোম্পানির রাজস্ব শেষ হয়ে গেছে বলে যা শোনা গিয়েছিলো, তা বোধহয় আসলে সত্যি নয়।

ইতোমধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে তাঁবুতে বাস করলেও সেখান থেকেই তার সজাগ দৃষ্টির নির্দশন প্রতিদিন বাংলাদেরশর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তো। শাসনকার্যে তিনি সত্যই সর্বাধিক জয়লাভ করেছিলেন। শাসনযন্ত্র নির্মাণ করে তার মধ্যে তিনি নিজের প্রাণশক্তি এমনভাবে সংক্রামিত করে দিয়েছিলেন যে, যন্ত্রটি তার সাহায্য ছাড়াই চালু থাকতে সক্ষম হয়ে উঠেছিলো। যে সকল যোগ্য ও বিচক্ষণ লোকের ওপর তিনি মুদ্রা সংস্কারের দায়িত্ব অপর্ণ করেছিলেন, দেশে সঙ্কট কমে আসছে বলে বুঝতে পারার পর তারা এমন কয়েকটি কাজে হাত দিলেন, যে কাজগুলো ভারতে কোম্পানির সরকারের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। আর্থিক বিষয়ে সরকারের প্রথম প্রচেষ্টা ছিলো সোনার একটি আইনসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করা এবং এ ব্যাপারে তারা যে কতোখানি সফলকাম হয়েছিলেন, তা আমরা দেখেছি। লর্ড কর্নওয়ালিস সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্ধেক সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থা; তাই তার সংস্কারের অপরিহার্য প্রাথমিক কাজ হিসেবে তিনি ১৭৮৮ সালে সোনার মুদ্রা তৈরি করা বন্ধ করে দেন।[১১৪] ১৭৯০ সালের তীব্র চাপের সময় রুপার মুদ্রা অন্যত্র চলে যাওয়ায় তার শূন্যস্থান পূরণের জন্য তিনি সাময়িকভাবে সোনার মোহর তৈরি করতে শুরু করেছিলেন বটে;[১১৫] কিন্তু ১৭৯১ সাল শেষ হওয়ার আগেই চাপ কমে গিয়েছিলো এবং লর্ড কর্নওয়ালিস দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থার বিপদ থেকে চিরতরে রেহাই পাওয়ার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। একজনের পর আরেক জন গভর্নর দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। জনসাধারণ আবার এ

---

১১৪. ১৭৮৮ সালের ৩রা ডিসেম্বরের আদেশ।

১১৫. কালেক্টরের নিকট লিখিত রাজস্ব বোর্ডের ১৭৯০ সালের ২৩শে জুলাইয়ের পত্রের সহিত প্রেরিত ২১শে জুলাইয়ের (১৭৯০) আদেশ। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

বিষয়ে আরও বিধি প্রণয়ন এবং শাস্তিমূলক বিধান চালু করার দাবি জানাতে থাকে; কিন্তু এই সময় একটি ফরমান জারি করে সোনা-রুপার লেনদেনের ওপর থেকে সকল প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয় এবং এই মূল্যমান ধাতু দু'টিকে সাধারণ সওদাগরী পণ্য বলে ঘোষণা করা হয়। ফরমানে বলা হয়, 'যেহেতু কিছুসংখ্যক লোক রুপার মুদ্রা সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে সোনার মুদ্রার বিনিময়ে রুপার মুদ্রা দেয়ার জন্য শ্রোফদের (টাকা-বদলকারী) বাধ্য করার এবং বিনিময়ের সময় সোনার মোহরের দাম সাবেক বাজারদরের চেয়ে কম দিতে চেষ্টা করলে তাদের শাস্তি দেয়ার আবেদন জানিয়ে সম্প্রতি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের কাছে বহু দরখাস্ত করেছে, সেহেতু সপারিষদ গভর্নর জেনারেল স্থির করেছেন যে, ভবিষ্যতে সোনা ও রুপার মুদ্রার বেচা-কেনা সোনা ও রুপার খণ্ডের বেচা-কেনার মতোই সকল দিক থেকে অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন হবে এবং বাজারের অন্যান্য দ্রব্যের মতো মুদ্রার দামও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধান অনুসারে নির্ধারিত হবে।'[১১৬]

সংস্কারের সাফল্য

এই নতুন পদ্ধতির ক্রিয়াশীলতা এক বছর যাবৎ পর্যাবেক্ষণ করার পর লর্ড কর্নওয়ালিস স্থির করেন যে, বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার মারফত পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া মুদ্রার বিলোপসাধনের সময় এসেছে।[১১৭] জনসাধারণকে 'বিনা বাটায়' তদের পুরনো টাকার বদলে নতুন টাকা নেয়ার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছিলো; তাই তিনি আদেশ দিলেন যে, বাংলা ১২০০ সালের পয়লা বৈশাখ থেকে (১০ই এপ্রিল, ১৭৯৪) একমাত্র নতুন টাকাই বৈধ বলে গণ্য হবে এবং 'কোনো তমসুক বা দলিলে ১৯তম সূর্যের সিক্কা টাকা ছাড়া[১১৮] অন্য কোনো প্রকার টাকা পরিশোধয়ে শর্ত থাকলে সেই তমসুক বা দলিল আদালতে বলবৎ বলে গণ্য হবে না।' ১৭৯৪ সালে পুরনো টাকার বদলে নতুন টাকা নেয়ার জন্য আরও বারো মাস সময় মঞ্জুর করা হলো,[১১৯] এবং পরের বছর ১৭৯৫ সালে দেখা গেলো যে, লর্ড কর্নওয়ালিসের দৃঢ় সংকল্প শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছে। এতোদিন যাবৎ হরেক রকমের যে সকল মূল্যমানহীন মুদ্রা জনসাধারণের অশেষ দুর্ভোগের কারণস্বরূপ ছিলো, তা সম্পূর্ণরূপে বাজার থেকে উঠে গেলো এবং তার বদলে নতুন ও একই ধরনের মুদ্রা সর্বত্র চালু হয়ে গেলো।

---

১১৬. তারিখ, ফোর্ট উইলিয়াম, পাবলিক ডিপার্টমেন্ট, ১৮ই নভেম্বর, ১৭৯১; সেক্রেটারি টু দি গভর্নমেন্ট, ই. হে কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ১৭৯১ সালের ১লা ডিসেম্বর 'ক্যালক্যাটা গেজেট' পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত।

১১৭. ফরমান; তারিখ, ফোর্ট-উইলিয়াম, পাবলিক ডিপার্টমেন্ট, ২৪শে অক্টোবর, ১৭৯২, সাব-সেক্রেটারি জে. এল. গোল্ডে কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং 'ক্যালকাটা গেজেটে' (১লা নভেম্বর, ১৭৯২) পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত।

১১৮. অর্থাৎ কোম্পানি কর্তৃক ১৭৭৩ সালে মুদ্রিত টাকা; এই টাকার উপর সম্রাট শাহ আলমের 'সুশাসনের ১৯তম বছরের' প্রতীক হিসেবে সূর্যের প্রতিকৃতি থাকতো।

১১৯. ১৭৯৪ সালের ২৮শে জুনের ফরমান।

মুদ্রা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করে লর্ড কর্নওয়ালিস অর্থবিজ্ঞান সম্পর্কে যে আত্মলব্ধ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন, ইংল্যান্ডের সেই জ্ঞান অর্জন করতে আরও পঁচিশ বছর সময় লেগেছিলো এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ এখনো তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ১৮১৯ সালের আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সোনার বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করেনি[১২০] এবং ভারতীয় রাষ্ট্রবিদ যখন একাকী তার সংস্কার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, সেই সময় কয়েক বছর যাবৎ ব্রিটিশ সোনা ফরাসি টাকশালে নামমাত্র মূল্যে কেনা হচ্ছিলো; ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় অচল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মুদ্রা ব্যবস্থা থেকে সোনা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া হয়।[১২১]

আমি যতোদূর অবগত আছি, কোনো ইতিহাসবিদ এই সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যাননি; অথচ এই ব্যবস্থার সময় থেকেই আসলে পল্লীবাংলার বাণিজ্যিক ক্রমবিবর্তন বা অগ্রগতি শুরু হয়। লর্ড কর্নওয়ালিস যে ব্যবস্থা করে গেছেন, ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা এখনো মূলত ঠিক সেই রকমই রয়েছে : রুপাই হচ্ছে মুদ্রার মাধ্যম এবং সোনা—তা সে মোহরের আকারেই হোক, আর সম্প্রতি প্রচলিত সভরেনের আকারেই হোক—বাট হিসেবে বাজারদর অনুসারে বেচা-কেনা হয়ে থাকে; কিন্তু মুদ্রা ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকলেও মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানির আমলে ভারতের জন্য যা করেছিলেন, মি. জেমস উইলসন রাজকীয় সরকারের আমলে ভারতে তাই করলেন। তিনি প্রত্যেকটি মুদ্রায় যে পরিমাণ ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে, তার দাম মুদ্রার ওপর লিখিত দামের সমান করে দিলেন। তারপর তিনি কাগজের টাকা চালু করলেন। গত দশ বছর যাবৎ বাংলাদেশের সর্বত্র যে পণ্য উৎপাদন ক্ষমতার তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, তার মূল উৎস হচ্ছে এই কাগজের টাকা; অথচ এই টাকা চালু হওয়ার ফলে কোনোরকম ত্রাস বা অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি।

পুলিশ বাহিনী

রাজস্ব আদায়কারী ও সরকারি ব্যাংকারের দায়িত্বের পরই মি. কিটিংয়ের তৃতীয় দায়িত্ব ছিলো জেলার বিচার ও ম্যাজিস্ট্রেট বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করা; কিন্তু এ কাজে তাকে তেমন অসুবিধায় পড়তে হতো বলে মনে হয় না। কারণ দস্যু-ডাকতরা যতোক্ষণ দেশ জনশূন্য করে রাজস্ব আদায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করতো, ততোক্ষণ তার হস্তক্ষেপ করার দরকার হতো না এবং এই অবস্থার সৃষ্টি হলে তিনি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিতেন। সামরিক শক্তির সাহায্যে ডাকাত দমনের ব্যাপারে তিনি যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আমরা দেখেছি; কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা যে রাজস্ব আদায়কেই তাদের দায়িত্ব পালনের সফলতার একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করতো, তা খুব সহজেই অনুভব করা যেতে পারে; সকলে না হোক, অন্তত পক্ষে সাধারণ কর্মচারীদের

১২০. ৫৯ জিও ৩ সি ৪৯।
১২১. এম. সাই প্রণীত ট্রেইটি দ্য লা ইকোনমি পলিটিক, প্রথম খণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

সকলে যে এই মনোভাব পোষণ করতো, সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই এবং মি. কিটিং এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মি. কিটিং পুলিশ সম্পর্কে যে সকল উৎকৃষ্ট রিপোর্ট লিখেছেন, তা তিনি কালেক্টর হিসেবে লিখেছেন, ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নয়। প্রজাদের জানমালের নিরাপত্তা সম্পর্কে তার কোনো উদ্বেগ নেই, তার উদ্বেগের একমাত্র বিষয় হচ্ছে রাজস্ব আদায়। প্রজাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানকে তিনি তার কর্তব্যের অঙ্গ বলে মনে করতেন না এবং নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টাও করতেন না। তার ফৌজদারি এক্তিয়ার ছোটোখাটো বিষয়ের অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো[১২২] এবং এই প্রক্রিয়াটিও খুব সহজ ছিলো, কারণ এমন কি রায় বা দণ্ড লিখতেও হতো না। যে একটিমাত্র মামলার বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করার উপযুক্ত বলে মনে করেছেন, সেটি হচ্ছে একটি জেল হাঙ্গামার মামলা এবং নথিপত্রে তাকে যেরূপে দেখতে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ অফিসারের রূপ—ভাবাবেগহীন বিচারকের নয়।

পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব তখনো পুরোনো আমলের দেশীয় ফৌজদারদের ওপর ন্যস্ত ছিলো এবং এ ব্যাপারে ক্ষমতার যে অপব্যবহার হতো, তার সঙ্গে তুলনা করলে অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগের কোনো বিশৃঙ্খলা আদৌ চোখেই পড়বে না। পুলিশ বাহিনী দুই দলে বিভক্ত ছিলো; একদল সীমান্ত পাহারা দিতো এবং অন্য দল জেলার অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখতো। উভয় দলের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়; তবে সরকারি দায়িত্ব রহিত হওয়ায় সীমান্ত পুলিশ এখন আর কোনো ক্ষতিসাধন না করলেও, দ্বিতীয় শ্রেণীর পুলিশ এখনো পল্লী অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থায় দুষ্টক্ষতস্বরূপ হয়ে রয়েছে। সীমান্ত প্রহরীরা 'ঘাটোয়াল' নামে অভিহিত হতো। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে তাদের মধ্যে নানা রকমের পার্থক্য ছিলো; কিন্তু একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ছিলো—তাদের সকলেই 'ঘাট' বা গিরিপথ পাহারা দেয়ার শর্তে পাহাড়ি এলাকার প্রান্তসীমায় অবস্থিত অনুমোদিত জমি দখল করতো।[১২৩] তাদের মধ্যে অনেকেই আফগান, রাজপুত বা উত্তর ভারতের অন্যান্য এলাকার লোক ছিলো; সৌভাগ্যের সন্ধানে তারা বাংলায় আগমন করে এবং নিম্নবাংলার জমিদার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারে চাকরি গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য তাদের তীক্ষ্ণধার তরবারি ও উত্তর ভারতীয় সাহসিকতায় নবাব-রাজা-জমিদারের জৌলুস অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। কখনো কখনো তাদের সাধুবেশেও দেখা যেতো, তাই এদিক থেকে তাদের মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধর্মীয় নাইটদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সীমান্তের বর্বর উপজাতিরা সাধু-যোদ্ধাকে যতোখানি ভয় করতো ততোখানি ভয় আর কাউকেই করতো না। ফার্সি ভাষায় লিখিত বীরভূমের দলিলপত্রে তাই দেখা যায়, তৎকালীন রাজারা সাধু-ঘাটোয়ালদের খুবই খাতির করতেন। একবার এক রাজা খবর পেলেন যে, উত্তর ভারত থেকে একজন সাধু-বাবাজী বীরভূম এসেছেন। রাজা তাকে ডাকিয়ে এনে বললেন যে, তিনি যদি ঘাট পাহারা দিতে রাজি থাকেন, তাহলে তাকে কিছু টাকা এবং পশ্চিম

১২২. বিচার বিষয়ক বিধি, নং ২২। ১—৫। ১৭৮৭।

১২৩. মানরঞ্জন সিং বনাম রাজা লীলানন্দ সিং-এর মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়।

বীরভূমের কিছু জঙ্গলের জমি দেয়া হবে। সাধু বাবাজী জবাব দিলেন যে, তিনি সীমান্তে বাস করতে রাজি আছেন বটে, তবে আগুন জ্বালানোর কাঠের জন্য যতোটুকু জঙ্গল দরকার এবং অবগাহনের পুকুরের জন্য যতোটুকু জমি দরকার তার বেশি তিনি আর কিছুই চান না।[১২৪]

সীমান্ত পুলিশ

প্রাচীন দলিলপত্রে কিন্তু সীমান্ত পুলিশকে জায়গিরদারের চেয়ে বেতনভুক সৈনিক হিসেবেই দেখা যায়। সীমান্ত এলাকায় যে জমি তারা দখল করতেন, তাতে তাদের কোনো মালিকানা স্বত্ব ছিলো না, জমির খাজনা মধ্য থেকে তারা কিছু ভাতা পেতেন মাত্র; তবে এই ভাতা তাদের নিজেদেরই আদায় করার অধিকার ছিলো। বাংলা দলিলে তাদের রাজার 'ডেপুটি'[১২৫] বলে বর্ণনা করা হয়েছে, জায়গিরদার বলে নয়। তবে তাদের নিয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক ছিলো এবং ১৭৯০ সালে মি. কিটিং তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বর্তমানে যারা ঘাটোয়াল আছেন, তাদের সকলেই বংশানুক্রমে এই পদ লাভ করেছেন'[১২৬] জমিতে তাদের অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের মধ্য থেকে মাত্র দু'জন জবাব দিয়েছিলেন এবং দু'জনই স্বত্ব[১২৭] দাবি করেছিলেন; কিন্তু মুসলিম আইন অনুসারে আদালত সুস্পষ্টরূপ ঘোষণা করেন যে, এই স্বত্ব বংশানুক্রমিক নয় এবং দীর্ঘদিনের দখল দ্বারা এই মূল স্বত্বের ত্রুটি সংশোধিত হয় না। ব্রিটিশ সরকার দখলি স্বত্বের ব্যাখ্যা সর্বদা দখলকারের অনুকূলে করতে ইচ্ছুক ছিলেন; তাই সীমান্ত পুলিশকে তাদের কর্তব্য থেকে রেহাই দিলেও সরকার কার্যত তাদের দখল ও অন্যান্য সুবিধা বহাল রাখার অনুমতি দেন। অবশেষে ১৮১৪ সালে আইন পরিষদে তাদের অধিকারের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়[১২৮]।

এই সীমান্ত বাহিনী যে কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতো, সে সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজরা যখন জেলার শাসনভার গ্রহণ করে, তখন পাহাড়িরা যদৃচ্ছা নির্বিবাদে সীমান্তের এপারেও আসতে পারতো, আবার ওপারেও কোম্পানির প্রাথমিক প্রচেষ্টার সময় সীমান্ত পুলিশের বিষয় মাত্র দুইবার উল্লেখ হতে দেখা যায়। একবার পলাতক দস্যু হিসেবে এবং আরেকবার দস্যুদলের সর্দার হিসেবে।

রাজস্ব পুলিশ

অভ্যন্তরীণ পুলিশ বাহিনীও ঠিক একইভাবে পরিচালিত হতো এবং ঠিক একই ধরনের কাজ হতো। রাজা তার সমগ্র এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগের

---

১২৪. উজ্জা আল্লা খানের একটি ফার্সি রোয়েদাদে বর্ণিত (১৩ই জুন, ১৮৪৮) বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।
১২৫. লোচন্দ নারায়ণ দেও-এর দরখাস্ত। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।
১২৬. ১৭৯০ সালের ১৮ই নভেম্বরের রিপোর্ট। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডাস।
১২৭. জায়গীর স্বত্ব।
১২৮. ১৮১৪ সালের ২৯ নং বিধি। 'ঘাটোয়ালী মহাল নামে পরিচিত বীরভূম জেলার কতিপয় মহাল বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য প্রণীত বিধি।' হাইকোর্টের রায় প্রভৃতি।

দায়িত্ব এক একজন অফিসারের ওপর অর্পণ করতেন। এই ভাগগুলো সমান বা নিয়মিত ছিলো না। দলিলপত্র থেকে জানা যায় যে, আদায়কারীদের খাজনা আদায়ের কাজে সাহায্য করাই এই সকল অফিসারের প্রধান কাজ ছিলো। তাদের পদবি ছিলো 'থানাদার'। প্রত্যেক থানাদারের অধীনে কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক সৈন্য থাকতো। এই সকল সৈন্যের অধিকাংশই থানাদারের বাড়ির চারিদিকে বাস করতো বলে বসতিটি 'থানা' নামে অভিহিত হতো। কোনো কোনো থানায় দুর্গও দেখতে পাওয়া যেতো। কোনো থানাদার তার পারিশ্রমিক হিসেবে খাজনার একটি অংশ পেতেন, আবার কোনো থানাদার নিষ্কর জমি পেতেন। যিনি খাজনার অংশ পেতেন তিনি ছোটো ছোটো খণ্ডের নিষ্কর জমি দিতেন। থানাদারের পদ ক্ষেত্র বিশেষে বংশানুক্রমিক হলেও ঘাটোয়ালদের মতো পুরোপুরি বংশানুক্রমিক ছিলো না। থানাদার সবসময় রাজার চোখের সামনে থাকতেন বলে রাজা এ ব্যাপারে প্রায় সরাসরি তদারক করতেন। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ এই পদটি একটিমাত্র পরিবারের দখলে থাকলেও পত্যেকটি নতুন থানাদারের জন্য রাজ দরবারের আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র দরকার হতো—এমন কি পুত্রের পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সময়ও। প্রত্যেকটি থানার বড়ো বড়ো গ্রামে একজন করে অধস্তন কর্মচারী নিয়োগ করা হতো; তিনি সেই গ্রামেই বাস করতেন এবং খাজনা আদায়ের সাহায্য করা ছাড়াও যারা খাজনা বাকি ফেলতো তাদের মাল ক্রোক করতেন এবং রায়তরা যাতে জমি ছেড়ে চলে না যায় সেদিকে নজর রাখতেন। এছাড়া তিনি আবগারি শুল্কসহ অন্যান্য ছোটোখাটো শুল্কও আদায় করতেন। ছোটোখটো গ্রামের খাজনা আদায়ের ভারও অনেক সময় তার ওপর অর্পণ করা হতো। কোনো কোনো জেলায় এই পল্লী কর্মচারীর বেতন থানা থেকেই দেয়া হতো; কিন্তু বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের মতো যে সকল জায়গার রাজারা আধা-স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলো এবং যে সকল জায়গায় মুসলিম শাসনের কেন্দ্রীয়করণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু রেওয়াজ বহাল ছিলো, সেই সকল জায়গার পল্লী কর্মচারীদের কিছু কিছু নিষ্কর জমি দেয়া হতো। এই পল্লী কর্মচারীরাই কালক্রমে প্রাচীন হিন্দু আমলের বংশানুক্রমিক পল্লী প্রহরীতে পরিণত হয় এবং বিষ্ণুপুরের মতো হিন্দুপ্রধান রাজ্যে এখন যে সকল পল্লী প্রহরী দেখা যায়, তাদের অনেকের পূর্বপুরুষই পল্লী কর্মচারী ছিলেন এবং সেই আমল থেকে এই পদটি বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে চলে আসছে; কিন্তু বংশানুক্রমিক হলেও, এমন কি বিষ্ণুপুরের মতো রাজ্যেরও নতুন নিয়োগপত্র ছাড়া এই পদে লোক নিয়োগ করা হতো না। প্রত্যেক থানাদারকে যেমন রাজার কাছ থেকে নিয়োগপত্র নিতে হতো, তেমনি প্রত্যেক পল্লী কর্মচারীকেও থানাদারের কাছ থেকে নিয়োগপত্র নিতে হতো। তবে থানাদারের মতো এই পদটিও সচরাচর এক বংশের বাইরে যেতো না।

অনেকে আপত্তি করে বলতে পারেন যে, আমি পুলিশের বর্ণনা না দিয়ে রাজস্ব কর্মচারীর বিবরণ দিচ্ছি। আপত্তির সঙ্গত কারণও আছে বটে; কিন্তু আমি যাদের কথা বলছি সেই আমলে একমাত্র তারাই পুলিশ নামে অভিহিত হতো। যোগ্য ও সক্ষম জমিদারের অধীনে থানাদারের কাজ প্রধানত রাজস্ব বিষয়ক ছিলো এবং অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ জমিদারের অধীনে সে পুরোপুরি দস্যু হয়ে যেতো। কোনো সরকারি অর্থ

সম্পদ জেলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলে তার নিরাপত্তার জন্য জমিদার সরকারের কাছে, আর থানাদাররা জমিদারের কাছে দায়ী থাকতো; অতএব বলা যেতে পারে যে, কোনো কোনো ব্যাপারে থানাদাররা পুলিশের দায়িত্বই পালন করতো। তাদের এই দায়িত্ব থেকেই একটি সাধারণ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তাদের এলাকার সমস্ত সম্পত্তির নিরাপত্তার দায়িত্বও বোধ হয় তাদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে; কিন্তু আসল ঘটনা যাই হোক না কেন, মুসলমান আমলে তাদের দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারি সম্পত্তির নিরাপত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। লর্ড কর্নওয়ালিস তাদের দায়িত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির লুটতরাজ প্রতিরোধ করা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি।[১২৯] জনমত এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় যে, যে দায়িত্ব পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হচ্ছে, তা অনেক আগেই মরে ভূত হয়ে গেছে। মি. কিটিং সরকারের কাছে পাঠানো রিপোর্টে প্রত্যেক দিন ডাকাতি হচ্ছে বলে উল্লেখ করলেও মাত্র তিনবার তিনি থানাদারের নতুন দায়িত্ব কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। দুইবার সরকারি টাকা বহনকারী দল লুণ্ঠিত হওয়ায় তিনি জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেন এবং আরেকবার তাকে কোম্পানির চুরি যাওয়া মাল খুঁজে পেতে এনে ফেরত দিতে বাধ্য করেন; কিন্তু কোনো বেসরকারি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারে একবারও এই দায়িত্ব কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়নি।

ফৌজদারি প্রশাসন

কিন্তু তথাপি পুলিশ খাতে বছরে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার পাউন্ড ব্যয় হতো। অনেকের পক্ষেই নিখুঁতভাবে মনে রাখা সম্ভব নয় যে, ১৭৬৫ সালের চুক্তি অনুসারে কোম্পানি কেবলমাত্র রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের শাসনভারই লাভ করেছিলো এবং ফৌজদারি মামলার বিচার ও পুলিশ সংক্রান্ত বিষয়ের সমস্ত দায়িত্ব নবাবের হাতেই ন্যস্ত ছিলো। নবাব আমাদের ট্রেজারি থেকে ব্যক্তিগত খরচের জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউন্ড এবং আদালত ও পুলিশ বাহিনীর ব্যয়স্বরূপ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার পাউন্ড নিতেন।[১৩০] ১৭৯০ সাল পর্যন্ত নবাব প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ও দায়িত্ব নিজের হাতেই রেখেছিলেন; কিন্তু দায়িত্ব তিনি কখনো পালন করেননি। তিনি যা করার ওয়াদা করেছিলেন, ১৭৬৫ থেকে ১৭৬৯ সাল পর্যন্ত তা করা তো দূরের কথা, করার ভাণ পর্যন্তও করেননি। ফলে নিয়মিত বিচার ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছিলো এবং যে ব্যক্তি নিজের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অন্যকে বাধ্য করতে পারতো, সেই ব্যক্তিই সকল ক্ষমতার মালিক ছিলো।[১৩১] ওয়ারেন হেস্টিংস চাপ দিতে লাগলেন যে, যে কাজের জন্য টাকা দেয়া হচ্ছে, নবাবের তরফ থেকে সেই কাজের কিছু নিদর্শন অন্তত দেখানো উচিত। ফলে ১৭৭২ সালে কলকাতায়

১২৯. এমন কি এই প্রচেষ্টাও ঘাটোয়ালদের সম্পর্কে করা হয়, থানদারদের সম্পর্কে নয়। কালেক্টরের নিকট প্রেরিত রাজস্ব বোর্ডের পত্র ; মে ১৭৮৯।

১৩০. নবাব নিমাজদৌল্লা ও কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি; তারিখ ফোর্ট-উইলিয়াম, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৫।

১৩১. কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের পত্র।

একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করা হলো এবং প্রত্যেক জেলায় একটি করে অধস্তন আদালত চালু করা হলো; কিন্তু ১৭৭৫ সালে নবাব সুপ্রিম ক্রিমিনাল কোর্ট তার বাসস্থান মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান এবং ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এই কোর্ট সেখানেই চালু থাকে। নবাবের বিলাসকক্ষের বিষাক্ত বাতাস সকল প্রকার সুবিচারকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে থাকে এবং যে টাকায় গরিবের দেহ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান হওয়া উচিত ছিলো, সেই টাকায় খোজা প্রহরী ও উপপত্নীদের ব্যয় নির্বাহ হতে থাকে। ১৭৭৫ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সমগ্র ফৌজদারি ব্যবস্থায় একমাত্র যে কাজটি হয়েছিলো, তা হচ্ছে অশিক্ষিত ও দুর্নীতিপরায়ণ মুসলমানদের কাছে বিচার বিভাগীয় পদ বিক্রি করা এবং এই সকল মুসলমান আদালতকে জোর করে টাকা আদায় করার নিরাপদ জায়গা ছাড়া আর কিছুই মনে করতো না।

কোম্পানির হস্তক্ষেপ করার কোনো বৈধ অধিকার ছিলো না। কারণ চুক্তি অনুসারে ফৌজদারি ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো নবাবের ওপর। সর্বত্র সুবিচার দেখার প্রবল আগ্রহ থাকায় ওয়ারেন হেস্টিংস সাময়িকভাবে (কিন্তু বেআইনিভাবে) নবাবের বিভিন্ন আদালতের তত্ত্বাবধান করতে শুরু করেন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পিছিয়ে আসেন। লর্ড কর্নওয়ালিসও তার শাসনের প্রথম চার বছরের মধ্যে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেননি। নিয়মিত পুলিশ বাহিনী (ফৌজদারি পুলিশ) রাখার জন্য নবাবকে বাধ্য করার ক্ষমতা কোম্পানির ছিলো না; কোম্পানি তাই যথাসম্ভব রাজস্ব পুলিশকেই (থানাদারি পুলিশ) কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে লোকে নিয়মিত ফৌজদারি পুলিশের অস্তিত্বই ভুলে গেলো।

১৭৯০ সালে লর্ড কর্নওয়ালির মুসলমান কুশাসনের এই শেষ আশ্রয়স্থলের ওপর হামলা করলেন।[১৩২] তিনি নবাবের হাত থেকে সমস্ত বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা নিয়ে নিলেন; কিন্তু অবজ্ঞার সঙ্গে তার ভাতার পরিমাণ স্পর্শ করলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কলকাতায় একটি সুপ্রিম ক্রিমিনাল কোর্ট এবং চারটি সার্কিট কোর্ট স্থাপন করলেন। সুপ্রিম ক্রিমিন্যাল কোর্টের সভাপতি হলেন গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিল এবং প্রত্যেকটি সার্কিট কোর্টের শীর্ষস্থানে থাকলেন দু'জন করে অভিজ্ঞ ইংরেজ অফিসার। এই সকল আদালতে আনার অনুপযুক্ত ছোটোখাটো অপরাধের বিচারের দায়িত্ব জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর অপর্ণ করা হলো। সমগ্র বিচার ব্যবস্থার তদারকের দায়িত্ব কলকাতায় স্থাপিত একটি সুপ্রিম কোর্টের ওপর অর্পিত হলো। কতিপয় সংশোধনীসহ মুসলিম ফৌজদারি আইন আগের মতোই দেশের মৌলিক আইন হিসেবে চালু থাকলো এবং ম্যাজিস্ট্রেট বা জজকে এই আইনের বিধান বুঝিয়ে দেয়ার জন্য সুপণ্ডিত মুসলমানদের এসেসর হিসেবে মামলার বিচারে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো।

নিয়মিত পুলিশ বাহিনী গঠন

নবগঠিত আদালতগুলো প্রথমে থানাদারি পুলিশের মারফত ফৌজদারি শাসনের কাজ চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পুলিশই তখন

১৩২. ১৭৯০ সালের বিচার বিভাগ সম্পর্কিত ২৬ নং বিধি।

একমাত্র পুলিশ ছিলো এবং তাদের ওপর যে নতুন দায়িত্ব অর্পিত হলো তা পালনের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলো। রাজস্ব পুলিশের ওপর এই নতুন কাজ চাপিয়ে দেয়ার কোনো অধিকার সরকারের ছিলো কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, তাদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়ার কোনো ক্ষমতা কালেক্টরদের নেই। থানাদাররা যেমন সরকারের পক্ষে কাজ করতো, তেমনি আবার ডাকাতদের পক্ষেও কাজ করতো। এমন কি মি. কিটিংয়ের মতো দৃঢ়চেতা পুরুষও তাদের নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হননি। আর হবেনই বা কেমন করে; তারা তো আসলে তার কর্মচারীই নয়। তিনি তাদের নিয়োগও করেননি, বরখাস্তও করতে পারতেন না। এমন কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মামলা দায়ের না করে তিনি তাদের শাস্তিও দিতে পারতেন না এবং তিনি অভিযোগ করেন যে, 'তাদের কার্যক্রমের জন্য, অথবা তাদের ক্ষমতার এক্তিয়ার নির্ধারণের জন্য কোনোরকম লিখিত বিধি নেই।'[১৩৩] দুই বছর যাবৎ এই বিরক্তিকর অবস্থা বহাল থাকার পর লর্ড কর্নওয়ালিস দেখলেন যে, শাসনের সক্রিয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা না করে আদালত স্থাপন করা নিরর্থক; তাই তিনি রাজস্ব পুলিশের মধ্য থেকে একটি নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার সংকল্প করলেন। তিনি থানাদারি ব্যবস্থাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেললেন—প্রথমত, যারা থানার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো ও টাকায় বেতন পেতো এবং দ্বিতীয়ত, যারা গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো ও নিষ্কর জমি ভোগ করতো। প্রথম শ্রেণীকে তিনি জমিদারের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সরাকরি নিয়ন্ত্রেণর অধীন করে দিলেন এবং ট্রেজারি থেকে তাদের বেতন দেয়ার নির্দেশ দিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ওপর তিনি কোনোরকম হস্তক্ষেপ করলেন না। এজন্য তার দু'টি সঙ্গত কারণ ছিলো। প্রথমত, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের মতো জেলায় হিন্দুদের জাতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে পল্লীর রাজস্ব পুলিশের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিলো এবং লর্ড কর্নওয়ালিস সকল বিষয়ে আধুনিক চাহিদার সঙ্গে জাতীয় ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করতেন। এই পল্লী পুলিশ ছিলো প্রাচীনকালের পল্লী প্রহরা ব্যবস্থার নির্দশন স্বরূপ, তাই তিনি স্থির করলেন যে এই ব্যবস্থা বহাল থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, পুরোনো ব্যবস্থা বাতিল করে তাদের সকলকে ট্রেজারি থেকে বেতন দিতে হলে খরচ অনেক বেশি পড়ে যেতো। বেতনের বদলে তারা খাজনা পেতো, অর্থাৎ বিনা খাজনায় জমি ভোগদখল করতো্খেন এই খাজনার মধ্যে দু'টি রাজনৈতিক ভাগ ছিলো—একটি ভাগ অর্থাৎ, ভূমি কর পেতেন সরকার এবং অপরটি অর্থাৎ মূল খাজনা ও ভূমি-করের মধ্যকার উদ্বৃত্ত অংশ পেতেন জমিদার। সরাসরি মুসলিম শাসনের অধীনে যাওয়ার ফলে যে সকল জেলার জমির মালিক[১৩৪] নিছক কর আদায়কারীতে পরিণত হয়, সেইসকল জেলায় এই উদ্বৃত্ত অংশ ভূমিকরের তুলনায় বহুগুণে বেশি হতো। প্রধানত এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলাতেই পল্লী প্রহরা বিস্তৃতি লাভ করে এবং স্বল্পতম খরচে এই ব্যবস্থা বহাল থাকায় লর্ড

১৩৩. সার্কিট কোর্টের বিচারপতি জন হোয়াইট ও টমাস ব্রুকের নিকট লিখিত পত্র; ৭ই আগস্ট, ১৭৯১। বীরভূম জুডিসিয়াল রেকর্ডস।

১৩৪. জমিন্দার বা জমিদার।

কর্নওয়ালিসের সিদ্ধান্ত তখন খুবই সঙ্গত বরে প্রতীয়মান হয়েছিলো।[১৩৫] পল্লী পুলিশদের নিয়োগ করার ক্ষমতা জমিদারের হাতেই থেকে যায়, তবে তাদের তত্ত্বাবধান করার কিছু কিছু ক্ষমতা নিয়মিত পুলিশকে দেয়া হয় এবং এরূপে তারা পরোক্ষভাবে জেলার ইংরেজ প্রধানের অধীনে চলে আসে।

পল্লী প্রহরা

১৭৯২ সাল থেকে বাংলাদেশে এই দুই শ্রেণীর পুলিশ চালু রয়েছে। একটি প্রাচীন খাজনাদারির ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত নিয়মিত বাহিনী, যাদের বেতন দেয়া হয় টাকায় এবং অপরটি প্রাচীন পল্লী প্রহরা ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী অনিয়মিত বাহিনী, যাদের বেতন দেয়া হয় নিষ্কর জমির মারফত। দু'টি বাহিনীরই দোষত্রুটি আছে; তবে প্রথম বাহিনীর দোষ-ত্রুটি আকস্মিক এবং তা সংশোধনযোগ্য। দ্বিতীয় বাহিনীর দোষত্রুটি মূল পদ্ধতিটির অন্তর্নিহিত ব্যাপার এবং কেবলমাত্র পদ্ধতি পরিবর্তন করেই তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত, পল্লী প্রহরা ব্যবস্থা সব জায়গায় সমানভাবে চালু নেই। রেলপথ ও রাস্তা নির্মিত হওয়ার ফলে জনসাধরণ তাদের প্রাচীন বাসস্থান থেকে নতুন বসতি কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে; অথচ পল্লী পুলিশরা তাদের প্রাচীন জায়গাতেই রয়ে গেছে। ফলে বহু স্থানে দেখা যায় যে, একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত গ্রামে তিন-চার জন পুলিশ রয়েছে, অথচ একটি নতুন জনবহুল বাজারে একজন নেই। দ্বিতীয়ত, পল্লী প্রহরী দুই মালিকের চাকর দিনের বেলায় তারা জমিদারের কাজ করে এবং রাতের বেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাজে গ্রাম পাহারা দেয়; অতএব ম্যাজিস্ট্রেট তার কাছ থেকে ঘুমে ঢুলুঢুলু সতর্কতা ছাড়া কিছু আশা করতে পারে না। তৃতীয়ত, জমিদার তাকে নিয়োগ করে বলে সে জমিদারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের অধীন; অতএব জমিদার যাতে খুশি হয়, কেবলমাত্র সেই খবরগুলোই সে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানায়। চতুর্থত, ম্যাজিস্ট্রেট স্বীয় ক্ষমতায় তাকে জরিমানা করতে পারে না। সে যদি গ্রাম পাহারা দেয়ার সময় ঘুমায়, তাহলে আদালতে তার নামে মামলা করতে হবে, দূরদূরান্ত থেকে সাক্ষী হাজির করতে হবে, পাবলিক প্রসিকিউটারকে মামলা পরিচালনা করতে হবে এবং এই বিপুল উদ্যোগ-ইন্তেজামের পর তার হয়তো বড়োজোর এক শিলিং জরিমানা হবে। পঞ্চমত, উচ্চতর কোনো পদ না থাকায় ম্যাজিস্ট্রেট তার পদোন্নতি করতে বা পুরস্কার দিতে পারে না; ফলে সমগ্র বাহিনীই অকর্মণ্যতার অতল গর্ভে নিমজ্জিত থেকে যায়। এই সকল দোষত্রুটির কিছু কিছু প্রাচীন কাল থেকে পদ্ধতিটির সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসছে; অবশিষ্ট দোষত্রুটিগুলো দেখা দিয়েছে শাসনব্যবস্থার অন্যান্য শাখায় উন্নতি ও তার ফলে আগত জাতীয় সমৃদ্ধি থেকে। ১৭৯১ সালে আমরা দেখতে পাই, ম্যাজিস্ট্রেটরা অভিযোগ করেছেন যে, তারা স্বীয় ক্ষমতায় পল্লী প্রহরীকে সাজা দিতে পারেন না এবং

১৩৫. তা'ছাড়া ১৭৯০ সালের ১৩ই অক্টোবরের আদেশের ফলে পল্লী পুলিশের জমি প্রত্যাহার করে স্থায়ীভাবে নির্ধারিত ভূমি কর বাড়িয়ে দেয়ার বৈধতা সম্পর্কেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিলো। সংশ্লিষ্ট আইনের জন্য জয়কিষাণ মুখার্জি বনাম পূর্ব বর্ধমানের কালেক্টরের মামলায় প্রিভি কাউন্সিলের রায় দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেকটি প্রহরীই মামলায় পড়ার ঝুঁকি না নিয়ে নির্বিবাদে তার পদমর্যাদার গৌরব ও সুযোগ-সুবিধে উপভোগ করতে পারে।[১৩৬]

এই ব্যবস্থার ত্রুটি

সরকার যদি স্থানীয় দলিল-দস্তাবেজগুলো মনোযোগ সহকারে পড়তেন, তাহলে পল্লী প্রহরার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের ওপর যে শোচনীয় দুর্গতি নেমে এসেছে, অনেক আগেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে যেতো। ভারতের ইতিহাসবিদরা বলেছেন যে, গ্রামের সম্পত্তি ও শান্তিরক্ষার জন্য প্রাচীন হিন্দু আমলে প্রত্যেকটি গ্রামে একজন করে বংশানুক্রমিক চৌকিদার দেখলেই তাকে সেই প্রাচীনকালের হিন্দু চৌকিদারের বংশধর বলে মনে করে এবং তার কাজে হস্তক্ষেপ করতে ইতস্তত করে। কিন্তু দলিলপত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের কাছ থেকে যে চৌকিদারি ব্যবস্থা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তার সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু আমলের যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ এবং কোনো কোনো জেলায় আদৌ কোনো যোগসূত্র নেই। মুসলমান আমলের চৌকিদার বংশানুক্রমিক ছিলো না; জমিদারই তাকে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করতেন, পল্লীসমাজ নয়। তার কর্তব্য প্রধানত রাজস্ব সংক্রান্ত ছিলো এবং ফৌজদারি বিষয়ে তাকে ফৌজদালী বাহিনীর সরকারি অধীনে কাজ করতে হতো; একজন মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেট এই ফৌজদারি বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। ১৭৬৫ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত প্রদেশের ফৌজদারি শাসনভার নবাবের হাতে ছিলো এবং তিনি ক্রমে ক্রমে নিয়মিত ফৌজদারি বাহিনীর অস্তিত্ব বিলোপ করে দেন। কোম্পানি তখন রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে চৌকিদারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করে এবং তার উপরে ফৌজদারি পুলিশের কাজ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কোম্পানির এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়; কিন্তু দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর যাবৎ ঘুষ, জোর করে টাকা আদায় ও অপরাধে সহায়তা করা সত্ত্বেও চৌকিদার বাহিনী বহাল থেকে যায়। এভাবে প্রাচীন হিন্দু আমলের ময়ূরপুচ্ছ পরে মুসলিম কুশাসনের একটি দাঁড়কাক আমাদের কাছে হাজির হয়েছে।

এভাবে আমরা যে চৌকিদার বাহিনী পেয়েছি, তারা প্রদেশের আয় প্রায় সমস্তই খেয়ে ফেলেছে। একমাত্র বীবভূমের ৩৭০ জান নিয়মিত কনেস্টবল ছাড়াও ৮,৯৭৬ জনপল্লী চৌকিদার রয়েছে[১৩৭] অর্থাৎ মাত্র সাড়ে তিন লক্ষেরও কম সংখ্যক লোকের[১৩৮] জন্য মোট ৯,৩৪৬ জন প্রহরী রয়েছে। খবরের কাগজে প্রকাশিত হিসেবে দেখা যায়, ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ লোকের বাসস্থান লন্ডনের পুলিশের সংখ্যা মাত্র ৬,৫০০। অতএব বীরভূমে প্রতি সাঁইত্রিশ জন লোকের জন্য একজন পুলিশ এবং লন্ডনে প্রতি পাঁচ থেকে ছয় শ লোকের জন একজন পুলিশ আছে। তবে 'বাহিনী' বা 'শক্তি' বলতে যা বুঝায়, লন্ডনের পুলিশ আসলে তাই। কিন্তু বাংলাদেশের চৌকিদার জনতা মাত্র; তাদের

১৩৬. আমি ১৮৫৫ সালে এই পুস্তক রচনা করি; এই বছরের পরে একটি সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তা কার্যকরী করা হয়েছে কিনা তা আমি আর জানতে পারিনি।

১৩৭. জেলা পুলিশ এলাকার সংখ্যা; বেসামরিক বা শাসন এলাকার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।

১৩৮. মাত্র পুলিশ এলাকার সংখ্যা; বেসামরিক বা শাসন এলাকার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।

মধ্যে না আছে একতার মনোভাব, না আছে পেশাগত গর্ব, না আছে পদের মর্যাদাবোধ। জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের ওপর নির্ভর করা যায় না এবং যে অকর্মণ্য যোগ্যতা তাদের কাছে, তাও তারা কাজে লাগাতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে তারা জনসাধারণের লুণ্ঠনকারী রক্ষাকর্তা নয়; অপরাধের সহায়ক—দমনকারী নয়।

মুসলিম কারাবিধান

কিন্তু এই অকর্মণ্য পুলিশও তখন পারদর্শী বলে প্রমাণিত হয়েছে। নবাব ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় চরম অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন বটে, কিন্তু চৌকিদাররা এতো বেশি আসামি পাঠাতো যে, আদলতের পক্ষে তাদের সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়তো। জেলখানার অর্ধেকেরও বেশি লোক ছিলো 'শিকলে বেঁধে কাজীর কাছে পাঠানোর জন্য অপেক্ষমাণ' সন্দেহজনক ব্যক্তি। কোনো কোনো জেলায় তাদের বিচারের জন্য আদালতই ছিলো না। ফলে তাদের অন্ধকার শ্বাসরোধকর খুপরিতে আটকে রাখা হতো এবং এভাবে বেশকিছু আসামি জমা হওয়ার পর সামরিক প্রহরাধীনে তাদের মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু আসামি গ্রেফতার খুব ঘন ঘন না হওয়ায় অনেকের প্রতীক্ষাকাল খুবই দীর্ঘ হয়ে যেতো এবং অবশেষে যখন তারা মুর্শিদাবাদ রওনা হতো, তখন দেখা যেতো যে, কতিপয় অর্ধমৃত কংকালসার মানুষ এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে বৃষ্টির ধারা বা শীতের তীব্রতা প্রতিরোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। শিকলের ভারে ধুকতে ধুকতে, অনাহারে মূর্ছিত হয়ে পথের ওপর পড়তে পড়তে, জঙ্গলের টাকাগুল্ম ও পাহারাদারের তলোয়ারের খোঁচায় রক্তাক্ত দেহে বিচারের বেদিতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং তাদের বিচার করার জন্য মুসলমান হাকিমের অবসর ও ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত তাদের সেখানেই পচতে হতো। এমন কি যেদিন বিচার হতো সেদিনও কোনো ফয়সালা হতো না। আসামি নির্দোষ হলে মুক্তির জন্য হাকিমকে ঘুস দিতে হতো; অন্যথায় নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়ার আশায় তিনি তাকে আবার হাজতে পাঠিয়ে দিতেন। আর আসামি দোষী হলে তিনি সরাসরি তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিতেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়াদ উল্লেখ করতেন না। বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে, বীরভূম জেলে মারাত্মক অপরাধের জন্য দণ্ডিত আসামিদের মধ্যে অধিকাংশই এভাবে 'অভিরুচি নাগাদ' কারাদণ্ড ভোগ করছিলো। 'অভিরুচি নাগাদ' শব্দ দু'টির মধ্যে আইনের একটি নীতি আছে বটে, কিন্তু তার তৎকালীন ব্যবহার বা প্রয়োগের সরল ইংরেজি ভাষায় তরজমা হলে যা বুঝায় তা হচ্ছে এই যে, হাকিম কয়েদির আত্মীয়-স্বজনদের শেষ কপর্দকটিও শুষে না নেয়া পর্যন্ত কারাদণ্ডের মেয়াদ বহাল থাকবে।

জেলার ইংরেজ প্রধানের ওপর কয়েদিদের খাদ্য সরবরাহ ও নিরাপদে রাখার দায়িত্ব ছিলো এবং এখানেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যেতো। তাদের দুর্গতি সম্পাদন করতেন বলেই প্রতীয়মান হয় এবং নথিপত্রে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট অনুকম্পার সঙ্গেই এ বিষয়ে তদারক করতেন।[১৩৯] জেলখানার এই শোচনীয় দুরবস্থার

১৩৯. কালেক্টরের নিকট লিখিত সিভিল অডিটরের জেল রিটার্ন সম্পর্কিত পত্র; ২৫শে জানুয়ারি, ১৭৯১ এবং খাদ্য সম্পর্কে একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের পত্র; ২৯শে ডিসেম্বর, ১৭৯০। বীরভূম জুডিসিয়াল রেকর্ডস ও বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

জন্য কয়েদিরা যাতে পালাতে না পারে, সেজন্য নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো এবং লর্ড কর্নওয়ালিস যখন কারা সংস্কারের কাজে হাত দেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, 'রাত্রিকালে কয়েদিদের দীর্ঘ লৌহদণ্ডের সঙ্গে বা মোটা ও ভারি লোহার শিকলে বেঁধে রাখা হয়; অথবা লম্বা বাঁশের সঙ্গে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখা হয়; অথবা বহু লোককে একটি আলো-বাতাসহীন ছোটো খুপরি ঘরে একত্রে আটক করে রাখা হয়।' বলাবাহুল্য, ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এই ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডেই পর্যবসিত হয়। তিনি জানতে পারেন যে, 'যে অপরাধ বা মামলার জন্য তারা জেল খাটছে, সেই অপরাধ বা মামলার জন্য নয়, জেলখানায় নিরাপত্তার অভাব বশত জেলের আর কোনোভাবে তাদের পলায়ন প্রতিরোধ করতে পারেন না বলে এই ব্যবস্থা করে থাকেন।'[১৪০]

১৭৯২ সালের আগে কোম্পানি বাংলাদেশের কারা-সংস্কারের কাজে ভালোভাবে হাত দেয়নি। এইসংস্কারের ফলে বহু যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো; কিন্তু বর্তমান পুস্তকে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভবপর নয়। পরের বছর ভারতে দেওয়ানী বিচারের যে ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা চালু করা হয়, তার প্রস্তুতি ও বিভিন্ন অনিশ্চিত পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণও এই পুস্তকের মূল বিষয়বস্তুর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। বীরভূমে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার প্রথম কয়েক বছরে বিচার ব্যবস্থার একটি সঠিক চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরাই যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। হিন্দু ও মুসলমান আইনবিধি প্রণয়নের ব্যাপারে ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যার উইলিয়াম জোনসের প্রচেষ্টা থেকে যারা আমাদের শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ অনুমান করতে পেরেছেন, তারা হয়তো কার্যক্ষেত্রে এই বিধির প্রয়োগ দেখে শিউরে উঠবেন।

দেওয়ানী বিচার ১৭৯০ ও ১৮৬৪

কারণ দলিলপত্র থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাওযা যায় যে, ১৭৯৩ সালের আগে বাংলাদেশে দেওয়ানী বিচারের অস্তিত্ব ছিলো না। কালেক্টরের কাজের মধ্যে দেওয়ানী হাকিম হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও এ বিষয়ে তার তেমন কিছু করণীয় ছিলো না। তা'ছাড়া রাজস্ব আদায় ও ডাকাত দমনের পর দেওয়ানী মামলার বিচার করার অবসর বা আগ্রহ কোনোটিই তার থাকতো না। হেস্টিংস তাই যথার্থই বলেছেন যে, 'যার নিজের ডিগ্রি জারি করার ক্ষমতা ছিলো সেই তখন হাকিম হয়ে বসতো।' বীরভূম জেলার কয়েকটি তথ্য*এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই আমলের সংযুক্ত জেলার আয়তন বর্তমান আয়তনের তিন গুণ ছিলো এবং লোকসংখ্যা দশ লক্ষের কম ছিলো না।[১৪১] তখন একজন মাত্র হাকিম ছিলেন কিন্তু তাকে মোট ছয়টি পদের দায়িত্ব

১৪০. সাব-সেক্রেটারি টু দি গভর্নমেন্ট, জি. এ. বার্লো একোয়ারের পত্র; তারিখ কাউন্সিল-চেম্বার, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৪১. মিঃ কিটিং বীরভূমের লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ এবং বিষ্ণুপুরের লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৭০ হাজার বলে উল্লেখ করেছিলেন; কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে, এটা তার অনুমান মাত্র। রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত পত্র; ১১ই আগস্ট, ১৭৮৯/১৮০১ সালে এই লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ বলে

পালন করতে হতো এবং প্রত্যেকটি পদের কাজকে তিনি বিচারের কাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।[১৪২] সংযুক্ত জেলাটি এখন তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে এবং এই নতুন জেলার প্রত্যেকটিতে দেয়ানি মামলার বিচারের জন্য এখন নয়টি আদালত সব সময় খোলা থাকে; এছাড়া খাজনা আদায় ও জমির দখল সংক্রান্ত মামলার বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় আরও চারটি করে আদালত রয়েছে।[১৪৩] ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত সরকার জেলার দেওয়ানী বিচারের জন্য কোনো পৃথক ব্যয় বরাদ্দ করতেন না; কিন্তু এখন বছরে সাত হাজার পাউন্ডেরও বেশি বরাদ্দ করে থাকেন।[১৪৪] ১৭৮৭ সাল বীরভূমের সরাসরি ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার সময় থেকে, ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস বিধি অনুসারে নতুন বিচার ব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় পর্যন্ত মোট ১১২টি মামলা দায়ের হয়; অর্থাৎ বছরে গড়পড়তা মাত্র আঠারোটি মামলা দায়ের হয়।[১৪৫] কিন্তু একমাত্র গত বছরই (১৮৬৪) বহু দরখাস্ত ও আদেশ ছাড়াও চার হাজারেরও বেশি দেওয়ানী মামলা দায়ের হয়েছে। বাংলাদেশে খণ্ড জমির সংখ্যাও যেমন প্রচুর, স্বত্বের শ্রেণীবিভাগও তেমনি অসংখ্য; আবার প্রত্যেকটি চাষীরইনিজস্ব স্বত্ব ও অধিকার রয়েছে; অতএব দেওয়ানি বিরোধের উৎস ও বিষয়বস্তুর এখানে ইয়ত্তা নেই। এই আলোকে মামলার সংখ্যা বিবেচনা করা হলে বুঝা যাবে যে, কতো অসংখ্য দুঃখময় অভিযোগ অশ্রুত এবং কতো অসংখ্য অন্যায় প্রতিকারহীন থেকে যাচ্ছে। মামলার এই সংখ্যা থেকে দেখা যায় যে, ভারতে আমরা যখন প্রথম সুবিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি, তখন বছরে প্রতি ষাট হাজার লোকের মধ্যে মাত্র একজন আমাদের আদালতের সাহায্য নিতে এগিয়ে এসেছে। আদালত সম্পর্কে লোকের এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মূলে সঙ্গত কারণও ছিলো—১৭৮৭ থেকে ১৭৯২ সালের মধ্যে যে একশো বারো জন দুঃসাহসী বাদি আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, তাদের মধ্যে মাত্র উনসত্তর জন ১৭৯২ সালের শেষভাগে ডিক্রি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলো। পক্ষান্তরে, ১৮৬৪ সালে মোট ৪৪৮৯টি মামলা দায়ের করা হয়, তার মধ্যে ৪৪৮২টি মামলা বছরের মধ্যেই ফয়সালা হয়ে যায়[১৪৬]; ফলে বাংলাদেশের বিচার বিভাগে এখন বকেয়া কাজের প্রায় অস্তিত্বই নেই।

অনুমান করা হয়।—জিওগ্রাফি অব হিন্দুস্থান, ২৯ পৃষ্ঠা, কলিকতা, ১৮৩৮। বীরবুম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৪২. ১৭৯৩ সালের আগে এসিসট্যান্ট-ম্যাজিস্ট্রেট তার রেজিস্ট্রার পদমর্যাদায় কোনো মামলার বিচার করেননি। বীরভূম জুডিসিয়াল রেকর্ডস। ১৭৯৩ সালের ১৩ নং বিধি।

১৪৩. একজন জেলা জজ, প্রধান সদর আমিন, একজন সদর আমিন ও ছয়জন মুনসেফ এবং খাজনার মামলা বিচারের জন্য একজন কালেক্টর, একজন এসিস্যান্ট কালেক্টর ও দু'জন ডেপুটি কালেক্টর।

১৪৪. বীরভূম জেলার বাজেট বরাদ্দ, ১৮৬৪-৬৫। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৪৫. সিভিল জজ কর্তৃক আমাকের প্রদত্ত হিসেব, ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫। বীরবুম জুডিশিয়াল রেকর্ডস।

১৪৬. অন্য একটি হিসাব, ১৮৬৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর প্রদত্ত। এই হিসাবে সমগ্র জেলার জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তির মামলা ধরা হয়েছে; কিন্তু ১৮৫৯ সালের ১০ নং আইনের মামলা ধরা হয়নি। বাংলাদেশে এক বিশেষ ধরনের কারণ থেকে এই মামলার উদ্ভব হয় এবং বিশেষ আদালতে তার বিচার হয়।

ভারতীয় মামলা-মোকদ্দমা

বাঙালি চরিত্র সম্পর্কে দু'জন সুপণ্ডিত ইতিহাসবিদ যে অভিযোগ করেছেন, এই প্রসঙ্গে আমি সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই। পল্লীবাংলা সম্পর্কে কোনোরকম ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও তারা দু'জনই বাঙালিদের সম্পর্কে সুললিত ভাষায় ইতিহাস রচনা করেছেন। মি. মিল ও লর্ড মেকলে বাঙালি কৃষককে অতিশয় মামলাবাজ ও ধূর্ত প্রাণীরূপে চিত্রিত করেছেন। অথচ মি. মিল কখনো ভারতেই আসেননি এবং লর্ড মেকলে এমন সব দলিলপত্র ও তথ্যের ভিত্তিতে লিখেছেন, যা সাধারণ নিয়মেই কোলকাতার একজন কর্মচারীর হাতে আসা সম্ভব।[১৪৭] ইংল্যান্ডের পল্লী অঞ্চলের মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যার সঙ্গে বাংলাদেশের মামলার সংখ্যার তুলনা করা যায় না; কারণ ইংল্যান্ডে জমিতে যাদের স্বত্ব আছে, তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং এ স্বত্ব থেকে যে সকল মামলার উদ্ভব হয়, তার সংখ্যাও সেই অনুপাতে কম। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের অন্তত‌পক্ষে পাঁচ ভাগেরই জমিতে কোনো না কোনোরকমের স্বত্ব আছে এবং এই স্বত্ব থেকে যে সকল বিরোধের উৎপত্তি হয়, তাতে অতি স্বাভাবিকভাবেই তাদের জড়িয়ে পড়তে হয়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে বুকানন দেখতে পান যে, পাটনা শহরসহ পাটনা জেলার অধিবাসীদের তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশি 'ভদ্রলোক' (জেন্ট্রি), অর্থাৎ জমির মালিক এবং মোট ১,২৩,০৯৪ জন লোকের মধ্যে ৯৫,৫১০ জনই জমির আয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। বড়ো বড়ো শহরসহ সমগ্র বাহার (বিহার) প্রদেশের ৮,২৯,১০৩ জন বাসিন্দার মধ্যে ৭,৩০,১৫৭ জনেরই জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস হচ্ছে জমি; যে সকল লোক মজুর বা কারিগর হিসেবে চাষ-আবাদের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে, তাদের এই হিসাবের মধ্য ধরা হয়নি। জমির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের স্বত্বের মধ্যে প্রকারভেদ আছে বটে; কিন্তু সাধারণত মোট জনসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগ লোকেরই এমন স্বত্ব রয়েছে, যার ফলে সঙ্গতভাবেই সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। অতএব, এ জাতীয় মামলা-মোকাদ্দমাকে নিশ্চয়ই অসুস্থতার লক্ষণ বা অবাঞ্ছিত বলে অভিহিত করা যেতে পারে না। মামলার এই উর্বর উৎসের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, কয়েক শতাব্দী যাবৎ যে সকল মামলা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো, গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে তার প্রায় সবগুলোই জাগ্রত হয়ে উঠেছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই আমাদের ইঙ্গ-ভারতীয় আইনে তাদের স্বত্বের প্রকৃতি নির্ণয় করে নিতে চেয়েছে।

---

১৪৭. ইন্ডিয়া অফিসের নথিপত্রের মধ্যে যিনি মি. মিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, একমাত্র তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন যে, মি. মিল কি কঠোর পরিশ্রম করে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং লর্ড মেকলে তার 'ইন্ডিয়ান এসেস' পুস্তকে এবং বিশেষত ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পর্কিত প্রবন্ধে যে সকল ইঙ্গিত করেছেন, সেগুলো তিনি নিশ্চয় কোম্পানির গোপন দলিল-দস্তাবেজ থেকে সংগ্রহ করেছেন; কিন্তু এই দুই মহামানবের একজনও ভারতের পল্লী অঞ্চলের বাসিন্দাদের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ পর্যালোচনার সুযোগ পাননি।

এবার আমরা মামলার চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখতে পারি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮৬৪ সালে বীরভূমে নিয়মিত মামলার সংখ্যা ছিলো ৪,৪৮৯। শাসিত এলাকার লোকসংখ্যা ছিলো ৫ লক্ষের কিছু বেশি[১৪৮]; অতএব দেখা যায়, গড়পড়তা প্রতি ১২০ জন লোক বছরে মাত্র একটি করে মামলা করেছে। বাংলাদেশে মানুষের আয়ু বিলেতের চেয়ে অনেক কম; সম্ভবত চল্লিশের চেয়ে ত্রিশেরই বেশি কাছাকাছি। অতএব হিসাবের ওপর অনাবশ্যক জোর না দিয়ে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, পল্লী অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজনই কোনোরকমে দেওয়ানি মামলায় জড়িত না হয়ে জীবন অতিবাহিত করে।

পল্লীবাসীর প্রসঙ্গ ছেড়ে প্রদেশের সাধারণ জনসংখ্যার বিষয় বিবেচনা করা হলে দেখা যাবে, মামলাবাজদের সংখ্যা আরও কমে গেছে। প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি এবং ১৮৬৪ সালের দেওয়ানি মামলার সংখ্যা ১,৩৪,৩৯৩[১৪৯]; অর্থাৎ প্রতি ২৬০ জন লোক বছরে মাত্র একটি করে দেওয়ানি মামলায় জড়িত হয়েছে। তাদের আয়ুকাল গড়পড়তা পঁয়ত্রিশ বছর ধরা হলে দেখা যাবে, প্রতি সাত জন বাঙালির মধ্যে ছয়জনই জীবনে দেওয়ানি আদালতের ধারে কাছে যায় না।

সুস্থতার লক্ষণ

এই মামলা-মোকদ্দমা প্রকৃতপক্ষে পঁচাত্তর বছরের সুবিজ্ঞ শাসনের একটি সুস্থ ও উৎসাহব্যঞ্জক সুফল। ভারতের অধিবাসীদের সম্পর্কে যাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ, তারা তাদের মামলাবাজ বলে রায় দিলেও যে সকল ম্যাজিস্ট্রেট তাদের মধ্যে সারাজীবনই অতিবাহিত করেছেন, তারা অভিযোগ করেছেন, কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেয়ার জন্য তাদের উৎসাহিত করা খুবই কঠিন। ভারতের ইতিহাসে এবারই ভারতের অধিবাসীরা সর্বপ্রথম তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে শিখছে এবং তাও আদালতের নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, লেঠেলদের সাহায্যে নয়। যে সকল অফিসার পল্লী অঞ্চলে কাজ করেছেন, তাদের প্রায় সকলেরই লাঠির বিপুল প্রতাপের কথা মনে আছে। মামলা-মোকাদ্দমায় যে উপকারিতাও আছে, একটি তথ্য থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—মোট ১,০৮,৫৫৯টি মূল মামলার মধ্যে ৭৭,৯৭৯টি মামলাতেই বাদির অনুকূলে রায় হয়েছিলো[১৫০] এবং এছাড়া অসংখ্য মামলার ক্ষেত্রে খরচ এড়ানোর জন্য বাদির দাবি মেনে নেয়ার আপোসরফা হয়ে গিয়েছিলো। রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গত

---

১৪৮. ১৮৫২ সালের লোকসংখ্যা ৫,১৪,৫৯৭। জরিপ রিপোর্ট, ৪৩ পৃষ্ঠা।

১৪৯. বাংলা প্রেসিডেন্সির শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ১৮৬৫-৬৬ সালের বার্ষিক রিপোর্ট। হাইকোর্ট (আদিম বিভাগ)—১,৩৮৫; স্মল কজেস কোর্ট—৮০,৯০৬ এবং অন্যান্য দেওয়ানি আদালত—৫২,১০২। (১৮৬৪ সালের হিসেব)।

১৫০. বাংলা প্রেসিডেন্সির শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ১৮৬৫-৬৬ সালের বার্ষিক রিপোর্ট; ৮ পৃষ্ঠা। (১৮৬৪ সালের হিসেবে)।

সদ্ব্যবহারের জন্য নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অভ্যাসই সম্ভাব্য সর্বোত্তম শিক্ষা এবং ভারতীয় জনসাধারণ আমাদের বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা স্থাপনের যে শিক্ষালাভ করেছে, তার সঙ্গে পঁচাত্তর বছর আগের অবস্থার তুলনা করলে এই উক্তির সত্যতা সহজেই বোঝা যাবে। মাত্র পঁচাত্তর বছর আগে প্রতি ষাট হাজার লোকের মধ্যে বছরে মাত্র একজন আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করেছে এবং প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে বছরে মাত্র একজন এই সাহায্য পেয়েছে।

মামলার ইতিহাস, ১৭৭২—৯১

তখন যে বিচার করা হতো, তার সংখ্যার কথা বাদ দিয়ে গুণগত বিষয়ের দিকে নজর দিলে আরও মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়ে। হাকিমরা তাদের অবসরমতো মামলার সাক্ষ্য নিতেন বা নিতেন না; নিজেদের সুবিধামতো শুনানি মুলতুবি রাখতেন এবং প্রায়ই পুনরায় তার শুনানি করতে ভুলে যেতেন। মামলার আলামতে তাদের দস্তখতও থাকতো না বা সিলমোহরও থাকতো না, ফলে আদালতের প্রাণীরা খুশিমতো যেকোনো কাগজ গায়েব করে দিতে বা নতুন কাগজ ঢুকিয়ে দিতে পারতো। কোনো মামলার শুনানি মুলতুবি হলে পরবর্তী শুনানির তারিখ প্রায়ই স্থির করা হতো না; সুতরাং পেশকার মামলাটির অস্তিত্বের কথা হাকিমকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুনরায় শুনানির ব্যবস্থা করবে কিনা, সে সম্পর্কে বাদি ও বিবাদির মধ্যে ঘুস দেয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেতো। স্যার হেনরি স্ট্রাচি বলেছেন, 'শতকরা পাঁচনব্বইটি মামলার ক্ষেত্রে বিবাদিই দোষী ছিলো'; কিন্তু ঘুসের প্রতিযোগিতায় সে-ই জয়লাভ করতো, কারণ বলতেও ঘৃণা হয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুলতুবির আদেশই মামলার সর্বশেষ আদেশ পরিণত হতো। কখনো কখনো সাক্ষী-সাবুদ হয়ে গেলেও রায় দেয়ার জন্য হাকিম আইন খুঁজে পেতেন না। বিভিন্ন বিধি-বিধান অনিয়মিতভাবে পাস হতো এবং অনিয়মিতভাবেই আদলতগুলোতে পাঠানো হতো। ফলে বহু পুরনো চিঠিপত্রে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের চিঠিতে কোনো আইনের বরাত দিলে জেলা কর্তৃপক্ষ তার জবাবে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, তাদের নথিপত্রের মধ্যে এ ধরনের কোনো আইন তারা খুঁজে পাননি। আইন ও বিধি-বিধানের মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদেশই যদি লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনের একমাত্র নির্দশন হতো, তাহলেও তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক হিসেবে সম্মানিত হতেন; কারণ, একথা বলা আশা করি অতিরঞ্জন হবে না যে, লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলের আগে বাংলাদেশের একটি জেলাতেও সমস্ত প্রচলিত আইন পাওয়া যেতো না। অবশ্য এজন্য খুব ক্ষতি হতো মনে করা হলে ভুল করা হবে; কারণ পরিস্থিতি এমনিতেই যথাসম্ভব শোচনীয় ছিলো, আইন থাকা না থাকার ওপর কোনো কিছুর অবনতি নিভর করতো না। মামলার রায় আসলে ঘুসখোর পেশকারের ওপরই নির্ভর করতো, হাকিমের ওপর নয়; কারণ রায় ও ডিক্রি ফার্সি ভাষায় লেখা হতো এবং জেলা-জজদের মধ্যে

একজনও এই ভাষা পড়তে পারতেন না। ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত বীরভূম আদালতে যে সকল মামলা হয়েছে, তার মধ্যে একটি মামলার রায়েও আমি ইংরেজ হাকিম বা তার রেজিস্ট্রারের দস্তখত বা সীলমোহর, অথবা এমন কি তাদের কারো নামের আদ্যাক্ষর লেখাও খুঁজে পাইনি।

কিন্তু মামলায় ডিক্রি পাওয়ার অর্থ ছিলো দুর্গতি ও হয়রানির সূত্রপাত হওয়া। পঁচিশ বছর কাল ধরে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর নতুন নতুন আদলত বসানো হতো এবং ডিগ্রিদারকে এক আপিল আদালত থেকে আর এক আপিল আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। ডিক্রিদার নিজে বা তার দায়িক ধ্বংসে না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই টানা-হেঁচড়া চলতে থাকতো। একটি মাত্র মামলার বিবরণ থেকেই বোঝা যাবে যে, কে কতোক্ষণ টিকে থাকতে পারে তার ওপরই শেষ পর্যন্ত জয়-পরাজয় নির্ভর করতো। কোম্পানি বাংলাদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত শাসনভার গ্রহণ করার আগে যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিলো, সেই সময় বিষ্ণুপুরের রাজা দু'টি পুত্রসন্তান রেখে মারা যান। সঙ্গে সঙ্গে বড়ো ভাই সম্পত্তির সিংহভাগ দখল করে নেয়। তখন ভালো-মন্দ কোনোরকমের বিচারই পাওয়া যেতো না, সুতরাং ছোটো ভাই চুপ করে যায়। কিন্তু কোম্পানির আদালত চালু হওয়ার পর ছোটো ভাই বড়ো ভাইয়ের নামে মামলা করে এবং বছরের পর বছর ধরে ঘুসের বন্যা বইয়ে দিয়ে ডিগ্রি পায়। বড়ো ভাই কালবিলম্ব না করে মুর্শিদাবাদের কাউন্সিলের কাছে আপিল করে। আপিলের বিচার্য বিষয়টি শেষ পর্যন্ত হিন্দু উত্তরাধিকার বিধির সূক্ষ্ম বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই বিধি এখনো সকলের কাছে সহজবোধ্য নয় এবং তখন তা পণ্ডিত পুরোহিতরা সযত্নে গোপন করে রাখতো। আপিলের হাকিম ছিলেন উনিশ বছর বয়সের[১৫১] এক অর্বাচীন যুবক এবং তিনি মনে করতেন যে, আইন সম্পর্কে আদৌ কোনো জ্ঞান না থাকলেও 'সমানাধিকার ও সুবিবেক' দিয়ে দিব্যি কাজ চালানো যায়। ওয়ারেন হেস্টিংস তাই যথার্থই লিখেছেন, 'আপনি বিশ্বাস করবেন কি যে, কোম্পানির বালকরাই দেশের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেছে? এবং তারাই সুপারভাইজার, রাজস্ব-কালেক্টর, বিচারক প্রভৃতি অর্থহীন নামে জনসাধারণের শাসক, হ্যাঁ কঠোর শাসক হয়ে বসেছে?' মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল থেকে মামলাটি কোলকাতায় রাজস্ব বোর্ডের কাছে চলে যায় এবং সেখানে আবার নতুন নতুন লোককে ঘুস দেয়া হয়; কিন্তু সেখানেও কোন চূড়ান্ত ফয়সালা হলো না। এভাবে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বন্টনের একটি তুচ্ছ তারতম্যকে দীর্ঘ মামলা-মোকাদ্দমার সাহায্যে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মারাত্মক সংগ্রামে পরিণত করা হয় এবং বিষ্ণুপুরের রাজা সরকারের কাছে প্রেরিত এক আনুষ্ঠানিক দরখাস্তে তার একমাত্র ভাইকে 'আমার জীবনের শত্রু' বলে অভিহিত করেন।[১৫২] রাজস্ব বোর্ড থেকে মামলাটি সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের কাছে

---

১৫১. 'লাইফ অব লর্ড টেইনমাউথ', ২৮ পৃষ্ঠা।

১৫২. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত কালেক্টরের পত্র; ১৫ই অক্টোবর, ১৭৯০। বীরভূম রেসিডেন্ট রেকর্ডস।

চলে যায়। তিনি রায় দেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত আদলত ভুল বিচার করেছে এবং দুই ভাই সমস্ত সম্পত্তির যৌথ অংশীদার। কিন্তু এই রায়ের আগেই এক ভাই দেনার দায়ে জেলে যায়—তার চুল তখন সাদা হয়ে গেছে এবং দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর এক ভাই তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সুখ-দুঃখের প্রতি তার কোনো অনুভূতিই আর অবশিষ্ট নেই।[১৫৩]

বিচারের এই বিলম্বের শিকার সরকারকেও নিতান্ত কম হতে হয়নি। ১৭৯১ সালের ১লা ডিসেম্বর কোম্পানির পক্ষ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট-কালেক্টর বারোটি মামলা দায়ের করেন; কিন্তু ১৭৯২ সালের ২৪শে জুলাই তিনি সবিনয়ে রিপোর্ট দেন যে, এখনো একটি মামলারও প্রাথমিক শুনানির দিন ধার্য হয়নি।[১৫৪]

কোম্পানির দায়িত্ব, ১৭৬৫-৯৩

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে এই ছিলো আমাদের প্রচেষ্টার স্বরূপ। এই চিত্র খুব মনোহর নয়; কিন্তু এই বই লেখার কোনো সার্থকতা থাকতে হলে আমাকে সত্য কথাই বলতে হবে। তবে প্রথম ইংরেজ শাসকদের নিন্দা করার আগে কোম্পানি কি কি কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলো তা ভালোভাবে জানা দরকার। ১৭৬৫ সালের চুক্তিতে কোম্পানির ওপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং এ দায়িত্ব কোম্পানি পারদর্শিতা ও বিজ্ঞতার সঙ্গেই সম্পাদন করে। ভারতীয় অভিমত অনুসারে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে দেওয়ানি বিচারের দায়িত্বও সংযুক্ত ছিলো; কিন্তু কোম্পানি ১৭৭২ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব উপলব্ধি করেননি এবং ওয়ারেন হেস্টিংস আইন প্রণয়নের মারফত চেষ্টা করলেও ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে কোনো নির্ভরযোগ্য বিচার-ব্যবস্থা পৌঁছায়নি। অতএব, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, আমরা এ ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রাচীন বিচার ব্যবস্থা ১৭৬৫ সালের পূর্ববর্তী অরাজকতার সময় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় আমরা এদেশে এসে কোনো দেওয়ানি আদালত দেখতে পাইনি এবং আমাদের আদালতগুলো খারাপ ছিলো বটে; কিন্তু আদৌ না থাকার চেয়ে তা ভালো ছিল। অভ্যন্তরীণ শাসনের তৃতীয় দায়িত্ব ফৌজদারি বিচার ও পুলিশ সম্পর্কে কোম্পানির আইনত কিছুই করণীয় ছিলো না। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত আইন বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব নবাবের হাতে ছিলো এবং বল প্রয়োগের একমাত্র রাজস্ব আদায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেই ইংরেজ কালেক্টররা হস্তক্ষেপ করতেন।

---

১৫৩. রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরিত অস্থায়ী কালেক্টরের পত্র; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১৫৪. কালেক্টরের নিকট প্রেরিত সি. ওভফিল্ড, এক্টোয়ারের পত্র; ২৪শে জুলাই, ১৭৯১। মামলাগুলো চাকরান জাতীয় জমি সরকারের দখলে আনা সম্পর্কিত শুনলে ভারতীয় কর্মচারিগণ নিশ্চয়ই আরও বিস্মিত হবেন। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

যে আমলের কথা আমি আলোচনা করছি, সেই আমলের অধিকাংশ সময়ই দেশের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির কাছে গৌণ ও অপ্রধান বিষয় মাত্র ছিলো। এই দায়িত্ব তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো, অথবা বলা যেতে পারে, আত্ম সংরক্ষণের জন্য তারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলো এবং কোম্পানির বিজ্ঞ উপদেষ্টাগণ বহুদিন যাবৎ এই দায়িত্বকে শক্তির উৎস মনে না করে দুর্বলতার উৎস বলেই মনে করেছেন। লর্ড কর্নওয়ালিস এই কর্তব্যের একটি মহত্তর ব্যাখ্যা না দেয়া পর্যন্ত বাণিজ্য ও অর্থ উপার্জনই কোম্পানির প্রধান লক্ষ্য ছিলো এবং দেশজয় ও শাসনব্যবস্থা এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা ছিলো মাত্র। অতএব, দেশের একটি বৃহৎ সওদাগরী শক্তি হিসেবে কোম্পানির আচরণ ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা না করা হলে গত শতাব্দীর শেষ অর্ধেক সময়ের পল্লীবাংলার অবস্থা পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পল্লী অঞ্চলে পণ্য প্রস্তুতকারী হিসেবে কোম্পানির ভূমিকা

পল্লী অঞ্চলের পণ্য প্রস্তুত পদ্ধতি

দলিল-দস্তাবেজে কোম্পানির সওদাগরী কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। ব্যবসা চালানোর জন্য তাদের দুটো পৃথক পদ্ধতি ছিলো—প্রথমত, নিয়মিত বেতনভুক কর্মচারীদের দ্বারা—এই কর্মচারীরা কোম্পানির টাকায় ব্যবসা করতো এবং সমস্ত মুনাফা কোম্পানিকে দিতো এবং দ্বিতীয়ত, এজেন্টদের দ্বারা—তারা একটি নির্ধারিত মূল্যে মাল সরবরাহ করতো, তার মধ্য থেকেই দর কষাকষি করে মুনাফা করতো; বলাবাহুল্য, এজেন্টরা কোম্পানির কাছ থেকে কোনো বেতন পেতো না। নিয়মিত কর্মচারীদের রেসিডেন্ট, সিনিয়র মার্চেন্ট, জুনিয়র মার্চেন্ট, ফ্যাক্টর ও সাব-ফ্যাক্টর পদবি ছিলো। এই পদগুলো খুবই আকর্ষণীয় ছিলো এবং কোম্পানির রাজনৈতিক দায়িত্ব 'কোম্পানির চালকদের ওপর অর্পিত হওয়ার পর এসব পদে সুযোগ্য লোকেরাই যোগ দিয়েছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ইঙ্গ-ভারতীয় রাষ্ট্রবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম সার্বভৌম ক্ষমতার দায়িত্ব উপলব্ধি করলেও তিনি তার উচ্চপদের বাণিজ্যিক কর্তব্যকে শাসন বিভাগীয় কর্তব্যের কাছে গৌণ করে তুলতে সাহস করেননি। আইনপ্রণেতা হিসেবে তার সাফল্য ছিলো আংশিক; কিন্তু একটি বৃহৎ সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তিনি পূর্ণাঙ্গ সফলতা অর্জন করেছিলেন এবং তাও এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে, যে প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বছরই শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফা দিতে হতো। তাই ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন-সংস্কার তাকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রাখলেও তিনি যখন ভারত ছেড়ে চলে যান, তখন শাসন-সংস্কার নয়—বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলায় স্থাপিত তাঁতিপল্লী, রেশমপল্লী ও কারখানাই তার শাসন-কৃতিত্বের সর্বাধিক দৃশ্যমান স্মৃতিসৌধ ছিলো। পল্লী শিল্পের এই কেন্দ্রগুলো জনসাধারণের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো, ইতিহাসবিদগণ তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেননি এবং আমি আশা করি, বর্তমান অধ্যায়ে আমি কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যকে একটি নতুন ও ইঙ্গিতপূর্ণ আলোকে পরিবেশন করতে সক্ষম হবো।

শিল্পপল্লী গঠন

পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলোর প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার বহু পূর্বেই কোম্পানি এই সকল রাজ্যে বহু বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিলো এবং রাজাদের

কুশাসনের ফলে এই কারখানাগুলোতে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়াই লর্ড কর্নওয়ালিসের বীরভূমের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো একজন কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট সমগ্র বাণিজ্যের তদারক করতেন, তার সরাসরি অধীনে তিনটি কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত তিনটি প্রধান কারখানা ছিলো এবং এই তিনটি কারখানা থেকে অধস্তন আরো বারোটি কারখানা পরিচালনা করা হতো। বীরভূমে কোম্পানির কারখানাগুলোতে প্রধানত রেশম, সুতিবস্ত্র, সুতা ও তন্তু, গঁদ এবং লাক্ষা রঙ উৎপন্ন হতো। পশ্চিমের বড়ো জঙ্গলের ধারে অবস্থিত গ্রামগুলোতে গুটিপোকার চাষ হতো এবং দক্ষিণে অজয় নদী এবং উত্তরে মোর নদীর প্রত্যেকটি বাঁকে বাঁকে একটি করে তাঁতিপল্লী ছিলো। তৎকালীন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্যেও এই শিল্পপল্লীগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলো। কারণ চারদিকে দেয়াল বা সশস্ত্র পাহারা না থাকলেও কোম্পানির নামেই তখন ত্রাসের সঞ্চার হতো এবং দস্যু-ডাকাতরা এই সকল পল্লীতে হামলা করতে সাহস করতো না। জেলার অন্যান্য জায়গা যখন কার্যত ডাকাতদের দখলে চলে গিয়েছিলো, তখনও নিরীহ কারিগররা এখানে বসে নির্বিবাদে কাজ করতো। এমন কি ফসল কাটার পর বহু কৃষকও তাদের স্ত্রী-পুত্র, ধান-চাল, গরু-বাছুর এবং কাঁসা-পিতলের থালা-ঘটি-বাটি এই সকল গ্রামের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিতো; তারপর হয়তো ডাকাতদল এসে তাদের ঘরবাড়ি শূন্য দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যেতো। এই নিরাপদ পল্লীর কয়েকটি ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হয়ে যায়। কোনো কোনো জায়গার নাম থেকে যেমন ডাকাত ও বন্য জন্তুদের এককালীন অপ্রতিহত রাজত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি তাঁতিপাড়া প্রভৃতি নাম থেকে বোঝা যায় যে, কারিগর ও ছোটোখাটো ব্যবসায়ীরা একসময় কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের পক্ষপুটের নিরাপদ আশ্রয়ে একত্রিত হয়ে বসবাস করেছে। ডাকাতরা মাত্র দু'বার কোম্পানির কারিগর বা তাদের জিনিসপত্রের ওপর হামলা করে। প্রথম হামলাটি হয় অসাবধানতাবশত এবং দ্বিতীয়টি হয় অনাহার ও দারিদ্র্য জর্জরিত লোকদের বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টা হিসেবে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একবার সরকারের মালবাহী বলদের একটি কাফেলা ডাকাতদের কবলে পড়ে; সঙ্গের লোকজন সব প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়; ফলে মালগুলো যে কোম্পানির, ডাকাতরা তা জানতে না পারায় মনের সুখে লুটতরাজ করে। কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে কালেক্টরকে চিঠি লেখেন। কালেক্টর ক্ষমা প্রার্থনার ভাষায় জবাব দেন যে, যে জমিদারের এলাকায় ডাকাতি হয়েছে, তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হওয়ায় তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সম্ভবত ডাকাতরাই তাদের ভুল বুঝতে পেরে মালগুলো ফেরত দিয়েছিলো; কারণ পরে আসল মালই ফেরত পাওয়া গিয়েছিলো।

দ্বিতীয় হামলাটি আরও মারাত্মক ছিলো। মি. কিটিং ডাকাতদের অজয় নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী এলাকায় তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন বটে; কিন্তু কোম্পানির নামই যথেষ্ট মনে করে উত্তর তীরের তাঁতিদের গ্রামগুলো রক্ষার জন্য কোনোরকম ব্যবস্থা করেননি। স্বাভাবিক অবস্থার জন্য তার এই অনুমান বেঠিক ছিলো না; কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট ও দারিদ্র্য জর্জরিত মানুষকে বিশ্বাস করা যেতে পারে না। তাই ডাকাতরা

একদিন নদী পার হয়ে এসে কোম্পানির প্রধান তাঁতি গ্রামে লুটতরাজ করলো। ঘটনাটি এমন নজিরবিহীন ছিলো যে, কালেক্টরের ক্ষমা প্রার্থনা বা জমিদারের ক্ষতিপূরণে তার সংশোধন হওয়ার উপায় ছিলো না। প্রায় একই সময় জেলার প্রাচীন রাজধানীতে হামলা হয় এবং রাজপ্রাসাদ ও বহু দুষ্প্রাপ্য সম্পত্তিসহ বারোটি তাঁতি গ্রামের সম্পত্তির চেয়ে অনেক বেশি সম্পত্তি লুটপাট ও বিনষ্ট হয়ে যায়। সরকার তখন কিছুই বলেননি; কিন্তু তাঁতি গ্রাম লুট হওয়ার পর কালেক্টর গলবস্ত্র হয়ে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের সামনে এসে হাজির হলেন। কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট বিষয়টি লর্ড কর্নওয়ালিসকে জানালেন। কয়েকদিনের মধ্যেই মি. কিটিং সরকারের কাছ থেকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ চিঠি পেলেন। তার শিক্ষা হয়ে গেলো যে, ডাকাতরা জেলার যেকোনো জায়গায় মহানন্দে ডাকাতি করতে পারে; কিন্তু কোম্পানির কারিগরদের যেকোনো মূল্যের বিনিময়ে রক্ষা করতে হবে।

বিভিন্ন পণ্য প্রস্তুতের কাজে কোম্পানি বীরভূম জেলায় বছরে ৪৫ হাজার থেকে ৬৫ হাজার পাউন্ড মূলধন নিয়োগ করতেন।[১] কারখানায় কোম্পানির তাঁতি গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তার নামে একটি হিসাব থাকতো। সারা বছর সে অগ্রিম টাকা নিতো এবং মাল প্রস্তুত করে কারখানায় জমা দিতো। বছরের শেষে মোট সে যতো টাকা নিয়েছে এবং যতো টাকার মাল দিয়েছে, তা হিসাব করে খাতা বন্ধ করে দেয়া হতো। সাধারণত তাকে আবার অগ্রিম টাকা দেয়া হতো এবং নতুন বছরের জন্য নতুন হিসাব খোলা হতো।

কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট

দলিলপত্রের সর্বত্রই কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট মি. চিপকে একজন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখা যায়; আরও দেখা যায় যে, নেহাত বন্ধুত্ব বা শুভবুদ্ধির প্রেরণায় না হলেও মি. কিটিং সর্বদা তার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কালেক্টরের চেয়ে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের চাকরিও যেমন দীর্ঘদিনের, বদলি হওয়ার সম্ভাবনাও তেমনি অনেক কম এবং কার্যত তিনিই ছিলেন জেলার আসল প্রধান। তিনি আয়ও করতেন প্রচুর; কারণ কোম্পানির বেতন ছাড়াও তিনি আবার ব্যক্তিগতভাবেও ব্যবসা করতেন। মি. কিটিংকে অভিযোগ করতে দেখা যায় যে, বেতনের টাকায় তিনি কোনোমতে জানেপ্রাণে বেঁচে থাকতে পারেন মাত্র; কালেক্টরদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত যে মাটির ঘর আছে, তার চাল দিয়ে পানি পড়ে, কখন বুঝি বা তার মাথার ওপরই ভেঙে পড়ে এবং বাড়ি তৈরির একখণ্ড জমির জন্য তিনি দরখাস্ত করে হয়রান হয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে মি. চিপ কেবলমাত্র প্রচুর টাকা ও বিপুল নীলের আবাদেরই মালিক ছিলেন না, তিনি প্রাসাদোপম বাড়িতেও বাস করতেন। প্রাচীরবেষ্টিত এবং কৃত্রিম হ্রদ ও প্রশস্ত বাগিচায় সজ্জিত কমার্শিয়াল রেসিডেন্সি দেখলে ব্যক্তিগত বাসভবনের চেয়ে একটি

১. ট্রেজারিতে প্রাপ্ত কোম্পানির বিভিন্ন বাণিজ্যিক চেক ও ড্রাফটে লিখিত পরিমাণ যোগ করে এই সংখ্যা পাওয়া গেছে। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

সুরক্ষিত নগর বলেই মনে হতো। একটি পাহাড়ের ওপর এই বিরাট বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ এখানো আছে এবং বহু মাইল দূর থেকেই তা নজরে পড়ে। বীরভূমের রাজারা দুইশ' বছর যাবৎ যে সকল প্রাসাদ, প্রমোদ-চত্বর ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন, এই ধ্বংসাবশেষ এখনো প্রায় তার সমান জায়গা জুড়ে রয়েছে।

কমার্শিয়াল রেসিডেন্টই সরকারি অর্থের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতেন—কালেক্টর নয়। মি. কিটিং বছরে মাত্র তিন হাজার পাউন্ড নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারতেন এবং তার অধীনস্থ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগের ক্ষমতা কোলকাতা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিলো; কিন্তু মি. চিপ বাণিজ্যিক প্রধান হিসেবে কোম্পানির পক্ষ থেকে বছরে ৪৫ হাজার থেকে ৬৫ হাজর পাউন্ড খরচ করতেন; সমগ্র কারিগর সম্প্রদায় তার বেতনভুক ছিলো এবং তিনিই সরকারের মহাপ্রাণ রূপে প্রতিনিধিত্ব করতেন। কালেক্টরকে রাজস্ব আদায়ের কর্কশ কর্তব্য পালন করতে হতো এবং কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট সেই রাজস্ব পুনর্বণ্টনের তৃপ্তিকর কর্তব্য সম্পাদন করতেন। তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের কাছে মি. কিটিং ছিলেন কোম্পানির শিব অবতার, অর্থাৎ অনিষ্ট ও অমঙ্গলের শক্তিমান দেবতা। অতএব, লোকে যথাসম্ভব তার তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করতো; পক্ষান্তরে মি. চিপ ছিলেন কোম্পানির বিষ্ণু অবতার, অর্থাৎ শক্তিমান দেবতা, তবে মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য; অতএব কম ভয় করতে হতো বলে লোকে তাকে কম শ্রদ্ধা করতো এবং ভালোবাসতো বটে, তবে সুযোগ পেলেই ঠকিয়ে যেতো। মি. চিপ যখন এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় যেতেন, তখন বহু উৎসুখ লোক তার পালকির পিছনে পিছনে চলতো এবং গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় পালকির দর্শন-লাভের জন্য মায়েরা শিশুদের দুই হাতে উঁচু করে ধরতো; আর বুড়োরা পালকির সামনে গড় হয়ে তাদের অন্নদাতা দেবতাকে প্রণাম করতো। কোনো শিশুর গায়ে তার ছায়া পড়লে তাকে অতিশয় সৌভাগ্যবান বলে মনে করা হতো! মি. চিপ প্রায় পঁচিশ বছরকাল সুরুলে ছিলেন এবং সর্বসাধারণের কাছে কোম্পানির সম্পদ, জৌলুস ও স্থায়িত্বের দৃশ্যমান প্রতীক বলে পরিগণিত হতেন। মি. চিপের সেই জৌলুসময় বাসভবনের চারদিকে আজকাল এক বুড়োকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়; কারো সঙ্গে দেখা হলেই সে ধ্বংসস্তূপের দিকে হাত দেখিয়ে বলে, ঐ বড়ো হলঘরটায় চল্লিশ দিন ধরে খানাপিনা হতো, ওখানে তার বাপ চাকরি করতো এবং সে নিজে ঐখানেই মানুষ হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ

মি. চিপ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও কাজ করতেন। বাদি হিসেবেই হোক, আর বিবাদি হিসেবেই হোক কালেক্টরের সামনে হাজির হওয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকের কাছেই রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার ছিলো; ফলে তারা সালিশ করার জন্য তাদের বিরোধ কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে আসতো। প্রত্যেকদিন সকালে বহু লোক এসে জমা হতো। কেউ হয়তো বাঘ মেরে পুরস্কারের আশায় মরা বাঘ ঘাড়ে করে আনতো; কেউ

হয়তো হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে একজন দস্যু[২] হাজির করতো; কেউ হয়তো তাদের গ্রামের ওপর ডাকাতদের আসন্ন হামলার খবর পেয়ে সাহায্য চাইতে আসতো; আবার কেউ বা পানির স্রোত বা জমির সীমানা সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে আসতো। আইনত অবশ্য মি. চিপের এই সকল বিষয়ের বিচার করার কোন ক্ষমতা ছিলো না; কিন্তু তখন ক্রিয়াশীল আদালত ছিলো না বলে জনসাধারণ প্রভাবশালী লোকদেরই দ্বারস্থ হতো; ফলে এই সকল প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে যে কেউ ইচ্ছে করলেই যেকোনো বিষয়ে এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে পারতেন। মি. চিপের এক্তিয়ারও তাই ব্যাপক ছিলো; আর তাছাড়া তার বিচার পাওয়ার জন্য কাউকে কিছু খরচও করতে হতো না। আরও একটি বড়ো সুবিধা ছিলো এই যে, মি. চিপ খুব তাড়াতাড়ি বিচার করতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুবিচার করতেন। অন্ধকার দেশে কামর্শিয়াল রেসিডেন্সি তাই একটি আলোকিত স্থান বলে পরিগণিত হতো এবং জনসাধারণও এতো সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হয়েছিলো যে, এমন কি নতুন আদলত চালু হওয়ার পারও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তারা আগের মতোই মি. চিপের কাছে এবং তিনি চলে যাওয়ার পর নতুন কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের কাছে যেতো। বাংলাদেশের প্রত্যেক জমিদারই তার কাছারিতে প্রজাদের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করে থাকেন এবং মাঝে মধ্যে তিনি সুবিচারও করেন; কিন্তু মি. চিপ ছিলেন জেলার মহাহাকিম। সরকার বিজ্ঞতার সঙ্গেই এই জাতীয় জনপ্রিয় বিচার ব্যবস্থা অনুমোদন করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় মি. চিপ কর্তৃক প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে প্রতিষ্ঠিত সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান রেসিডেন্ট পার্টনারকে নিয়মিত ম্যাটিস্ট্রেটের ক্ষমতা দান করেন।

সাধারণ বণিক

কোম্পানির টাকা লাভজনক ব্যবসায়ে খাটানো ছাড়া মি. চিপ নিজেও একজন পারদর্শী বণিক ও পণ্য প্রস্তুতকারী ছিলেন। একসময় ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা চালানোর সুযোগের চরম অপব্যবহার করা হতো। ১৭৬২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস এ সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করে চিঠি লেখেন। লর্ড ক্লাইভ একাধিকবার পার্লামেন্টে এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেন[৩] এবং এ সম্পর্কে তিনি যে সংস্কারসাধন করেন, তার ফলে তরুণ লেখকগণ তাকে 'কুখ্যাত স্মৃতির ক্লাইভ' আখ্যা দেয়।[৪] ভ্যান্সিটার্টের দুর্বল শাসনের সময় ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পরিমাণ এতো বেশি বেড়ে যায় যে, দেশের সরকারি কাজকর্মই প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ১৭৭৩ সালে বোর্ড অব ডিরেক্টর এই প্রথার তীব্র নিন্দা করে গভর্নর জেনারেলকে চিঠি লেখেন; ১৭৮২ সালে পার্লামেন্টে এ বিষয়ে সমালোচনার ঝড়

---

২. কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট তার জনপ্রিয়তার ফলে একবার জনসাধারণের সাহায্যে বিনা অস্ত্রে এক দুর্ধর্ষ দস্যুকে আটক করতে সক্ষম হন। এই দস্যুকে সদরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কালেক্টরকে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছিলো।

৩. স্বীয় নীতির সমর্থনে পার্লামেন্টে প্রদত্ত বক্তৃতা। কোর্ট অফ ডিরেক্টরের নিকট লিখিত পত্র; ৩০শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫। মিলের পুস্তক, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৩৫ ও ২৩৬ পৃষ্ঠা।

৪. জন শোর কর্তৃক লিখিত পত্র; ৩রা ডিসেম্বর, ১৭৬৯। জীবনী, প্রথম খণ্ড, ২৬পৃষ্ঠা।

বয়ে যায়; কিন্তু নানাভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৯ সালে দেখতে পান যে, কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বণিকের সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না। তাই তিনি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে জজ ও কালেক্টরদের ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে বিরত থাকার হুকুম দেন;[৫] কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের একটিমাত্র শ্রেণীকে এই নিষেধাজ্ঞার এক্তিয়ার থেকে রেহাই দেয়া হয়। বিচার ব্যবস্থা বা রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টদের কোনোরকম সম্পর্ক না থাকায় সরকারি পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে জোর করে টাকা আদায় করা বা অসৎ উপায়ে মুনাফা করা তাদের কোনো সুযোগ ছিলো না; তাছাড়া অনেকে মতপ্রকাশ করেন যে, নিজেদের কিছু ব্যবসা থাকলে তারা কোম্পানির ব্যবসা আরও দক্ষতার সঙ্গে চালাতে পারবেন। জন শোর লেখেন, 'আপনি দেখতে পাবেন যে, আমরা আপনাদের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট ও এজেন্টদের ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ বহাল রেখেছি। বিশ্বাস করুন, আপনাদের কারবারের উন্নতি করার আসল উপায় হচ্ছে, ব্যক্তিগত ও কোম্পানির স্বার্থ পাশাপাশি চলতে দেয়া'[৬]

মি. চিপের ব্যক্তিগত ব্যবসা সম্পর্কে দলিলপত্রে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তিনি বীরভূম জেলায় নীলচাষ প্রবর্তন করেন, ইউরোপ থেকে সরঞ্জাম আমদানি করে চিনি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার উন্নতি করেন এবং একটি নিজস্ব সওদাগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এখনো ভালো কারবার করছে এবং তাদের সওদাগরী প্রতীকে মি. চিপের নামের আদ্যাক্ষর রয়েছে। কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের প্রাচীন কর্তৃত্বের কিছু কিছু এই প্রতিষ্ঠানটি এখনো উপভোগ করে থাকে। জমিদার ও প্রজার মধ্যকার যে অসদ্ভাব পূর্ব বাংলায় ধ্বংসসাধন করেছে, মি. চিপের প্রতিষ্ঠানের এলাকায় তার নামগন্ধ নেই এবং এখনো অজয় নদীর উপত্যকার সর্বত্র এই প্রতিষ্ঠানের রেসিডেন্ট পার্টনারের আদেশ আইন সভায় পাস করা আইনের মতোই প্রতিপালিত হয়ে থাকে।

'ভাগ্যান্বেষী' মি. ফ্রুশার্ড

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোম্পানির ব্যবসা দু'টি পদ্ধতিতে চালানো হতো—প্রথমত, কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের মতো বেতনভুক্ত কর্মচারীদের দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত, এজেন্টদের সাহায্যে—এই এজেন্টেরা বেতনভুক ছিলো না, তারা একটি নির্দিষ্ট হারে কোম্পানিকে মাল সরবরাহ করতো। বীরভূম জেলায় এ জাতীয় এজেন্ট মাত্র একজন ছিলেন। কোলকাতার বণিক মি. ফ্রুশার্ড বীরভূমে রেশম সরবরাহের ঠিকা নেন এবং মোর নদীর তীরে এটি কারখানা স্থাপন করেন। চারদিকে পরিখা খনন করে এবং উঁচু মাটির ঢিবি বসিয়ে কারখানাটি সুরক্ষিত করা হয়েছিলো। নদীটি তখন দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো এবং মাঝে মাঝে যেখানে একটু পরিষ্কার জায়গা দেখা যেতো সেখানেই গুটিপোকা চাষীরা বসতি গড়ে তুলতো। ডাকাত ও বন্য জন্তুর ভয় তখন

---

৫. জেলা জজদের নিকট প্রেরিত সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের পত্র; ৪ঠা মার্চ, ১৭৮৯। রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলার অর্ডার, ৬ই মার্চ, ১৭৮৯। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

৬. এইচ. ইংলিচ, এস্কোয়ারকে লিখিত জন শোরের পত্র; ৯ই নভেম্বর, ১৭৮৮।

সমানই ছিলো; কিন্তু বীরভূমের রেশম খুব উচ্চমূল্যে বিক্রি হতো বলে চাষীরা সবরকম বিপদের ঝুঁকি নিতো। ডাকাত বা বন্য জন্তুর আক্রমণে একটি পল্লী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি গড়ে উঠতো। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে এসে সংলগ্ন জেলায় কিছুদিন বাস করেছিলেন। সেই সময় বীরভূমের রেশমী বস্ত্র দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং পরে শাহী দরবারে এই বস্ত্রের ফ্যাশন চালু করেন। ভারতে এক ফ্যাশন কয়েক শতাব্দী যাবৎ চালু থাকে; তাই ১৭৮৬ সালের দিকে মি. ফ্রুশার্ড ব্যাপক ভিত্তিতে বীরভূমে রেশম উৎপাদনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কোম্পানির সঙ্গে মাল সরবরাহের চুক্তি থাকায় তিনি কোম্পানির প্রভাব কাজে লাগিয়ে রাজার কাছ থেকে মোর নদীর উত্তর তীরের জংলি জমি ইজারা নিতে সক্ষম হন।

তার সাহসিকতার কাহিনী শুনে মনে হয়, সত্যিই আমরা একটি নতুন যুগে বাস করছি। যে বাধা-বিপত্তি তাকে পদে পদে বিপর্যস্ত করতো এবং যে রাজনৈতিক গরজ তার মর্যাদা নিয়ন্ত্রণ করতো, তা বর্তমান কালের ইঙ্গ-ভারতীয়দের কাছে সহজবোধ্য নয় এবং এমন কি তিনি যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, সেই শ্রেণীর অস্তিত্বও একপুরুষেরও অনেক আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই 'ভাগ্যান্বেষী' যেদিন বীরভূম জেলায় পা দেন, সেদিনই বুঝতে পারেন যে, সমস্ত কর্মচারীই তাকে সবচেয়ে কম মুনাফা দিতো। তিনি ছিলেন সরল কিন্তু কৃতসংকল্প। জমি সম্পর্কেও তিনি কিছু জানতেন না, চাষীদের সঙ্গে কারবারের কৌশলও জানতেন না; কিন্তু তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো যে, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি অগাধ টাকার মালিক হয়ে যাবেন। তাই খরচের হিসাব না করেই তিনি ব্যবসায়ে নেমে পড়েন এবং কঠোরতম পরিশ্রম করেও অল্প-স্বল্প মুনাফা করতে থাকেন। প্রথমত, জমির জন্য তাকে অনেক বেশি দাম দিতে হতো। তিনি যে জঙ্গলের জমি ইজারা নিয়েছিলেন, বাজার দর অনুসারে তার খাজনা একরপ্রতি বড়োজোর দেড় শিলিং ছিলো; কিন্তু জেলার প্রায় সমস্ত জমিতে একচেটিয়া মালিকানা থাকায় রাজা এই উৎসাহী ইংরেজের কাছ থেকে একরপ্রতি সাড়ে ৬ শিলিং আদায় করতে সক্ষম হন। এই অনুপাতে আবাদযোগ্য জমির খাজনা হয় একরপ্রতি ১৬ শিলিং; অথচ সরেস ধানী জমির খাজনা তখন ছিলো ৭ থেকে ১২ শিলিং-এর মধ্যে।[৭] কিছুদিনের মধ্যেই মি. ফ্রুশার্ডের খাজনা বাকি পড়ে গেলো এবং রাজাও এই অজুহাতে রাজস্ব বাকি ফেলে জানালেন যে, মি. ফ্রুশার্ডের কাছ থেকে টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাজস্ব পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন না। কালেক্টর দেখলেন, মহাসঙ্কট; জমিদারের কেশাগ্র স্পর্শ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারখানার জমি ক্রোক বা মালপত্র নিলাম তিনি করতে পারেন না; কারণ তাহলে কোম্পানির ঘরে নিয়মিত রেশম সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া একজন দেশীয় লোকের প্রতি সুবিচার করার জন্য কোম্পানির কারবারে ব্যাঘাত সৃষ্টির কথা তখন কল্পনা করাও সম্ভব নয়। মি. কিটিং এই ইংরেজ 'ভাগ্যান্বেষীর' প্রতি রাগে গরগর করতে লাগলেন; কিন্তু আসলে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস করলেন না; কারণ বাণিজ্য বোর্ড তাহলে তার ওপরই ক্ষেপে উঠবে।

৭ হেতমপুর এস্টেটের কোর্ট অফ ওয়ার্ডের ম্যানেজার কর্তৃক প্রদত্ত প্রাচীন পরগনা নিরিখ ও অন্যান্য কাগজপত্র। কালেক্টরের নিরিখও দ্রষ্টব্য। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি তার অভিযোগের ফিরিস্তি রাজস্ব বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন যে, কারখানার সম্পত্তি ক্রোক করা সম্ভব নয় এবং এই 'ভাগ্যান্বেষীকে' গ্রেপ্তার করাও সম্ভব নয়, কারণ সে তার এলাকার বাইরে বাস করছে; অর্থাৎ 'এই পাইকান্ত রায়ত মি. ফ্রুশার্ডকে' পাকড়াও করার কোনো উপায়ই তার নেই; কিন্তু মি. ফ্রুশার্ডও নিতান্ত চুপ করে বসে ছিলেন না। তার দরখাস্ত শেষ পর্যন্ত কোর্ট অফ ডাইরেক্টরের কাছে পৌঁছায় এবং লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৭ সালে লেখেন যে, বিশেষ ঘটনা হিসেবে তার প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত।[৮] তার দরখাস্তের মূল বক্তব্য ছিলো এই যে, রাজার কাছ থেকে তার বকেয়া খাজনা মওকুফ করিয়ে নেয়ার জন্য সরকার প্রভাব বিস্তার করুন; কিন্তু এই কাজ করতে এমন কি স্বেচ্ছাচারী সরকারও সম্ভবত দ্বিধাবোধ করতেন। অবশেষে ১৭৯০ সালে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছেন বলে উল্লেখ করে শেষবারের মতো সাহায্যের আবেদন করেন। তিনি জানান, তিনি বেশি হারের খাজনায় জমি ইজারা নেন; টাকা ধার করে জঙ্গল সাফ করেন; বন্যায় তার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে; চার বছর যাবৎ রেশম কারখানা চালু রয়েছে; কিন্তু এখানো মুনাফা শুরু হয়নি; গত বছর (১৭৮৯) তিনি তার মোট দেনার মধ্যে মাত্র দু'শ' পাউন্ড পরিশোধ করেছেন; কিন্তু এ বছর (১৭৯০) তার আর কোনোমতেই চালানোর উপায় নেই। 'দশ বছর আগে আমি বাড়ি ছেড়েছি; এই পাঁচ বছরের মধ্যে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিনি, এখানেই নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছি; বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনো আশা দেখতে পাচ্ছিনে; আর কোনোমতে প্রাণে বেঁচে থাকার সঙ্গতি ছাড়া আজ আমার কিছুই নেই।'[৯]

তার বাধা-বিপত্তি

আমাদের প্রথম ভারতীয় বাণিজ্যের লটারিতে যারা প্রাইজ পেতেন, কেবলমাত্র তারাই ইংরেজ সমাজে মেলামেশা করতেন। প্রাচীনকালে বণিক হয়ে ভারতে গেলেই সৌভাগ্যের দরজা খুলে যেতো বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার চেয়ে অসত্য বোধ হয় আর কিছুই হতে পারে না। যারা প্রাইজ পেতো না, তারা ভারতের চমকপ্রদ কাহিনী বলার জন্য কখনোই বাড়ি ফিরে আসতো না। নথিপত্রে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতেই মি. ফ্রুশার্ডের মতো ব্যর্থ ফটকাবাজারির সন্ধান পাওয়া যায়; সুদ, পীড়া, গরম ও ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে হয়েছে; স্বদেশবাসীকে সরকারি মহল থেকে একঘরে হয়ে থাকতে হয়েছে এবং যে সকল অপরিহার্য বিলাসদ্রব্য শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীর ভারতে অবস্থান সহনযোগ্য করে তোলে, তার একটিও তারা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি।

---

৮. কোর্ট অফ ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত বঙ্গীয় কাউন্সিলের পত্র; ২৭শে জুলাই, ১৭৮৭; ৩৪ অনুচ্ছেদ। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

৯. রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনারেবল চার্লস স্টুয়ার্ট ও সদস্যদের নিকট প্রেরিত পত্র; ৪ঠা জুন, ১৭৯০। বীরভূম রেজিনিউ রেকর্ডস।

জেলা অফিসাররা এবং বিশেষত মি. কিটিং রেশম কেন্দ্রের এই হতভাগ্য সুপারিনটেনডেন্টের কাজে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতেন। আর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে নাছোড় দুষ্টগ্রহ বলে মনে করতেন এবং সেভাবেই তার সঙ্গে ব্যবহার করতেন। লর্ড কর্নওয়ালিস অবশেষে দেখলেন যে, ফ্রুশার্ডের কাছ থেকে কোম্পানি যে সুবিধে ভোগ করছে, তাও শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই ১৭৯১ সালে তিনি তার সমস্ত পুরনো বকেয়া দেনা মওকুফ করে দেয়ার এবং ভবিষ্যতের জন্য তার খাজনা কমিয়ে অর্ধেকের মতো করে দেয়ার হুকুম দেন। ফ্রুশার্ডের এই অর্ধেক খাজনা দেয়ার সঙ্গতি নেই দেখে তিনি আরও হুকুম দেন যে, রাজার কাছ থেকে আদায়যোগ্য রাজস্ব থেকে রাজাকে দেয় ফ্রুশার্ডের খাজনার পরিমাণ বাদ দিয়ে কালেক্টর প্রতিবছর কেবলমাত্র অবশিষ্ট পরিমাণ রাজস্বই রাজার কাছ থেকে আদায় করবেন।[১০] কর্নওয়ালিসের এই আদেশের পেছনে কেবলমাত্র উদারতাই নয়, স্বার্থবুদ্ধিই ছিলো। কারণ দেখা গেছে যে, কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের জৌলুসপূর্ণ প্রক্রিয়ার চেয়ে এজেন্সি প্রথা থেকেই কোম্পানির বেশি মুনাফা হয়। এজেন্টরা অংশত নিজেদের টাকা এবং অংশত বাণিজ্য বোর্ডের কাছ থেকে পাওয়া ঋণের টাকায় ব্যবসা করে; ফলে কোম্পানির কোনোরকম ঝুঁকি থাকে না। ব্যবসা মন্দা হলে এজেন্টই লোকসান খায়, কোম্পানির কিছু হয় না। এজেন্টের কারখানাও তার নিজের টাকায় তৈরি হয়। অতএব, সে যদি কখনো কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কোম্পানি তার কারখানা বিক্রি করেই নিজেদের লোকসান পুষিয়ে নিতে পারে।

তার সাফল্য

এভাবে অতিরিক্ত খাজনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে মি. ফ্রুশার্ড বীরভূমের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই একজন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। একমাত্র কোম্পানির পক্ষ থেকেই তিনি বছরে ১৫ হাজার পাউন্ড[১১] খরচ করতেন এবং কারবারে নিয়োজিত তার নিজের টাকার পরিমাণও নিতান্ত কম ছিলো না, কারণ তখন আর তার ঋণ পাওয়ার কোনো অসুবিধাই ছিলো না। মি. ফ্রুশার্ডের অধস্তন কর্মচারীরা অনেক বাড়িয়ে বললেও উর্ধ্বতন সরকারি মহলেও তার প্রভাব নিতান্ত কম ছিলো না; ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে ফেললেন। কালেক্টরের এক্তিয়ারকার্য মোর নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্তই বিস্তৃত ছিলো। তার ওপাশে যা ছিলো তা হচ্ছে পোড়ো জমি আর জঙ্গল; লোকসংখ্যাও সেখানে অনেক কম এবং লোকালয়গুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; ফলে তারা নিজেদের চেষ্টাতেই কোনোমতে আত্মরক্ষা করতো। সরকারি নিরুৎসাহ সত্ত্বেও এই উপেক্ষিত এলাকায় একজন অধ্যবসায়ী ইংরেজ বণিকের উপস্থিতি স্বভাবতই সর্বত্র অনুভূত হতে লাগলো।

১০. রাজস্ব বোর্ডের ১৭৯১ সালের ১৮ই জুলাইয়ের পত্রের সাথে এই হুকুম প্রেরিত হয়; পূর্ববর্তী, কতিপয় চিঠিপত্রেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

১১. ট্রেজারি ড্রাফটে বর্ণিত বিভিন্ন পরিমাণ যোগ করে এই সংখ্যা পাওয়া গেছে। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

কিছুদিনের মধ্যেই মি. ফ্রুশার্ড স্থানীয় অধিবাসীদের ম্যাজিস্ট্রেট ও জজে পরিণত হলেন; তিনি ডাকাত ধরতেন, গ্রাম থেকে বাঘ তাড়াতেন এবং জঙ্গলের কবল থেকে উদ্ধার করে বিপুল পরিমাণ জমি আবাদযোগ্য করতেন।

বলাবাহুল্য মি. ফ্রুশার্ডের এই প্রাধান্য মি. কিটিংয়ের চক্ষুশূল ছিলো। জেলার মধ্যে অবস্থানকারী কোনো বেসরকারি ইংরেজকে তিনি বিপজ্জনক জীব বলে মনে করতেন। মি. ফ্রুশার্ডের যখন দুর্দিন ছিলো, তখন তিনি তার উন্নতি রোধের জন্য সুপরিকল্পিত উপায়ে চেষ্টা করেছেন এবং এখন যখন তার সুদিন এসেছে, তখন তিনি সমস্ত দিক থেকে তার জীবন দুর্বিসহ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। কাগজপত্র থেকে দেখা যায় যে, জেলা সদর থেকে তাকে তাঁতিপল্লী পাহারা দেয়ার জন্য সেনাদল পাঠানোর আদেশ দিতে পারতেন; কিন্তু মি. ফ্রুশার্ড যে সকল ডাকাত ধরে তার কারখানায় আটক করে রাখতেন, তাদের শিউড়ি পাঠানোর জন্য কয়েকজন সেপাই চাওয়া ছাড়া আর কিছু চাইতে সাহস করতেন না।[১২] তাছাড়া, মি. চিপকে জমি কিনে ও তাতে নিজে আবাদ করে কাঁচামাল যোগাড় করতে হতো না; সরকারি ক্ষমতাবলে তিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারে চাষীদের যেকোনো ফসলের আবাদ করতে বাধ্য করতে পারতেন; কিন্তু মি. ফ্রুশার্ডকে মজুরের সাহায্যে নিজের জমিতে গুটিপোকার চাষ (নিজ-আবাদ) করতে হতো এবং তখনকার দিনে এভাবে আবাদ করা ব্যয় বহুল ও ঝামেলাপূর্ণ ছিলো।

মি. ফ্রুশার্ড বিচারের কাজ শুরু করায় মি. কিটিংয়ের সঙ্গে তার মনোমালিন্য আরও বেড়ে যায়। উভয়ে উভয়ের প্রতি গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকেন। ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত রাজস্ব বোর্ড পর্যন্ত গড়ায়; কিন্তু তারা এ বিবাদের ফয়সালা করতে পারেন না, সার্কিট কোর্টের পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হয় না এবং কিঞ্চিৎ পারস্পরিক সৌজন্য যে বিবাদকে গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত করতে পারতো, সেই বিবাদ অবশেষে খোদ গভর্নর জেনারেলের কাছে পৌঁছায়। মি. ফ্রুশার্ড অভিযোগ করেন, 'বছরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মওসুমে" কালেক্টর তার লোকজনদের নানা ছুতোনাতায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান এবং এভাবে কোম্পানির চুক্তি মোতাবেক কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব করে তোলেন।[১৩] পক্ষান্তরে কালেক্টর পালটা অভিযোগ করেন, মি. ফ্রুশার্ড 'আমার আদালতের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করছেন' এবং তার কারখানাকে পলাতক আসামিদের আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ের কাগজপত্রে এই দুই বিবদমান ইংরেজের কাহিনী এ পর্যন্তই পাওয়া যায়। তবে তারা যে শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন, তা বোধ করি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে; সেই আমলের ইংরেজ ভাগ্যান্বেষী ও সাধারণ ইংরেজ সরকারি কর্মচারীর তারা যোগ্য প্রতিনিধিই বটে।

ভাগ্যান্বেষীর আইনগত মর্যাদা

এ প্রসঙ্গে আমি বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজ বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্য আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই। চার বছর যাবৎ দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে গবেষণা

---

১২. সামরিক চিঠিপত্র; ২৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।
১৩. সার্কিট কোর্টের জজদের নিকট প্রেরিত পত্র; ১৭ই মে, ১৭৯১। বীরভূম রেভিনিউ রেকর্ডস।

করার সময় এ জাতীয় একটি বিবরণের জন্য যে মাল-মসলা আমার কাছে জমা হয়েছে, তার পরিমাণ স্বভাবতই বিপুল; কিন্তু আমি সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করেছি যে, এই বইখানির বিষয়বস্তু স্থানীয় জনসাধারণ, সরকারি হোক আর বেসরকারিই হোক, ভারতের ইংরেজরা নয়। অতএব এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যে সকল ইংরেজ বাংলাদেশে প্রথম ব্যক্তিগত ভিত্তিতে ব্যবসা শুরু করেন, তাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক ছিলো। প্রথম, 'অনধিকার চর্চাকারীরা'। অর্থাৎ যারা কোম্পানির নিষেধ অমান্য করে চলে আসতো এবং আশা করতো যে, তদবির করে বা ঘুস দিয়ে বা কাকুতি-মিনতি করে কোনোমতে থাকার অনুমতি সংগ্রহ করা যাবে এবং দ্বিতীয়, 'ভাগ্যান্বেষীরা', অর্থাৎ যারা ইংল্যান্ড থেকে রওনা হওয়ার আগে কোম্পানির অনুমতি নিয়ে আসতো—এই শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষিত ও অধ্যবসায়ী ছিলেন এবং অনেকেই যথেষ্ট মূলধন নিয়ে আসতেন। স্থানীয় বা জেলা অফিসারদের কাছে এই দুই শ্রেণীর লোকই রবাহূত ছিলো এবং এজন্য দু'টি সঙ্গত কারণও ছিলো। ইংরেজদের ওপর জেলা আদালতের কোনো এক্তিয়ার ছিলো না; কোলকাতা থেকে মফস্বল এলাকায় রওনা হওয়ার আগে অবশ্য প্রত্যেক 'ভাগ্যান্বেষী'কেই মুচলেকা সম্পাদন করতে হতো যে, আদালতের এক্তিয়ার তার ওপর প্রযোজ্য হবে; কিন্তু কার্যত দেখা যেতো যে, আদালতের পক্ষে তার ওপর এক্তিয়ার প্রয়োগ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। 'ভাগ্যান্বেষী' কোম্পানির ঘরে মাল সরবরাহ করার চুক্তি সম্পাদন করে তার কারখানাকে ক্রোকমুক্ত করে রাখতে পারতো এবং নিজে জেলার সীমানার বাইরে বা কোলকাতায় বাস করে গ্রেপ্তার এড়াতে পারতো। মি. ফ্রুশার্ড ঠিক এ কাণ্ডই করেছিলেন এবং রাজা তাকে প্রেসিডেন্সি আদালতের মারফত ধরার কথা একবারও চিন্তা করেছিলেন বলে মনে হয় না; কারণ ব্যয়বহুল হওয়া ছাড়াও দেশীয় লোকদের কাছে আদালতের প্রক্রিয়া একটি রহস্যময় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। ব্রিটিশ বাসিন্দাদের সম্পর্কে আপত্তির দ্বিতীয় কারণ ছিলো এই যে, দেশীয় লোকেরা যাতে খুশি হতো তারা তার চেয়ে অনেক বেশি উঁচুদরের শাসন ব্যবস্থা দাবি করতো এবং নিজ নিজ ব্যাপারে তা আদায়ও করে নিতো। অথচ কোম্পানি তখন এই উঁচুদরের শাসন দিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলো না। এমন কি এখনো যে সকল এলাকায় প্রধানত ইংরেজরা বাস করে, সেই সকল এলাকায় সেরা কর্মচারীদের নিয়োগ করতে হয় এবং যে সকল কালেক্টর সুনাম-দুর্নাম কোনোটিই না কুড়িয়ে বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশের কোনো জেলা শাসন করেছে, ইংরেজপ্রধান এলাকায় বদলির কথা শুনলে তারা হই-হল্লা করে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

কিন্তু বাংলাদেশে এখন ঠিক এজন্যই ইংরেজ বাসিন্দাদের অভ্যর্থনা জানানো দরকার। তারা সরকারকে ভালোভাবে কাজ করতে বাধ্য করে থাকে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও যে গোড়া থেকেই এদেশের লোকদের জন্য উপকার হয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। জেলার মধ্যে মি. চিপের মতো একজন লোকের উপস্থিতির ফলে দৈনন্দিন শাসনকার্যের নিতান্ত কম ত্রুটি সংশোধন হয়নি এবং তার কারবারের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয়তার ফলে সকল প্রকার সম্পত্তির তৎকালীন সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার ওপর কিছু বিধি-নিষেধ অন্তত আরোপিত

হয়েছিলো। কোম্পানির বাণিজ্যের আরেকটি বাস্তব উপকারিতা ছিলো এই যে, রাজস্বের খুব কম অংশই তখন জেলার বাইরে যেতে পারতো। মুসলমান আমলে সমস্ত রাজস্বই মুর্শিদাবাদে চলে যেতো; কিন্তু কোম্পানির আমলে জেলার প্রাধান উৎপন্ন দ্রব্য কেনার জন্য রাজস্বের তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগই সরাসরি স্থানীয় বাজারে ফিরে যেতো। পরে ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসা কোম্পানির ব্যবসার জায়গা দখল করে এবং এ সময় সমস্ত উদ্বৃত্ত রাজস্ব সরকারি খরচের জন্য কোলকাতায় চলে গেলেও নীলকর ও অন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে ক্রমাগত টাকা খরচ করতে থাকে।

ব্রিটিশ বাণিজ্য, ১৭৮৯ ও ১৮৬৬

মি. চিপ যে উপকার ব্যাপক ভিত্তিতে করেছিলেন, মি. ফ্রুশার্ড সীমাবদ্ধ আকারে তারই পুনরাবৃত্তি করেন। তার কারখানার চারদিকে তিনি বহু জমি আবাদি করে তোলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বীরভূমের উত্তর-পূর্ব এলাকার জংলি অঞ্চলের সর্বত্র ছোটো ছোটো রেশম কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইংরেজ চরিত্রের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—তিনি এমন আশাবাদী যে, প্রথমে হিসাব-নিকাশ না করেই কাজে নেমে পড়েন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এমন সংকীর্ণমনা যে, কাজ করার দেশীয় প্রক্রিয়ার ওপর আদৌ নির্ভর করতে চান না; তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি অভিজ্ঞ ইংরেজ নীলকরের মতোই খানু হয়ে ওঠেন এবং বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার ইংরেজদের মতো স্থানীয় লোকদের প্রতি পিতৃসুলভ স্নেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন। তার কারখানা কয়েকবার ভেঙে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এবং এখন তা বীরভূমের সবচেয়ে বড়ো ও জৌলুসময় সওদাগরী ইমারত। মোর নদীর তীরে উঁচু জায়গায় অবস্থিত এই ইমারতের চারদিকে উঁচু ও বহু কোণবিশিষ্ট দেয়াল রয়েছে; নদীর ধারে একটি দীর্ঘ স্থান কংক্রিটের সাহায্যে বেঁধে দিয়ে ভাঙন রোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং দেয়ালের মধ্যে যে জায়গা আছে, তার ওপর একটি ছোটোখাটো শহর অনায়াসে বসানো যেতে পারে। ইমারতের পাঠাগারের যেটুকু এখন অবশিষ্ট আছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে, এখানকার বাসিন্দারা বেশ মানসিক চর্চা করতেন। গিবন রচিত আটচল্লিশ পৃষ্ঠার একখানি 'এডিসিও প্রিনসেপ্‌স' এখনো রয়েছে। এই বই খুলে নিঃসঙ্গ 'ভাগ্যান্বেষী' সম্ভবত কালেক্টরের সঙ্গে বিবাদ, বা তুঁত ক্ষেতে বন্যার আশঙ্কার কথা ভুলে থাকতে চেষ্টা করতেন। ইমারতের বর্তমান বাসিন্দারা কেবলমাত্র গুটি থেকে রেশমতন্তু ছাড়ানোর কাজেই দুই হাজার চার শ লোক নিয়োগ করে থাকেন এবং এই সঙ্গে যদি অসংখ্য তুঁতচাষী, গুটিপোকা চাষী ও তাদের পরিবারের কথা ধরা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, কারখানাটি থেকে কমপক্ষে পনেরো হাজার লোকের জীবিকার সংস্থান হয়। এই কারখানায় বছরে গড়পড়তা ৭২ হাজার পাউন্ড, অর্থাৎ কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের আমলের তুলনায় অনেক বেশি মূলধন নিয়োগ করা হয় এবং সমগ্র জেলায় প্রতি বছর যে রেশম উৎপন্ন হয়, তার মোট দাম এক লক্ষ ষাট হাজারে পাউন্ডেরও বেশি।[১৪] উল্লেখযোগ্য যে, রেশম ছাড়াও এই জেলায় অন্যান্য

১৪. প্রতিষ্ঠানের রেসিডেন্ট পার্টনার কর্তৃক প্রদত্ত আমার প্রশ্নের জবাব। একজন কৃষক ৮ পাউন্ডে সারা বছর স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

অর্থকরী ফসলও উৎপন্ন হয়ে থাকে। মোর নদীর তীরে মি. ফ্রুশার্ডের উত্তরাধিকারীরা ছাড়াও অজয় নদীর তীরে মি. চিপের উত্তরাধিকারীরা রয়েছেন—অজয়ের উজান-ভাটিতে তাদের বহু ছোটো-বড়ো কারখানা রয়েছে। রেশম ছাড়াও তারা নীল, লাক্ষা, লোহা, সুতা, তিষি প্রভৃতির কারবার করে থাকেন এবং এই সকল দ্রব্য এখানে বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া, এই জেলায় এতো বেশি ধান উৎপন্ন হয় যে, প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ ধান অন্যত্র চালান হওয়ার পরও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে। এই ধান-চালের কারবারটি এখানো একচেটিয়েভাবে দেশীয় লোকদের হাতে রয়েছে। প্রধানত এই ব্রিটিশ মূলধনের অবিরাম প্রবাহের ফলেই ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার কর্মসংস্থান হয়েছে এবং বলাবাহুল্য, দেহ এবং সম্পত্তির দীর্ঘ ও অব্যাহত নিরাপত্তার ফলেই লোকসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। পল্লীবাংলা আজ আর জীবিকার জন্য কেবলমাত্র জমির ওপর নির্ভরশীল নয় এবং জমির পরিমাণ সমান থেকে লোকসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গেলেও জীবিকার জন্য তাদের আর ভাবতে হবে না। কোম্পানির কর্মচারীরা একসময় ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়কে সন্দেহের চোখে দেখতেন; কিন্তু আজ একথা বলা সম্ভবত অন্যায় হবে না যে, এই ব্যবসায়ের ফলেই জীবন সংগ্রামের তীব্রতা না বাড়িয়েই ভারতে সুশাসন কায়েম করা সম্ভব হয়েছে।

অতএব, কোম্পানি যে প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলো, সে সম্পর্কে কোনো অভিমত গঠন করতে হলে কোম্পানি তাদের দায়িত্ব বলতে কি বুঝেছিলো তা মনে রাখা প্রয়োজন। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত কোম্পানির প্রতিশ্রুত ও নির্ধারিত প্রধান কাজ ছিলো ব্যবসা এবং এ কাজ তারা ভালোভাবেই সম্পাদন করেছিলো। ব্যবসার অর্থ সংগ্রহের জন্য তাদের দ্বিতীয় ও গৌণ কাজ ছিলো রাজস্ব আদায় এবং এই কাজ সম্পাদনেও তারা দক্ষতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দেয়। তাদের তৃতীয় কর্তব্য ছিলো বিচার পরিচালনা করা; কিন্তু সাত বছর পর (১৭৬৫—৭২) তারা প্রথম বুঝতে পারে যে, এ দায়িত্ব আদৌ তাদের এবং আরও একুশ বছর যাবৎ (১৭৭২-৯৩) তাদের পল্লী অঞ্চলের আদালতগুলো জনসাধারণকে সুবিচার দিতে ব্যর্থ হয়। কারণ চুক্তি অনুসারেই হোক, আর কার্যক্ষেত্রেই হোক, ১৭৯০ সাল পর্যন্ত ফৌজদারি প্রশাসন ও পুলিশ ব্যবস্থার ওপর তাদের কোনো হাত ছিলো না।

সপ্তম অধ্যায়

পরিসমাপ্তি

সরকারের ক্রমবিকাশ

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের পল্লী সমাজের উপরিভাগে যে অবস্থা বিদ্যমান ছিলো, তা আমি পর্যালোচনা করেছি এবং এখানেই এই পুস্তকের পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। আমার দেশবাসীর মধ্যে যে বিপুলসংখ্যক বীরপূজারী বিশ্বাস করেন যে, দু'জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি—লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস সহসা একদিন কোম্পানিকে সওদাগরী প্রতিষ্ঠান থেকে সার্বভৌম শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন, তাদের কাছে এই চিত্র বোধ করি খুব মনোহর বলে মনে হবে না। ক্লাইভ সত্যিই কোম্পানির জন্য সার্বভৌম শক্তি জয় করেছিলেন; কিন্তু তিনি যে কি জয় করেছেন, তা তিনিও জানতেন না, তার প্রভুরাও জানতেন না। ওয়ারেন হেস্টিংস সাম্রাজ্য সম্পর্কে গভীরতর দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, শাসিত ও শাসক এবং আইন প্রণয়নের দিক থেকে তার শাসনের প্রথম বছরগুলো ভারতের ব্রিটিশ জাতির ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অংশ; কিন্তু তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা কাজে পরিণত করার ক্ষমতা তার ছিলো না এবং ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত সেই আমলের কাগজপত্রে শুধু সাধু সংকল্পেরই বিবরণ পাওয়া যায়—প্রকৃত সংস্কারের নয়; কল্পনা রাজ্য আছে, কল্পনারও অভাব নেই; কিন্তু তা কখনো কাজে পরিণত হয়নি; তাই আসলে যে তিনি কি সম্পাদন করেছিলেন, এই কাগজপত্র থেকে তা বোঝা যায় না। অথচ এগুলোই হচ্ছে একমাত্র কাগজপত্র এবং এযাবৎকাল ভারতের যতো ইতিহাস লেখা হয়েছে, তার সবগুলোর মাল-মসলাই এখান থেকেই নেয়া হয়েছে। লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস উভয়ই ক্ষুদ্র সঙ্গতির সাহায্যে বৃহৎ সাফল্য লাভ করেছিলেন; কিন্তু ক্লাইভের চেয়ে হেস্টিংসের ক্ষেত্রে সঙ্গতি ও সাফল্যের মধ্যকার আনুপাতিক পার্থক্য অনেক বেশি ছিলো; কেননা, বহু সেনাপতিই মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে বিপুল বাহিনী পর্যুদস্ত করেছেন; কিন্তু বিজয়ীদের ইতিহাসে একমাত্র হেস্টিংসই কয়েকজন মাত্র সওদাগরী কেরানি নিয়ে তিন কোটি লোককে শাসনের কাজে সততার সঙ্গে হাত দিয়েছেন।

শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদ হওয়ার জন্য যে সদগুণাবলি ও সৌভাগ্যের অবদান প্রয়োজন, লর্ড কর্নওয়ালিসের মধ্যে তার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিলো। ব্যক্তিগত মর্যাদার বলে কোম্পানির ওপর তিনি কাজ করার ব্যাপারে নিজের শর্ত আরোপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আইনত ও কার্যত স্থানীয় ব্যাপারে সর্বভৌম ক্ষমতা তার ওপর অপর্ণ না করা পর্যন্ত কোম্পানির কোনো কথাতেই তিনি রাজি হননি। ওয়ারেন হেস্টিংস যদি এই ক্ষমতা লাভ করতেন, তাহলে ১৭৯০-৯৩ সালে যে শাসন সংস্কার হয়েছিলো, তা আরও বিশ বছর আগেই সম্পাদিত হতো; কিন্তু অধিকতর ক্ষমতা ছাড়াও লর্ড কর্নওয়ালিস তার অধীনে কাজ করার জন্য একদল সুযোগ্য রাষ্ট্রবিদ পেয়েছিলেন এবং যখন তারা পারদর্শী হয়ে উঠেছিলো সে সময় তাকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়। ইংল্যান্ডে রাউস এবং বাংলাদেশে শোর ছিলেন এই পারদর্শী রাষ্ট্রবিদদের মধ্যে অন্যতম। ভারতে তখন যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা হয়েছিলো, সে সম্পর্কে আলোচনা করা আমার এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত নয়; এমন কি যারা মনে করেন যে, পরবর্তী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস মাত্র না দিয়ে কেবলমাত্র প্রাচীন অন্ধকার যুগের বিবরণ দেয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ারও আমি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। বাংলাদেশের শাসনভার আমাদের হাতে আসার সময় সেখানকার পল্লী অঞ্চলে যে অবস্থা বিরাজ করছিলো, আমি তার বিবরণ দিয়েছি এবং অধিকাংশ শিক্ষিত ইংরেজই সেখানকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন; অতএব এই দুই আমলের মধ্যকার পার্থক্য তারা অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। ভবিষ্যতে কখনো এই পার্থক্যের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে পারলে আমি আনন্দিত হবো; তবে ইতোমধ্যে যিনি ব্রিটিশ শাসনের সুফল সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন এবং বিশেষত তিনি যদি ভারতীয় হন, তাহলে আমি শুধু বলবো, নিজের চারপাশে তাকালেই বুঝতে পারবেন।

স্বত্ব এখনো অনিশ্চিত

কারণ, ইতোমধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের প্রশস্তি গাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি কাজ আমার হাতে রয়েছে। শাসিত জনসাধারণের অধিকার ও স্বত্ব এখনও অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত রয়েছে। আমরা সচেতনভাবে দেশীয় রীতি-রেওয়াজ অনুসারে শাসনের চেষ্টা করছি; কিন্তু এই নীতি-রেওয়াজগুলো যে আসলে কি, তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। ১৮৫৯ সালে বাংলাদেশের জমিজমা সম্পর্কিত সমগ্র আইনের সংস্কারসাধন করা হয় ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো কার্যকরী করা হয়; কিন্তু তার ফলে সমগ্র প্রদেশটি মামলা-মোকদ্দমার গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়। পাঁচ বছরকাল চালু থাকার পর ১৮৬৫ সালে এই নয়া পদ্ধতির ধারা ও প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের পনেরো জন বিচারপতি একত্রে মিলিত হন; কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে তারা দেখতে পেলেন যে, গূঢ় ও দুর্বোধ্য ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই।

শেষ পর্যন্ত তারা যে অভিমত প্রকাশ করেন, তার মধ্যে কয়েকটি অভিমত লিখিত আইন না হয়ে পুরাতত্ত্বের আলোচনায় পর্যবসিত হয় এবং তাদের সিদ্ধান্ত যতোই উপকারি ও সঙ্গত বলে প্রমাণিত হোক না কেন, পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা যখন আইনের বই থেকে অনির্ধারিত ইতিহাসের সীমানায় প্রবেশ করে, তখন বিচারকদের আর তার মধ্যে প্রবেশ করার উপায় থাকে না। স্বত্ব নির্ণয়ের কাজ তাই তাদের হাতেই ছেড়ে দিতে হয়।

কয়েকজন সুযোগ্য ব্যক্তি ইতোমধ্যেই এই কাজ করার চেষ্টা করেছেন। একদল প্রাচীন হিন্দুবিধির মধ্য থেকে জনসাধারণের স্বত্ব আবিষ্কারের আশা প্রকাশ করেছেন; কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান ভূমি আইনের সঙ্গে মনু ও যাজ্ঞবল্কের বিধির যে সম্পর্ক, তুরস্কের বর্তমান ভূমি আইনের সঙ্গে কোডেক্স থিওডোসিয়ানাসেরও প্রায় সেই সম্পর্কই বিদ্যমান। অন্য দল বলে, বাংলাদেশ মূলত হিন্দুপ্রধান হলেও দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলমান শাসনাধীনে ছিলো; অতএব আরবীয় আইনবিদদের রচনার মধ্যেই বাংলাদেশের প্রজাস্বত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু এই শ্রেণীর পণ্ডিতরা ভুলে যান যে, নিম্নবাংলায় মুসলমানদের বিজয় কখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি; বাংলার অধিকাংশ রাজাই মুসলমানদের করদ রাজা ছিলেন, প্রজা ছিলেন না এবং মুসলিম সার্বভৌমত্বের বাইরে কোরআন, হেদায়া অথবা ফতোয়ায়ে আলমগিরির মতো পুস্তকের নীতিগুলোতেও তেমন প্রচলিত ছিলো না। আমাদের শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বছরে পল্লী অঞ্চলের অফিসাররা যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যেই দেশের প্রকৃত ভূমি আইনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

স্বত্বের সংখ্যাধিক্য

পরবর্তী খণ্ডে আমি তাই পল্লী অঞ্চলের দলিলপত্র থেকে জমির যারা মালিক ছিলো, অথবা জমি যারা চাষ করতো, তাদের স্বত্ব ও আইনসম্মত মর্যাদা নির্ণয়ের চেষ্টা করবো। যে সকল প্রাচীন বংশকে আমরা জমির মালিক হিসেবে দেখতে পেয়েছি, তাদের ইতিহাস থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। কয়েক পরিবারের সিন্দুক বা কয়েকটি জেলার নথিপত্র থেকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যাবে না; প্রদেশের সমস্ত জেলার এবং যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক প্রাচীন পরিবারের দলিল-দস্তাবেজ থেকেই এ ইতিহাস সংগ্রহ করতে হবে। উল্লেখযোগ্য যে, আমার নিজস্ব গবেষণা ছাড়াও বাংলাদেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক সম্প্রতি প্রাচীন পরিবারগুলো ইতিহাস সংগ্রহের কাজে হাত দিয়েছেন; অতএব কিছুদিনের মধ্যেই ভারতীয় ভূমিস্বত্ব ও রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। আমি নিজে যে অনুসন্ধান করেছি তাতে দেখা যায়, জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অসংখ্য রকমের স্বত্ব রয়েছে। কয়েকটি জেলার জমিদাররা মুসলিম রাজপ্রতিনিধির অধীনে

থেকেও প্রায় স্বাধীন ছিলেন এবং মুসলিম রাজপ্রতিনিধি প্রায়ই অথবা আদৌ তাদের কাছে হস্তক্ষেপ করতেন না; অন্যান্য জেলার জমিদাররা খাজনা আদায়কারী কর্মচারী ছিলেন মাত্র। অপর কয়েকটি জেলায় কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার করা হতো এবং গ্রাম প্রথা একটি সুস্পষ্ট প্রভাব হিসেবে বিদ্যমান ছিলো; অন্যান্য জেলায় আবার কৃষকরা ভূমিদাস মাত্র ছিলো এবং পল্লী পুলিশের প্রধান কাজ ছিলো তাদের পলায়ন প্রতিরোধ করা। ভূমি আইন সম্পর্কে লর্ড কর্নওয়ালিসের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যে পরস্পরবিরোধী আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিলো, এটা ছিলো তার আসল রহস্য। 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর প্রকাশিত এক মন্তব্যে কোম্পানির একজন কর্মচারী সে সময় বলেছিলেন যে, জনসাধারণের স্বত্ব এতো অস্পষ্ট যে, 'যোগ্যতম ব্যক্তিদের অনুসন্ধানের পরও তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।'[১] আর একজন বিশেষজ্ঞ বলেন যে, ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে কোম্পানির কোনো দু'জন কর্মচারীই একমত পোষণ করেন না। এই অবস্থার ফলে যে সকল জেলায় জমিদারগণ জমির প্রকৃত মালিক ছিলেন, সে সকল জেলার কালেক্টরগণ অভিযোগ করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের স্বত্ব রহিত হয়েছে এবং তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যে সকল জেলায় মুসলিম পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে প্রাচীন পরিবারগুলো উচ্ছেদ হয়ে গেছে, সে সকল জেলার কালেক্টরগণ বলেন, একশ্রেণীর খাজনা আদায়কারীকে অন্তঃসারশূন্য সম্ভ্রান্ত লোকে পরিণত করার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারের অধিকার ও জনসাধারণের স্বত্ব বিসর্জন দিয়েছেন।

একবার আমি অসুস্থতাবশত ছুটি নিয়ে ভারত থেকে তুরস্ক ও দানিউব প্রদেশগুলো সফর করতে যাই এবং সে সুযোগে আমি ভারত এবং বিশেষত বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে ইউরোপের মুসলিম ভূমি ব্যবস্থার ব্যাপারে আমি বাংলাদেশের মতোই অনিশ্চয়তা দেখতে পাই। ইউরোপেই হোক, আর ভারতেই হোক, মুসলমানরা কোনো একক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে বা কোনো সুসংবদ্ধ জাতি সৃষ্টি করতে পারেনি। এ সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেয়েছিলাম, তার মধ্যে একমাত্র গ্রিসের তুর্কি উজির ফতেইয়ারিস বের অভিমতের মধ্যেই কিঞ্চিৎ গভীর উপলব্ধির নিদর্শন ছিলো। যে স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞ রাষ্ট্রবিদের ওপর তুরস্কের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল, ফতেইয়ারিস বে তাদের মধ্যে অন্যতম; কিন্তু তথাপি তার বিবরণের সঙ্গে মফস্বল এলাকার প্রকৃত পরিস্থিতির কোনো সামঞ্জস্য আমি খুঁজে পাইনি। ওয়ালাচির জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মতে বড়ো বড়ো কৃষকই হচ্ছে পল্লী ব্যবস্থার মূলকেন্দ্র, অথচ বড়ো বড়ো শহরের সরকারি মহল ও কনস্টান্টিনোপলের সংবাদপত্রগুলো বলে—সরকারই সবকিছু।

সমাপ্তি কথা

এই পুস্তকে আমি বাঙালিদের জাতিগত উপাদান এবং ব্রিটিশ শাসন কায়েমের সময় তাদের অবস্থা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। আমার বিবরণে ব্রিটিশ সরকারের সুনাম বা

১. 'ক্যালকাটা গেজেট', ৩রা জুন, ১৭৯০।

দুর্নামের কোনো ভূমিকা নেই এবং আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে, আমার বিবরণে যে শাসকের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে, সেই মি. কিটিং এমন একটি সাধারণ শ্রেণীর লোক ছিলেন যিনি সুনাম বা দুর্নামের কোনোটিরই উদ্রেক করেন না। তিনি তার নির্ধারিত কাজ করতেন এবং নির্ধারিত বেতন পেতেন; কিন্তু যেভাবে কর্তব্য উপলব্ধি করা হলে ভারতের একজন ইংরেজ কর্মচারীর দীর্ঘ উত্তপ্ত চাকরি-জীবন মর্যাদা ও বিষণ্ণতা বোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, সেভাবে স্বীয় দায়িত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার ছিলো না। আমার মনে হয়, আমাদের পূর্ববর্তী শাসক মুসলমানদের সম্পর্কে আমি অনেক কঠোর মন্তব্য করেছি; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, আমি কেবলমাত্র তাদের অথর্বতা ও দুর্বলতার সর্বশেষ আমল সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। দেশীয় প্রাচীন পরিবারগুলোই ছিলো জনসাধারণের প্রকৃত নেতা এবং তাদের সম্পর্কে আমি এখনো আলোচনা করিনি। যে আমলের মধ্যে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ, সেই অন্ধকার আমল থেকে কেউ যদি তাদের বিষয় বিচার করেন, তাহলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে—যেমন অবিচার করা হবে সমগ্র জনসংখ্যার ওপর, যদি কেউ মুসলমানদের অত্যাচার হীনবল বাঙালি সম্পর্কে লর্ড মেকলের নিখুঁত বিবরণকে হিন্দুদের স্বাভাবিক ও স্থায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন।

পরিশিষ্ট

ক পরিশিষ্ট

ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক বর্ণিত ১৭৭২ সালের বাংলাদেশ

ইস্ট ইন্ডিজে ব্যবসায়রত ইংল্যান্ডের বণিকদের অনারেবল ইউনাইটেড কোম্পানি বিষয়ক অনারেবল কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স সমীপেষু—তারিখ, ফোর্ট উইলিয়াম, ৩রা নভেম্বর, ১৭৭২।

রাজস্ব বিভাগ

শ্রদ্ধেয় জনাব,

কোলব্রুকের গত ১৩ই এপ্রিলের চিঠিতে আমরা ঐ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে আপনাদের রাজস্ব সম্পর্কিত অবস্থার বিবরণ দিয়েছি। ইতোমধ্যে আমরা গত বাংলা সনের আয়-ব্যয়ের হিসেব মিটিয়ে ফেলেছি এবং এই খামের মধ্যে তার একখানা নকলও পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই হিসাব থেকে আপনারা দেখতে পাবেন যে, কিছু বকেয়া দেনা-পাওনা মওকুফ করার পর গত বছর মুর্শিদাবাদ ট্রেজারিতে মোট ১,৫৭,২৬,৫৭৬।।৯২। সিক্কা টাকা সংগৃহীত হয়; অর্থাৎ এ বছর ১২,৪০,৮১২।৯১৫ টাকা কম আদায় হয়েছে। তবে আমরা এই টাকার অধিকাংশই আদায় করতে পারবো বলে আশা করছি। বাংলাদেশের গত কয়েক বছরের আদায়ের সঙ্গে গত বছরের আদায়ের তুলনা করলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন যে, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছি। মুর্শিদাবাদের খাতাপত্রগুলো আমরা পরে জাহাজে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং তা থেকে আপনারা এই সঙ্গে পাঠানো নকলের বিশদ বিবরণ জানতে পারবেন।

আমাদের কাশিমবাজার সার্কিট কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণ রাজস্ব বিষয়ের সদর দফতর প্রেসিডেন্সিতে স্থানান্তর এবং আপনার কার্যের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি আপনাদের গভর্নর ও কাউন্সিলের সরাসরি অধীনে আনার জন্য যে প্রস্তাব করেন, গত ৩০শে আগস্ট আপনাদের কাউন্সিলের এক সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গত মাসের ১৩ তারিখে আমরা একটি রাজস্ব বোর্ড গঠন করি এবং তারপর থেকে প্রদেশের রাজস্ব আদায় ও অভ্যন্তরীণ শাসন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব এই বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ে আমরা এখন থেকে পৃথকভাবে আপনাদের কাছে চিঠি লিখবো।

সম্প্রতি যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা তার পুনরুল্লেখ করছি। আমাদের আগের চিঠিপত্র থেকে এই ব্যবস্থাগুলোর বিষয়ে আপনারা কিছু কিছু অবগত হয়েছেন।

নটিংহামের একখানা চিঠিতে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, আমরা প্রদেশের সর্বত্র চাষ-আবাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও সুনিয়ন্ত্রিত ভিত্তিতে জমি ইজারা দেয়ার সংকল্প করেছি এবং রাজস্ব আদায়ের এই প্রধান পদ্ধতির সঙ্গে আপনারা পুরোপুরি একমত হওয়ায় খুবই আনন্দিত হয়েছি। গত ১৪ই মে রাজস্ব কমিটির সভায় গভীর মনোযোগ ও সঙ্গতিসহকারে আলোচনার পর কয়েকটি জেলায় আমরা এই ব্যবস্থা অনুসারে আপনাদের রাজস্ব আদায়ের সংকল্প গ্রহণ করি। আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্যক্রম এবং ইতোমধ্যে আমরা যে পদ্ধতি উদ্ভাবনে চেষ্টা করেছি, পরিকল্পনাটি তার প্রাথমিক কাঠামো হওয়ায় আপনাদের আশু বিবেচনার জন্য এই খামে আমরা পরিকল্পনার একখানা নকল পাঠিয়ে দিলাম। আমরা যে সকল কারণে এই বিধি গ্রহণ করেছি, নকলে তার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

এ বিষয়ে আর কিছু করার আগে প্রদেশের বর্তমান সঙ্কটকাল সম্পর্কে কতিপয় সাধারণ মন্তব্য করার সম্ভবত অসঙ্গত হবে না।

১৭৭০ সালের গোড়ার দিকে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং সারা বছর যাবৎ অব্যাহত থাকে, তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা আমাদের আগের চিঠিপত্রে আপনাদের নিয়মিতভাবে জানিয়েছি। সকল প্রকার ঘটনা বিন্যাস ও ভাষার কলাকৌশল সংবলিত দীর্ঘ বিবরণের মারফত জনসাধারণকেও এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে এবং তার ফলে সকল প্রকার অনুকম্পা বোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং আপনাদের কর্মচারীদের মধ্যে যাদের মানুষের এই সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু রাজস্বের ব্যাপারে একমাত্র যাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে, তাদের ওপর ছাড়া এই দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া অন্য কোথাও পরিলক্ষিত এবং এমন কি অনুভূতও হয়নি; কারণ প্রদেশের তিন ভাগের অন্তত পক্ষে এক ভাগ লোকের প্রাণহানি ও তার ফলে আবাদ কমে যাওয়া সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের নিট আদায় ১৭৬৮ সালের চেয়েও বেশি হয়। মুর্শিদাবাদ রাজস্ব বোর্ডের গত চার বছরের নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত হিসাব থেকে এই উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে :

বাংলা সন	ইংরেজি সন		মোট আদায়
১১৭৫ ...	১৭৬৮–৬৯ ...		১, ৫২, ৪৪, ৮৫৬।।৪/৪।।
১১৭৬ ...	১৭৬৯–৭০ ...	এই বছর ফসল মারা যায় ও অভাব-অনটন দেখা দেয় এবং তার ফলে পরের বছর দুর্ভিক্ষ হয়...	১, ৩১, ৪৯, ১৪৮।৯৩।।
১১৭৭ ...	১৭৭০–৭১ ...	এই বছর দুর্ভিক্ষ হয় ও লোক মারা যায় ...	১,৪০,০৬,০৩০ ।৯৩।।

১১৭৮ ... ১৭৭১-৭২ : ১,৫৭,২৬,৫৭২৬।। ৯২।
সরকার কোনোমতেই রোধ করতে পারেননি
এ জাতীয় লোকসান
বাদ ... ৩, ৯২, ৯১৫।।৯১২।। } ১,৫২,৩৩,৬৬০।। ৯।।

স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিলো যে, ব্যাপক প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব আদায়ও আনুপাতিক হারে কমে যাবে; কিন্তু তা হয়নি; কারণ, পূর্বনির্ধারিত মান কঠোরতার সঙ্গে বহাল রাখা হয়েছিলো। কি কি প্রক্রিয়ায় যে এই কাজ সম্ভবপর হয়েছে, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন খাত ও দফার বিবরণ দেয়া কঠিন; এমন কি আদায়ের প্রথম দফায় টাকার বদলে যে সকল জিনিসপত্র পাওয়া যায়, তারও বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তবে পূর্ববর্তী বছরগুলোতে আদায় করা রাজস্বের সঙ্গে পরিমাণগত সমতা বজায় থাকার কারণ হিসেবে আমরা এখানে একটিমাত্র করের বিষয় বর্ণনা করবো; মূলত এই কর আদায় করার ফলেই সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। এই করটির নাম 'নাজাই'; নিরেস জাতের জমির প্রত্যেকটি বর্তমান বাসিন্দার কাছ থেকে এই কর আদায় করা হয়; অর্থাৎ যারা গিয়েছেন, বা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তাদের কাছে পাওনা খাজনা তাদের জীবিত প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। এই কর প্রথা হিসেবেও যেমন শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ, আদায়ের ব্যাপারেও তেমনি অত্যাচারমূলক; কিন্তু দেশের প্রাচীন ও সাধারণ রেওয়াজে এ জাতীয় করের অনুমোদন আছে। সরকার এই কর অনুমোদন করেননি; কিন্তু প্রচলিত প্রথার সাধারণ নিয়মেই তা আদায় হয়ে গেছে। সাধারণত যে সকল এলাকায় আবাদ চালু ছিলো, সেই সকল এলাকায় এই করের চাপ তেমন অনুভূত হয়নি এবং আদৌ কোনো আপত্তি শুনা যায়নি, অথবা খুব কম আপত্তিই শুনা গেছে। সঠিক সুবিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হলেও এই ব্যবস্থার মধ্যে ঘাটতি পূরণের একটি উপায় আছে। বাসিন্দাগণ পরস্পরের খাজনার জন্য দায়ী হওয়ায় গ্রাম ত্যাগের ফলে রাজস্ব ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং কোনো নিচাশয় কালেক্টরও পতিত বা পরিত্যক্ত জমির অজুহাত দেখিয়ে আদায় করা টাকার কোনো অংশ গায়েব করে দিতে পারে না; কিন্তু অন্য সময়ে ও অন্য পরিস্থিতিতে উপকারী হলেও এই সময় এ ব্যবস্থা জনসাধারণের ওপর অতিরিক্ত বোঝা বলেই পরিগণিত হয়েছে। 'নাজাই' ধার্য করার কোনো নির্ধারিত মান বা হার না থাকায় যে সকল গ্রাম সবচেয়ে বেশি জনশূন্য হয়েছে, সে সকল গ্রামের স্বল্পসংখ্যক হতভাগ্য জীবিত অধিবাসীর ওপরই এই করের চাপ সবচেয়ে বেশি পড়েছে; অথচ সরকারের কৃপার ওপর তাদের দাবিই সবচেয়ে বেশি ছিলো। সাধারণ নিয়মের প্রত্যেকটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, এই ব্যবস্থার সঙ্গেও তেমনি আনুসর্গিক উপসর্গ নেমে এসেছিলো। আবাদি তালুকদার ও সিকদাররা এই করের আবরণে অন্যান্য নানাবিধ কর আদায় করে এবং এমন কি নাজাই করের ক্ষেত্রেও তারা ইচ্ছামতো যেকোনো অতিরিক্ত পরিমাণ টাকা আদায় করে; কিন্তু যেহেতু ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে তারাই একমাত্র বিচারক ছিলো, সেহেতু

ক্ষতিপূরণের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে কতো আদায় করতে হবে তাও তারাই ঠিক করতো।

এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রদেশের সর্বত্র অভিযোগ ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং আশঙ্কা দেখা দেয় যে, এই ব্যবস্থা বহাল রাখা হলে জনসাধারণ আর পরিশ্রম করতে চাইবে না এবং যে সঞ্চয় থেকে তারা বর্তমানে কর পরিশোধ করছে, তা ফুরিয়ে যাওয়ার পর রাজস্ব আদায়ও বিপুল হারে কমে যাবে।

কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর সাত বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার জন্য এখনো কোনো নিয়মিত পদ্ধতি গঠন করা হয়নি। প্রত্যেকটি জমিদারি ও প্রত্যেকটি তালুকের স্ব স্ব বিশেষ রীতি-রেওয়াজ বহাল থাকতে দেয়া হয়েছে; কিন্তু এই রেওয়াজ সব সময় সঠিকভাবে পালন করা হয় না। যারা তদারক করে, তাদের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী ক্ষমতা; যারা খাজনা আদায় করে, তাদের ছল-চাতুরি; প্রত্যেক জেলার আকস্মিক জরুরি পরিস্থিতি এবং মাঝে মধ্যে কালেক্টরের সঙ্গত সিদ্ধান্তের ফলে বহু পরিবর্তন হয়ে থাকে। এ জাতীয় প্রত্যেকটি পরিবর্তনের ফলে সামগ্রিকভাবে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। সরকারের বর্তমান সদস্যগণ অধিকাংশ পরিবর্তন সম্পর্কেই অবহিত নন এবং তাদের অনুমোদন নিয়েও এগুলো চালু হয়নি। এই প্রদেশের জমি ও উৎপন্ন দ্রব্য যেমন বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন ধরনের, ঠিক তেমনি এখানে যে মুদ্রায় রাজস্ব আদায় হয়, যে পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয়, যে প্রক্রিয়ায় মেয়াদ গণনা করা হয় এবং যে সকল বিশেষ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাও তেমনি বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন আকারের—সর্বত্র সমান দুর্বোধ্যতা বিরাজ করছে। সাবেক সরকারের শাসনপদ্ধতি থেকেই এই বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়েছে। নাজিমরা জমিদারদের কাছ থেকে যা পারতেন তাই শোষণ করে নিতেন। আবাদি তালুকদারদের তাদের অধীনস্থ সকলকে লুণ্ঠন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাজিমরা আবার তালুকদারদের ওপর লুণ্ঠন চালাতেন। মুৎসুদ্দিরা নাজিম ও জমিদারের মধ্যবর্তী শ্রেণীর লোক; অথবা বলা যেতে পারে, তারা নাজিম-জমিদার ও জনসাধারণের মধ্যবর্তী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জনসাধারণের সম্পদে তাদেরও ভাগ ছিলো। মুৎসুদ্দিদের মুনাফা বেআইনি ও তহরুপ বরে গণ্য হতো; ফলে গোপনীয়তা বজায় রাখার সকল সতর্কতাই গ্রহণ করা হতো এবং কোনো নির্দিষ্ট হার না থাকায় প্রত্যেক মুৎসুদ্দির মেজাজ, পারদর্শিতা, ক্ষমতা ও প্রভাবের ওপরই তার মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করতো। এই কারণে প্রত্যেকটি লোক তার সম্পত্তির আসল পরিমাণ ও দাম গোপন করতো এবং সকল প্রকার তদন্ত ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতো। দীর্ঘদিনের দখলের সুবিধা থাকায় জমিদার ও জমির অনুরূপ অন্যান্য মালিকগণও এ সুযোগ গ্রহণ করতে থাকে এবং খাজনা সম্পর্কিত সকল বিষয় গোপন রেখে জমির জটিল শ্রেণীবিভাগ ও খাজনা আদায়ের সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার গোলকধাঁধায় সরকারি অফিসারদের বিভ্রান্ত করতে থাকে। অতএব, সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, বর্তমান রাজস্বের অধিকাংশই ইতোপূর্বে সরকারি ট্রেজারিতে আসার পথে গায়েব হয়ে যেতো। বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য তেমন প্রয়োজন হয় না হলেও উল্লেখ করা দরকার যে, এ প্রক্রিয়া একদিক থেকে বরং এই প্রদেশের জন্য উপকারীই ছিলো। তহরুপের

ফলে প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা এই প্রদেশেই থেকে যেতো এবং পুনরায় এখানকার বাজারেই ফিরে আসতো। সরকারি টাকার একটি বিরাট অংশও এখানেই খরচ হতে; কিন্তু দিল্লির শাহী দরবারে যে মুদ্রা পাঠানো হতো, তা আর কখনোই এই প্রদেশে ফিরে আসতো না।

প্রদেশের প্রাচীন শাসন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মৌলিক ক্রটি ছাড়া আমাদের দখলে আসার পর বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ধরনের অনিশ্চিত শাসন চালু হয়েছে। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের মতো যে সকল জায়গা আমাদের সরাসরি দখলে ছিলো সেই সকল জায়গায় স্থানীয় প্রধানদের কর্তৃত্ব বহাল করা হয় এবং এই প্রধানদের প্রত্যক্ষভাবে প্রেসিডেন্সির অধীন করা হয়। পলাশীর সন্ধি অনুসারে কোম্পানি চব্বিশপরগনা লাভ করে; কিন্তু সেখানে দেখা যায় জমিদার বা অন্য কোনো বংশানুক্রমিক মালিক নয়, স্থানীয় প্রধানদের নানাপ্রকার স্বত্ব রয়েছে। প্রত্যেক পরগনায় একজন করে এজেন্ট নিয়োগ করা হয় এবং আদায় করা টাকা কোলকাতায় কালেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

প্রদেশের অবশিষ্ট এলাকার দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য যৌথভাবে নায়েব-দেয়ান ও দরবারের রেসিডেন্টের ওপর; পরে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব কাউন্সিলের ওপর এবং আরও পরে সুপারভাইজারদের ওপর অর্পণ করা হয়। সুপারভাইজাররা অবশ্য সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। রাজস্ব ব্যবস্থার এই শাখার সঙ্গে শাসনকার্যের কোনো সম্পর্কই ছিলো না।

প্রদেশের বিভিন্ন জেলার যেমন বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি চালু রয়েছে, প্রত্যেকটি জেলার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তেমনি একাধিক পদ্ধতি অনুসারে কাজ চলছে। একই কালেক্টরের অধীনস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর জমি পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। কিছু জমি সরাসরিভাবে আবাদি আছে; কিছু জমি কালেক্টরের অধীনস্থ সিকদার বা এজেন্টদের তদারকে আছে; এবং কিছু জমি বিভিন্ন স্তরের নিয়ন্ত্রণে জমিদার ও তালুকদারদের অধীনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আবাদি জমির চাষীদের নির্মমভাবে শোষণ করে, কারণ ইজারার মেয়াদ মাত্র এক বছর হওয়ায় এ সময়ের মধ্যে তিনি যা পারেন সাধ্যমতো কমিয়ে নেন। সিকদাররাও নিতান্ত কম যান না; তারা খাজনা আদায় করেন এবং তছরুপ করেন। কালেক্টর যতোই বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার হোন না কেন, সিকদারদের ফাঁকি ধরা বা প্রতিরোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব। জমিদার ও তালুকদাররাও যে দুর্নীতিমুক্ত নন, তা বোধ করি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে; কারণ তারা দুর্নীতিমুক্ত হলে নিকটবর্তী এলাকার অন্য জমির বাসিন্দারা অধিকতর উৎপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্বভাবতই তাদের জমিতে চলে আসতো।

রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠ যে, এ প্রসঙ্গে আমরা তার উল্লেখ না করে পারছি না। বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা অবশ্য অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি এবং সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তাই কঠোর পরিশ্রমের জন্য সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে থাকে এবং জনসাধারণের পরিশ্রমের ওপরই প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সম্পদ নির্ভর করে। স্থানীয় শাসকদের ওপর অর্পিত ক্ষমতার গণ্ডি বেঁধে দেয়া, তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে

জনসাধারণের হাতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং আদালতের দরজা সর্বসাধারণের জন্য খোলা রাখার মারফতই এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে; কিন্তু এতোদিন যাবৎ এখানে যে অবস্থা বিরাজ করছিলো, সেই অবস্থায় এই উদ্দেশ্য সফল করা কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। নিজামত ও দেওয়ানি পৃথক পৃথক হাতে ন্যস্ত ছিলো এবং জনসাধারণের উপকারের জন্য গঠিত হলেও আদলতগুলোর ওপর নাজিমের একচ্ছত্র কর্তৃত্বই বহাল ছিলো। নিজামত আদলত ও নিজামতি কর্মচারীরা যথাবিধি কাজ করে যাচ্ছিলেন বটে; কিন্তু দেওয়ানির বৃহত্তর প্রভাবে তাদের সমস্ত ক্রিয়াশীলতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। বিচারের নিয়মিত পন্থা সর্বত্র অকেজো হয়ে পড়েছিলো এবং নিজের রায় মেনে নিতে অন্যাকে বাধ্য করার শক্তি যার ছিলো, সেই ব্যক্তিই কার্যত বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতো। জনসাধারণ উৎপীড়িত ও নিরুৎসাহ হওয়ায় জমির বা চাষ-আবাদের উন্নতি করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহও ছিলো না, সামর্থ্যও ছিলো না। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভুর দাবি পূরণ করতে গিয়ে সরকারের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করাও আর তাদের সঙ্গতি থাকতো না।

রাজস্বের অবস্থা যখন এরকম ছিলো, সেই সময় ল্যাপউইং-এর স্বাক্ষরিত আপনাদের নির্দেশনামা পাওয়া যায়। তারপর একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রবর্তনের সকল বাধা অপসারণ করা হয় এবং নায়েবে-দেয়ানের পদ বিলোপ করে আপনাদের প্রতিনিধিদের প্রকাশ্যে আপনাদের নামে দেওয়ানির শাসনভার গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়। আপনাদের এই নির্দেশনামা মোতাবেক কাজ করার সময় আমরা রাজস্বের হিসাব সহজ ও বোধগম্য করা, আদায়ের হার নির্ধারিত করা, প্রদেশের সর্বত্র আদায়ের একই প্রক্রিয়া চালু করা এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার দিকে নজর রেখেছি। এ ব্যাপারে আমরা কতোখানি সফলকাম হয়েছি, তা আমরা পরে বর্ণনা করবো।

আগের চিঠিতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আমরা বিধি প্রণয়ন সমাপ্ত করেছি এবং সার্কিট কমিটি নিয়োগ করেছি। গভর্নর, মি. মিডলটন, মি. ডাক্রেস, মি. লাউরেল ও মি. গ্রাহাম এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। আমরা বাংলাদেশের সমস্ত জমি পাঁচ বছরের মেয়াদে ইজারা দেয়ার কথা সর্বত্র ঘোষণা করি এবং সকলের কাছ থেকে এ ব্যাপারে প্রস্তাব আহ্বান করি।

কমিটি প্রথমে কৃষ্ণনগর গিয়ে নদীয়া জেলায় বন্দোবস্ত দেয়ার কাজ শুরু করেন।[১] কিন্তু তারা যে সকল প্রস্তাব পান, সেগুলোর শর্ত এমন অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ছিলো এবং কাঠামোগত দিক থেকে এমন পৃথক পৃথক ধরনের ছিলো যে, একটির সঙ্গে অন্যটির শর্ত বা আনুপাতিক অর্থের পরিমাণ মিলিয়ে দেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কয়েকটি প্রস্তাব অবশ্য বেশ বোধগম্য ছিলো; কিন্তু সেগুলোর শর্ত বা অর্থের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য ছিলো না। ফলে মূল ঘোষণার পরিপন্থী হলেও কমিটি সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জমি নিলাম করার সিদ্ধান্ত করেন।

---

১. ১৭৭২ সালে ১৬ই ও ২৮শে জুনের কার্যবিবরণ।

ইজারাদার ও কৃষকের মধ্যে বন্দোবস্তের ভিত্তি এবং খাজনা আদায়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিলামক্রেতাদের মনে যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি না হতে পারে, সেজন্য কমিটি নিলামের আগেই একটি নতুন ও পূর্ণাঙ্গ হস্তাবুদ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হস্তাবুদ হচ্ছে বিভিন্ন শর্ত ও খাজনার দফার বিবরণ ও ব্যাখ্যা বিশেষ। খাজনার দফার মধ্যে আসল অর্থাৎ মূল ভূমিকর এবং আবোয়াব নামে অভিহিত নানাবিধ করের বিষয়ই প্রধানত উল্লেখযোগ্য। সরকার, জমিদার, ইজারাদার এবং এমন কি নিচাশয় আদায়কারীরাও বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য প্রকারের আবোয়াব ধার্য ও আদায় করেছেন। উপরে আমরা একটি আবোয়াবের বিষয় ব্যাখ্যা করেছি; কিন্তু এমন অনেক আবোয়াবও আছে, যেগুলোর আদৌ ব্যাখ্যাই করা যায় না।

রাজস্বের সমস্ত দফা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার পর কমিটি যে সকল কর অত্যাচারমূলক বা অতি সম্প্রতি আরোপিত হয়েছে বলে স্থির করেন, সেগুলো রদ-রহিত করে দেন এবং যে সকল কর প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে অথবা রায়তরা সানন্দে পারিশোধ করে আসছে, কেবলমাত্র সেই করগুলোই বহাল রাখেন। কমিটির বহাল রাখা করগুলো থেকেই কার্যত রাজস্বের বৃহত্তর অংশ আদায় হয়ে থাকে। যে সকল কর রদ-রহিত করা হয়, তার মধ্যে পণ্য কর, বাজি-জুম্মা ও হালদারি করের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের পল্লী অঞ্চলের নদীপথে যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য চলাচল করে, জমিদার ও ইজারাদাররা তার প্রত্যেকটির ওপর নিজেদের খুশিমতো হারে পণ্য-কর আদায় করতেন। বাজি-জুম্মা হচ্ছে ছোটোখাটো অপরাধ ও অসদারচণের জরিমানা; আপনাদের নির্দেশনামার অন্তর্নিহিত অনুভূতি অনুসারে এই কর সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে। এই দফায় সরকারের আয় হয় অতি অল্প; কিন্তু দেশের যে ক্ষতি হয় তা বিরাট; কারণ হালদারি পরিশোধ করার সঙ্গতি না থাকলে লোকে বিয়ে করতে পারে না এবং তার ফলে লোকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে যায়। এ জাতীয় ক্ষতিকর ব্যবস্থা সর্বদা পরিহার করা প্রয়োজন; বিশেষত গত মহাদুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোকের প্রাণহানির পর এই কর বহাল রাখার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। জনসাধারণের অনুকূলে এই কয়েকটি কর রদ-রহিত হওয়ার ফলে রাজস্বের পরিমাণ আপাতত কিছু কমে যাবে বটে; কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক বেশি সুফল পাওয়া যাবে কারণ দেশীয় লোকেরা পণ্য প্রস্তুত ও বিভিন্ন জায়গায় আদান-প্রদান এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হবে এবং হয়রানি ও দুর্গতির পরিসমাপ্তি ঘটায় দেশে শান্তি ও আনন্দ ফিরে আসবে। রাজস্বের পরিমাণ তখন বেড়ে যাওয়া ছাড়া নিশ্চয়ই কমবে না।

আবাদের সময় রায়তরা যাতে নির্বিঘ্নে জমির দখলে থাকতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে যাতে অবৈধভাবে কোনো টাকা আদায় না করা হয়, সেজন্য কমিটি নতুন আমলনামা বা ইজারা দলিল প্রণয়ন করেন। সরকার ও ইজারাদারের মধ্যে সম্পাদিত এই আমলনামায় রায়তদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য খাজনা ও করের বিষয় সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত আছে এবং অতিরিক্ত কিছু দাবি করা হলে ইজারাদারদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। ইজারাদাররা যাতে আমলনামার এই শর্ত লঙ্ঘন করতে বা এড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য তাদের স্ব স্ব অধীনস্থ রায়তদের সঙ্গে পাট্টা বা দলিল

সম্পাদন করতে বাধ্য করা হয়। কমিটি এই পাট্টার কাঠামো ও শর্তাবলি প্রণয়ন করেন এবং সর্বত্র তা প্রচার করেন। পাট্টায় রায়তদের জমি দখলে রাখার শর্ত এবং দেয় খাজনা ও করের নাম ও পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পতিত জমি উদ্ধার ও ভালো আবাদ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়ার জন্য কতিপয় আকর্ষণীয় ধারা যোগ করা হয়।

অনাবশ্যক ও অসঙ্গত ব্যয় কমানো হলে রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে যাবে বলে কমিটি আদায়ের খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন জেলায় কাছারি খরচের একটি নির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত করেছি এবং কঠোর নির্দেশ জারি করেছি যে, আগে থেকে আমাদের অনুমতি না নিয়ে কোনোমতেই তালিকায় নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি খরচ করা যাবে না। এই ব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যতে সমস্ত অনাবশ্যক খরচ বন্ধ হয়ে যাবে এবং অনারেবল কোম্পানির বিস্তর পয়সা বেঁচে যাবে। আমরা সম্ভবত ওয়াদা করতে পারি যে, এ নিয়ম আমরা কঠোরভাবে চালু রাখতে পারবো; কারণ প্রত্যেকটি হিসাব অডিটরের হাত দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তিনি নির্ধারিত নিয়েমের কোনো লঙ্ঘনই বরদাস্ত করবেন না।

এই সকল প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর কৃষ্ণনগরের জমি নিলাম করা হয় এবং পাঁচ বছরের মেয়াদে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত সম্পাদন করা হয়। রাজস্বের পরিমাণ ও বন্দোবস্তের শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত কমিটির কার্যক্রমের নকল এই সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

কৃষ্ণনগরে নিলামের সময় সেখানকার রাজা সমগ্র জেলার ইজারা নেয়ার প্রস্তাব দেন। এ প্রসঙ্গে আমরা বাংলা প্রদেশের জমিদার ও তালকুদারের সম্পর্কে নিম্নলিখিত সাধারণ অভিমত পেশ করছি।

সঙ্গত ও সমীচীন ক্ষেত্রে জেলার খাজনা আদায়ের ভার আমরা বংশানুক্রমিক জমিদারের ওপর অর্পণ করারই পক্ষপাতী। কারণ আমাদের বিশ্বাস, এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ সদয় ব্যবহার পাবে, আদায় বেশি হবে এবং আবাদও বেড়ে যাবে। তাছাড়া জমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকায় জমিদাররা সহজে সরকারি পাওনা বকেয়া ফেলে নিলামের ঝুঁকি নিতে চায় না এবং স্বত্ব সহজে হস্তান্তরযোগ্য না হওয়ায় বাকি-বকেয়া ফেলে তাদের পালিয়ে যাওয়ারও ভয় থাকে না। পক্ষান্তরে ইজারাদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ও অন্যান্য শর্ত পূর্বনির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই তাদের বাকি-বকেয়া ফেলে জেলা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে দেখা যায়।

এবাবর হুজুর জেলা, অর্থাৎ যে সকল জেলার খাজনা সরাসরি মুর্শিদাবাদের বড়ো কাছারিতে পরিশোধ করা হয়, সে সকল জেলার তালুকদারি ও ছোট জমিদারি এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের অনুরূপ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে জমির প্রকৃত মূল্য অনুসারে রাজস্ব ধার্য করা হবে, না জমিদার ও তালুকদারদের দখল, স্বত্ব ও উত্তরাধিকার বহাল রেখে তাদের কাছ থেকে আনুপাতিক হারে রাজস্ব আদায় করা হবে, সে সম্পর্কে আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করেছি এবং আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত দু'টি

উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে—প্রথম উপায়টি হচ্ছে এই যে, জমির দখল ও কর্তৃত্ব আবাদি প্রজাদের কাছে ইজারা দিতে হবে; তবে খাজনার একটি অংশ তাদের জমিদার বা তালুকদার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য দিতে হবে। দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে, ইজারাদারির ভিত্তিতে জমিদারের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত করা; তবে জমিদারকে প্রথমে ইজারাদারির সকল শর্ত সম্পাদন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইজারাদারের সমান রাজস্ব দিতে হবে। তৃতীয়ত, পর্যাপ্ত ও দায়িত্বশীল লোকের জামানত দিতে হবে এবং চতুর্থত, বর্তমান ইজারা বহাল থাকার সময় হিসাবে বা জমির পরিমাণে গরমিল দেখা দিলে সরকারকে নতুন হস্তাবুদ প্রস্তুত করতে ও জমি জরিপ করতে দিতে হবে এবং এই হস্তাবুদ ও জরিপের ভিত্তিতে নতুনভাবে ইজারা সম্পাদন করতে হবে। প্রথম উপায়ে বন্দোবস্ত দেয়া হলে জমিদার ও তালুকদারদের স্বত্ব কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, তা আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছি। এ যুক্তিতে যথেষ্ট সারবত্তা আছে; কারণ ইজারাদারদের হাতে কর্তৃত্ব যাওয়ার পর জমিদার ও তালুকদাররা নিছক পেনশনভোগীতে পরিণত হয়ে যাবেন এবং মালিক হিসেবে তাদের দাবি দুর্বল হয়ে পড়বে। তাছাড়া পরপর কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদি ইজারার সময় উত্তীর্ণ হতে হতে বর্তমান জমিদাররা হয়তো তাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব নিয়ে মারা যাবেন এবং তাদের নাবালকদের উত্তরাধিকার লাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে; কারণ ইজারাদার ইতোমধ্যে জমিতে নিজ নিজ পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য নিশ্চয়ই সচেষ্ট হয়ে উঠবে। জমিদার ও তালুকদারদের এই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়া আমাদের ন্যায়বোধের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, আপনাদের আদেশের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়; কারণ আপনাদের আদেশে বলা হয়েছে যে, 'আমরা যেন কোনো আকস্মিক পরিবর্তন দ্বারা জমিদার প্রভৃতিদের প্রাচীন পদ্ধতি ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করি।'

প্রথম উপায়টি অবলম্বন করা যে সঙ্গত নয়, জমিদার ও তালুকদারদের আচরণ ও মর্যাদার মধ্যে আমরা তার আরেকটি কারণ খুঁজে পেয়েছি। দীর্ঘদিন যাবৎ বংশানুক্রমিকভাবে জমির মালিকানা তাদের হাতে থাকায় জেলার মধ্যে তারা যথেষ্ট কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে এবং রায়তদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হওয়ায় তাদের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছে। এ সকল কারণে সহসা তাদের সমস্ত কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হলে যে ক্ষতি হবে, তার পরিমাণ দ্বৈত কর্তৃত্ব, জমি ত্যাগ ও আনাবাদের ক্ষতির চেয়ে কোনো অংশেই কম হবে না। পক্ষান্তরে জমিতে যাদের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে, পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে বহাল রাখা হলে কতিপয় বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে। এ সকল সুবিধা-সুযোগের জন্যই আমরা ছোটোখাটো জমিদার ও তালুকদারদের সঙ্গে দ্বিতীয় উপায়ে জমি বন্দোবস্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেছি। এই ব্যবস্থার ফলে প্রথমত, যথাসময়ে পাওয়ার নিশ্চয়তাসহ সর্বদা সমান পরিমাণ পাওয়া যাবে এবং ঘাটতি যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। দ্বিতীয়ত, তাদের সঙ্গে ইজারাদারি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় সরকার যেকোনো সময় নিলাম করতে বা ইজারা বাতিল করতে পরবেন এবং এই আশঙ্কায় তারা সর্বদা সরকারের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং ভালোভাবে জমিদারি পরিচালনা করবে। তৃতীয়ত. হিসাব ও জমির

পরিমাণ পরীক্ষা করার ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকায় কোনো তথ্য গোপন করা হচ্ছে বলে বুঝতে পারলে সরকার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন এবং সম্ভবত এই উপায়ে রাজস্বের পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে পারবেন।

এই সকল কারণে কমিটি কৃষ্ণনগরে জেলার কয়েকটি তালুককে নিলাম থেকে অব্যাহতি দেন। এই তালুকাদারগণ সরকারের শর্ত মেনে নেন; অতএব তাদের জমির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়; কিন্তু কৃষ্ণনগরের রাজা যে পরিমাণ টাকা দেয়ার প্রস্তাব করেন, কমিটির তা মেনে নিতে পারেননি; কারণ নিলামের সময় ইজারাদারা তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা দেয়ার প্রস্তাব করে ও সরকারকে অতিরিক্ত সুবিধাজনক শর্ত দিতে রাজি হয়। এই কারণে এবং রাজার সর্বজনবিদিত ছল-চাতুরিপূর্ণ স্বভাবের জন্য তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইজারাদারদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

কৃষ্ণনগরের বন্দোবস্ত এভাবে শেষ হওয়ার পর রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে কালেক্টরকে সাহায্য করার জন্য কমিটি একজন দেওয়ান নিয়োগ করেন এবং আমাদের নির্ধারিত উপরে উল্লিখিত বিধি অনুসারে কাজ করার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

কমিটি যে সকল সাবেক ব্যবস্থা বাতিল করেছেন ও যে সকল নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে আপনাদের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্যই আমরা কৃষ্ণনগরে আমাদের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। সমগ্র প্রদেশে যে আমরা কি ধরনের ব্যবস্থা চালু করতে চাই, এ বিবরণ থেকেই তা আপনারা বুঝতে পারবেন; কারণ অন্যান্য এলাকার জমি মোটামুটিভাবে কৃষ্ণনগরে অনুসৃত নীতি অনুসারেই বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

কমিটি কৃষ্ণনগর থেকে রওনা হয়ে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে কাশিমবাজার পৌঁছে। সেখানে তাদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিলো নবাবের গৃহস্থালি ও ভাতা বিধিবদ্ধ করা এবং তার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করা। এ বিষয়ে আমরা আমাদের সাধারণ বিভাগের চিঠিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো এবং বর্তমান চিঠির বিষয়বস্তু আমরা কেবলমাত্র রাজস্বের অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো।

রাদশাহী (রাজশাহী) প্রদেশ ও হুজুর জেলাগুলোর বিষয় বিবেচনার সময় কৃষ্ণনগরের মতো একই নিয়ম পালন করা হয়। রাদশাহীর বিভিন্ন পরগনা ইজারা দেয়ার জন্য ঘোষণা ও প্রচারের মারফত প্রস্তাব আহ্বান করা হয়, প্রস্তাব পেশের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, সমগ্র পশ্চিম বিভাগের জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাব পরীক্ষা করা হয় এবং জমিদার ও ইজারাদারদের প্রস্তাবগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। জমিদারের প্রস্তাব সরকারের কাছে অধিক সঙ্গত ও সুবিধাজনক মনে হওয়ায় জেলার জমিদার রানী ভবানীর সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদি বন্দোবস্ত সম্পাদন করা হয়। রানীর সুনাম, সঙ্গতি ও সামর্থ্যে সরকার মুগ্ধ হন এবং তদুপরি তিনি কমিটির পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র জমি চৌদ্দটি ভাগে ভাগ করতে রাজি হন, ইজারাদারি কবুলিয়ত সম্পাদন করেন এবং যথাসময়ে রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য ব্যক্তিগত জামানত ছাড়াও অতিরিক্ত জামানত দেন। রাদশাহীর পূর্ব বিভাগের জন্যও অন্য কেউ রানীর মতো

আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিতে সক্ষম না হওয়ায় এই এলাকার বন্দোবস্তও তার সঙ্গেই সম্পাদন করা হয়। এই বিস্তৃত জেলাগুলো থেকে আমরা যে সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় করতে পারবো সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। একজন প্রাচীন বংশানুক্রমিক মালিকের হাতে সমগ্র এলাকার কাজ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধা হবে এবং এক জায়গা থেকে সমগ্র রাজস্ব পাওয়া যাবে বলে আমাদের আদায়ের খরচও অনেক কমে যাবে।

মার্জিনে উল্লিখিত আমাদের বিভিন্ন চিঠিতে বর্ণিত কারণে আমরা দরবারের রেসিডেন্ট ও কাশিমবাজারের প্রধান মি. মিড্লটনের ওপর রাজস্ব আদায়ের তদারক করার দায়িত্বও রাদশাহীর অপর্ণ করেছি। এ বিষয়ে আমাদের অন্যান্য বিভাগের চিঠিতে আরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছি। রাদশাহীর সমস্ত দায়িত্ব সরাসরি জমিদারের ওপর অর্পিত থাকায় কালেক্টর হিসেবে মি. মিড্লটনের তেমন বেশি কাজ থাকবে না। তিনি বেকলমাত্র জমিদারের কাছ থেকে রাজস্বের মাসিক কিস্তি নেবেন, রায়তদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করবেন এবং যথাযথভাবে যাতে বিধি ও নিয়ম পালন করা হয়, সেদিকে নজর রাখবেন।

রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদের শেষ প্রান্তে অবিস্থত হুজুর জেলা এবং ছোটোখাটো জমিদারি ও তালুকাদারি একই নিয়মে বন্দোবস্ত দেয়া হয়; তবে সর্বত্রই বংশানুক্রমিক দখলকারদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হবে বলে আমরা সাবেক সার্কিট কমিটির কার্যবিবরণের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই বিরত হচ্ছি। এ কার্যবিবরণে আপনারা দেখতে পাবেন যে, জেলাগুলোর রাজস্ব বিষয়ে তদারক করার জন্য আমরা পাঁচজন অতিরিক্ত কালেক্টর নিয়োগ করেছি। হুজুর জেলাগুলোর কাজ অস্বাভাবিক রকমের জটিল হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা এই অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি। তবে আমরা আশা করি, ইজারাদারদের আমরা যে সুবিধা দিয়েছি তার সুযোগ নিয়ে তারা যদি সরাসরি সদর কাছারিতে টাকা জমা দিতে শুরু করে, তাহলে আমরা যথাসময়ে কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে পারবো।

ল্যাপউইং কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রে আপনারা যে আদেশ দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য কমিটি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কাজ করে যাচ্ছেন। এই আদেশে আপনারা কোম্পানির নামে দেওয়ানি গ্রহণ 'রাজস্ব পরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব' গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যে আমাদের কোম্পানির পক্ষে সর্বাধিক লাভজনক বিধি ও কর্মপন্থা ও তা কার্যকরি করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

আমাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় ছিলো মুর্শিদাবাদের রাজস্ব বোর্ড বিলোপ করা উচিত কিনা এবং রাজস্ব আদায়ের সকল দায়িত্ব প্রেসিডেন্সিতে আপনাদের সরকারের সদস্যদের ওপর অর্পণ করা উচিত কিনা। এ বিষয়ে সকল সুবিধা-অসুবিধা ধীরভাবে বিবেচনা করে আমাদের কমিটির সঙ্গে একমত হয়ে সদস্যদের ওপরই দায়িত্ব অর্পণ করি। আপনারা আমাদের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন আশা করে, আপনাদের সামনে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের কারণগুলো তুলে ধরছি।

বিচার পরিচালনা ও রাজস্ব আদায় সরকারের দু'টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিধায় এ বিষয়ে আপনাদের প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের আশু মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন; বিশেষত এ সময় এই দু'টি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত থাকায় এবং দেশে বহু সুষ্ঠু ও সমুচিত কর্মপন্থার প্রয়োজন থাকায় এই মনোযোগের বেশি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল রাজস্ব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের কাজ পরিচালনা এবং কালেক্টরদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান দায়িত্ব পালন করায়, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান সংগ্রহ হয়, আপনার সরকারের সদস্যগণ রাজস্ব বিষয়ে সেই জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ পাননি; কিন্তু আপনাদের সাম্প্রতিক নির্দেশে একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের আভাস থাকায় এবং বহু নতুন বিধি প্রণয়ন ও তদন্ত পরিচালনার ইঙ্গিত থাকায় এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব একটি অধস্তন কাউন্সিলের ওপর অর্পণ করা সঙ্গত হতে পারে না। রাজস্ব বিষয়ের সকল কাজ তাই আমাদের চোখের ওপর ও আমাদের সরাসরি নির্দেশ মোতাবেক পরিচালনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এই পরিবর্তনের ফলে প্রদেশবাসীর সুবিধা হবে বলেই আমরা মনে করি। কারণ, তা এখন নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রেসিডেন্সিতে আপিল করতে পারবে; অথচ ইতোপূর্বে তাদের প্রথমে মুর্শিদাবাদ কাউন্সিলে যেতে হতো এবং একমাত্র এই কাউন্সিলের রায়ের বিরুদ্ধেই আমাদের কাছে আপিল চলতো।

আর একটি সুফল হবে এই যে, কোলকাতার লোকসংখ্যা ও সম্পদের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। তার ফলে স্বদেশ থেকে আমদানি করা আমাদের মূল্যবান পণ্যগুলো শুধু বেশি পরিমাণেই বিক্রি হবে না, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকেরাও এই পণ্যের মারফত আমাদের রীতি-রেওয়াজের বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারবে এবং আমাদের নীতি ও শাসনের সঙ্গে আমাদের পণ্যেরও একটি সামঞ্জস্য তুলে ধরা হবে।

মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল বিলোপ করার এ সকল কারণ ছাড়াও আপনাদের ১৭৬৯ সালের ৩০শে জুনের নির্দেশের পরিপন্থী বলে যে আপত্তি উঠতে পারে, তার জবাবে আমরা আরেকটি যুক্তি দেখাবো। ল্যাপউইং কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরবর্তী চিঠিতে আপনারা আমাদের ওপর যে নির্দেশ দিয়েছেন ও স্বাধীন ক্ষমতা অর্পণ করেছেন, তার ফলে ৩০শে জুনের আদেশ বাতিল হয়ে গেছে বলেই আমরা মনে করি। তথাপি দেওয়ানির নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে আপনাদের আদেশের অন্তর্নিহিত মর্মের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা আমাদের উচিত ছিলো; কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, নতুন ব্যবস্থার ফলে আপনাদের আদেশ সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়েছে।

মুর্শিদাবাদে আপনাদের রাজস্ব আদায়ের সদর দপ্তর অবস্থিত হওয়ার এই কাজ তদারক করার জন্য একটি কাউন্সিল নিয়োগ করা হয়। কারণ একজন মাত্র লোকের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নয়। আমরা অনুমান করি যে, এই একই কারণে আপনারা মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় কাউন্সিল গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু নায়েবে-দেয়ানের পদ বিলোপ হওয়ার পর আপনারা যখন আদায়ের দায়িত্ব সরাসরিভাবে আপনাদের কর্মচারীদের ওপর অর্পণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তখন

আপনাদের গভর্নর ও কাউন্সিলের কাছ থেকে এতো দূরে রাজস্বের এ বিভাগটি বহাল রাখার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। তদুপরি আদায়ের দায়িত্ব প্রেসিডেন্সিতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে অধস্তন কাউন্সিলের হাতে আদৌ আর কোনো কাজ থাকে না; এ অবস্থায় এতো টাকা খরচ করে কাউন্সিল বহাল রাখার কোনো আবশ্যকতাই সম্ভবত থাকতে পারে না। আমরা তাই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনকালীন অসুবিধা ও খরচ সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও আশা পোষণ করি যে, এই পরিবর্তনের ফলে অন্ততপক্ষে কয়েক লক্ষ টাকার খরচ আমাদের বেঁচে যাবে।

সার্কিট কমিটি ২৮শে জুলাইয়ের বৈঠকে খালসা বা বড়ো কাছারি অপসারণের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে রাজস্বের সাধারণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। এ চিঠিতে বৈঠকের বিবরণ দেয়া সম্ভব নয় বলে আমরা কমিটির কাগজপত্রের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

খালসার কাজ পরিচালনার জন্য আমরা যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি, তার একখানা নকল এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সার্কিট কমিটি নিয়মিত বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরিকল্পনাটি পরে আপনাদের অনুমোদনও লাভ করেছে। বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে চিঠি লম্বা হয়ে যাবে বলে আমরা পরিকল্পনার একটা নকল এবং এ প্রসঙ্গে বোর্ডের কাছে লেখা কমিটির একখানা চিঠির নকল এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরা আশা করি, এ বিষয়টি আপনারা মনোযাগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখবেন এবং আমরা সমানাধিকার ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে যে স্থায়ী পদ্ধতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, তা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আপনাদের মূল্যবান আদেশ ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন। কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা এই খসড়া খাড়া করেছি; আইনের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে যে সুবিধে হতো, সেই সুবিধে থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। তবে আমরা দেশীয় জনসাধারণের প্রাচীন রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের পরিস্থিতি এবং জনসাধারণের সমঝোতা অনুসারে বিধি প্রণয়নের চেষ্টা করেছি। এই নতুন ব্যবস্থা প্রদেশের সর্বত্র চালু হতে এখনো কয়েক মাস সময় লাগবে; তবে আপনারা যদি অনুমোদন করেন এবং আমরা যা আশা করেছি সেই সুফল যদি ফলে তাহলে আমাদের পরিশ্রম অনেক বেশি সার্থক হয়েছে বলেই আমরা মনে করবো।

আমাদের প্রেসিডেন্ট সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কোলকাতায় ফিরে আসেন। মি. মিডলটন তার নতুন কার্যভার গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদে থেকে যান এবং অপর তিনজন সদস্য ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়ে যান। ঢাকায় এখন তারা ঢাকা ও সংলগ্ন জেলাগুলো বন্দোবস্ত দেয়ার কাছে ব্যাপৃত আছেন। ঢাকার কাজ শেষ হলে তারা বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের অবশিষ্ট বিভাগগুলো সফর করে বন্দোবস্ত দেয়ার কাজ চালাবেন। এই মৌসুমেরই কোনো জাহাজে আমরা তাদের কাজের আরও বিবরণ এবং আপনাদের রাজস্বের আগামী পাঁচ বছরের একটি হিসাব পাঠাতে পারবো বলে আশা করি।

রাজস্ব পরিচালনার নয়া পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের সাধারণ পরিকল্পনা ছাড়াও আপনাদের কাউন্সিলের অবশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে গঠিত প্রেসিডেন্সি রাজস্ব কমিটি হুগলি, মেদিনীপুর, বীরভূম ও যশোর জেলা এবং কোলকাতার জমি বন্দোবস্ত দেয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। এ সকল জেলা এবং সার্কিট কমিটির অধীনস্থ জেলাগুলোর কাজ শেষ হয়ে গেলে একমাত্র বর্ধমান ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ বন্দোবস্ত দেয়ার কাজ শেষ হয়ে যাবে। বর্ধমানের জমি ইতোমধ্যেই পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেয়া হয়েছে এবং বাংলা ১১৮২ সন (ইংরেজি ১৭৭৫) শেষ হওয়ার আগে তার মেয়াদ শেষ হবে না।

হুগলি জেলা ইজারা দেয়ার জন্য ঘোষণা প্রচার করা হলে বহুসংখ্যক প্রস্তাব পাওয়া যায় এবং ভালোভাবে পরীক্ষার পর সরকারের কাছে যেগুলো সবচেয়ে লাভজনক বলে মনে হয়, সেগুলো গ্রহণ করা হয়। প্রথমে ছোটো ছোটো খণ্ডে ইজারা দেয়া হবে বলে স্থির করা হয়; কিন্তু বড়ো এলাকার জন্য আনুপাতিক হারে বেশি টাকার প্রস্তাব আসায় আমরা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করি। এই জেলায় বহু ছোটো জমিদারি ও তালুকদারি আছে। এই জমিদার ও তালুকদারগণ আমাদের জানান, তারা বহু কাল যাবৎ দখলে আছেন এবং এখন তাদের বঞ্চিত করা হলে তারা চরম দুর্দশায় পড়বেন। তারা আগের চেয়ে বেশি খাজনা দিতে রাজি হওয়ায় আমরা তাদের দখল কায়েম রাখি। সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দুয়েকটি পরগণায় খাজনার পরিমাণ কিছু কমিয়ে দিতে হয়; কিন্তু অন্যান্য পরগনায় আবার তা বাড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে হুগলি ও নিকটবর্তী এলাকার জমি বন্দোবস্ত দেয়ার কাজে আমরা যথেষ্ট সফলকাম হয়েছি বলেই আশা করি।

অন্যান্য জেলার মতো বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও পাচেয়াটের জমিও বর্ধিত হারের খাজনায় বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।

যশোর ও মোহাম্মদশাহী জেলাও সরকারের পক্ষে লাভজনক শর্তে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। আমাদের বোর্ডের সদস্য মি. লেনের ওপর এই কাজের ভার দেয়া হয়েছিলো। আমাদের ১০ই আগস্টের পত্রে সন্নিবেশিত তার বিবরণ থেকে এ বিষয়ে বিশদভাবে জানা যাবে।

কাজগজপত্র থেকে দেখা যাবে যে, কোলকাতার জমি পুরোপুরিভাবে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে; কিন্তু কোনো ইজারাদার শর্ত মোতাবেক কাজ না করে পলাতক থাকায় এবং অবশিষ্ট ইজারাদারদের দলিল সম্পাদনে বিলম্ব হওয়ায় এ কাজ আমরা এখনো চূড়ান্তভাবে শেষ করতে পারিনি। মেদিনীপুরের কাজ এখন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। অতএব আমরা আশা করছি যে, কোলকাতা ও মেদিনীপুর সম্পর্কে আমাদের বিবরণ আমরা পরের জাহাজে পাঠাতে পারবো।

লবণ শুল্ক আদায় সহজ এবং লবণ ব্যবসা সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বিধি প্রণয়নের জন্য আপনাদের নির্দেশ মোতাবেক এখন আমরা বাংলাদেশের লবণ ব্যবসা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যে আমরা এ ব্যাপারে কতোদূর অগ্রসর হয়েছে তা আপনারা আমাদের আগের চিঠি এবং বিশেষত ৭ই অক্টোবরের চিঠি থেকে জানতে পারবেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা অন্যান্য কাজের সঙ্গে এই কাজটিতে

পুরোপুরিভাবে হাত দেবো। তাই আমরা আশা করি, পরের চিঠিতে আমরা এ বিষয় আপনাদের পূর্ণ বিবরণ জানাতে পারবো।

হুগলির লবণ বিরোধ নিয়ে গত দুই বছর যাবৎ আমরা যে সমস্যার মধ্যে ছিলাম, অবশেষে আমরা তার সন্তোষজনক সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি এবং ১লা অক্টোবরের চিঠিতে আমরা আপনাদের এ বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ জানিয়েছি।

হুগলি ও মুর্শিদাবাদের বখ্‌শবন্দর বা শুল্ককেন্দ্রগুলো ইজারা না দিয়ে আমরা নিজেরাই পরিচালনা করছি এবং সরকারি কর্মচারিগণই আগের মতো শুল্ক আদায় করছেন। এই ব্যবস্থায় আপনাদের নির্দেশ মোতাবেক আপনাদের রাজস্বের এই উৎসের পুনর্বিন্যাস করা সহজ হবে। এখন আমরা ঢাকায় অবস্থানরত সার্কিট কমিটির কাছ থেকে সেখানকার শাউবন্দর বা প্রধান শুল্ককেন্দ্র সম্পর্কে বিবরণের প্রতীক্ষা করছি। এ বিবরণ পাওয়ার পর শুল্ক আদায় সম্পর্কে আমরা একটি সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে হাত দেবো এবং যথাসময়ের পরিকল্পনাটি আপনাদের খেদমতে পেশ করবো।

১৭৬৯ সালের ৩০শে জুন ও পরবর্তী বিভিন্ন চিঠিপত্রে আপনারা প্রাচীন বংশের উত্তরাধিকারী জমিদারদের অধিকার সম্পর্কে যে অনুকম্পার মনোভাব দেখিয়েছেন, তার ফলে আমরা সাহস করে চব্বিশ পরগনা বা কোলকাতার জমির প্রাচীন মালিকদের জন্য আপনাদের কৃপা প্রার্থনা করছি। পলাশীর সন্ধি অনুসারে এ সকল জমি কোম্পানির জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই প্রাচীন মালিকদের বেদখল ও উচ্ছেদ করা হয়। এই সময়ের আগে তাদের জমিদারির কিছু কিছু এলাকা বর্ধমান ও নদীয়ার জমিদারির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো। ইতোমধ্যে এই দু'টি জেলার জমিদারদের সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু বেদখলের সময় থেকে চব্বিশ পরগণার জমিদার ও তালুকদারগণ চরম দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করছেন। তাদের অনেকেরই বড়ো বড়ো পরিবার রয়েছে এবং বহুবিধ খরচের মোকাবিলা করতে হয়। মোগল আমলে কোনো জমিদারকে বেদখল বা উচ্ছেদ করা হলে তার জমিদারির বার্ষিক আয়ের একটি অংশ তার ভরণ-পোষণের জন্য মঞ্জুর করা হতো। এই ভাতা সাধারণত বার্ষিক আয়ের দশ ভাগের এক ভাগের বেশি হতো না। আমরা অবশ্য এতো বেশি পরিমাণ ভাতার জন্য সুপারিশ করছি না; কারণ আমরা জানতে পেরেছি যে, তারা অনেক কম ভাতাতেই সন্তুষ্ট হবেন এবং তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। আপনাদের দখলে আসার পর উভয় প্রদেশের অন্য সমস্ত জমিদারকে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে বলে এবং একমাত্র এই জমিদারগণই আপনাদের কৃপা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বলে আমরা আশা করছি যে, আপনাদের দরবারে তাদের এই আবেদন নামঞ্জুর হবে না।

সমগ্র বাহার (বিহার) প্রদেশে কয়েক বছরের মেয়াদে ইজারা দেয়া হয়েছে বলে সেখানে কোনো আশু পরিবর্তনের দরকার নেই। তবে বাহারে কোনো নতুন ব্যবস্থা চালু করার আগে বাংলাদেশে আমরা আমাদের সমগ্র বিধি-ব্যবস্থার কাজ সম্পন্ন করবো। এই দু'টি প্রদেশ সম্পর্কে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে এখন আমরা আপনাদের এটুকু মাত্র আভাস দিতে পারি যে, কর্মচারীর সংখ্যা না বাড়িয়ে এবং অন্য কোনোরকম

অসুবিধে সৃষ্টি না করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা উভয় প্রদেশে একই নিয়ম-কানুন চালু করবো এবং একত্রে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করবো।

আমাদের রাজস্ব কমিটির ১০ই মে'র বৈঠকের বিবরণ মুর্শিদাবাদের সাবেক রাজস্ব কাউন্সিল ও দিনাজপুরের সুপারভাইজার মি. হেনরি কোট্রেলের মধ্যকার বিরোধের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই বিরোধের ফলে মি. কোট্রেলকে তার পদ থেকে প্রত্যাহার করা হয়। মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল তার আচরণের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তার জবাবে তিনি যে চিঠি লেখেন, তার বিশদ বর্ণনা কমিটির বিবরণে সন্নিবেশিত আছে। আমরা এই কাজগজপত্রের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি এবং আশা করছি, আপনারা যেরূপ সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করবেন, এ ব্যাপারে সেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(দস্তখত)

ওয়ারেন হেস্টিংস[২]
আর. বার্কার
ডব্লু. এল্ডাসি
টমাস লেন
রিচার্ড বারওয়েল
জেমস হ্যারিস
এইচ. গুডউইন

ফোর্ট উইলিয়াম, ৩রা নভেম্বর, ১৭৭২।

২. এই চিঠির প্রধান প্রধান অংশগুলো ওয়ারেন হেস্টিংস নিজের হাতে লিখেছিলেন।

খ পরিশিষ্ট

১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষ : প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ

প্রথম সর্গ—বাংলাদেশ থেকে লেখা সাধারণ চিঠিপত্রের অংশবিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠির পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯—২০ থেকে ২৭ নং অনুচ্ছেদ। মাসের পর মাস দস্যুদলের লুটতরাজ ও অনাবৃষ্টির ফলে মাদ্রাজে খাদ্যশস্যের এমন তীব্র অনটন দেখা দিয়েছে যে, সরকার অতিশয় মারাত্মক রকমের পরিণতির আশঙ্কা করছেন। বাংলাদেশে থেকে খাদ্য সরবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো; কিন্তু সেখানেও তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। কিছু পরিমাণ চাল নিয়ে মাদ্রাজ যাওয়ার পথে লর্ড হল্যান্ড (মহিলা) নিখোঁজ হয় গেছেন; তবে আরেক চালান পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৭৬—৫৩ নং অনুচ্ছেদ। ধান-চালের অস্বাভাবিক অনটনের জন্য বাংলা ও বিহার প্রদেশের রাজস্ব ঘাটতি পড়বে বলে আশঙ্কা হচ্ছে।

২৩শে নভেম্বর, ১৭৬৯—৮ থেকে ১০ নং অনুচ্ছেদ। ৮। ভদ্রমহোদয়গণ, অত্যন্ত গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি যে, খাদ্যশস্যের অভাবের ফলে আসন্ন ব্যাপক দুঃখ-দুর্দশার একটি মর্মান্তিক চিত্র আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি[১]। দেশের কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি; অতিবৃদ্ধ লোকেরা জীবনে কখনো এমন অনাবৃষ্টি দেখেনি। সর্বত্র তাই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

৯। 'এই দুর্দশা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় এবং পরবর্তী ছয় মাসের কমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকায়, এই সময়ের জন্য আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর রসদ বাবদ পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছি। এই ভয়াবহ বিপর্যয় দরিদ্র জনসাধারণ যে শোচনীয় দুরবস্থায় পতিত হবে, তা থেকে তাদের রক্ষার জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবো। তবে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হলে তা আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো কিনা, অথবা মানুষের চেষ্টায় তা প্রতিরোধ করা যাবে কিনা, তা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারছি না।'

১০ নং অনুচ্ছেদে রাজস্ব ঘাটতি পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা কমিয়ে দেয়ার দরকার হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এছাড়া, সুনির্দিষ্ট কোনো সাহায্যদান

---

১. এই চিঠিখানি গভর্নর মি. ভেরেস্টের স্বাক্ষরিত নয়।

ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি এবং বহুদিন পরে ছাড়া কোনো ব্যবস্থা গ্রহণও করা হয়নি। এমন কি রাজস্ব কমিয়ে দেয়ার কাজটিও সঠিকভাবে করা হয়নি

২৫শে জানুয়ারি, ১৭৭—৪৮ ও ৪৯ নং অনুচ্ছেদ। '৪৮। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অস্বাভাবিক অনাবৃষ্টির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গত ২৩শে নভেম্বরের চিঠিতে আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, তা সত্যে পরিণত হয়েছে এবং সকল প্রদেশেই এই সাধারণ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এ সম্পর্কে কালেক্টর জেনারেল বর্ধমানের রাজা ও রেসিডেন্টের একখানি আবেদনপত্র আমাদের কাছে পেশ করেছেন। রাজা হাল সনের খাজনা কমিয়ে দেয়ার আবেদন জানিয়েছেন এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সত্যতা সম্পর্কে আমরা অবহিত আছি বলে বর্ধমানের ইজারাদারদের খাজনা মোট আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা কমিয়ে দিয়েছি। রায়তরাও যাতে এই সুবিধা আনুপাতিক হারে পায় সেদিকে আমরা নজর রেখেছি। তবে এই কমানো খাজনা যাতে আগামী সনের খাজনার সঙ্গে আমরা আবার ফিরে পেতে পারি, সেজন্য আমরা ইজারাদার ও রায়ত উভয়ের কাছ থেকেই শর্ত আদায় করে নিয়েছি।' (প্রকৃতপক্ষ এক লাখ টাকারও কম পরিমাণ, অর্থাৎ মাত্র ৮,২১৮ পাউন্ড খাজনা হ্রাস করা হয় এবং তাও আবার পরের বছরই আদায় করে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।) 'কালেক্টর-জেনারেলকে আমরা কোলকাতার জমির ব্যাপারেও এ সুবিধা দেয়ার অনুরোধ করেছি।'

'৪৯। দুঃখ-দুর্গতিতে জর্জরিত ইজারাদার ও রায়তদের আমরা এভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি; কারণ এই দুঃসময়ে তাদের সকলভাবে সাহায্য পাওয়া উচিত। যে টাকা আমরা কমিয়ে দিয়েছি, তা আপনাদের সাময়িক অসুবিধার কারণ ঘটাবে মাত্র; তবে একেবারে লোকসান যাবে না। কারণ আগামী বছর ভালো ফসল হলে এই টাকা পুরোপুরি আদায় করে নেয়া হবে।'

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০—৫ নং অনুচ্ছেদ।' বাংলাদেশের রাজস্ব বা নির্ধারিত পরিমাণ টাকা আদায়ের ব্যাপারে এখনো কোনো ঘাটতি দেখা দেয়নি। তবে আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভের উপায় নেই; কারণ এখানকার মজুররা কোনো স্থায়ী সম্পত্তি বা সঞ্চিত ধনের ওপর নির্ভর করে না, যেকোনো সময় তারা সরকারের পাওনা পরিশোধ করতে পারবে। তারা নির্ভর করে আবাদের ওপর; অতএব সুবিচার বা পরিণতি সম্পর্কে কোনোরকম বিবেচনা থাকলে যেকোনো সময় আমরা টাকার জন্য চাপ দিতে পারি না।

৯ই মে, ১৭৭০—গোপনীয়—৩ নং অনুচ্ছেদ। 'আমাদের বাইরের নিরাপত্তার সঙ্গে এই প্রদেশগুলোর অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, তাহলে আমরা খুবই আনন্দিত হতাম; কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। গত ছয় মাসের মধ্যে অধিকাংশ জেলাতেই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি। দুর্ভিক্ষ, মানুষের মৃত্যুর হার, ভিক্ষুকের সংখ্যাবৃদ্ধি সকল বর্ণনার ঊর্ধ্বে চলে গেছে। একদা যে জেলা প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ছিলো, সেই পূর্ণিয়াতেই তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশি লোক মারা গেছে। অন্যান্য জেলাতেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। বিহারের সুপারভাইজার আমাদের রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন, সেখানে মার্চ ও এপ্রিল মাসে ফসল কাটা হয়; কিন্তু এবার এতো কম ফসল হয়েছে যে, বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দাম হু হু করে বেড়ে গেছে। তিনি আরও

জানিয়েছেন, কুরামনাপার অন্য পাশে বাঁকিপুরে যে সামরিক ছাউনি রয়েছে, সেখানকার সৈন্যদের জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য খরচ হচ্ছে; অথচ এই খাদ্যের সাহায্যে বহু গরিব লোকের প্রাণ রক্ষা হতে পারে। তিনি তাই সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। সুপারভাইজারের চিঠিতে যথেষ্ট জোরদার যুক্তি আছে বটে; কিন্তু এ জাতীয় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আপনাদের নির্দেশ এতো কঠোর, ইউরোপীয়দের পথ চলার জন্য মৌসুমটি এতো বিপজ্জনক, প্রেসিডেন্সির যথাসম্ভব কাছে সেনাবাহিনী রাখার প্রায়োজনীয়তা এতো বেশি এবং সম্প্রতি যে বিরোধ থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি, রাজার সঙ্গে পুনরায় সেই জাতীয় বিরোধে জড়িত হওয়ার পরণতি এমন ভয়াবহ যে, অন্যান্য দিক থেকে যতোই সঙ্গত বলে মনে হোক না কেন, সেনাবাহিনী অপসারণ করা আমরা কোনোমতেই সমীচীন বলে মনে করিনি। তবে আমরা অশ্বারোহী বাহিনী ও দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্যকে বাঁকিপুর থেকে বক্সার দুর্গে অপসারণ করতে রাজি হয়েছি। এই ব্যবস্থার ফলে পাটনার অনটন কিছু পরিমাণে কমে যাবে[২], কিন্তু আপনাদের রাজনৈতিক স্বার্থ কোনোমতেই ক্ষুণ্ণ হবে না। পক্ষান্তরে রাজা ও উজির এখন আমাদের সঙ্গে পত্রালাপ ও ঘনিষ্ঠ মেলামেশা শুরু করেছেন বলে, সেনাবাহিনী অপসারণকে সকল প্রকার হামলা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের আগ্রহের নির্দশনরূপে ব্যাখা করে আমরা তাদের আরও কঠিন বাঁধনে বেঁধে ফেলার সুযোগ গ্রহণ করেছি।'

২৮শে জুন, ১৭৭০—২ নং অনুচ্ছেদ। 'ইতোমধ্যে অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইতোপূর্বে আমরা দুর্ভিক্ষের একটি অতিরঞ্জিত বিবরণ আপনাদের দিয়েছি। দুর্ভিক্ষের ব্যাপক ধ্বংসলীলা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং দরিদ্রদের খয়রাতি সাহায্যদান, খাজনা হ্রাস ও নিকটবর্তী প্রদেশগুলো থেকে খাদ্য আমদানি করে নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিপর্যয় দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এখন এবং ভবিষ্যতে আপনাদের রাজস্বের অবশ্যই ক্ষতি হবে; তবে এই ক্ষতিকে সামান্য ও সাময়িক করার জন্য আমরা কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই ইতস্তত করবো না।'

৩১শে আগস্ট, ১৭৭০—১৪ নং অনুচ্ছেদ। 'গত ৯ই মের চিঠিতে প্রদেশগুলোর সর্বত্র দুর্ভিক্ষের ব্যাপক ধ্বংসলীলার যে বিবরণ আমরা দিয়েছি তা যদি আতঙ্কজনক হয়ে থাকে, তাহলে সেই সময় থেকে প্রতিদিন বেড়ে গিয়ে এখন আমাদের দুর্গতি কোন্ পর্যায়ে পৌছতে পারে তা সম্ভবত আপনারা অনুমান করতে পারবেন। অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হবে না বলে আমরা আশা করতে করতে পারছি না। এই বিপর্যয়ের ফলে স্বভাবতই খাজনা আদায় কমে যাবে; তবে আমরা এখানো আশা করতে চাই যে, যতোখানি আশঙ্কা আমরা করেছি, প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি তার চেয়ে অনেক কম হবে।'

---

২. কিন্তু বক্সারের অনটন বেড়ে যাবে, কারণ বক্সার সর্বাধিক দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৭৭০—৮ ও ৫ নং অনুচ্ছেদ। '৮। দুর্ভিক্ষের নির্মমতায় এই দেশে যে চরম দুর্গতি নেমে এসেছে কমিটির পক্ষ থেকে প্রেরিত কয়েকটি চিঠিতে আমরা সে সম্পর্কে সঠিক, নির্ভুল ও নিরপেক্ষ বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছি জনসাধারণ যে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে তার কোনো বিবরণই সম্ভবত অতিরঞ্জিত করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আদায়ের ওপর যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তাতে আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারে; কিন্তু আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা যা অনুমান করেছিলাম, আদায় তার চেয়ে বেশি হয়েছে।

৫। গত কয়েক দিনের মধ্যে আমরা দরবারের রেসিডেন্টের কাছ থেকে যে বার্ষিক হিসাব পেয়েছি তাতে দেখা যায়, মোট সিক্কা এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ দুই হাজার ছয়শ' তিরানব্বই টাকা নয় আনা দশ পাই (সিক্কা ১,৩৮,০২,৬৯৩।।/১০ পাই) আদায় হয়েছে।' (কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে আরও ২,০৩,৩৩৭ টাকা শোষণ করে মোট ১,৪০,০৬,০৩০ টাকা আদায় হয়।) 'দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধাররণের সুবিধার জন্য সিক্কা আট লক্ষ তিন হাজার তিন শ' একুশ টাকা পনেরো আনা (সিক্কা ৮,০৩,৩২১।। ০) কমিয়ে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে প্রদেশে শতকরা ৩৫ জন লোক মারা গেছে, সেই প্রদেশের জন্য শতকরা মাত্র ৫ টাকা হারে রাজস্ব হ্রাস।) 'এবং গত বছরের পাওনা বাবদ সিক্কা ছয় লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশ' উনিশ টাকা আট আনা (সিক্কা ৬,১৪,২১৯।।) আদায় বাকি আছে। হিসাবে আরও দেখা যায় যে, গত পুণ্যাহারের সময় (১০ই এপ্রিল, ১৭৭০) বাংলাদেশের জন্য এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয় শ' উনাশি টাকা পনোরো আনা দুই পাইয়ের (১,৫২,৪৫,৯৭৯।। পাই) একটি নতুন হিসাবে ধরা হয়েছে,' (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছরে শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি।) 'এবং মোহাম্মদ রেজা খানের জবানি উদ্ধৃত করে আমাদের রেসিডেন্ট একটি ক্ষীণ আশা দিয়েছেন যে, বহু লোক মারা যাওয়া সত্ত্বেও আবাদ ভালো হলে এই টাকা আদায় করা যাবে।'

২৪শে ডিসেম্বর, ১৭৭০—২২ নং অনুচ্ছেদ। 'দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে এবং ইতোমধ্যেই প্রচুর ফসল লোকের ঘরে উঠেছে। কিছুদিনের মধ্যে আরও ফসল কাটা হবে এবং তখন চারদিক প্রাচুর্যে ভরে যাবে। জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কিছু খাদ্যশস্য কিনে নতুন দুর্গে গুদামজাত করে রাখার জন্য আমরা বোর্ডকে পরামর্শ দিয়েছি এবং আমরা আশা করি খুব সস্তা দরেই খাদ্যশস্য কেনা যাবে।'

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১—৪৩ ও ৪৪ নং অনুচ্ছেদ।'৪৩ গ্রফটনের স্বাক্ষরিত আমাদের ১৭৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারির চিঠিতে আমরা আপনাদের জানিয়েছিলাম যে, দেশের সর্বত্র দুর্ভিক্ষের জন্য আমরা বর্ধমানের ইজারাদারদের খাজনা আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা কমিয়ে দিয়েছি। তবে শর্ত আছে যে, পরের বছরের খাজনার সঙ্গে তারা এই টাকা পরিশোধ করে দেবে।

'৪৪। কিন্তু কালেক্টর জেনারেল আমাদের জানিয়েছেন যে, ঐ সময়ের পর দুর্ভিক্ষ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় বহু রায়ত মারা গেছে ও জমি ছেড়ে চলে গেছে। ফলে ইজারাদারদের আর বকেয়া খাজনা আদায় করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এ অবস্থায় কমানো টাকার পরিমাণ যদি আরও না কমানো হয়, তাহলে বহু ইজারাদার ধ্বংস হয়ে

যাবে। মি. স্টুয়ার্ট পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, রায়তদের মৃত্যু ও জমি ছেড়ে যাওয়ার ফলে ইজারাদারদের উপরোক্ত ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ৮২, ১৮০ টাকা লোকসান হয়েছে। খাজনা যখন কমানো হয়, দুর্ভিক্ষ এমন ভয়াবহ হতে পারে আশা করা যায়নি বলে এবং রায়তদের কাছ থেকে যা আদায় হবে না, ইজারাদারকে তা থেকে রেহাই দেয়াই সঙ্গত বলে মনে করে আমরা কালেক্টর জেনারেলকে আরেকবার পরীক্ষা করে আরও কমানো সম্ভব না হলে ইজারাদারকে উক্ত ৮২,১৮০ টাকা রেহাই দেয়ার অনুমতি দিয়েছি।' (কিন্তু কার্যত এই রেহাই দেয়া হয়নি, সমস্ত টাকাই আদায় করে নেয়া হয়।)

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১—২ নং অনুচ্ছেদ। 'সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ নির্মমতা ও তার ফলে বহু লোক মারা যাওয়া সত্ত্বেও হাল সনের জন্য বাংলা ও বিহার প্রদেশের খাজনা কিছু বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমরা আশা করি যে, আগামী বছরগুলোতে দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া থেকে দেশ যতোই মুক্ত হয়ে উঠবে, রায়তদের উৎপীড়ন না করেও খাজনা ততোই বাড়িয়ে দেয়া যাবে। খাজনার সুপারভাইজারগণ এ ব্যাপারে যে মনোযোগ দিচ্ছেন, তাতে আমরা আশা করি যে, হাল সনের জন্য নির্ধারিত প্রায় সমস্ত টাকাই আদায় হয়ে যাবে। তবে যে সকল এলাকায় খুব বেশি লোক মারা গেছে এবং অন্য যে সকল এলাকায় সম্প্রতি বন্যার ফলে ফসল মারা গেছে, সে সকল এলাকার অব্যশম্ভাবী কারণেই কিছু ঘাটতি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১২ এপ্রিল, ১৮৮১—২রা এপ্রিল পত্রের পুনশ্চ। অনুরূপভাবে আপনাদের জানানো দরকার যে, বাংলাদেশের গরিব শ্রেণীর লোক ব্যাপক হারে মারা যাওয়ার ফলে কুলি সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা যে বিরাট অসুবিধার সুম্মখীন হয়েছি তা বিবেচনা করা হলে দেখা যাবে যে, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারের শেষ রিপোর্টের পর দুর্গ নির্মাণের কাজে আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি।'

১০ই জানুয়ারি, ১৮৮২—১৫ থেকে ১৮ নং অনুচ্ছেদ। '১৫। মুর্শিদাবাদ রাজস্ব কাউন্সিলের পরামর্শ মোতাবেক গত বছরের জমা খরচ সম্পর্কে আমরা যে বিবরণ দিয়েছিলাম, তাতে একটি মারাত্মক ভুল থাকায় আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বছরের বকেয়ার অংকটি ভুলক্রমে মার্চ মাসের শেষে বসানো হয়েছে। এখন আমরা ভুল সংশোধন করে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই বিভাগে গত বছরের নিট বকেয়া দাঁড়িয়েছে মাত্র আঠারো লক্ষ আটত্রিশ হাজার ছয়শ' একষট্টি টাকা চার আনা দুই গণ্ডা তিন কড়ি (১৮,৩৮,৬৬ ১।২)।' (এই বকেয়া পরে কমে গিয়ে বারো লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছরে যে পরিমাণ খাজনা বাড়ানো হয়েছিলো, এই পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম।)

'১৬। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা যেমন আশা করেছিলাম, ঠিক তেমনি সফলতার সঙ্গে রাজস্বের প্রত্যেকটি বিভাগে হাল সনের খাজনা আদায়ের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এ বছর আবাদ ভালো হওয়ায় আমরা আশা করছি যে, আগের কোনো বছরে নির্ধারিত পরিমাণের যতোখানি কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, এবার তার চেয়ে অনেক বেশি কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হবে।

'১৭। আমাদের শেষ চিঠির পর ইতোমধ্যে আমরা বিহারের আদায় সম্পর্কে বাংলা ১১৭৮ সনের (ইংরেজি ১৭৭০-৭১)—বিবরণ পেয়েছি এবং আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, মোট ৪৩,৬১,৫৬১ টাকা ৬ পাই আদায় হয়েছে। এছাড়া আগের কয়েক বছরের বকেয়া, টেণারি, সুদ, বাটা প্রভৃতি বাবদ আরও মোট ২,৬৫,০৪৪।। আদায় হয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট ৪৬,২৬,৬৯৫।। ৬ পাই আদায় হয়েছে।

'১৮। এই হিসাবে থেকে দেখা যায় যে, বকেয়া আদায় বাদ দিলেও মোট আদায়' (দুর্ভিক্ষের বছরে) 'আগের বছরের আদায়ের চেয়ে ৪,২৫, ৭৪।।/৩ পাই বেশি হয়েছে।'

দ্বিতীয় সর্গ—১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে দেশীয় লোকদের চিঠিপত্র

মহারাজ সেতাব রায়—১৭৭০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি প্রাপ্ত।—'এই প্রদেশে ধান-চালের অভাব এতো বেশি যে, পাটনার রাস্তায় অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে প্রতিদিন পঞ্চাশ জন হতভাগ্য মারা যায়। জেলাগুলোতে বিপর্যয়ের তীব্রতা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। বাঁকিপুর ছাউনির সৈন্যদের জন্য ঢাকা থেকে যে ৪০ হাজার মণ চাল আনার ফরমায়েস দেয়া হয়েছে, তা এখনো এসে পৌছায়নি।' প্রদেশের খাদ্যশস্য স্থানীয় লোকদের জন্যই পর্যাপ্ত নয় বলে সেনাবাহিনী যাতে আবার তাতে ভাগ না বসায় সেজন্য তিনি তাড়াতাড়ি তাদের রসদ সরবরাহের আবেদন জানান।

ফজুক খান, ফৌজদার—১৭৭০ সালের ১৩ই এপ্রিল প্রাপ্ত।—খারিফ ফসল অনাবৃষ্টির ফলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মারা যাওয়া সত্ত্বেও 'যা উৎপন্ন হয়েছে, তা আদায় করেছি এবং এবং রবিশস্য (বসন্তকালীন ফসল) অপেক্ষাকৃত ভালো হওয়ায় পুরো পাওনা আদায় করেছি।'

মোহাম্মদ রেজা খান—১৭৭০ সালের ১৫ই মে প্রাপ্ত।—'বিশ্বস্ততম হিতকাঙ্ক্ষীর অধ্যবসায় ও মনোযোগ নিয়ে এ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আদায় ও অন্যান্য কাজে কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং মানব চরিত্রে যেটুকু স্বাভাবিক, সেটুকু ছাড়াও কোনোরকম চেষ্টাই আমি বাদ রাখিনি; কিন্তু আল্লাহর ফরমানের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার নেই। অনাবৃষ্টির ফলে দেশে যে মর্মান্তিক দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। এতোদিন যাবৎ ধান-চালের মহার্ঘতা ও অনটন ছিলো কিন্তু এখন তার অস্তিত্বই নেই। পুকুর ও নদী-নালা শুকিয়ে গেছে এবং পানি এখন দিন দিনই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। এই বিপর্যয়ের পরও দেশের সর্বত্র প্রায়ই আগুন লেগে সব পুড়ে যাচ্ছে; অসংখ্য পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে এবং হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার রাজগঞ্জ, দেয়ানগঞ্জ ও অন্যান্য জায়গায় এখানো যে সকল ছোট-খাটো ধান-চালের গুদাম ছিলো, তা আগুন লেগে ছাই হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মারা যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে একটি ক্ষীণ আশা ছিলো যে, এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টি হবে এবং গরিব রায়তরা তাদের জমি আবাদ করতে পারবে; কিন্তু আজ পর্যন্ত এককোঁটা বৃষ্টিও মাটিতে পড়েনি। এই সময় যে ফসল কাটা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে

মারা গেছে। আগস্ট মাসে যে ফসল কাটা হয়, তার বীজ এপ্রিল-মে মাসে বোনা হয়; কিন্তু এখন মে মাসের মাঝামাঝি সময় হওয়া সত্ত্বেও পানির অভাবে বীজ বোনা সম্ভব হয়নি। এমন কি এখনও যদি এক পশলা বৃষ্টি হতো, তাহলেও বোধহয় কিছু আশা করা যেতো। খাদ্য ও বৃষ্টির অভাব যদি প্রদেশের কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে মনোযোগ ও তৎপরতার মারফত প্রতিকার পাওয়া যেতো; কিন্তু অভাব যখন সর্বত্র, তখন একমাত্র আল্লাহর রহমত ছাড়াও আর কোথায়ও প্রতিকার পাওয়ার আশা নেই। দেশের ওপর কেন যে এই গজব এসছে, তা একমাত্র আল্লাই জানেন। দুঃখ-দুর্দশা। মানুষের ধৈর্য ও সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। এই মহাদুর্যোগ থেকে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহই আমাদের রক্ষা করতে পারেন।

মোহাম্মদ রেজা খান—১৭৭০ সালের ২রা জুন প্রাপ্ত।—অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও সর্বশক্তি নিয়োগ করে 'এই ভয়াবহ দুঃসময়ে যতো বেশি পরিমাণ সম্ভব' তিনি ১৭৭০ সালের খাজনা আদায় করেছেন। 'রায়তদের ধ্বংস না করে, দেশ উৎসন্নে না দিয়ে এবং পরের বছরে বিপুল ক্ষতির ঝুঁকি না নিয়ে অবশিষ্ট আর আদায় করা সম্ভব নয়' (কিন্তু আমরা দেখেছি যে, কালক্রমে প্রায় সমস্ত টাকাই আদায় করে নেয়া হয়েছে।)

বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ—১৭৭১ সালের ১৪ই মে লিখিত এক চিঠিতে বলেন : 'দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের রায়ত, গরিব ও অন্যান্য বাসিন্দা দুঃখ-কষ্টে পতিত হলেও পুরো খাজনা আদায় করা হয়েছে এবং কিছুই বকেয়া নেই।'

তৃতীয় সর্গ—বঙ্গীয় সরকারের আদেশ-নির্দেশ থেকে উদ্ধৃত

২৩শে অক্টোবর, ১৭৬৯—অভাব-অনটন দেখা দেয়ায় সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য মজুদ করা প্রয়োজন। ছয় মাসের জন্য ১,২০,০০০ মণ দরকার। যে সকল এলাকায় সবচেয়ে ভালো ফসল হয়েছে এবং অনাবৃষ্টির জন্য সবচেয়ে কম দুর্দশা দেখা দিয়েছে, সে সকল এলাকা থেকে মাল সংগ্রহ করতে হবে।

পাটনার চিফ ও কনসাল ৮০,০০০ মণ সংগ্রহ করবেন : ৬০,০০০ মণ বহরমপুর ও পাটনার জন্য শহরে পাঠাতে হবে এবং অবশিষ্ট ২০,০০০ মণ সেনাবাহিনীর জন্য প্রেসিডেন্সিতে পাঠাতে হবে (লক্ষণীয় যে, এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য যেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়, সেই পাটনা সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম।)

দরবারের রেসিডেন্ট স্থানীয় চাহিদার প্রতি নজর রেখে এবং এই চাহিদা পূরণের পর দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলা থেকে ৪০,০০০ মণ সংগ্রহ করবেন। (লক্ষণীয় যে, পূর্ণিয়া থেকে এই মাল সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে এ জেলার তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশি লোক মারা যায়।)

রাজধানীতে ও পাটনায় গুদাম নির্মাণ করতে হবে। আগুন ও অন্যান্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

দরবারের রেসিডেন্টগণ ও বিহারের সুপারভাইজারগণ ধান-চালের একচেটিয়া কারবার বন্ধ করবেন। ডাল, বার্লি ও শীতকালীন রবিশস্যের আবাদে উৎসাহ দিতে হবে এবং অভাব পূরণের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

একচেটিয়া কারবার বন্ধ করা ও জনসাধারণকে সাহায্য দেয়ার জন্য কালেক্টর জেনারেল, বক্‌শি ও জমিদার সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি বিধি প্রণয়ন করবেন।

১৪ই নভেম্বর, ১৭৬৯—ঢাকার চিফ ও কাউন্সিল ৬০,০০০ টাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। মঞ্জুর করা হলো। ধান-চাল কেনার জন্য মি. সামনারকে বাকেরগঞ্জে পাঠানোর প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

১৪ই নভেম্বর, ১৭৬৯—কম দামে ধান-চাল সরবরাহের ওয়াদা করে কোলকাতায় নির্মীয়মান দুর্গে শ্রমিক সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো; কিন্তু ব্যবসায়ীরা বাধা সৃষ্টি করেছে বলে জানা গেলো।

১৯,০০০ মণ গুদামে আছে (অর্থাৎ একটিমাত্র ব্রিগেডের তিন মাসের খোরাকের চেয়েও কম)। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আরও পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কেনা দাম ও আনার খরচে দুর্গে কার্যরত শ্রমিকদের মাথাপ্রতি দৈনিক এক সের করে চাল সরবরাহ করা হবে বলে স্থির করা হয় এবং এদের অবশিষ্ট পাওনা কড়িতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে তারা বাজার দরের চেয়ে শতকরা ৪০ ভাগ কম দামে চাল পাবে। আগামী আট মাস যাবৎ অনটন চলতে পারে এবং তীব্রতা ক্রমেই বেড়ে যেতে পারে। ৮ হাজার কুলির জন্য ৪৯ হাজার মণ লাগতে পারে। গুদামে যা আছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পরিমাণ সংগ্রহের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং চট্টগ্রাম থেকে আরও যোগাড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সৈন্যদের জন্য বক্‌শি সর্বদা ২০ হাজার মণ গুদামে জমা রাখবেন। সেন্ট জর্জ দুর্গ থেকে এখন সম্ভবত চাল সংগ্রহ করা যেতে পারে। মার্লবরো দুর্গের জন্য বাংলাদেশে থেকে রসদ সরবরাহ করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম থেকে আরও খাদ্য সরবরাহের জন্য চাপ দেয়া হোক। রসদের জন্য সেন্ট জর্জ দুর্গ থেকে মাদ্রাজে লেখা হয়েছে। (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষের আগে পর্যন্ত বাংলা থেকেই মাদ্রাজে খাদ্য সরবরাহ হয়েছে, মাদ্রাজ থেকে বাংলায় নয়।)

২০শে নভেম্বর, ১৭৬৯—বর্ধমানের রাজার দরখাস্ত : অনাবৃষ্টি ও ধান-চালের অভাব। ফসল রোদে শুকিয়ে গেছে এবং ছাগল-গরুর খাবার হিসেবে কেটে আনা হয়েছে। সমস্ত পুকুর শুকিয়ে গেছে। পানির অভাব দেখা দিয়েছে। রবিশস্য অনেক পরে লাগানো হয়েছে এবং পানি না হলে তাও নষ্ট হয়ে যাবে। রায়তরা দলে দলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

দরবারের রেসিডেন্ট জানাচ্ছেন যে, ধান-চালের একচেটিয়া কারবার বন্ধ করে দেয়ার সুফল ফলেছে; কিন্তু রায়তরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় এবং আবাদ না হওয়ায় আগামী মৌসুমে সমগ্র প্রদেশ বিরান হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি হতে পারে বলে রেসিডেন্টের এই চিঠি গোপন রাখা হয়; কিন্তু কর্তব্য ও মানবতাবোধের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে দেশের দুর্গতির কথা সকলের

গোচরীভূত করা উচিত। দক্ষিণাঞ্চলে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু উত্তরাঞ্চলের ধানের আবাদ কয়েকটি জায়গায় সম্পূর্ণরূপে মারা গেছে এবং অবশিষ্ট জায়গার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। নদীনালা শুকিয়ে গেছে; পুকুরগুলোতে যে কিঞ্চিৎ পানি ছিলো, তাও লোকে খেয়ে ফেলেছে; পানি আজ আর কোথাও নেই। রায়তদের তুলা, তুঁত, যব, তামাক, বেত, মটর, ছোলা, কোনোকিছুই আবাদ করার উপায় নেই। তাই তারা দলে দলে দিনমজুরের কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছু একটা প্রতিকার না করা গেলে রাজস্বের মারাত্মক ক্ষতি হবে।

৬ই ডিসেম্বর, ১৭৬৯—অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও খাজনা আদায় অন্যান্য বছরের মতোই সন্তোষজনক হচ্ছে; কিন্তু বেশিদিন এভাবে পারবেন বলে মনে হয় না। রেসিডেন্ট ২০০০ কুলি পাঠাতে পারবেন বলে আশা করছেন। ছয় মাসের জন্য ৫০০ কুলি নিয়োগ করা হয়েছে, তবে তাদের মজুরি বেশি দিতে হচ্ছে।

১২ই ডিসেম্বর, ১৭৬৯—চট্টগ্রামের চিফ ও কাউন্সিল অনটন কমানোর জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন।

১৮ই জানুয়ারি, ১৭৭০—মালাবার উপকূল থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে সেন্ট জর্জ দুর্গ মার্লবরো দুর্গে পাঠাবেন ওয়াদা করেছেন। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় তারা ভালো ফসল পাবেন বলে আশা করেছেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০—দরবারের রেসিডেন্টে ছয়টি জায়গায় দৈনিক মাথাপ্রতি আধ সের করে চাল বিতরণের সংকল্প করেছেন; কিন্তু ইউরোপীয়রা ও তাদের গোমস্তারা বাজার থেকে সব চাল কিনে নিয়ে তার এই সংকল্প ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। যে সকল জায়গা থেকে শহরে সরবরাহ হয় সে সকল জায়গায় তাদের চাল কেনা অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা হোক। এই নিষেধাজ্ঞা আগামী আগস্ট পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কোলকাতার জন্য পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো থেকে ধান-চাল সরবরাহ করা হোক। বহরমপুরের সৈন্যদের জন্য ৪০ হাজার মণ চাল কেনার নির্দেশ দেয়া গেলো।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০—খাজনা কমানোর ব্যাপারটি রেসিডেন্টের 'বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার ওপর' ছেড়ে দেয়া হলো; তবে বকেয়া খাজনা ও তাকবি ঋণের আগে এই টাকা আদায় করতে হবে।

২৭শে মার্চ, ১৭৭০—বাকেরগঞ্জ থেকে চালের যে চালান আসার কথা ছিলো তা এখনো আসেনি।

৩রা এপ্রিল, ১৭৭০—বকশি জানাচ্ছেন যে, বাকেরগঞ্জ থেকে ৩৩,৯১৩ মণ চাল এসে পৌঁছেছে। আগস্ট ফসলের মজুদ মাল থেকে ২৫,৬৫৭ মণ (নিরেস জাতের) বেচে ফেলার হুকুম দেয়া গেলো; কিন্তু অল্প অল্প পরিমাণে বেচতে হবে।

৩রা এপ্রিল, ১৭৭০—মেসার্স রাসেল ফ্লায়ার এন্ড হেয়ার কোম্পানির উদ্যোগে কোলকাতায় প্রতিদিন পঞ্চাশ মণ এবং বর্ধমানে প্রতিদিন বিশ থেকে পঁচিশ মণ চাল খয়রাতি সাহায্য হিসেবে বিতরণেরই আদেশ দেয়া গেলো। কোম্পানি নিজস্ব তহবিল থেকেও চাল বিতরণ করবে।

১৪ই আগস্ট ১৭৭০—গুদামে একদিনের রসদের উপযোগী মালও না থাকায় কাউন্সিল চন্দননগরের ফরাসি কলোনিতে কোনোরকম সাহায্য দিতে অস্বীকার করছেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭০—অনাবৃষ্টি ও অনটনের ফলে মালদা জেলায় বহু লোক মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে তারাও অক্ষম হয়ে পড়েছে। ফলে সেখানকার কারখানায় গত বছর যে কাপড় উৎপন্ন হয়েছিলো এবার তার অর্ধেকও হয়নি।

২২শে অক্টোবর, ১৭৭০—অল্প পরিমাণ চাল পাচার করার চেষ্টা করায় নুসাইপুরের ফরাসিদের সঙ্গে বিরোধ শুরু হলো।

১৪ নভেম্বর, ১৭৭০—দুর্ভিক্ষ এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং কেবলমাত্র যে প্রচুর ফসল হয়েছে তা-ই নয়, আরও প্রচুর ফসল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় চালের ওপর থেকে সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলো। এই মর্মে সর্বত্র ঘোষণা প্রচার করা হোক।

চতুর্থ সর্গ—মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক কাউন্সিলের বৈঠকের কার্যবিবরণ থেকে উদ্ধৃতি

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭০—ভাদুই ফসল (সেপ্টেম্বর) থেকে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে নবাবকে সকল প্রকার সাহায্য করতে হবে। দেশের বর্তমান দুরবস্থায় খাজনা আদায়ে যে ঘাটতি পড়ার আশঙ্কা আছে, সেই ঘাটতি যাতে না পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

৪ঠা অক্টোবর, ১৭৭০—১৭৭০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর গোবিন্দগঞ্জ থেকে লেখা বিহারের সুপারভাইজার মি. গ্রোসের চিঠি : ইতোমধ্যে বৃষ্টি হয়েছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ জমিই অনাবাদি রয়েছে; কারণ রায়তরা হয় মারা গেছে আর না হয় ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গেছে। যারা এখনো আছে, তারা দুর্বল, অক্ষম ও দুর্দশাগ্রস্ত। ধানের চারা বেশ সতেজ হয়ে গজিয়ে উঠেছে; পুরো আবাদ হলে প্রচুর ফসল হতো।

২৬শে সেপ্টেম্বর লেখা রংপুরের সুপারভাইজারের চিঠি : গরিবের দুর্দশা এখনো ভয়াবহ রয়েছে। প্রতিদিন বহু হতভাগ্য এসে সাহায্য চায়। যাদের বেশি দরকার তাদের মধ্যে প্রতিদিন পাঁচ টাকার চাল বিতরণ করা হয়েছে। প্রাদেশিক কাউন্সিল এই খরচ মঞ্জুর করলেন। (চার লক্ষ অনাহারী লোকের জন্য দৈনিক দশ শিলিং সাহায্য।)

১৭ই ১৭৭০—পূর্ণিয়ার সুপাইভাইজার মি. ডুকারেল তার ১০ই অক্টোবরের চিঠিতে অভিযোগ করেছেন যে, পূর্ণিয়া থেকে অন্যত্র চালান দেয়া নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কর্নেল চ্যাম্পিয়ন মুংগেরের সৈন্যদের জন্য ধান-চাল কেনার উদ্দেশ্যে সেপাই পাঠিয়েছেন। বর্তমান দুরবস্থায় এবং আগস্টের ফসল মারা যাওয়ায় তিনি আশা করেন, দেশীয় ব্যবসায়ীদের মারফত সাধারণ উপায়ে মুংগেরের জন্য রসদ সংগ্রহ করা হবে—সশস্ত্র সিপাইদের মারফত নয়।

২৩শে অক্টোবর, ১৭৭০—বীরভূমের সুপারভাইজার মি. হিগিনিসন তার ১৮ই অক্টোবরের চিঠিতে জানিয়েছেন, সিকদারদের অধীনস্থ জমির খাজনা ব্যাপকহারে বাকি পড়েছে। 'দুর্ভিক্ষের ফলে তারা এমন জনশূন্য বিরান অবস্থার মধ্যে পড়েছেন যে, রায়ত

পাওয়া তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়েছে; কিন্তু তথাপি তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি 'অনেক বেশি পরিমাণ খাজনা' আদায় করতে সক্ষম হবেন এবং সামনের বছর আরও বেশি আদায় করতে পারবেন।

৬ই নভেম্বর, ১৭৭০—পূর্ণিয়ার সুপারভাইজার চিঠি : দুর্ভিক্ষের সময় যে সকল জায়গা প্রায় বিরান হয়ে গেছে, সে সকল জায়গা থেকে কোলকাতার জন্য ধান-চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। চাল যখন টাকায় দুই-তিন মণ করে বিক্রি হতো তখন মজুরদের মাসিক মজুরি ছয় থেকে আট আনা ছিলো। (এছাড়া নাস্তা-পানির জন্যও কিছু দেয়া হতো)। মজুররা তাদের জীবিকা সংগ্রহ করতে না পারলে যেখানে বেশি মজুরি ও কম দামে জিনিসপত্র পাওয়া যায় পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে চলে যায়। ধান-চালের চালান এখন অবাধ করা হলে গোমস্তা ও বণিকরা সমস্ত মাল এমন দামে কিনে ফেলবে, যে দামে মজুররা কোনোমতেই কিনতে পারবে না।

২৬শে নভেম্বর, ১৭৭০—নায়েবে দেয়ান অভিযোগ করেছেন, রেশম উৎপাদনের ব্যাপারে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। নজিরবিহীন দুর্ভিক্ষের ফলে বহু রায়ত অনাহারে মারা গেছে, বহু ঘরবাড়ি জনশূন্য হয়ে গেছে এবং যারা বেঁচে আছে তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে; আবাদ করা বা অন্য কোনোরকমের পরিশ্রম করার তাদের ক্ষমতা নেই। রাজমহলের পূর্ণিয়ার সুপারভাইজার মি. হারউড চলতি সালের বন্দোবস্তের হিসাব পাঠানোর সময় তার জেলার 'দুর্গত, বিধ্বস্ত ও মর্মান্তিক' অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

২৮শে নভেম্বর, ১৭৭০—নদীয়ার রাজা কুসুম চাঁদ দুর্ভিক্ষের ফলে তার এলাকায় 'বহু রায়তের মৃত্যু ও গ্রাম ত্যাগের বিষয়' জানিয়েছেন।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৭৭০—পূর্ণিয়ার সুপারভাইজার মি. ডুকারেল অতিরিক্ত খাজনায় তিন বছর মেয়াদি বন্দোবস্ত সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে বলেছেন : 'দুর্ভিক্ষ এবং তার ফলে মানুষের মৃত্যুর কথা ভালোভাবে জানা থাকলে আমি কখনোই তিন বছর মেয়াদি বন্দোবস্ত এবং তাও বর্ধিত হারে করতাম না।' নিজে চারটি পরগনা সফর করার পর তিনি লিখেছেন : 'আদৌ ফসল না হওয়ায় জনসাধারণ মারা গেছে অথবা অন্যত্র চলে গেছে। এক বছরের মধ্যে জমির দাম অন্ততপক্ষে অর্ধেক কমে গেছে। নিজের চোখে না দেখলে আমি কখানোই এই অবস্থার কথা বিশ্বাস করতাম না। হাবেলি পূর্ণিয়াসহ সমস্ত এলাকার জমি জনশূন্য অবস্থায় পতিত হয়ে পড়ে আছে, অথচ একমাত্র হাবেলি পূর্ণিয়াতেই এক হাজারেরও বেশি গ্রাম ছিলো। এই জনশূন্যতার জন্যই পূর্ণিয়ায় এবার আগের চেয়ে অনেক কম খাজনা আদায় হয়েছে।

মি. ডুকারেল আরও লিখেছেন : 'আলমগঞ্জ বাজারটি ধান-চাল ও রবিশস্য বেচাকেনার একটি বড়ো কেন্দ্র ছিলো এবং এখানকার খাজনার প্রধানত এই কারবার থেকেই আদায় হতো; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় বহু লোক মারা যাওয়ায় বাজার এখন বিরান হয়ে গেছে। বাজারের অধিকাংশ জায়গাই এখন জঙ্গলে ছেয়ে গেছে এবং বন্য জন্তুদের আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে।

'দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনারা প্রশ্ন করেছেন, তার জবাবে আমি জানাচ্ছি যে, বিভিন্ন পরগনা থেকে আমি যে হিসাব পেয়েছি, তাতে দেখা যায়, এই জেলায়

কমপক্ষে দুই লক্ষ লোক মারা গেছে। এই জনশূন্যতার প্রতিক্রিয়ার কথা কেউ যদি বাদ দিতে চান তাহলে আমি নিরাপদে বলতে পারি যে, দেশে ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধি ফিরে আসছে।'

২০শে ডিসেম্বর, ১৭৭০—মি. রিড মুর্শিদাবাদ থেকে জানাচ্ছেন যে, ঢাকা, পূর্ণিয়া ও হুগলিতে ভালো খাজনা আদায় হচ্ছে এবং কোনো কোনো জায়গায় লোকেরা অগ্রিম খাজনাও দিয়ে দিচ্ছে। অন্যান্য সুপারভাইজার জানাচ্ছেন যে, 'সামান্য কয়েকটি জায়গা ছাড়া' সবর্ত্র যথাসময়ে খাজনা আদায় হয়ে যাবে।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৭৭০—মি. বেচার মন্তব্য করেছেন : 'সঙ্কটপূর্ণ সময়ে বাকেরগঞ্জ থেকে চালের চালান এসে পৌছায়। ফলে এখানকার ইংরেজ বাসিন্দাদের খুব উপকার হয় এবং শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। এদিক থেকে কোম্পানির যথেষ্ট লাভ হয়েছে। অন্যথায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো।

শহর ও শহরতলির গরিবদের মধ্যে চাল বিতরণের জন্য কমিটি ৮৭ হাজার টাকা টাকা মঞ্জুর করেন। এই টাকার মধ্যে ৪০ হাজার দেন কোম্পানি এবং ৪৭ হাজার দেন নবাব; কিন্তু খরচ অনেক বেশি হয়ে যায়।'যতোই দিন গেছে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ততোই বেড়ে গেছে। চালের দাম টাকায় দশ সের থেকে বেড়ে গিয়ে টাকায় মাত্র তিন সের হয়েছে। অতএব, যে সময় বন্ধ করা হয়েছে মানবতাবোধ থাকলে তার আগে খয়রাতি সাহায্য কোনোমতেই বন্ধ করা সম্ভব ছিলো না। বাড়তি খরচের টাকার জন্য নবাব ও উজিরদের কাছে দাবি জানানো হবে কিনা তা এখন ভেবে দেখা দরকার। কারণ এ সকল ভদ্রলোক এই ধান ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে দান করে বহু লোকের প্রাণরক্ষা করেছেন এবং আমার বিশ্বাস, এ এলাকায় প্রত্যেকটি সঙ্গতিপূর্ণ লোক এভাবে দান করেছেন। যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ছিলো, তাতে একমাত্র যার হৃদয় পাথরে গড়া, সেই লোক ছাড়া আর কারো পক্ষেই সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দান করতে অস্বীকার করার উপায় ছিলো না। বাড়তি খরচ একান্তই অপরিহার্য ছিলো এবং চাল বিতরণের ফলে যাদের প্রাণরক্ষা হয়েছে, তাদের দ্বারা কোম্পানি একসময় নিশ্চয়ই লাভবান হবেন।'

৩১শে ডিসেম্বর, ১৭৭০—রাজশাহীর (রাজশাহী) পূর্ণিয়ার সুপারভাইজার মি. রোস লিখেছেন : 'আগস্টের ফসল যে কি ব্যাপকভাবে মারা গেছে, তা প্রমাণ করার জন্য আমি একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করবো এবং এই বিষয়টি এ যাবৎ কারো গোচরীভূত হয়নি। এ এলাকার প্রায়োজনীয় ধান-চাল এখন উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা এবং মুর্শিদাবাদের আশপাশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। এখানকার বিখ্যাত ধনী এলাকার মধ্যস্থলে অবস্থিত নাহোরে (নাটোরে) টাকায় মাত্র ১৮ সের চাল পাওয়া যাচ্ছে, অথচ মুর্শিদাবাদে পাওয়া যাচ্ছে টাকায় ৩০ সের দরে।'

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০—দিনাজপুরের রাজা বিজনাথ দুর্ভিক্ষের ফলে তার জেলার জনশূন্যতা ও বিপর্যয় অবস্থার জন্য কিছু পরিমাণ খাজনা মওকুফ করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, তার জেলার বহু গ্রাম সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য হয়ে গেছে এবং বীজ ও সম্পূর্ণরূপে সাজসরঞ্জামের অভাবে আবাদ না হওয়ায় অধিকাংশ

জমিই পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। মোট ১৩,৭০,৯৩২ টাকার মধ্যে ১২,০০,০০০ টাকা আদায় হয়েছে এবং বোর্ড এতদ্বারা আদেশ দিচ্ছে যে, তাদের 'পুরো টাকা আদায়ের আশা পূরণের ব্যাপারে' রাজা যদি 'সর্বান্তকরণে সহযোগিতা' না করেন, তাহলে তাকে জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করা হবে এবং দাইক হিসেবে বোর্ডের এজলাসে তলব করা হবে।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১—বীরভূমের পূর্ণিয়ার সুপারভাইজার মি. হিগিনসন লিখেছেন : 'এ এলাকার গরিব রায়তদের কাছ থেকে গত বছরের বকেয়া খাজনা আদায় করা হলে যে কি পরিণতি দেখা দেবে সে সম্পর্কে আপনাদের ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। এখন যারা রায়ত আছে তারা দুর্ভিক্ষের ধ্বংসাবশেষ মাত্র এবং তাদের অধিকাংশেরই বকেয়া পরিশোধ করার সঙ্গতি নেই। গরু-বাছুর ও আবাদের সরঞ্জাম বেচতে বাধ্য করা হলে সামান্য কিছু আদায় হতে পারে বটে; কিন্তু এই পন্থা অবলম্বন করা হলে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে অর্থাৎ এই যে ক্ষতি হবে, তার পরিমাণ বকেয়া অনাদায় থাকার চেয়ে অনেক বেশি। আমার কার্যভার গ্রহণের আগে এভাবে ১,০৬৭ টাকা আদায় করা হয়েছিলো এবং যে সকল রায়তের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে তারা সকলেই জেলা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমিল ও অন্যান্য অকর্মণ্য আদায়কারীর (তখন আমরা তাদের মারফতই দেশ শাসন করতাম) কুপরিচালনার জন্যই গত বছর খাজনা বাকি পড়ে। বিষ্ণুপুরের রায়তরা পুরোনো রেওয়াজ অনুসারে টাকার বদলে ধান দিয়ে খাজনা পরিশোধ করে; কিন্তু গত বছর অনাবৃষ্টিতে ফসল মারা যাওয়ায় দেয়ার মতো ধান তারা পায়নি। কালেক্টর এই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং একরপ্রতি তিন টাকা হারে জমি বন্দোবস্ত নিতে তাদের বাধ্য করেন। অথচ আগের বছরও একরপ্রতি মাত্র এক টাকা হারে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। কালেক্টরের এই নির্দেশ পালন করতে সক্ষম না হয়ে অনেক রায়ত জেলা ছেড়ে চলে যায় এবং যারা থেকে যায় তারা ধ্বংস হয়ে যায়। এখন কিভাবে আমি বকেয়া আদায় করতে পারি, সে সম্পর্কে নির্দেশ লাভের জন্য এই সকল বিষয় আপনাদের গোচরীভূত করছি। টাকা দেয়ার যাদের সঙ্গতি আছে, ইতোমধ্যে আমি তাদের কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা অবশ্যই করবো কিন্তু আমার মনে হয় এ জাতীয় লোক এখানে খুব বেশি নেই।'

পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পরগণায় ব্যক্তিগতভাবে সফরের পর মি. হিগিনসন লিখেছেন : 'গত বছর খুব কম বৃষ্টি হওয়ায় পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই পরগনাগুলোতে অন্যান্য পরগনার তুলনায় অনেক বেশি বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া এ এলাকায় সবচেয়ে বেশি মারাত্মক আকারের দেখা দিয়েছে। শত শত গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেছে এবং এমন কি বড়ো বড়ো শহর-বাজারগুলোতেও আজকাল চার ভাগের মাত্র এক ভাগ বাড়িতে লোকবসতি দেখা যায়। রায়তের অভাবে বিস্তৃত এলাকার সরেস জমি অনাবাদি পড়ে রয়েছে। এ সকল পরগনার প্রায় সর্বত্রই রায়তগণ সিকদারের উৎপীড়ন থেকে তাদের রক্ষার জন্য আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করেছে। তারা আমাকে বলেছে, প্রদেশের অন্যান্য জায়গার মতো এখানেই ইজারাদারদের কাছে জমি বন্দোবস্ত দেয়া হলে তারা

রেহাই পাবে এবং অন্য কোথাও না গিয়ে এখানেই বাস করবে এবং সানন্দে আবাদের কাজে মন দেবে। আশা করি, মৌসুমের গোড়া থেকেই এই নয়া ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে আপনারা রাজি হবেন। কারণ অধিকাংশ রায়তই টাকাভি ঋণ না পেলে আবাদ করতে পারবে না এবং এই ঋণ আমরা একমাত্র ইজারাদারদের মারফতই দিতে পারি। ইজারাদার তার নিজের স্বার্থে কৃষকদের এই টাকা অগ্রিম দেবে।'

মি. হিগিনসনের এই চিঠির জবাবে কাউন্সিল বলেন : 'আপনার অধীনস্থ জেলাগুলোর বকেয়া টাকার দাবি আমরা কোনোমতেই প্রত্যাহার করতে পারি না। তবে আপাতত বকেয়া আদায় স্থগিত রাখার সমীচীনতা সম্পর্কে আমরা আপনারা সঙ্গে একমত। বিশেষত এখন বকেয়ার জন্য চাপ দেয়া হলে যখন সামনের বছরের আবাদ ও আদায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সামনের বছর ভালো ফসল হলে আমরা আশা করি সমস্ত বকেয়া পুরোপুরি আদায় করা হবে এবং এ বিষয়টির ওপর বিশেষ নজর রাখার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।'

১লা এপ্রিল, ১৭৭১—কৃষকদের আবাদ শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নদীয়ার সুপারভাইজার ৪০০০ পাউন্ড ঋণ চেয়েছেন। কাউন্সিল ২৫০০ পাউন্ড মঞ্জুর করলেন এবং এই টাকা পরিশোধের দায়িত্ব ইজারাদারদের ওপর ন্যস্ত করলেন।

১৫ই এপ্রিল, ১৭৭১—রাজশাহীর সুপারভাইজার মি. রোস লিখেছেন : 'দুঃখ-দারিদ্র্য ও হতাশায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বহু লোক অন্যের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন পরগনা থেকে আমি প্রায়ই এ ধরনের খবর পাচ্ছি। যে সকল রায়ত নিজ নিজ এলাকায় সজ্জন বলে পরিচিত ছিলো, তাদের অনেকেই জীবিকা নির্বাহের শেষ উপায় হিসেবে এই ভয়াবহ পথ বেছে নিচ্ছে।'

পঞ্চম বর্গ—সিলেক্ট কমিটি, গোপন মন্ত্রণা ও রাজস্ব কমিটির কাগজপত্র থেকে উদ্ধৃতি

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৯—দরবারে রেসিডেন্ট মি. বেচার জানাচ্ছেন যে, আগে কখনো এতো বেশি পরিমাণ খাজনা আদায় হয়নি।

১৬ই আগস্ট, ১৭৬৯—বিহারের চিফ মি. রামবোল্ড পর পর কয়েকখানি চিঠিতে অনাবৃষ্টি ও অভাব-অনটনের কথা জানানোর পর এখন লিখেছেন, প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি আশা করছেন যে, অনাহার ও অনটনের দিন হয়তো শেষ হয়ে যেতে পারে।

এই তারিখ থেকে বছরের শেষ পর্যন্ত সময়ের নথিপত্রে স্থানীয় অফিসারদের বহুসংখ্যক চিঠিপত্রের উল্লেখ আছে। এই সকল চিঠিতে অনাবৃষ্টির খবর, ব্যাপক বিপর্যয় ও রাজস্ব ঘাটতির আশঙ্কা, খাজনা হ্রাসের সুপারিশ এবং খাজনার জন্য টাকার বদলে পুরোপুরি বা অংশত ধান নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা প্রভৃতি আছে।

২৮শে জানুয়ারি, ১৭৭০—বিহারের সুপারভাইজার মি. আলেকজান্ডার জানান, 'ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নয়, আশু বিপদের জন্য অবিলম্বে প্রতিকার প্রয়োজন'; কারণ, 'চিন্তাভাবনার জন্য যতোই দিন যাবে, বিপর্যয় ততোই বেড়ে যাবে।' তিনি আরও জানান, তিনি প্রতিমণ চাল থেকে পঁচিশ সের সরকারের জন্য রেখে অবশিষ্ট পনেরো

সের রায়তদের দেয়ার এবং আখ, তুলা ও আফিম থেকে নির্ধারিত হারে শুল্ক আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মি. আলেকজান্ডার রাজা সেতাব রায়কে সঙ্গে নিয়ে সমগ্র প্রদেশ ঘুরে দেখার সংকল্প করেছেন। তিনি বলেন, : 'এমন কি পাটনা শহর থেকে বিচার করা হলেও অনুমান করা কঠিন নয় যে, মফস্বলের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। কারণ গত দশদিন যাবৎ পাটনার রাস্তায় প্রতিদিন পঞ্চাশ থেকে ষাট জন লোক অনাহারে মারা গেছে।' একমাত্র শহরেই ৮ হাজারেরও বেশি ভিখারি রয়েছে এবং রাজা যদি প্রকাশ্যে তাদের খয়রাত দেয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে পাটনায় লোক চলে আসবে। রাজবাড়ির কাছের লোকদের মধ্যে তিনি প্রতিদিন পঞ্চাশ টাকার চাল বিতরণ করে থাকেন। কোম্পানি এই খরচ বহন করে। অনটন দূর না হওয়া পর্যন্ত, অথবা কোম্পানি ভিন্নরূপ আদেশ না দেয়া পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু থাকবে। গরিবদের সাহায্যের জন্য রাজা প্রায় দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মি. আলেকজান্ডার তা মঞ্জুর করতে রাজি হননি।

কাউন্সিল খাজনার জন্য টাকার বদলে ধান-চাল নেয়া সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মি. আলেকজান্ডারকে কেবলমাত্র অনন্যোপায় ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন।

২৮শে এপ্রিল, ১৭৭০—যারা স্বচক্ষে দেখেননি, তারা অনুমান করতে পারবেন না যে, মফস্বল এলাকা কতো তাড়াতাড়ি জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে। লোকের মনোবল এমনভাবে ভেঙে গেছে যে, পরিশ্রম করে অনাহারে ও দুর্দশা থেকে রেহাই পাওয়ার চেয়ে তারা এখন মৃত্যুবরণ করতেই ইচ্ছুক। আবাদ করার জন্য আমি সকল প্রকার উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করেছি এবং পরোয়ানা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছি যে, যে সকল জমিতে অর্জুনের চাষ করা হবে, সে সকল জমির খাজনা ছয় মাসের জন্য মওকুফ করে দেয়া হবে। অর্জুন এক ধরনের বিশেষ গম, আকারে খুব মোটা এবং খুব সস্তা; ভালো আবাদের বছরে টাকায় পাঁচ মণ দরে বিক্রি হয়।

জনসাধারণের দুর্গতি এখানে এতো বেড়ে যাচ্ছে যে, পাটনাতে একদিনেই ১৫০ জন লোক অনাহারে মারা গেছে। অবস্থা এরূপ শোচনীয় হওয়ায় এবং আপনারা আমাকে অনুমতি দেয়ায় কোম্পানির নামে আমি প্রতিদিন ৩৩০ সোনাত টাকা দান করছি, এই টাকার মধ্যে ১০০ রাজা, ৮০ মেসার্স স্টিফেনসন, ড্রজ, এন্ড ল কোম্পানি এবং ১৫০ আমি নিজে বিতরণ করে থাকি। এ ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে কাজ হচ্ছে বলেই আমার বিশ্বাস। দিনাজপুরের অফিসারগণ বেসরকারি ভাবে চাঁদা তুলে বহু লোককে খেতে দিচ্ছেন। ফরাসি ও ওলন্দাজ কারখানার মালিকরাও যথাসম্ভব সাহায্য দিচ্ছেন।

২৮শে এপ্রিল, ১৭৭০—প্রতিকূল মৌসুমের জন্য পূর্ণিয়া, রাজমহল ও বীরভূম জেলা এবং রাজশাহী জেলার একটি অংশই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঢাকা এবং পূর্বাঞ্চলে যে সকল জেলায় বহু নদী-নালা মাটি সরস করে রাখে, কেবলমাত্র সে সকল জেলা থেকেই অনাবৃষ্টির কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় না।

অনাবৃষ্টির ফলে ভাগলপুরেও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতির সঙ্গে অন্যান্য ক্ষতি মিলিত হয়ে সেখানে মর্মান্তিক অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে। তাই খাজনা আদায়ের ব্যাপারে এই জেলায় উদার-নীতি অনুসরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

বীরভূম জেলার বাসিন্দাদের অবস্থা 'শোচনীয় এবং প্রায় বর্ণনার অতীত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনাবৃষ্টি অব্যাহত থাকায় দুঃখ প্রকাশ করে দেশের অবস্থা সম্পর্কে মি. বেচার বলেছেন : 'ঈশ্বর যদি এই অনাবৃষ্টি অব্যাহত রাখেন, তাহলে আপনাদের (সিলেক্ট কমিটি), উজিরদের এবং আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফেব্রুয়ারি মাসে যে বৃষ্টি হয়েছিলো, তার ফলে রায়তরা জমি চষতে সক্ষম হয়েছিলো। এখন আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোনার জন্য আরেক দফা বৃষ্টি দরকার। শিগ্‌গির যদি তারা এই সওগাত পায়, তাহলে আগামী ফসল বেশ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যদি না পায়, তাহলে দুর্গতির আর পরিসীমা থাকবে না। কোম্পানি খাদ্যদ্রব্য ও বৃষ্টির অভাবেই নয়, জেলার বহু জায়গায় খাবার পানির অভাবেও লোকদের সীমাহীন দুর্গতি ভোগ করতে হচ্ছে।'

২৮শে এপ্রিল, ১৭৭০—পূর্ণিয়ার ফৌজদার মোহাম্মদ আলি খান বলেন : 'প্রায় প্রতিদিনই ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক মারা যাচ্ছে। অনাহারে বহু লোক মারা গেছে এবং আরও মারা যাচ্ছে। লোকে বীজধান খেয়ে ফেলেছে, বা খাদ্য হিসেবে বেচে ফেলেছে। ছাগল-গরু, লাঙল-জোয়াল সবই বেচে ফেলা হয়ে গেছে। লোকে এখন সন্তান বিক্রি করতে চাচ্ছে; কিন্তু ক্রেতা নেই।' মোহাম্মদ আলী খান 'সরকারের স্বার্থে' লোকের দুর্দশা সম্পর্কে সরকারি কর্মচারীসুলভ 'দৃষ্টি ও শ্রুতিশক্তিহীনতা' প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

বিষ্ণুপুরের আমিল নবকিশোর বলেন, : 'বৃষ্টি না হওয়ায় এবং হ্রদ ও পুকুর শুকিয়ে যাওয়ায় ধানের ক্ষেত রোদে শুকিয়ে শুকনো খড়ের ক্ষেতে পরিণত হয়েছে।'

যশোরের আমিল উজাগর মাল বলেন : 'ভাদর মাসের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। লোকে গাছের পাতা খাচ্ছে এবং পুত্র-কন্যা বিক্রি করার চেষ্টা করছে। অধিকাংশ রায়তই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।'

রাজমহলের ফৌজদার প্রতাপ রায় একই ধরনের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন : 'খাজনা চাইলে লোকে গরু এবং যার গরু বেচা হয়ে গেছে, সে লাঙল এনে হাজির করছে। চারদিকে লোকের মর্মান্তিক আর্তনাদে কাছারির কাজে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।'

মি. ডুকারেল বলেন : 'পল্লী অঞ্চলের চেয়ে পূর্ণিয়া শহরের অবস্থা কোনো অংশেই কম শোচনীয় নয়। মহামারী ও মড়ক প্রতিরোধ করার জন্য অবিলম্বে মানুষের লাশগুলো সরিয়ে ফেলা দরকার। আমি এখানে আসার পর তিন দিনে এক হাজারেরও বেশি লাশ কবর দেয়া হয়েছে। অনাহারে চাষী ও খাজনাদাতাদের অন্তত অর্ধেক মারা যাবে। যাদের আহার কেনার সঙ্গতি থাকবে, তাদের শতকরা কমপক্ষে পাঁচশ' গুণ বেশি দাম দিতে হবে। উঁচু ও বেলে জমির এলাকায় অর্ধেকেরও বেশি রায়ত মারা গেছে।'

রাজমহলের মি. হারউড বলেন : 'জমিদাররা ধ্বংস হয়ে গেছে; গত বারো মাসে জমিতে অর্ধেক ফসলও হয়নি।' খাজনা হ্রাসের ফলে যে উপকার হয়েছে, তার বিবরণ দিতে গিয়ে মি. হারউড পরে ১৭৭০ সালের ২৮শে মার্চের চিঠিতে বলেছেন :

'রায়তদের দুর্গতির কথা যদি আরও আগে আপনাদের জানো হতো এবং তারা যদি এই উপকার যথাসময়ে পেতো তাহলে আপনাদের মহানুভবতা পুরোপুরি সফল হতো এবং আজ যে হাজার হাজার লোক নিঃস্ব হয়ে গেছে, তাদের অনেকেই প্রাচুর্য না হলেও সচ্ছলতা উপভোগ করতে পারতো। মিথ্যা সরকারি নীতির মুখোশ পরে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশীয় আদায়কারীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে এই দুঃসময়েও রায়তদের ওপর এমন কঠোর চাপ দিয়ে খাজনা আদায় করেছে যে, এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তবে বিপর্যয় এখন ক্রমে ক্রমে কেটে যাচ্ছে এবং ধান-চালের এখন তেমন অভাবও নেই, আর দামও খুব বেশি নয়।'

৩রা মে, ১৭৭০-মি. আলেকজান্ডার পাটনা থেকে জানিয়েছেন, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বেড়ে যাচ্ছে, মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেনাবাহিনীর রসদ যোগাতে গিয়ে জনসাধারণকে আরও দুর্দশায় পড়তে হচ্ছে।

এই চিঠির জবাব দিতে গিয়ে কমিটি বলেন : 'আপনার প্রতিবেশীরা যখন প্রাচুর্য-মৌসুমের সুফল উপভোগ করছে, সে সময় আপনি দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এই অপ্রীতিকর বৈপরীত্য ব্রিটিশ নীতির কৃতিত্বের পক্ষে সম্ভবত ক্ষতিকর। আপনার যোগ্যতা ও সদাসতর্কতা সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ নেই; কিন্তু এই দেশের সরকার দারিদ্র্যের নিরাপত্তার জন্য এমন অপূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করেছেন যে, প্রতিরোধের জন্য অস্বাভাবিক রকমের কোনো চেষ্টা না করা হলে এ জাতীয় বিপর্যয়ে ক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহার প্রায় স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে থাকে।'

৯ই জুন, ১৭৭০—দরবারের রেসিডেন্ট লিখেছেন : 'অনাহার, যন্ত্রণা ও দুর্দশার যে ভয়াবহ দৃশ্য এখনো দেখা যাচ্ছে, তা বর্ণনার অতীত—সমগ্র মানবতার পক্ষে ভীতিপ্রদ, বীভৎস। কোনো কোনো জায়গায় জীবিত মানুষ মৃত মানুষের গোশত খেয়ে জীবনধারণ করেছে। যে সকল জেলায় সবচেয়ে বেশি দুর্গতি দেখা দিয়েছে, সেখানে গত কয়েক মাসেই প্রতি ১৬ জনের মধ্যে ৬ জন লোকই মারা গেছে।'

২১শে জুন, ১৭৭০—দরবারে রেসিডেন্ট জানাচ্ছেন : 'দুঃখ-দুর্দশা প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে। চাল টাকায় মাত্র ছয়-সাত সের দরে বিক্রি হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে কয়েকদিন বাজারে আদৌ ধান-চাল পাওয়া যায়নি। বাকেরগঞ্জ থেকে চাল সরবরাহ করা না হলে বহু লোক, এমন কি কোম্পানিরও বহু লোক মারা যেতো। এখন বৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশ ভেসে যাবে বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু বৃষ্টি হলেও লোকজন নেই, গরুবাছুর নেই, এমন কি বীজধানও নেই; অতএব আবাদ হবে কেমন করে! সামনের আদায়ও তাই ভালো হবে বলে মনে হয় না।'

১৯শে জুলাই, ১৭৭০—দরবারের রেসিডেন্ট জানিয়েছেন : 'জনসাধারণ এখন যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছে, তার কাছে আমার পূর্ববর্তী সমস্ত রিপোর্ট ক্ষীণ ও খর্ব হয়ে গেছে। শহরের ত্রিশ মাইল এলাকার মধ্যে চাল টাকায় মাত্র তিন সের দরে বিক্রি হচ্ছে; অন্য খাদ্যশস্যের দামও অনুরূপভাবে বেড়ে গেছে এবং এমন কি এই চড়া দামেও দৈনিক অর্ধেক বাসিন্দার উপযোগী খাদ্যশস্যও বাজারে আসে না। ফলে মুর্শিদাবাদ শহরেই প্রতিদিন প্রায় পাঁচশ' লোক অনাহারে থাকে এবং গ্রামাঞ্চলে যে

অনাহারে প্রতিদিন কতো বেশি লোক মারা যায়, তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিপর্যয়ের তীব্রতা হ্রাসের জন্য দেশীয় উজিরগণ ও আমি নিজে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আসন্ন ফসল ভালো হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং আমরা জেনে সুখী হয়েছি যে, আমাদের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের দুর্গতি আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। ফসল কাটার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক লোক যদি ততোদিন বেঁচে থাকে, তাহলে এক মাসের মধ্যে নতুন ফসল উঠবে এবং সম্ভবত আমাদের দুর্দিনের অবসান হবে; কিন্তু ইতোমধ্যে যতো লোক মারা যাবে বলে আমি বুঝতে পেরেছি এবং প্রতিদিন চারদিকে যে অসংখ্য লোকের মৃত্যু চোখের সামনে দেখছি, তার ফলে মানুষ হিসেবে আমার অনুভূতি করুণতম হয়ে উঠছে এবং কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে রাজস্ব আদায়ের অবস্থা সম্পর্কে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠছি।'

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১—কমিটি গোপন মন্তব্য : 'বাকেরগঞ্জ থেকে আমদানি করা চাল বিক্রি করে মোট ৬৭,৫৯৩ টাকা মুনাফা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ ট্রেজারি থেকে চাল কেনার জন্য যে, ১,২৪,৮০৬ টাকা নেয়া হয়েছিলো, তার মধ্য থেকে মুনাফার টাকা বাদ দিলে ৫৭,২১৩ টাকা অবশিষ্ট থাকে। এই টাকা, অর্থাৎ কোম্পানির মূল চাঁদার (৪০,০০০ টাকা) চেয়ে মাত্র ১৭,২১৩ টাকা বেশি খরচ করেছে। নবাব প্রথমেই কোম্পানির চেয়ে বেশি চাঁদা দিয়েছিলেন (৪৭,০০০ টাকা)। তিনি ও তার উজিরগণ উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। অতএব তাদের কাছে আর টাকা দাবি করা উচিত নয়।'

দরবারের রেসিডেন্ট মি. বেচার ১৭৭০ সালের ২৪শে ডিসেম্বরের এক রিপোর্টে বলেন : 'এই চাল সঙ্কটকালে এসে পৌঁছায় এবং আমি সানন্দে লক্ষ্য করি যে, কোম্পানির অনেক সুবিধা হয়েছে (অর্থাৎ প্রায় ৭০০০ পাউন্ড মুনাফা হয়েছে)। এই পদক্ষেপের ফলে এখানকার ইংরেজ পরিবারগুলো যথেষ্ট সাহায্য লাভ করে এবং দুঃসময়ে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার সহায়ক হয়। আমার বিশ্বাস, এই চাল না এলে এবং আমি যথাসময়ে গুদাম থেকে সরবরাহ না করলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। আমি এখন দুর্ভিক্ষের সময় মুর্শিদাবাদে শহর ও শহরতলির হতভাগ্য লোকদের মধ্যে চাল বিতরণের বিষয়টি উল্লেখ করবো। আমার আবেদনক্রমে কমিটি ৮৭ হাজার টাকার চাল বিতরণ করতে রাজি হন এবং কোম্পানির তহবিল থেকে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। অবশিষ্ট ৪৭ হাজার টাকা নবাব ও তার উজিরদের কাছে চাওয়া হয় এবং তারা তা দিয়ে দেন।'

অতঃপর মি. বেচার দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের দানশীলতার বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, দুর্ভিক্ষের শেষের দিকে চালের দাম বেড়ে গিয়ে পাউন্ডপ্রতি ৪ পেন্স হয়েছিলো।

ষষ্ঠ সর্গ—দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গীয় কাউন্সিলের কর্মপন্থা সম্পর্কে কোর্ট অফ ডিরেক্টরের অভিমত

১৭৭১ সালের ২৮শে আগস্টের চিঠি—দুর্ভিক্ষের নির্মমতা হ্রাসের জন্য যারা সামান্যতম কাজও করেছিলেন, কোর্ট সাধারণভাবে তাদের প্রত্যেকের প্রশংসা করেন; কিন্তু

জনসাধারণের এই দুর্দশাকে যারা ব্যক্তিগত মুনাফার উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন (বিশেষত ইংরেজগণ), তারা তাদের তীব্র নিন্দা করেন।

'১০। মি. বেচার ও মোহাম্মদ রেজা খানের চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে—ইংরেজদের গোমস্তাগণ' (অর্থাৎ কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিগণ)' কেবলমাত্র ধান-চালের কারবারে একচেটিয়ে অধিকারই প্রতিষ্ঠা করেননি, তারা গরিব রায়তদের পরবর্তী মৌসুমের বীজধান বেচে ফেলতেও বাধ্য করেছেন। এ সকল চিঠি পড়ার পরই এ ব্যাপারে আমরা এই মনোভাব গ্রহণ করেছি। আমরা স্বভাবতই আশা করি যে, এ জাতীয় কাজ যারা করতে পারে, তাদের নাম-ধাম সম্পর্কে কঠোরতম তদন্ত করা হবে এবং যারা কোম্পানির মহানুভবতা ক্ষুণ্ন করতে সাহসী হয়েছে এবং যাদের মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তনাদ বর্ণনাতীত রূপে মর্মস্পর্শী বলে আমরা জানতে পেরেছি, সেই দেশীয় লোকদের মর্মান্তিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা মুনাফা করার কথা কল্পনা করতে পেরেছে, সেই সকল অপরাধীকে নির্মমতম শাস্তি দেয়া হবে।

'১১। এরূপ সাধারণভাবে অভিযোগ হওয়া সত্ত্বেও এবং মি. বেচার অথাব মোহাম্মদ রেজা খান একটিমাত্র নামও উল্লেখ না করা সত্ত্বেও, আপনারা আদৌ কোনারকম তদন্ত শুরু না করায় আমরা যে কতোখানি বিস্মিত হয়েছি, তা সম্ভবত আপনারা অনুমান করতে সক্ষম হবেন! আরও অদ্ভুত ও হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আপনারা দরবারের রেসিডেন্টকে বলেছেন—'এই দুর্দিনে গরিব জনসাধারণের দুর্দশা মোচনের জন্য গৃহীত প্রত্যেকটি ব্যবস্থা আপনারা অনুমোদন করবেন, অথচ এই উদ্দেশ্যে তিনি যে একটিমাত্র প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ ও সুপারিশ করেছেন, তা আপনারা বাতিল করে দিয়েছেন। ... অভিযোগের একটি অংশে ইউরোপীয় একচেটিয়া কারবারিদের কাছে ধান-চাল বিক্রি করার জন্য রায়তদের বাধ্য করার বিষয় উল্লেখ থাকায় আমাদের সন্দেহ হওয়ার কারণ আছে যে, এই ব্যবসায়িগণ কোম্পানির কোনো কোনো পদস্থ কর্মচারী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না, তা না হলে আমাদের বিশ্বাস, তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কিত তদন্ত প্রতিরোধ করার মতো পর্যাপ্ত প্রভাব তাদের আছে বলে তারা ধরে নিতো না।'[৩]

---

৩. সকল কাগজপত্র থেকে এই উদ্ধৃতিগুলো নিয়েছি, ভারত-সচিব (সেক্রেটারি অফ এস্টেট ফর ইন্ডিয়া) মেহেরবানি করে সেগুলো আমাকে দেখতে দেয়ায় আমি তার কাছে ঋণী। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব কাগজপত্রে সে বিবরণ আছে। তা এতো সংক্ষিপ্ত যে, প্রকাশের উপযোগী নয়।

গ পরিশিষ্ট

বাবুর্চি কথিত বীরভূমের কাহিনী

(১৭৮৫—১৮২০)

৮০ বছর বয়স্ক রাম গোলাম বাবুর্চির বিবরণ

[এই কাহিনীতে 'সাহেব' শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। দেশীয় লোকেরা ইংরেজদের নামের পরে এই সম্মানসূচক শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।]

বীরভূমের প্রথম ইংরেজ কর্তা ছিলেন কিটিং সাহেব; আমার বাপ তার বাবুর্চি ছিলেন এবং তাকে দেখেছি। তিনি যখন হাতির পিঠে চড়ে সেপাই সঙ্গে করে যেতেন, তখন তাকে দেখার জন্য মা আমাকে দুই হাতে উঁচু করে ধরতেন। তখন বীরভূমের রাজাদের আমল ছিলো। তাদের খুব নামডাক ছিলো; তাদের বহু হাতি-ঘোড়া ও সৈন্য ছিলো এবং তাই দিয়ে তারা লড়াই ও শিকার করতেন। রাজনগরে তাদের একটি রাজবাড়ি ছিলো; আর একখানা সুন্দর বাগান ছিলো। সেই বাগানে তাদের সমাধি ছিলো; কিন্তু এখন সব জঙ্গল হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকের পাহাড়ে তাদের অনেক দুর্গ ছিলো; আর হোসেনবাদে একখানা গরমকালের বাড়ি ছিলো। সে সব এখন মাটির তলায় বসে গেছে। কালেক্টরের বাড়ির পেছনে সবুজ ঘাসে ঢাকা যে মাটির গড় দেখা যায়, ঐখানটায় গরমকালের বাড়িখানা ছিলো। বাপকে আমি বলতে শুনেছি যে, মহারাজ কিটিং সাহেব খুব বড়ো সাহেব; কিন্তু আমি তখন খুব ছোটো ছিলাম, ওসব বুঝতাম না। বাপ খুব বুড়ো ছিলেন; তিনি আমাকে বলতেন যে, তার যখন বিয়ে হয় সে সময় সাহেবরা এদেশে আসে, আর কিছুদিনের মধ্যেই চালের দাম বেড়ে গিয়ে টাকায় মাত্র তিন সের হয় (অর্থাৎ ১৭৭০ সালের মন্বন্তরের সময়); ফলে সব লোক মারা যায়, আর দেশ জঙ্গল হয়ে যায়। তিনি আমাকে আরও বলতেন যে, পশ্চিম দিক থেকে বর্গীলোক (মারাঠা) এসে বহু বাজার জ্বালিয়ে দেয় আর বহু লোক মেরে ফেলে। একদিন তারা আমার বাপকে ধরে হাত-পা বেঁধে ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে তাকে তাদের ছাউনিতে নিয়ে যায়। আমার ফুফু গিয়ে সর্দারদের কাছে কান্নাকাটি করায় তারা তাকে ছেড়ে দেয়। কিটিং সাহেবেরও আগে হেসিলরিজ সাহেব ও পাই সাহেব এসেছিলেন; কিন্তু পাই সাহেব অনেক দূরে থাকতেন; আর হেসিলরিজ সাহেব এসেই সমস্ত জঙ্গল সাফ করে ফেলেন, ফলে রায়তরা আবার আবাদ করতে শুরু করে।

যে প্রথম সাহেবের কথা আমার ভালো করে মনে আছে, তিনি হচ্ছেন জজ ব্রুক সাহেব। এখন যেখানে জজ সাহেবের বাড়ি, তার কাছেই তার বাড়ি ছিলো। আমার চাচা ব্রুক সাহেবের বাবুর্চি ছিলেন; আমার মনে আছে, আমি যেদিন প্রথম সেই বাড়িতে যাই, সেদিন দেখতে পাই যে, মেম সাহেব ব্রুক বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন আর কাঁদছেন। শুনলাম, তার ছোট মেয়েটি মারা গেছে; কিসে মারা গেছে, তা আর আমার মনে নেই। সাহেব ও মেম সাহেব যখন মেয়েটিকে কবর দিচ্ছিলেন, তখন চাচা হাত ধরে আমাকে সেখানে নিয়ে যান। আরও অনেক সাহেব সেখানে ছিলেন; কেবল ডাক্তার সাহেব ছিলেন না; চিপ সাহেবের ছেলেমেয়ের চিকিৎসার জন্য তিনি সুরুলে গিয়েছিলেন। মেয়েটিকে বাগানের ধারে একটা তেঁতুল গাছের তলায় কবর দেয়া হয়েছিলো; সাহেবরা কবরের শিয়রে একখানা সাদা পাথর পুঁতে দিয়েছিলো; পাথরখানা এখনো আছে।

আমি চিপ সাহেবকেও চিনতাম। কিটিং সাহেব চলে যাওয়ার পর আমার বাপ তার বাবুর্চি হয়েছিলেন। চিপ সাহেব ছিলেন কোম্পানির সওদাগর (কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট)। পাহাড়ের ওপর তার মস্ত বড়ো বাড়ি ছিলো; বাড়ির চারদিকে খুব উঁচু দেয়াল ছিলো— কোলকাতার দুর্গের দেয়ালের চেয়েও উঁচু। দেয়ালের মধ্যে অনেক ঘর-বাড়ি, গুদাম, আর ফুল-ফলের বাগান ছিলো; সেই বাগানে নানা জাতের ফল হতো। গুদামে কোম্পানির কাপড় থাকতো। কোম্পানির গোমস্তা ও কেরানিদের গ্রামখানাও দেয়ালের মধ্যে ছিলো। সেপাইরা সবসময় কোম্পানির গুদাম পাহারা দিতো। কোম্পানির ছোটোখাটো কর্মচারীরা পাহাড়ের গোড়ায় একটা বাজারে থাকতো। চিপ সাহেব খুব ধনী ও ক্ষমতাবান ছিলেন; তার অনেক ছেলেমেয়ে ছিলো, তবে মেয়েই বেশি; প্রত্যেকটি ছেলে ও মেয়ের জন্য আলাদা আলাদা চাকর ছিলো। সাহেব ও মেম সাহেব যখন খানা খেতেন, তখন ছয়জন খেদমতগার সেখানে হাজির থাকতো। তার বাড়িতে মোট ষাটজন চাকর ছিলো। তার অনেক ঘোড়া ছিলো, আর তিনি নানা জাতের পাখি পুষতেন। বাড়ির প্রমোদ-কাননে হরিণ ঘুরে বেড়াতো। মেম সাহেব ফুল খুব ভালোবাসতেন। চিপ সাহেব সত্যিই খুব বড়ো সাহেব ছিলেন। আমি তার বাবুর্চিখানাতেই কাজ শিখেছি।

কিছুদিন পরে নদীর ধারে এলমবাজারে আরস্কিন সাহে নামে একজন সাহেব এসেছিলেন। তিনি খুব বেশিদিন আগে মারা যাননি। তিনিও খুব বড়ো সাহেব ছিলেন; চিপ সাহেবের সঙ্গে তিনি অংশীদারী কারবার করতেন। তারা কাপড়, চিনি, রেশম, লাক্ষা প্রভৃতি জিনিসের কারবার করতেন; আর মোটা পয়সা কামাতেন। চিপ সাহেবের বাবুর্চিখানায় কাজ শেখা হয়ে যাওয়ার পর আমাকে একদিন এলমবাজারে পাঠিয়ে দেয়া হয়; আরস্কিন সাহেবের বাবুর্চির অসুখ হয়েছিলো বলে আমি কিছুদিন তার জায়গায় কাজ করি; কিন্তু আরস্কিন সাহেবের বাবুর্চিখানা চিপ সাহেবের বাবুর্চিখানার মতো অতো বড়ো ছিলো না।

আমি যখন সুরুলে ও এলমবাজারে ছিলাম, তখন শিউড়িতে অনেক সাহেব এসেছিলেন-গিয়েছিলেন। তাদের বাবুর্চিখানায় আমি কাজ করিনি; তাদের আমি

চিনতামও না। কেম্বল সাহেব, টিকরি সাহেব, চালবান সাহবে, রেলি সাহেব, মরিসন সাহেব ও বিক্টো সাহেবের নাম আমার মনে আছে। মরিসন সাহেব এখানে বারো বছর ছিলেন। তাদের আমি ভালো করে চিনতাম না। (কয়েকটি নাম এমন বিকৃত হয়ে গেছে যে, আমি মূল নাম অনুমানই করতে পারছি না।)

সব জিনিসই তখন সস্তা ছিলো। দেড় পয়সায় (আধা-পেনি) বড়ো ভোজ (বড়ো খানা) হয়ে যেতো। (এটা কথার কথা, তবে পরে যা বলা হয়েছে, তা সত্য) এক টাকায় (দুই শিলিং) বত্রিশটি বড়ো মোরগ পাওয়া যেতো। ছোটো মুরগি টাকায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি, আর হাঁস টাকায় ষোলো থেকে পঁচিশটি পর্যন্ত পাওয়া যেতো। একটা ছোটো ভেড়ার দাম ছিলো তিন আনা (সাড়ে চার পেন্স); আর বড়ো ভেড়ার দাম ছয় আনা। চাল পাওয়া যেতো এক টাকায় ষাট থেকে একশ' পাউন্ড। (ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ সের) সব জিনিসের দামই কম ছিলো, তবে চাকর-বাকরদের বেতন বেশি ছিলো। আমার বাপ প্রধান বাবুর্চি হিসেবে বিশ টাকা পেতেন; খেদমতগাররা পেতো আট টাকা করে; আর কুলিরা পেতো দৈনিক চার থেকে সাত পয়সা করে। এই টাকায় তারা অনেক জিনিস কিনতে পারতো আর খুব আরামে থাকতো। সাঁওতালরা তখনো কাগজের খোঁজে সমতল ভূমিতে আসেনি; ফলে বাউরি ও হাঁড়িরা প্রচুর কাজ পেতো। সাঁওতালরা তখন পশ্চিম দিকে পাহাড়ের গোড়ায় জঙ্গল কাটতো; এখন তারা সারা জেলাতেই কাজ করে। গরিবদের হাতে টাকা ছিলো না, তারা কড়ি দিয়ে বেচা-কেনা করতো। একজন কুলি একদিনের মজুরি হিসেবে চার থেকে ছয় পণ (৩২০ থেকে ৪৮০) কড়ি পেতো। লোকজনও তখন খুব কম ছিলো। চাষীদের অনেকেরই নিজস্ব আবাদি জমি ছিলো, তবে তাদের জমিতে কিছু কিছু কৃষাণও কাজ করতো। চাষী জমি দিতো, বীজধান দিতো ও লাঙল-গরু দিতো এবং ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পেতো; আর কৃষাণ শুধু গতরে খেটে এক ভাগ পেতো। এভাবে তখন জঙ্গলের জমি আবাদ করা হতো। পাহাড় থেকে সাঁওতাল ও অন্য পাহাড়িরা আসার পর কৃষাণদের সংখ্যা বেড়ে যায়. এখন জেলার সর্বত্রই কৃষাণ আছে। আজকাল অনেক জায়গায় কৃষাণদেরই লাঙল-গরু দিতে হয়; কিন্তু ফসল তারা সেই আগের মতোই তিন ভাগের এক ভাগ পায়। তাদের দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে। আগে সমস্ত চাষীই জমি সংগ্রহ করতো পারতো; কিন্তু আজকাল অনেকে কৃষাণ হিসেবেও জমি পায় না; ফলে তাদের দিন-মজুর হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে।

আমি যখন বালক ছিলাম, তখন আদালত ও অন্যান্য সরকারি অফিস রেড-হাউস গ্রামে ছিলো। এখন পাদ্রি সাহেব (মিশনারি) যেখানে থাকেন, গ্রামটি তার কাছেই ছিলো। সদরে তখন সামান্য কয়েকজন সাহেব থাকতেন,—কালেক্টর, জজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ও ডাক্তার; মাত্র এই ক'জন। আর কোনো সাহেব ছিলো কিনা আমার মনে নেই। সাত বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়; কিন্তু আমার বৌকে তার বাপ-মা গোয়াড়ী (কৃষ্ণনগর) নিয়ে যায়; তারপর আমার বয়স তখন বিশ বছর, সে সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়; ইতোমধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। ঠিক এই সময় অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ক্লার্ক সাহেবের কুঠিতে আমি নিয়মিত কাজ পাই। তিনি লাইনে (ক্যান্টনমেন্ট) অনিন্দপুর হাউসে থাকতেন। বাড়িটা এখন ভেঙে-চুরে গেছে। সদরে তখন একটিমাত্র

ছোটো রাস্তা ছিলো; এই রাস্তার দুই পাশে ঘরবাড়ি ছিলো। ক্লার্ক সাহেব গোয়াড়ী বদলি হলেও আমিও গোয়াড়ী যাই। তিনি আগে পালকিতে চলে যান। আমি পরে অন্য চাকর-বাকরদের সঙ্গে মালপত্তর নিয়ে যাই। আমাদের সঙ্গে একজন পাহারাদার ছিলো। কিছু পথ আমরা গরুগাড়িতে করে মালপত্তর নিয়ে যাই; কিন্তু গরুগাড়ি চলার পথ সব জায়গায় ছিলো না; তাই অধিকাংশ পথই আমরা সমস্ত মালপত্তর পিঠে ও মাথায় করে নিয়ে যাই। আমরা লামপুর ও কিরিনাহার হয়ে কাটোয়া যাই এবং সেখান থেকে নৌকায় কৃষ্ণনগর যাই। আমার মনে আছে, মোট আমাদের ষোল দিন সময় লেগেছিলো। এ এলাকায় তখন সরকারি রাস্তা ছিলো না; তবে প্রত্যেক জমিদার তার নিজস্ব এলাকায় একটা করে হাঁটা-পথ তৈরি করেছিলেন। আমরা যখন যে জমিদারের এলাকা দিয়ে যেতাম, তখন সেই এলাকায় চৌকিদাররা অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টরের মাল পাহারা দেয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার শেষ সীমা পর্যন্ত যেতো।

[রাম গোলাম বাবুর্চি তার কাহিনী বলে যেতো আর আমি হিন্দুস্থানিতে লিখে নিতাম; কিন্তু এই পর্যন্ত বলার পর সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তারপর সে সুস্থ হওয়ার আগেই আমি জেলা ছেড়ে চলে আসি। এই বর্ণনার মধ্যে নিখুঁত নির্ভুলতার সন্ধান করা সম্ভবত সঙ্গত নয়; তবে অন্য প্রাচীন বাসিন্দাদের কাছ থেকে আমি যে সকল কাহিনী সংগ্রহ করেছি, এই কাহিনীটি নিঃসন্দেহে তার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা।—লেখক]

ঘ পরিশিষ্ট

পণ্ডিত রচিত বীরভূমের কাহিনী

আমার পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় কিংবদন্তী, সংস্কৃত পুঁথি ও সম্ভ্রান্ত বংশের পারিবারিক কাগজপত্র থেকে আমার জন্য বাংলা ভাষায় এই বিবরণটি রচনা করেন।

ভূমিকা

ঐতিহাসিক তথ্য নিখুঁতভাবে পরিবেশনের চেষ্টা না করেই আমি এই কাহিনী এবং পরবর্তী পরিশিষ্টে বিষ্ণুপুরের কাহিনী উদ্ধৃত করছি। এগুলো স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে একজন দেশীয় বিদ্বান লোকের ধারণার উৎকৃষ্ট নমুনা। এ জাতীয় অন্যান্য বিবরণের মতো এই বিবরণেও মাঝে মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের আগে জনসাধারণের মাঝে অবস্থা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অধিকার সম্পর্কে মূল্যবান ইঙ্গিত আছে।

জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে যারা অনুসন্ধান করে থাকেন, তারা 'ঘ' ও 'চ' পরিশিষ্টে বর্ণিত পুঁথি থেকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রমাণ পাবেন : প্রথমত, আর্যদের আগমনের আগে বাংলাদেশে কৃষক ও পশুপালক জাতি তাদের নিজ নিজ দলপতিদের অধীনে বাস করতো; দ্বিতীয়ত, আর্যরা সর্বদা বিজয়ী হিসেবেই নয়, অন্যান্য ক্ষমতায়ও বাংলাদেশে জায়গা পেয়েছে; তৃতীয়ত, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আর্যদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পাশাপাশি বহু আদিম রাজার রাজ্য বহাল ছিলো এবং কোনো কোনো আর্য রাজা আদিম জাতির লোকদের নিয়ে সেনাবাহিনীও গঠন করেছিলেন এবং চতুর্থ, উত্তর দিক থেকে পরপর বহু আর্য আসায় বাংলাদেশে আর্যদের বিস্তার ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই সম্পন্ন হয়েছিলো এবং অনার্যরা সমতলভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ার অথবা আর্যদের দাসে পরিণত হওয়ার আগে বহুকাল যাবৎ আর্যদের ভাষা ও ধর্মকে প্রভাবিত করেছিলো।

পণ্ডিতের বিবরণ

পুরাণের ভৌগোলিক বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, পাণ্ডার দেশের শেষ সীমা বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো এবং আধুনিক বাংলাদেশ, বীরভূম, জঙ্গল-মহল, রাজমহল, মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ, দিনাজপুর, মেদিনীপুর, নদীয়া ও

নবদ্বীপ এই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। দেশের নাম অনুসারে বাসিন্দাদের পাণ্ডারি বলে অভিহিত করা হতো। আদিশ্বর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে এনেছিলেন, গৌড়ের রাজা বল্লাল সেন তাদের বংশধরকে বরেন্দ্র ও রাঢ়ী, এই দুই বর্ণে বিভক্ত করেন। এই দু'টি বর্ণই কুলীন ছিলো। রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় বাসবাস করতো এবং এই জায়গাগুলো নিয়ে ভুবানন্দ সেন একটি পৃথক রাজ্য গঠন করেন। সেন অথবা পাল বংশের রাজত্বকালেই বিষ্ণুপুরের আদি রাজারা পাহাড়ি এলাকায় একটি রাজ্য স্থাপন করেন। আদিশ্বরের উত্তরাধিকারীরা যে সকল পৃথক পৃথক রাজ্য স্থাপন করে, সে সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। প্রত্যেক রাজাই প্রবল প্রতাপের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন এবং উৎপীড়ন না করলেও রাজ্যের সামন্তদের পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

বীরভূম নামের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে যে, বিষ্ণুপুরের রাজা পোষা বাজপাখির সাহায্যে শিকার করার জন্য তার রাজ্যের পাহাড়ি এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে একটি বাজকে তিনি একটি বকের পিছনে লেলিয়ে দেন; কিন্তু বকটি পালানোর চেষ্টা না করে মহাবিক্রমে পালটা আক্রমণ চালায় এবং বাজকে কাবু করে ফেলে। এই অস্বভাবিক ঘটনায় রাজা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি অনুমান করেন যে, এখানকার মাটিতে নিশ্চয়ই এমন কোনো রহস্যময় গুণ আছে, যার ফলে এই অসম্ভব হয়েছে; এ মাটি সত্যই বীর মাটি এবং এই মাটিতে যা কিছু ফলানো যাবে, তার সমস্ত কিছুর মধ্যেই বীরোচিত শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শন পাওয়া যাবে। তাই তিনি এই এলাকার নাম রাখেন বীরভূমি এবং এই নামই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে; কিন্তু অনেকে বলেন, প্রাচীনকালে বহু বীর পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলো বলে জায়গাটির নাম বীরভূমি (বা বীরভূম) বা বীর পুরুষের দেশ[১], নামে অভিহিত হয়। জেলার বর্তমান রাজধানীর নাম শিউড়ি বা সুরি; এই শব্দটি সূর্য (অর্থাৎ গৌরব) শব্দের বিকৃত রূপ।

বীরভূমের উত্তরে মুংগের ও রাজমহল, দক্ষিণে বর্ধমান ও পাচেট (বাঁকুড়া), পূর্বে রাজশাহী এবং পশ্চিমে মুংগের ও পাচেট অবস্থিত। মুসলমান আমলে আবুল ফজল এই এলাকাটির নামকরণ করেন 'মাদারান'। প্রাচীনকালে এখানে পানির খুব অভাব ছিলো; তাছাড়া অধিকাংশ জায়গা জঙ্গলে ঢাকা থাকায় চাষ-আবাদের তেমন সুযোগ ছিলো না।

মুসলমান আমলে 'ঝাড়-বন্দি' নামক পাহাড়ি উপজাতিরা প্রায়ই বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালিয়ে লুটতরাজ করতো। এই উৎপাতের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য শেরশাহ আদুলার পুত্র বদরুল্লার ওপর শিউড়িরে দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৫৪০ সালে শেরশাহ পাঁচ লক্ষ আফগান সৈন্যের সাহায্যে কনৌজে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন এবং দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরের বছর গৌড়ে এসে সমগ্র গৌড়কে তিনি কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক জেলায় একজন করে শাসক নিয়োগ

---

১. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বীরভূমের আদি ভাষা সাঁওতালিতে ভীর বা বীর শব্দের অর্থ জঙ্গল।
—লেখক।

করেন। এই শাসকদের উপরে একজন সুবাদার নিযুক্ত হন; তিনি বিভিন্ন জেলার মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করতেন এবং শাহী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।

শিউড়ির পূর্ব দিকে আকচোকরা নামে একটি গ্রাম আছে। কথিত আছে যে, জতুগৃহ থেকে পলায়নের পর পাণ্ডবরা এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলো। পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতার এক ভ্রাতা ভীম এই জায়গায় হিড়ম্বক নামক এক দৈত্যকে হত্যা করেন (সম্ভবত আর্যদের বাংলা জয়ের একটি কিংবদন্তী) এবং তার বোন হিড়িম্বাকে বিয়ে করেন। হিড়িম্বার গর্ভে তার ঘটোৎকচ নামে এক ছেলে হয়; এই ছেলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং মহাভারতে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। অনেকের মতে নিমাই, ঘোড়দহা, গোনুটিয়া ও কটেশ্বর আকচোকরার অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং ভীম তার স্ত্রী ও মাকে নিয়ে সেখানে বাস করতেন। বীরভূমে দেওঘর নামে একটি জায়গা আছে; লংকায় যাওয়ার পথে রামচন্দ্র এখানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্য একটি গ্রামে বকেশ্বর নামে একটি শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে গ্রামটির নামও বকেশ্বর হয়ে যায়। এখনো প্রতি বছর এপ্রিল মাসে এখানে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। বৈদ্য বংশের রাজত্বকালের ইতিহাসে কেবলমাত্র বিষ্ণুপুর ও বর্ধমানের রাজাদেরই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। লৌশান, ইচাই ঘোষ, শুংগাই, গিধড় (এই সকল নাম সম্ভবত আদিম অনার্য রাজাদের), মল্লার সিং, বীর সিং প্রভৃতি বীরভূমের রাজাদের সম্পর্কে একমাত্র নামগুলো ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না।

বীরভূমের পাহাড়ি এলাকায় বর্বর উপজাতিদের বাস ছিলো এবং ছোটোখাটো রাজারা সমতল ভূমিতে বাস করতেন। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বীর সিং ও চৈতন্য সিং নামে দুই ভাই এসে পাহাড়িদের পরাজিত করে রাজ্য স্থাপন করেন। তাদর রাজধানীর জায়গাগুলো এখনো বীর সিংপুর, চৈতংগতর ও চৈতংগ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ফতে সিং নামে বীর সিং-এর আরেক ভাই মুর্শিদাবাদের বহু জায়গা দখল করেন; এ এলাকাটি এখন বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত এবং ফতেপুর পরগনা নামে পরিচিত।

বীর সিংই ছিলেন বীরভূমের প্রথম হিন্দুরাজা। তিনি খুব দীর্ঘদেহী ও বলবান ছিলেন এবং শক্তিবলে পাহাড়িদের দলে এনে রাজ্যের এলাকা বিস্তার করেছিলেন। তিনি তার ভাইকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করেন, রাজধানী বীর সিংপুর গড়ে তোলেন। তার অধীনে বহু সামন্ত ও জমিদার ছিলো এবং তারা সকলেই তাকে রাজা বলে মানতো। শিউড়ির ছয় মাইল পশ্চিমে বীর সিংপুরে এখনো রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও দিঘির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। রাজা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান এবং রানী অবমাননার ভয়ে দিঘির পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করেন। এই দিঘিটি এখনো রানীদোহা (রানীর পুকুর) নামে পরিচিত। বীর সিং একটি কালীমন্দির স্থাপন করেন এবং সেখানে কালীদেবীর একটি প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বীর সিংপুরের কাছে তিনি একটি কৃষ্ণমূর্তি (গোপাল) প্রতিষ্ঠা করেন এবং জায়গাটির চারদিকে জঙ্গল থাকায় স্থানটির নাম বৃন্দাবন হয়ে যায়।

কোল, ভীল, গণ্ড প্রভৃতি পাহাড়ি জাতি মগধ রাজ্যে (বিহার ও বাংলা) বাস করতো এবং বীরভূমও এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই রাজ্যের অধীনে বিরাট এলাকা

ছিলো কিন্তু সুশাসন ছিলো বলে মনে হয় না; কারণ রাজধানীর নিকটবর্তী এলাকার জমিদারদের মধ্যেও অনেকে রাজাকে কর দিতো না; অর্থাৎ আর্যদের বিজয় এখানে আংশিক মাত্র ছিলো। একজন সামন্ত ভালো শিকারী হওয়ায় তাকে কর থেকে রেহাই দেয়া হয়। মগধ বংশের পতনের পর পাল বংশ ক্ষমতায় আরোহণ করে; তাদের আদি রাজধানী ছিলো বিহারে। পালদের পর বৈদ্য বংশ ক্ষমতা লাভ করে।

বীরভূমের সাঁওতালরা দুমকা, জলঝরি ও কুমারবাদের পাহাড়ে বাস করে। তাদের দেবতার নাম 'বোরাম' (মারাং-বুরু) এবং এই দেবতার উদ্দেশে তারা একসময় নরবলি দিতো। একবার তাদের এলাকায় মহামারী হওয়ায় তারা নরবলি দেয়া বন্ধ করে এবং ছাগল, শূকর ও অন্যান্য পশু বলি দিতে শুরু করে। বোয়ালিয়া নামক পাহাড়িরাও একই দেবতার পূজা করতো। রাজা কৃত্তিচন্দ্রের আমলে বহু বোয়ালিয়া বর্ধমানে বাস করতো এবং রাজদরবারে কুলির কাজ করতো। বর্ধমান ও কোলকাতায় এখানো বহু বোয়ালিয়া কুলি দেখা যায়। বীরভূমের উত্তর-পশ্চিমের জঙ্গলে বীরপোড় নামে একটি অসভ্য উপজাতি বাস করে। তারা গাছের ছাল দিয়ে একরকমের শক্ত দড়ি প্রস্তুত করে এবং এই দড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা বানর, কুকুর ও শূকরের গোশত খায় এবং হাতির পূজা করে। এই সকল বর্বর উপজাতি ও বন্য জন্তু সমতল ভূমির বাসিন্দাদের কাছে নিত্য ভয়ের কারণ ছিলো; কিন্তু হিন্দু রাজাদের বাহিনীতে যে সকল তথাকথিত বীর ছিলো, তারা কখনোই এ উপদ্রব শায়েস্তা করতে সক্ষম হয়নি।

অনেকে বলেন, আলি নকি খানের পূর্বপুরুষগণ বীর রাজাকে হত্যা করে রাজনগর দখল করেন; কিন্তু বীর রাজার রাজত্বকালের বিবরণ দেয়ার আগে রাজনগর কখন প্রতিষ্ঠা হয় তা জানা দরকার। নগর রাজ্য সম্ভবত বৈদ্য বংশের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়, মুসলমান আমলে নয়। কারণ ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমানগণ যখন বাংলার সিংহাসন দখল করেন, তখন মুসলমান সুবাদার (শাহী প্রতিনিধি) যাতায়াতের সুবিধার জন্য গৌড়ের পূর্বে অবস্থিত দেবকুঠি থেকে বীরভূমের প্রধান শহর নগর পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। এই রাস্তাটি নির্মিত হয় ১২০৫ সালে।

বীর রাজা একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নগরে তার রাজধানী স্থাপন করেন। সাহসিকতা যুদ্ধ-বিগ্রহের পারদর্শিতায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন। নিকটবর্তী এলাকায় সকল রাজাই তার প্রাধান্য বিস্তার করতেন। পাঠানরা যখন ক্ষমতার শীর্ষদেশে অবস্থান করছিলো এবং বাংলাদেশে বহু জায়গায় লুটতরাজ চালাচ্ছিলো, বীর রাজা তখন তাদের বাধা দেন এবং অপূর্ব সাহসিকতা ও বিজ্ঞ রণকৌশলের পরিচয় দিয়ে দেশকে হামলাকারীদের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন।

একদিন আসাদুল্লাহ খান ও জোনেদ খান নামক দু'জন পাঠান নগরের রাজার দরবারে গিয়ে হাজির হয়। তাদের শক্তি-সমর্থ ও বলবান চেহারা দেখে রাজা মুগ্ধ হন এবং তাদের চাকরিতে নিয়োগ করেন। ক্রমে ক্রমে বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের বিক্রম ও সাহসিকতা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ হওয়ার পর রাজা তাদের সেনাপতি ও উজির পদে নিয়োগ করেন। তাদের পরিচালনায় দেশে সমৃদ্ধি আসে এবং প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকে; কিন্তু কালক্রমে তারা ক্ষমতার মোহে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং রাজাকে

খতম করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ইতোমধ্যে দু'জনই রানীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাকে পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। রাজা কুস্তিখেলার খুব ভক্ত ছিলেন এবং কুস্তির জন্য তার আলাদা একটি দালান ছিলো। একদিন রাজা যখন কুস্তি খেলায় রত ছিলেন, সে সময় আসাদুল্লাহ সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু রাজা প্রহরীদের তাকে ঢুকতে দিতে নিষেধ করে দেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে আসাদুল্লাহ ফিরে আসে এবং পরে ভাই জোনেদকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জোর করে কুস্তিখানায় ঢুকে রাজার ওপর চড়াও হয়। হইচই শুনে রানীও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তুমুল ধস্তাধস্তির মধ্যে রানীর ইশারায় জোনেদ খান রাজা ও আসাদুল্লাহকে একটি পাতকুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। সেখানে রাজার অনেক অনুচর পার্শ্বচর হাজির ছিলো বটে; কিন্তু রানীর ভয়ে কেউ এগুতে সাহস করলো না; ফলে রাজা ও আসাদুল্লাহ কুয়োর পানিতে ডুবেই মারা গেলেন। রাজার শাসনে জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে ছিলো; তাই তার অকালমৃত্যুতে তারা শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লো।[২]

এ ঘটনার পর রানী নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং জোনেদ খানকে দেয়ান নিযুক্ত করেন। বলাবাহুল্য, জোনেদ খানই কার্যত রাজ্য পরিচালনা করতেন। কিছুদিন পর সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি পুত্র রেখে রানী মারা যান। তার মৃত্যুর পর সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে; কিন্তু জোনেদ খান কঠোর হস্তে তাদের দমন করেন। কিছুদিন পর জোনেদ খানও মারা যান এবং তার মৃত্যুর পর বাহাদুর খান নামে এক ব্যক্তি রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

বাহাদুর খানের রাজত্বকালে সম্পর্কে কিছু বলার আগে এই পাঠানদের আদি ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। আসাদুল্লাহ ও জোনেদ যখন শিশু ছিলো; সে সময় তাদের বাপ মারা যায়। তাদরে বিধবা মা কষ্টে-সৃষ্টে তাদের মানুষ করতে থাকেন। তারা খুবই গরিব ছিলো; ফলে অন্যের কৃপার ওপর নির্ভর করেই তাদের জীবিকা অর্জন করতে হতো। একদিন মা ভিক্ষে করতে গেলে কোথা থেকে একজন ফকির এসে এক ভাইকে বেদম জুতোপেটা করে। ছেলের আর্তনাদে মা ছুটে আসেন এবং মারধরের কারণ জিজ্ঞেস করেন। ফকির জানান তিনি মারেননি, দোয়া করছিলেন মাত্র; কারণ তার দুই ছেলেই কালক্রমে বাংলাদেশের শাহী তখতে বসবে। দুই ভাই বড়ো হয়ে প্রথমে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে এবং তারপর বাংলাদেশ অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। অবশেষে তারা একদিন বীরভূম এসে পৌঁছে, ফকিরের কথামতো সত্যই রাজকীয় মর্যাদা লাভ করে।

বাংলা ১০০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বাহাদুর খান বা রণমস্ত খানের (ইংরেজি ১৬০০-১৬৫৯)[৩] রাজত্বকাল শুরু হয়। তার আমলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আসে, চাষ-আবাদের উন্নতি হয় এবং লোকসংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়। বাংলা ১০৬৬ সালে (ইংরেজি ১৬৮৯) তিনি মারা যান এবং তার একমাত্র পুত্র খাজা কামাল খান সিংহাসনে আরোহণ

২. এখানে পণ্ডিত একটি মজার কিংবদন্তী মাটি করে ফেলেছেন। কিংবদন্তীটি আমি যথা আকারে বলবো।—লেখক।

৩. বীরভূম রাজবংশের পারিবারিক ইতিহস।

করেন। তিনি রাজধানীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে নানাপ্রকার উন্নতি বিধান করেন। এছাড়া তার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বাংলা ১১০৪ সালে (ইংরেজি ১৬৯৭) কামাল খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আসাদুল্লাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আসাদুল্লাহ সমসাময়িক বিজ্ঞ ও ধার্মিক রাজাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু পুকুর ও দিঘি খনন করে পানির অভাব পূরণ করেন। তিনি নবাবকে কর দেয়ার পরিবর্তে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী দ্বারা সাহায্য করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি ধর্মীয় ও সেবামূলক কাজে ব্যয় করতেন। তিনি বদিউজ্জামান খান ও আজমত খান নামক দুই পুত্র রেখে মারা যান।

বদিউজ্জামান বাংলা ১১২৫ সালে (ইংরেজি) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদ কুলি খানের কাছ থেকে সনদ লাভ করে। এই সময় নবাবের কর সম্পর্কে পুরোনো ব্যবস্থা চালু হয় এবং তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা মুর্শিদাবাদে পাঠাতে হবে বলে স্থির হয়। বদিউজ্জামানের রাজত্বকালে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠারা পশ্চিম অঞ্চলে লুটতরাজ শুরু করে এবং একসময় কেন্দুয়া ডাংগা বা গঞ্জ মুর্শিদ নামক জায়গায় এসে ছাউনি ফেলে। ইতোমধ্যে বর্ষাকালে শুরু হওয়ায় তারা কাটোয়ার চলে যায়। মীর হাবিব নামক একজন পাঠান এই সময় ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গী হয়। মারাঠাদের ছত্রভঙ্গ করে মেদিনীপুরের দিকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে বদিউজ্জামান তার এক জ্ঞাতি ভাই আলি নকি ও বর্ধমানের রাজা নবাবকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বদিউজ্জামানের দুই বেগম ছিলো। প্রথম বেগমের গর্ভে আহমদুজ্জামান খান ও মোহাম্মদ আলি নকি খান নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয় বেগমের গর্ভে আসাদুজ্জামান খান নামে তার এক জারজ পুত্র ছিলো। আহমদ অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং শাসনকার্যে কোনোরকম আগ্রহ দেখাতেন না। মোহাম্মদ ও আসাদ অতিশয় প্রভাবশালী ছিলেন এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। একদিন সায়ফুল হক নামে এক ফকির উত্তর দেশ থেকে এসে বীরভূম দরবারে হাজির হয় এবং ক্রমে রাজার গভীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। ফকির কুরআন-হাদিসে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজা তার সঙ্গে ধর্মালোচনায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করতেন। কালক্রমে তিনি ফকিরের সঙ্গে এমন মশগুল হয়ে পড়েন যে, শাসনকার্য সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে থাকেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে শাহজাদা আহমদ ও মোহাম্মদ ফকিরকে সরিয়ে দেয়ার সংকল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তারা মুর্শিদাবাদে গমন করেন এবং সেখানে থাকার সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে নবাবের দৃষ্টি তাদের ওপর পতিত হয়। একদিন আহমদ একটি পুকুরে পানি খেতে আসে। হাতিটি কাছাকাছি এসে পড়ায় মাহুত তাকে সরে যেতে বলে; কিন্তু আহমদ একপাও নড়লেন না। অবশেষে প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ায় তিনি হাতিটির শুঁড় ধরে ছুড়ে দূরে ফেলে দেন। এই আশ্চর্য ঘটনাক্রমে নবাবের

কানে পৌঁছায় এবং তিনি দুই ভাইকে ডেকে পাঠান। মুর্শিদাবাদে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা নবাবকে ফকিরের কথা জানিয়ে বলেন, এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে শিগগিরই তাদের রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেবে। নবাব তাদের ফকিরকে হত্যা করার অনুমতি দেন এবং স্বদেশে ফিরে তারা কয়েক দিনের মধ্যেই ফকিরকে হত্যা করেন। ফকিরের মৃত্যুতে রাজা অতিশয় ভেঙে পড়েন এবং কিছুদিনের মধ্যে নিজেও মারা যান। এ ঘটনায় আহমদ ও মোহাম্মদ তীব্র আত্মগ্লানি অনুভব করেন এবং সিংহাসন সম্পর্কে কোনোরকম অভিলাষ পোষণা না করার শপথ গ্রহণ করেন। তারা স্থির করেন যে, বিমাতা ভাই আসাদকেই তারা সিংহাসনে বসাবেন। একদিন মুর্শিদাবাদ গিয়ে নবাবকে তারা তাদের অভিপ্রায় জানালেন। নবাব প্রথমে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, বড়ো ভাই বেঁচে থাকতে ছোটো ভাইকে সিংহাসনে বসানো আইন-বিরুদ্ধ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আবেদন-নিবেদনে রাজি হয়ে গেলেন। দুই ভাই স্বদেশে ফিরে মহা ধুমধামের সঙ্গে আসাদের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করলেন। আহমদ ও মোহাম্মদ পরে মুর্শিদাবাদে চলে গিয়ে নবাবের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং একটি ঘটনায় তারা মারাঠাদের বোকা বানিয়ে দেন। একবার মারাঠারা মীর জাফর আলি খানের জামাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে লোহার খাঁচায় বন্দি করে রাখে। তাকে উদ্ধার করার জন্য দুই ভাই ছদ্মবেশে মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করেন এবং অতর্কিত আক্রমণে তাদের কাবু করে বন্দিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

ইতোমধ্যে সিরাজুদ্দৌলা তার মাতামহের স্থলে বাংলার নবাব হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েন। এ যুদ্ধের জন্য দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়ে থাকে; প্রথমত, ইংরেজরা কৃষ্ণদাস নামে নবাবের এক শত্রুকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, নবাবের অনুমতি না নিয়েই ইংরেজরা নবাবের জমিতে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। নবাব বিপুল সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেন এবং বীরভূমের আলি নকি খান ও আহমদুজ্জামান খান এবং দেওয়ান মানিক চাঁদ, বহর মোহন লাল ও জাফর আলি খানের ওপর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোলকাতা অভিমুখে রওনা হয় এবং বাগবাজারে গিয়ে ছাউনি ফেলে। ইংরেজরা পালিয়ে প্রথমে ফুলতা ও পরে বালি যায় এবং অবশেষে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে। নবাব বাহিনী দুর্গ আক্রমণ করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বিধ্বস্ত করে ফেলে। নবাব ইংরেজ বন্দিদের দায়িত্ব দেওয়ান মানিক চাঁদের ওপর অর্পণ করে বিজয় গৌরবে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। দেওয়ান বন্দিদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালান এবং মোট একশ' ছেচল্লিশ জনকে অন্ধকূপে আটক করে রাখেন; তাদের মধ্যে মাত্র তেইশ জনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ ঘটনা ঘটে ১৭৫৬ সালে।

এই বিজয়ের পর বীরভূমের আলি নকি নবাবের তরফ থেকে ইংরেজ এলাকার দখল নেন এবং আলিপুরে সেনাসমাবেশ করেন। আলিপুর এখন সরকারের কর্মকেন্দ্র ও

বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাসস্থান। নবাবের অধীনস্থ সকল শাহজাদার মধ্যে আলি নকি ও তার ভাই-ই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। নবাবকে তারা সাহায্যও করেছেন সবচেয়ে বেশি। একবার নবাব সিরাজুদ্দৌলা আলি নকিকে জিজ্ঞেস করেন, বীরভূমের কোন্ নারীকে তিনি সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে করেন।[৪] ক্রুদ্ধ আলি নকি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দেন যে, তার মা ও বোনের সঙ্গে যাদের চেহারার মিল আছে, একমাত্র তাদেরই তিনি সুন্দরী বলে মনে করেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তরবারি কোষমুক্ত করে নবাবকে লক্ষ্য করে আঘাত করেন; কিন্তু নবাব সরে যাওয়ায় আঘাতটি একটি পাথরের স্তম্ভের ওপর গিয়ে পড়ে। স্তম্ভটি সশব্দে ভেঙে দুই খণ্ড হয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং সম্ভবত আলি নকির বিক্রমের কথা জানা থাকার জন্যও নবাবের পার্শ্বচররা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। আলি নকি ও তার ভাইকে অবশ্য এজন্য শাহী দরবার থেকে বিদায় নিতে হয়। কিছুদিন পর নবাব তাদের ক্ষমা করেন এবং দরবারে ফিরিয়ে নেন।

রাজ গিধড়ের হাতে বদিউজ্জমানের পরাজয়ের পর আলি নকি খান পিতার শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং ছয় দিনব্যাপী তীব্র সংগ্রামের পর তাদের পরাভূত ও বিতাড়িত করেন। পাহাড়িদের পরাজিত করার পর দেওঘর তার দখলে চলে আসে। এখনকার মতো তখনো সেখানে হিন্দুদের দেবতা বৈদ্যনাথের (বৈজনাথ) মন্দির ছিলো। ভক্তরা প্রতিমাসে এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য নৈবেদ্য নিয়ে আসতো। আলি নকি খান মন্দিরের পরিচালনভার আগের মতোই পাণ্ডাদের হাতে রেখে দেন, তবে তাদের কাছ থেকে তিনি নজরানা আদায় করেন। তিনি তার পিতার এক বোনকে বিয়ে করেন এবং তার গর্ভে একটি ছেলে হয় (?)। ছেলেটি অল্প বয়সেই মারা যায়। ছেলের শোকে বাপ ও চাচা আহমদুজ্জামান খান মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং আহমদ অবশেষে ১১৬৯ সালের ১৪ই মাঘ (ইংরেজি ১৭৬২) আত্মহত্যা করেন। শোকের ওপর শোকে আলি নকি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং জীবনের শেষ দুই বছর চরম মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি ১১৭১ সালের ২১শে ফাল্গুন ইন্তেকাল করেন এবং ভাইয়ের পাশেই তাকে কবর দেয়া হয়। দুই ভাই বহু সদগুণের অধিকারী ছিলেন। তারা সাহসী, বিনয়ী ও উদারচেতা ছিলেন এবং কোনোরূপ লালসার বশীভূত ছিলেন না। বদিউজ্জামান খান জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্মীয় সাধনায় ব্যয় করেন; শেষ বয়সে পুত্রের মৃত্যুতে অন্তরে গভীর আঘাত পান। অবশেষে ১১৭৮ সালে (ইংরেজি ১৭৭১) তিনি ইন্তেকাল করেন। নগরের পশ্চিম পাশে একটি বাগানে তাকে কবর দেয়া হয়। তার পুত্র আসাদুজ্জামান খান সিংহাসনে আরোহণ করে রাজধানীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন এবং বহু ধনী সওদাগর বসিয়ে বাণিজ্যিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দেন। মীর জাফর আলি খান রাজ্য শাসনের দায়িত্ব তার পুত্রের ওপর অর্পণ করেন; কিন্তু পুত্র ক্ষমতা হাতে পেয়েই প্রজাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। সে নবাবের দুই কন্যাকে হত্যা

৪. উক্তিটি অপমানসূচক; এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আলি নকি তার পরিবারের কারও নাম করবেন এবং নবাব তাদ্যকে উপ-পত্নী হিসেবে গ্রহণ করবেন।

করে; কিন্তু তাদের অলঙ্কার ও অন্যান্য সম্পদ অপহরণের সময় বজ্রাঘাতে নিহত হন। নবাবকে ঘায়েল করার এই উপযুক্ত সময় মনে করে বীরভূমের রাজা আসাদুজ্জামান বিপুল বাহিনী নিয়ে চুনাখালি অভিমুখে রওনা হয়। নবাবের অধীনস্থ সামন্তগণ চেষ্টা করেও তাকে বাধা দিতে ব্যর্থ হন এবং পুত্রশোকে মূহ্যমান নবাবও এই সময় তাদের নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হন। বীরভূমের রাজার অগ্রগতি রোধের জন্য তিনি শান্তির প্রস্তাব করেন এবং জানান যে, তিনি যে সকল জেলা দখল করেছেন, আর অগ্রসর না হয়ে সেগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন; কিন্তু রাজা আসাদ এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে গঙ্গা নদী অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকেন। নবাবের পত্নী মারি বেগম এ সময় উপায়ন্তর না দেখে স্বামীর রাজ্যের একটি বড়ো অংশ দেয়ার ওয়াদা করে ইংরেজদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজরা রাজি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শুরু করে। রাজা আসাদের বাহিনী ক্রমে পিছু হটতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নগরের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ইংরেজরা দুর্গ অবরোধ করে বীর বিক্রমে কয়েকদিন যাবৎ আক্রমণ চালায়। এ সময় রাজার সবচেয়ে সাহসী সেনাপতি আফজাল খান নিহত হন এবং রাজা পরাজয়বরণ করেন। পরে ইংরেজদের সঙ্গে রাজার একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্ত ছিলো : প্রথমত, রাজা তার রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ইংরেজদের দেবেন; দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা বীরভূমের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তৃতীয়ত, সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজা ইংরেজদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এই সন্ধির পর রাজা নিয়মিতভাবে নবাবকে কর দিতে থাকেন। যুদ্ধের সময় টাকা ধার দেয়ায় মুনশি অনুপ মিত্র নামে এক ব্যক্তিকে তিনি এক হাজার বিঘা (২৬০ একর) নিষ্কর জমি দেন। তিনি পুত্রের শিক্ষার জন্য সাড়ে ছয় হাজার বিঘা (২২০০ একর) জমির একটি জায়গির পত্তন করেন।

শিউড়ি থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে মল্লারপুর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের মালিক মল্লার সিং খুব জনপ্রিয় ও ধার্মিক লোক ছিলেন। একবার একজন লোক তাকে বলেন, নগরের রাজা তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চান। এ কথা শুনে তিনি নিরতিশয় মর্মাহত হয়ে পড়েন এবং কথাটির সত্যতা যাচাই না করেই আত্মহত্যা করেন। এই খবর পেয়ে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং এই কারসাজির প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শিউড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরে ও নগরের উত্তরে সিনপাহাড়ি নামে এক বিরাট জঙ্গল আছে। সেখানকার সামন্ত ছিলেন ইচাই ঘোষ। তিনি ইচাই মন্দির নামে একটি বড়ো মন্দির এবং শামরূপ ঘর নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। লাইসেন নামে আরেকজন সামন্ত তার রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তাকে পরাস্ত করেন। ফলে ইচাই ঘোষের মন্দির ও দুর্গ লাইসেনের দখলে চলে যায়।

শিউড়ি থেকে আঠারো মাইল দূরে কিন্দু বিল্বগ্রাম নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে জয়দেব মুন্সি নামে এক বিখ্যাত কবি বাস করতেন। কথিত আছে যে, গঙ্গাস্নান করার জন্য তিনি প্রত্যহ চল্লিশ মাইল পথ হাঁটতেন। এই গ্রামে রাধা-দামোদর নামে এক দেবতার আসন ছিলো। হিন্দুরা গ্রামটিকে পবিত্র স্থান বলে মনে করে এবং দেবতার পূজা করায় প্রতি বছর সেখানে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার লোকের সমাবেশ হতো।

প্রত্যেক বছর মাঘ মাসের শেষদিনে সেখানে মাঘের সংক্রান্তি নামে একটি বড়ো মেলা হয়।

আসাদুজ্জামান খান পক্ষাঘাত রোগে ১১৮৪ সালে (ইংরেজি ১৭৭৭) কলকাতায় ইন্তেকাল করেন। তিনি শক্তিশালী ও উদারচেতা রাজা ছিলেন। প্রজারা তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। সমগ্র বাংলাদেশের ওপর রাজত্ব করা তার খুবই ইচ্ছা ছিলো এবং এই উদ্দেশ্যে একাধিকবার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন; কিন্তু সফলকাম হতে পারেননি। তিনি ছাব্বিশ বছর যাবৎ রাজত্ব করেন। তার মৃত্যুর পর তার ভাই বাহাদুরুজ্জামান খান সিংহাসন লাভের জন্য ইংরেজ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আসাদুজ্জামানের বেগম লাল বিবি তার ভাই মোহাম্মদ তকি খানের সাহায্যে সিংহাসন দাবি করে বলেন যে, বাহাদুর তার পিতার জারজ সন্তান হওয়ায় সিংহাসনের ওপর তার কোনো বৈধ অধিকার নেই। ইংরেজরা লাল বিবির পক্ষ সমর্থন করেন এবং তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু লাল বিবি নামেমাত্র রানী ছিলেন এবং সমস্ত রাজকার্য তার ভাই তকি খানই পরিচালনা করতেন। এ সময় বাহাদুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভোটন শাহের ষড়যন্ত্রে লাল বিবি ক্ষমতাচ্যুত হন। ভোটন শাহ তকি খানের এক পার্শ্বচরকে ঘুস দিয়ে বশীভূত করেন এবং তাকে দিয়ে বাহাদুরের শয়নকক্ষের প্রহরীকে হত্যা করিয়ে ঘোষণা করান যে, তার প্রভু তকি খান বাহাদুরকে হত্যা করার জন্য তাকে নিয়োগ করেছে। ইংরেজরা এই অপপ্রচার সত্য বলে ধরে নেয় এবং লাল বিবি ও তকি খানকে অপসারণ করে বাহাদুরকে সিংহাসনে বসায়। বাহাদুর লাল বিবির সঙ্গে খুব শোভন আচরণ করেন এবং তার জন্য মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেন। বাহাদুর ১১৯৬ (ইংরেজি ১৭৮৯) ইন্তেকাল করেন এবং নগরের বাগানে তাকে কবর দেয়া হয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি তার পুত্র মোহাম্মদুজ্জামান খানকে রেখে যান।

রাধাকৃষ্ণ রায় নামে এক ব্যক্তি নগরের রাজাদের অন্যতম দেওয়ান ছিলেন। তিনি পুরন্দরপুরে বাস করতেন। মাটির নিচে পুরন্দর দেবতার মূর্তি পাওয়া যাওয়ায় জায়গাটির নাম পুরন্দরপুর। রাধাকৃষ্ণ রায় রাজাদের কাছ থেকে জায়গীর হিসেবে চৌদ্দ শ' বিঘা (৫০০ একর) জমি লাভ করেন।

মোহাম্মদুজ্জামান ইংরেজদের সম্মতিক্রমে ১১৯৭ সালে (ইংরেজি ১৭৯০) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যতোদিন নাবালক ছিলেন, ততোদিন দেওয়ান লালা রামনাথ ও মিং কিটিংয়ের ওপর রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। সাবালক হওয়ার পর মোহাম্মদ স্বহস্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিজ্ঞতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। তিনি দীর্ঘদেহী, বলবান ও সুপুরুষ ছিলেন এবং মৃত্যুর পর তার একখানি তৈলচিত্র কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তার আমলে বীরভূমের লোকসংখ্যা ছিলো ৭ লক্ষ; তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ (প্রকৃতপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ) ছিলো হিন্দু। দেওয়ান লালা রামনাথ বীরভূমের রাজস্ব সম্পর্কে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি শিউড়ি থেকে ছয় মাইল দূরে বান্দিবন নামক স্থানে বান্দিশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণ করেন। রাজাদের কাছ থেকে জায়গির হিসেবে তিনি অনেক জমি পেয়েছিলেন।

মোহাম্মদুজ্জামান খানের পুত্র মোহাম্মদ দেওয়ানুজ্জামান খান ১২০৯ সালে (ইংরেজি ১৮০২) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১২১৯ সালে (ইংরেজি ১৮১২) ইংরেজদের কাছ থেকে সনদ লাভ করেন। তিনি ১২৬২ সালে (ইংরেজি ১৮৫৫) ইন্তেকাল করেন। তার পুত্র জহুরুজ্জামান খান এখনো জীবিত আছেন। বীরভূম যখন পুরোপুরি ইংরেজ শাসনাধীনে আসে, তখন জেলখানাটি কাঁচা ছিলো—মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল। ১৮০০ সালের ১৫ই মে সরকারের আদেশে মি. ক্যাম্পবেলের তদারকে পাকা জেলখানা নির্মিত হয়। এ সময় চাষ-আবাদে খুব উৎসাহ দেয়া হয়, জনসাধারণ দ্রুত সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে।

বীরভূমের রাজাগণ বহু মসজিদ ও দুর্গ নির্মাণ এবং পুকুর খনন করেন। সেসব এখন ধ্বংসের পথে।

১২৬১ সালে (ইংরেজি ১৮৫৪-৫৫) বীরভূমের সাঁওতালরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে; কিন্তু বর্ধমানের রাজা ও বর্ধমান বিভাগের কমিশানর মি. ইলিয়টের সক্রিয় তৎপরতায় কিছুদিনের মধ্যেই তাদের দমন করা সম্ভব হয়। এই বিদ্রোহ দমনে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করায় বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের আদেশক্রমে দারোগা মোহাম্মদ হামিদ, জমাদার হিমাত আলি, গোলাম আলি খান, মীর খান, সাহেব খান ও সুখলালকে ১৮৫৬ সালের ২০শে জানুয়ারি পুরস্কার দেয়া হয়।

বীরভূম অতিশয় উর্বর এলাকা। রাজনগরের আম ও সংরক্ষিত ফল আগের মতো এখনো বিখ্যাত। অজয়, মোর ও বাকেশ্বর নদীর পানি বীরভূমের মাটিকে সরস করে রাখে। এই জেলায় এখন গড়পড়তা প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা (৬৫ হাজার পাউন্ড) খাজনা আদায় হয়।

[এ বিবরণে যে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ভুল-ত্রুটি আছে, তা আমি আরেকটি খণ্ডে সংশোধনের আশা রাখি। সঠিক তারিখগুলো চ পরিশিষ্টে বীরভূমি রাজবংশের পারিবারিক পুস্তকে পাওয়া যাবে।—লেখক]

৩ পরিশিষ্ট

পণ্ডিত রচিত বিষ্ণুপুরের কাহিনী

আমার পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় যে বিবরণ রচনা করেছেন, এখানে তা সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হলো। এই বিবরণ প্রস্তুত করার সময় পণ্ডিত রাজার আদেশে প্রণীত একখানি ফার্সি পাণ্ডুলিপি এবং রাজার নথিখানায় প্রাপ্ত অন্যান্য কাগজপত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। ফার্সি পাণ্ডুলিপিখানির জন্য আমি বঙ্গীয় সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মি. জর্জ লচের কাছে ঋণী।

পণ্ডিতের বিবরণ

বৃন্দাবনের নিকটবর্তী জয়নগর রাজবংশের সন্তান রঘুনাথ সিং বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা। তার জন্মকাহিনী বৈচিত্র্যময়। জয়নগরের রাজা বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পুরুষোত্তম অভিমুখে রওনা হন এবং পথিমধ্যে বিষ্ণুপুর উপনীত হন। সেখানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি আশ্রয়ে বিশ্রাম করার সময় তার পত্নীর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। রাজা প্রসূতি ও শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলার কথা চিন্তা করে তাদের সেই বনের মধ্যে ফেলে রেখে একাকী বিদেশ ভ্রমণে চলে যান। এরূপ বর্বরোচিতভাবে স্ত্রী ও সন্তান পরিত্যাগের কথা এখনো শোনা যায়। এমন কি কোন নারী একবার তীর্থযাত্রায় রওনা হলে পথিমধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেও তাকে নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করে চলে যায়।

রাজা চলে যাওয়ার পর শ্রী কাশমেতিয়া বাগদি (অনার্য বাসিন্দা) নামে একজন লোক কাঠ সংগ্রহ করতে এসে বনের মধ্যে শিশুটিকে একাকী অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পায়। তার মায়ের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাকে বন্য জন্তুতে খেয়ে ফেলেছিলো, না সে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলো, তা আর কখনো জানা যায়নি। বাগদি শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সযত্নে লালন-পালন করতে থাকে। তার বয়স যখন সাত বছর, সে সময় স্থানীয় একজন ব্রাহ্মণ তার সুদর্শন চেহারায় মুগ্ধ হয়ে ও কপালে রাজটিকা দেখে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। (লক্ষণীয় যে, কিংবদন্তীর এখানেই সর্বপ্রথম একজন আর্য বাসিন্দার আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে; কিন্তু আর্য হলেও তাকে সাধারণ একজন দরিদ্র বাসিন্দা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বিজয়ী হিসেবে নয়।) ব্রাহ্মণ অত্যন্ত গরিব হওয়ায় ছেলেটিকে গরু চরানো প্রভৃতি কাজে নিয়োগ করে। ক্রমে

সে বাগদিদের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে এবং তারা আদর করে তার নাম দেয় রঘুনাথ (অর্থাৎ রঘু দেবতা)।

একদিন রঘুনাথ যখন অন্য রাখালদের সঙ্গে মাঠে খেলা করছিলো, সে সময় চাষীরা তার সুদর্শন চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে বেলা পড়ে আসায় সকলে গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়। রঘুনাথও তাদের সঙ্গে রওনা হয়; কিন্তু তার একটি গরু হারিয়ে যাওয়ায় সে বাড়ি না ফিরে জঙ্গলে গরু খুঁজতে যায়। চারদিকে বহু খোঁজাখুঁজি করে গরুর কোনো সন্ধান না পেয়ে অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং একটি গাছের তলায় শুয়ে পড়ে। সে ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাটকায় জাত সাপ ঘাসের মধ্য থেকে বেরিয়ে তার কাছে আসে; কিন্তু ছোবল না মেরে তার বহু বর্ণরঞ্জিত বিরাট ফণা মেলে ঘুমন্ত রঘুর মুখের ওপর ছায়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতোমধ্যে তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রাহ্মণ তাকে খুঁজতে বেরোয় এবং ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাস্থলে এসে পড়ে। উদ্যত-ফণা সাপ দেখে সে ভয়ে কাঠ হয়ে যায় এবং বিলাপ করে বলতে থাকে ঃ 'হায়, হায়, আমার কি সর্বনাশ হলো, কেন এই সোনার চাঁদকে আমি কাজে পাঠিয়েছিলাম।' তার উপস্থিতির শব্দে সাপ ফণা সংকোচন করে দ্রুত প্রস্থান করে। মুখের ওপর থেকে ছায়া সরে গিয়ে রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রঘুর ঘুম ভেঙে যায়। সাপে কামড়ায়নি দেখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলে এবং তাকে কাঁদতে দেখে রঘুর চোখেও পানি এসে যায়। ব্রাহ্মণ আর কখনো তাকে কাজে পাঠাবে না বলে বারবার শপথ করে বলতে থাকে ঃ 'হায়, হায়, আজ যদি তোকে আমি হারাতাম, তা'হলে আমার উপায় কি হতো। তোকে না দেখে যে আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারিনে। যেদিন তোকে আমি বাড়ি নিয়ে আসি, সেদিন থেকেই তোর ওপর আমার গভীর মায়া বসে গেছে। তোর এই সুন্দর মুখ চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে, এ আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। গভীর সমুদ্রে যেমন কোনো মাছই তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি জীবনের কোনো ঘটনাবিবর্তনই প্রকৃত স্নেহকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না।

একদিন রঘু নদীতে একখণ্ড সোনা কুড়িয়ে পায় এবং বাড়ি ফিরে এসে তা ব্রাহ্মণকে দেয়। ব্রাহ্মণ বালকের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের নিদর্শন হিসেবে সোনার খণ্ডটি সযত্নে তুলে রাখে। কিছুদিন পর দেশের রাজা (অনার্য) মারা যায় এবং রাজকীয় ধুমধামের সঙ্গে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়। দেশের সমস্ত লোকই রাজবাড়িতে ভোজ খেতে আসে। ব্রাহ্মণও রঘুকে সঙ্গে নিয়ে ভোজ খেতে যায়। তারা যখন খাওয়া-দাওয়া করছে, সে সময় রাজার হাতি এসে রঘুকে শুঁড় দিয়ে উঁচু করে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটতে থাকে। বালকের প্রাণসংশয়ে সকলে হায় হায় করে উঠলো; কিন্তু দেখা গেলো, হাতি কোনোরকম আঘাত না করে বালককে সযত্নে শূন্যে রাজপ্রাসাদের ওপর বসিয়ে দিলো। লোকে প্রথমে বিস্মিত হলো: কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূরণ হয়েছে বুঝতে পেরে আনন্দধ্বনি করে উঠলো। মন্ত্রিগণ তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলো এবং এরূপে রঘুনাথ দেশের রাজা হয়ে গেলো। গায়করা

এসে গান গাইতে লাগলো, বাদকরা সুমধুর বাজনা শুরু করলো এবং সভাকবিরা এসে রাজবন্দনা আবৃত্তি করতে লাগলো।

প্রাচীনকালে এভাবেই রাজা মনোনীত করা হতো। কোনো রাজা মারা গেলে তার বৈধ উত্তরাধিকারী সিংহাসনে আরোহণ করতে পারতো না। মন্ত্রিগণ রাজার শ্বেতহস্তীকে মণিমুক্তা খচিত ঝালরে সুসজ্জিত করে সমস্ত সভাসদ ও রাজকর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে রাজধানী পরিক্রমায় যেতেন। পথিমধ্যে রাজহস্তী যাকেই শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নিক না কেন, তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে দেয়া হতো এবং ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বলে মনে নিয়ে রাজা হিসেবে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়া হতো।

প্রাচীন কিংবদন্তীতে সাপের ছায়া দেয়ার ফলে রাজা হওয়ার আরও অনেক ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। একদা এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গরিব রাখাল ছিলো। একদিন সে গরু চরাতে চরাতে মাঠে ঘুমিয়ে পড়ে। এক সন্ন্যাসী সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায় যে, একটি কালো রঙের সাপ রাখালের মুখের ওপর ছায়া করে রেখেছে। সন্ন্যাসী কাছে আসতেই সাপটি চলে যায় এবং রাখালের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর সে কোচড় থেকে চিড়ে-মুড়ি বের করে নিজে খায় ও সন্ন্যাসীকে খেতে দেয়। যাওয়ার সময় সন্ন্যাসী তাকে বলে যায় যে, একদিন সে রাজা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে আরও বলে যে, সে যেন পা গুটিয়ে বা সূর্যের দিকে মুখ রেখে না ঘুমায় এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য যেন আপ্রাণ চেষ্টা করে। পরে আরেকবার দেখা হলে সন্ন্যাসী রাখালের পায়ে রাজটিকা দেখতে পায় এবং তাকে বলে যে, তার কথা অনুসারে কাজ করে সে যদি রাজা হয়, তাহলে সে তাকে কি দেবে। রাখাল সানন্দে জবাব দেয় যে, সন্ন্যাসী যা চাইবে সে তাই দেবে। সন্ন্যাসী তাকে প্রথম প্রতিবেশী রাজাদের রাজ্যের ওপর ছোটোখাটো হামলা ও লুটতরাজ চালানো এবং এভাবে শক্তি সঞ্চয় করে পরে একসময় প্রকাশ্যে যুদ্ধ চালিয়ে সমগ্র দেশ জয় করে নেয়ার পরামর্শ দেয়। এসময় থেকে সন্ন্যাসী সর্বদা রাখালের ওপর নজর রাখে এবং কখনো তার নির্দেশ অমান্য করলে তাকে মারধর করতে থাকে। কালক্রমে রাখাল একদিন সত্য সত্যই সমগ্র দেশের রাজা হয়। সন্ন্যাসীকে সে এক লক্ষ টাকা ও নির্ধারিত নামমাত্র খাজনায় চাঁদপাড়ায় জমি দেয়; সেই থেকেই চাঁদপাড়ার নাম নামকর-চাঁদপাড়া হয়ে যায় এবং এই নাম এখনো চালু আছে। (পণ্ডিত এরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন; কিন্তু সংক্ষেপ করার জন্য সেগুলো বাদ দেয়া হলো।)

অতএব রঘুনাথ সিং-ই ছিলেন বিষ্ণুপরের প্রথম রাজা (অর্থাৎ প্রথম আর্য রাজা; অনার্য রাজাগণ আমার সুযোগ্য পণ্ডিতের ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না)। ইতিহাসে তিনি বাগদিদের রাজা এবং প্রায় ১১০০ বছর রাজত্বকারী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি বিষ্ণুপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে একাধিক মঙ্গলঘট স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তার রাজ্য মালভূমি (কুস্তিগিরের বা পালোয়ানের দেশ) নামে পরিচিত ছিলো; পরে এই নাম পরিবর্তন হয়ে জঙ্গল-মহল (জঙ্গলের দেশ) হয়। এখন এই রাজ্য বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত।

বীরভূম বীর ও বাগদিদের (অনার্য) জায়গা হিসেবে প্রসিদ্ধ। তারা লম্বা চুল রাখতো এবং লোহার অলঙ্কার পরতো। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা রুপার বালাও পরিধান করতো। তাদের অস্ত্র ছিলো ফলা ও বর্শা। তারা ভালো কুস্তিগির ছিলো। রাজারা প্রায়ই তাদের রাজপ্রাসাদের প্রহরী হিসেবে নিয়োগ করতেন। অনেক সময় পাহাড়িদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা লুটতরাজও করতো; ফলে শান্তিপ্রিয় বাসিন্দাদের কাছে তারা ত্রাসের বস্তু ছিলো। যুদ্ধের সময় মাঝে মধ্যে মুর্শিদাবাদের নবাবও তাদের কাছে সাহায্য চাইতেন। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় নবাব তার অধীনস্থ করদ রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। বিষ্ণুপুরের রাজা তখন তার বীর সৈন্যদের একটি বাহিনী নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই বাহিনীর প্রবল পরাক্রমে মারাঠারা পরাজয়বরণ করে এবং তখন থেকেই করদ রাজাদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের রাজা সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

বাঁকুড়া কালক্টরেটের কাগজপত্রের মধ্যে রাজা গোপাল সিং রচিত বিষ্ণুপুরের রাজাদের একখানি ইতিহাস পাওয়া যায়। এই পুস্তকের বর্ণনা এবং অন্যান্য স্থান থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমি বিষ্ণুপুরের রাজাদের একটি ঘটনাপঞ্জি দিচ্ছি। প্রত্যেক রাজার পরিচয়ের সঙ্গে তার রাজত্বকালের দুই-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও আমি বর্ণনা করেছি।

বিষ্ণুপুরের রাজাগণ মহর্ষি পরিবারের কুটুমি শাখার অন্তর্ভুক্ত। তাদের দেবতার নাম আলোকং ও দেবীর নাম পুরা; এই দেব-দেবী কেত্তি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। রাজারা শম্বদের অনুসারী ছিলেন এবং তাদের গুরু বা ঋষি ছিলেন বিশ্বামিত্র। বিষ্ণুর পূজারী ব্রাহ্মণগণ ছিলেন তাদের পুরোহিত। পৈতা গ্রহণের সময় গাথা নামক যে পবিত্র মন্ত্র রাজারা গ্রহণ করতেন তা এখনো চালু আছে। রাজা রঘুনাথ সিং-এর আমলেই বিষ্ণুপুর খ্যাতিলাভ করে এবং তখন থেকেই এই রাজ্যের ইতিহাস শুরু হয়। রাজা রঘুনাথ সিং-কে বাগদিরা 'রঘুনাথ' বলে অভিহিত করতো। সিংহাসনে আরোহণের সময় তার নাম দেয়া হয় 'আদি মল্ল' বা মূল কুস্তিগির।

১। **আদি মল্ল**—বাংলা ১২২ সালে (ইংরেজি ৭১৫)[১] আদি মল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তার কপালে রাজটিকা ছিলো এবং বিষ্ণুপুরের ১ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৩৪ বছর রাজত্ব করেন। তার রানী চন্দ্রাকুমারী পশ্চিম দিকে অবস্থিত সোলার রাজ্যের রাজা ইন্দ্র সিং-এর কন্যা ছিলেন। তার রাজধানীর নাম ছিলো লাউগ্রাম। সেখানে তিনি পান্তসুরি দেবীর একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

২। **জয়মল্ল**—রাজা জয়মল্ল বাংলা ১৫৬ সালে (ইংরেজি ৭৪৯) জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুপুরের ৩৪ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিরিশ বছরকাল রাজত্ব করে বিষ্ণুপুর ৬৪ সালে তিনি মারা যান। সোলার রাজবংশের রাজা দিনু সিংয়ের কন্যা তার রানী ছিলেন। তিনি দেবতা সাতচাকো বিহারির একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

---

১. তারিখের ব্যাপারে আমি পণ্ডিতের তারিখ ব্যবহার না করে বিষ্ণুপুর রাজাদের পারিবারিক পুস্তক এবং অন্যান্য ফার্সি দলিল অনুসরণ করেছি। পণ্ডিতের তারিখগুলোর অধিকাংশই ভুল।—বিষ্ণুপুর রাজবংশের পারিবারিক ইতিহাস।

রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব রাজার কামদার (মন্ত্রী) ভাগিরথী গোপের ওপর অর্পিত ছিলো। জয়মল্লের দুই পুত্র ছিলো। পিতার মৃত্যুর পর প্রথম পুত্র রাজা হন এবং দ্বিতীয় পুত্র ভ্রাতা ও জায়গির ভোগ করতে থাকেন। দ্বিতীয় পুত্রের কোনো বংশধর এখন আর জীবিত নেই। জয়মল্ল অতিশয় শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং জাঁকজমক ভালোবাসতেন। তিনি তার সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন।

৩। **অম্বুমল্ল বা বেনিমল্ল**—রাজা অম্বুমল্ল বা বেনিমল্ল বাংলা ১৮৬ সালে (ইংরেজি ৭৭৯) সংবত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুপুর ৬৪ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১২ বছর রাজত্ব করার পর ৭৬ সালে মারা যান। তার রাজধানী ছিলো লাউগ্রামে। তিনি সোলার বংশের রাজা মাত্তির সিংয়ের কন্যা কাঞ্চনমণিকে বিবাহ করেন। পূর্ববর্তী রাজার ন্যায় বেনিমল্লের কামদারও ছিলেন ভাগিরথী সিং। তার পাঁচটি পুত্র ছিলো। প্রথম পুত্র পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে এবং অন্য চার পুত্র ভাতা ও জায়গির ভোগ করে। তাদের কোনো বংশধর এখন আর জীবিত নেই।

[এভাবে আমার পণ্ডিত মশায় রাজার পর রাজার বিবরণ দিয়ে গেছেন। তারা সকলেই আর্য বংশের ক্ষত্রীয় রাজকুমারী বিয়ে করেন এবং আর্য বাসিন্দাদের মন্ত্রী প্রভৃতি পদে নিয়োগ করেন। তারা প্রায় সকলেই প্রতিবেশী আর্য ও অনার্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং আর্য দেবতা ও ক্ষেত্র বিশেষে অনার্য উপাসনা-রীতি অনুসারে বিখ্যাত লোকদের নামে মন্দির নির্মাণ করেছেন; কিন্তু এ জাতীয় যতো পুথিপত্র আমি পরীক্ষা করেছি, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে অনার্য বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব ক্রমে বিলীন হয়ে গেছে। পণ্ডিতের বিবরণের বদলে পারিবারিক ইতিহাস থেকে আমি নিচে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।]

১৮। **জগতমল্ল**—রাজা জগতমল্ল বিষ্ণুপুর ২৭৫ সালে (ইং ৯৯০) জন্মগ্রহণ করেন, ৩১৮ সালে (ইং ১০৩৩) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৩৬ সালে (ইং ১০৫১) মারা যান। তার রাজধানী ছিলো বিষ্ণুপুর। তিনি গোলুণ্ডা সিংয়ের কন্যা চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করেন। রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি রাধাবিনোদ ঠাকুর ও রাসমণ্ডপের নামে দু'টি ইমারত নির্মাণ করেন। তার কামদারের নাম ছিলো গোপাল সিং। তিনি তিন ছেলে রেখে মারা যান। বিষ্ণুপুর তখন জগদ্বিখ্যাত শহর ছিলো এবং ইন্দ্রদেবের স্বর্গোদ্যানের চেয়ে সৌন্দর্যময় ছিলো। রাজপ্রাসাদ ছিলো শ্বেতপাথরের; প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে নাটমন্দির, নাট্যশালা, শয়নকক্ষ, প্রসাধন কক্ষ প্রভৃতি ছিলো। এছাড়া হাতিশালা, আস্তাবল, সেপাইদের ব্যারাক, অস্ত্রাগার, গুদাম, মালখানা ও একটি মন্দিরও ছিলো। শহরের জাঁকজমক বৃদ্ধি করায় রাজার খুব সুনাম হয়। তার রাজত্বকালেই বহু বণিক ও সওদাগর এই শহরে বসতি স্থাপন করে।

৩৩। **রামমল্ল (ক্ষেত্রনাথ মল্ল?)**—রাজা রামমল্ল ৫৬৪ সালে (ইং ১২৭৭) রাজা হন এবং ২৩ বছর রাজত্ব করার পর ৫৮৭ সালে (ইং ১৩০০) মারা যান। নন্দলাল সিংয়ের কন্যা সুকুমারী বাঈ তার রানী ছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে রাধাকান্ত জিনের নামে (সম্ভবত কোনো বীরপুরুষ) একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তার কামদারের নাম ছিলো জগু মন্দর গোহো। রাজা চার ছেলে রেখে যান। তার আমলে দুর্গের উন্নতিসাধন হয়,

সেখানে নানাপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র স্থাপন করা হয়। সৈন্যদের জন্য একই ধরনের পোশাক প্রস্তুত করা হয় ও একজন ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। সৈন্যরা অস্ত্র চালনায় খুবই পারদর্শিতা অর্জন করে এবং এ ব্যাপারে তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিবেশী সকল রাজা ভীত হয়ে পড়ে। রামমল্লর আমলে তাই কোনো রাজা বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে সাহস করেনি।[২]

৪৮। **বীরমল্ল**—রাজা বীরমল্ল ৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৮১ সালে (ইং ১৫৯৬) রাজা হন। তিনি ২৬ বছর রাজত্ব করেন। তার চার রানী ও বাইশটি ছেলে ছিলো। তিনি তিনটি মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি দুর্গের আরও উন্নতি করেন এবং প্রাসাদের ওপর কামান স্থাপন করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান করেন; কিন্তু নবাব দেশের বলে জানতে পারায় রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং নবাবকে ১,৬৭,০০০ টাকা (১৭,০০০ পাউন্ড) নজরানা দেন। তার কামদারের নাম ছিলো দুর্গা প্রসান্দ ঘোর।

৫৪। **গোপাল সিং**—রাজা গোপাল সিং ৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮ বছর রাজত্ব করার পর ১০৫৫ (ইং ১৭০৮) সালে মারা যান। টুংগু ভূমির রাজা রঘুনাথ টুংগুর কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তিনি পাঁচটি মন্দির নির্মাণ করেন। এ সময় ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠারা বিষ্ণুপুর দুর্গের দক্ষিণ তোরণে এসে হাজির হয়। রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন; কিন্তু তার পরাজয়ের উপক্রম দেখা দেয়। কথিত আছে যে, দেবতা মদন মোহনের কৃপায় এই সময় মানুষের সাহায্য ছাড়াই কামান থেকে আপনাআপনি গুলি হতে থাকে। ফলে অন্যান্য বহু লোকসহ মারাঠা সেনাপতিও নিহত হন। বিষ্ণুপুর বাহিনী শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে দুর্গে ফিরে আসে। অনেকে বলেন, রাজা নিজেই বহু শত্রু সৈন্য হত্যা করেন; কিন্তু মারাঠা সেনাপতিকে হত্যা করতে না পারায় আর যুদ্ধ না করে দুর্গে পলায়ন করেন। এই সুযোগে মারাঠারা নতুন উদ্যমে আক্রমণ চালায়; কিন্তু কামান থেকে আপনাআপনি গোলা বৃষ্টি হওয়ায় তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বর্ধমানের মহারাজা কৃত্তিচাঁদ বাহাদুরও বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন এবং রাজা গোপাল সিংকে পরাস্ত করেন; কিন্তু পরে তারা একযোগে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। রাজা দুই ছেলে রেখে মারা যান। বড়ো ছেলে পরে রাজা হয় এবং ছোটো ভাইকে যমকুণ্ডির জায়গির দেয়। যমকুণ্ডি এখনো এই ছোটো কুমারের বংশধরদের দখলে রয়েছে।

[এভাবে পণ্ডিতের বিবরণ এগিয়ে চলেছে। এক রাজা পুকুর কেটেছেন, আরেক রাজা দেবমূর্তি স্থাপন করেছেন, আরেকজন বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছেন এবং আরেকজন যুদ্ধ করেছেন। বড়ো রাজকুমার জীবিত থাকলে তিনিই রাজা হয়েছেন, তবে অন্যান্য কুমার জায়গির বা ভাতা পেয়েছেন। বিষ্ণুপুর রাজবংশকে কখনো মুর্শিদাবাদের নবাবের শত্রু, কখনো মিত্র, কখনো করদ হিসেবে দেখা যায়। তবে নবাব বিষ্ণুপুরের রাজাদের

২. পারিবারিক ইতিহাসে রামমল্ল নামে কোনো রাজার উল্লেখ নেই। পণ্ডিত তাকে তেত্রিশতম রাজা বলে উল্লেখ করায় আমি পারিবারিক তালিকার তেত্রিশতম রাজা হওয়ার তারিখ ও রাজত্বকালের মেয়াদ উল্লেখ করেছি।—বিষ্ণুপুর রাজবংশের পারিবারিক ইতিহাস।

ব্যক্তিগতভাবে মুর্শিদাবাদ দরবারে হাজির হওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং পরবর্তীকালের ইংরেজদের মতো রাজপ্রতিনিধি বা দরবারের রেসিডেন্টের মারফত হাজির হওয়ার অনুমতি দেন। কয়েকজন রাজা ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করায় বিদেশী বণিকরা এসে রাজধানীতে বাস করতে শুরু করে। একজন রাজা দু'জন বিচারক নিয়োগ করেন এবং অন্য একজন দুর্গের উন্নতিসাধন করেন। কালক্রমে বিষ্ণুপুরের রাজাদের পারিবারিক উপাধি মল্ল (প্রাচীন অনার্য প্রভাবের শেষ নিদর্শন) বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং পঞ্চাশতম রাজার আমল থেকে (বিষ্ণুপুরের ৯২২ সালঃ ইং ১৬৩৭) সিং উপাধি চালু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই রাজবংশের দ্রুত অবনতি ঘটে; মারাঠারা একাধিকবার তাদের ধনসম্পদ লুট করে এবং ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে রাজ্য জনশূন্য হয়ে যায়। ইংরেজরা প্রথমে এ জাতীয় রাজাদের নায়েব-গোমস্তার পর্যায়ে অবনত করেন এবং তারপর একদিন সমস্ত ক্ষমতাই তাদের হাত থেকে নিয়ে নেন।]

পণ্ডিত তার বিবরণের শেষে বলেছেন—'বিষ্ণুপুর থেকে মদন মোহনের মূর্তি' (অনার্য উপাসনার সর্বশেষ নিদর্শন) অপসারিত হওয়ার পর শহরের পতন শুরু হয়। একসময় রাজা দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়ে কলকাতার গোকুলচন্দ্র মিত্রের কাছে মূর্তিটি রেহেন দিয়ে কিছু টাকা নেন। কিছুদিন পরে হতভাগ্য রাজা টাকার যোগাড় করতে সক্ষম হন এবং দেনা পরিশোধ করে মূর্তিটি ফিরিয়ে আনার জন্য তার মন্ত্রীকে কলকাতায় পাঠান। গোকুল মিত্র টাকা নেন বটে; কিন্তু মূর্তিটি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। রাজা মামলা করেন এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতার সুপ্রিম কোর্ট থেকে ডিক্রি পান; কিন্তু গোকুল মিত্র ইতোমধ্যে মূল মূর্তির মতো অবিকল আরেকটি মূর্তি প্রস্তুত করেন এবং নকল মূর্তিটি রাজাকে দেন।'

চ পরিশিষ্ট

বীরভূম রাজাদের পারিবারিক পুস্তক

প্রাচীন রাজারা যে কিভাবে তাদের বংশ তালিকা প্রণয়ন করতেন, তার নমুনা হিসেবে নিম্নলিখিত বিবরণটি উদ্ধৃত করা হলো—অন্য কোনো গুরুত্বের জন্য নয়। মূল পুস্তকটি ফার্সি ভাষায় হাতে লেখা; রাজার ভগ্ন প্রাসাদ থেকে পুস্তকখানি উদ্ধার করা হয়।

পারিবারিক পুস্তক

এটা বীরভূমের রাজাদের পারিবারিক পুস্তক। প্রত্যেক রাজা কোন্ বছর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কতোদিন রাজত্ব করেন, কোথায় বাস করতেন এবং কি রোগে মারা যান, তার বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রথম ॥ **দেওয়ান রণমস্ত খান বাহাদুর বাংলা ১০০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু** থেকে (ইং ১৬০০) ১০৬৬ সালের পয়লা কার্তিক পর্যন্ত (ইং ১৬৫৯) রাজত্ব করেন এবং পয়লা কার্তিকেই জ্বরে ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় ॥ দেওয়ান খাজা কামাল খান বাহাদুর রণমস্ত খানের পুত্র, বাংলা ১০৬৬ সাল থেকে (ইং ১৬৫৯) ১১০৪ সাল পর্যন্ত (ইং ১৬৯৭) রাজত্ব করেন এবং জ্বরে ইন্তেকাল করেন। গুলবাগিচায় তাকে কবর দেয়া হয়। তিনি আটত্রিশ বছর চার মাস তের দিন রাজত্ব করেন।

তৃতীয় ॥ দেওয়ান আসাদুল্লাহ খান, খাজা কামাল খানের পুত্র, বাংলা ১১০৪ সাল থেকে (ইং ১৬৯৭) ১১২৫ সাল পর্যন্ত (ইং ১৭১৮) রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালের মেয়াদ ছিলো একুশ বছর এক মাস কুড়ি দিন। তিনি তার পুত্র আজিম খান ও বদিউজ্জমান খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইন্তেকাল করেন।

চতুর্থ ॥ দেওয়ান বদিউজ্জামান খান বাংলো ১১২৫ সাল থেকে (ইং ১৭১৮) ১১৫৮ পর্যন্ত (ইং ১৭৫১) রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালের মেয়াদ ছিলো তেত্রিশ বছর। তিনি তার চার পুত্র আহমদুজ্জামান খান, মোহাম্মদ আলী নাকি খান, আসাদুজ্জামান খান ও বাহাদুরুজ্জামান খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং অন্য তিন পুত্রের সম্মতিক্রমে ১১৫৯ সালের পয়লা বৈশাখ আসাদুজ্জামান খানকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। বাংলো ১১৭৮ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং গুলবাগিচায় তাকে কবর দেয়া হয়।

জ্যেষ্ঠপুত্র আহমদুজ্জান খান পিতার জীবিতকালে রাজনগরে ১১৬৯ সালের ১৫ই মাঘ (ইং ১৭৬২) ইন্তেকাল করেন এবং তাকে ইমামবারায় কবর দেয়া হয়।

মোহাম্মদ আলি নাকি খান বাহাদুর ১১৭১ সালের ২১শে ফাল্গুন (ইং ১৭৬৪) রাজনগরে ইন্তেকাল করেন। তাকে ইমামবারায় তার ভাইয়ের পাশে কবর দেয়া হয়।

পঞ্চম ॥ রাজা মোহাম্মদ বাহাদুরুজ্জামান খান বাহাদুর ১১৫৯ সালের পয়লা বৈশাখ (ইং ১৭৫২) থেকে ১১৮৪ সাল (ইং ১৭৭৭) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১১৮৪ সালে সম্ভ্রান্ত লোকদের বাসস্থান কলকাতা শহরে গিয়ে তিনি 'কালেজ' রোগে আক্রান্ত হন ও ইন্তেকাল করেন। তার লাশ রাজধানীতে এনে গুলবাগিচায় কবর দেয়া হয়। তিনি ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করেন। [কালেজ একপ্রকার পক্ষাঘাত রোগ; কথিত আছে যে, একজাতীয় অশুভ পাখি কারো দেহে ছায়া ফেললে তার এই রোগ হয়।]

ষষ্ঠ ॥ মোহাম্মদ বাহাদুরুজ্জামান খান তার ভ্রাতার মৃত্যুর পর বাংলা ১১৮৫ সালের গোড়া (ইং ১৭৭৮) থেকে ১১৯৬ সাল (ইং ১৭৮৯) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালের মেয়াদ ছিলো বারো বছর। জীবিতকালে তিনি বাংলা ১১৯৩ সালে তার শিশুপুত্রকে সমস্ত সরকারি কাগজে দস্তখত ও সীলমোহর করতে দেন এবং তাকে শাহজাদার সকল কর্তব্য সুশিক্ষিত করে তোলেন। ১১৯৬ সালে মূত্রাশয়ের উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি হোসেনবাদে তার পল্লীভবনে ইন্তেকাল করেন। তার লাশ রাজধানীতে এনে গুলবাগিচায় কবর দেয়া হয়।

সপ্তম ॥ রাজা মোহাম্মদুজ্জামান খান বাহাদুর পিতার মৃত্যুর পর নাবালক অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজেই রাজকার্য সম্পাদন করেতন এবং সরকারি কাগজপত্রে দস্তখত করতেন; কিন্তু তিনি নাবালক হওয়ায় মি. কিটিং সরবরাকর ও লালারাম নাথ দেওয়ান নিযুক্ত হন। বাংলা ১১৯৭ সালে (ইং ১৭৯০) সাবালক হওয়ার পর তিনি বীরভূম রাজ্যের জন্য সরকারের কাছ থেকে সনদ লাভ করেন। তিনি বারো বছরকাল রাজত্ব করেন। সনজ্বর রোগে (সনজ্বর-পোড়া) আক্রান্ত হয়ে ১২০৮ সালের ৫ই ফাল্গুন (ইং ১৮০১) তিনি বারোদরজা প্রাসাদে ইন্তেকাল করেন এবং গুলবাগিচায় তাকে কবর দেয়া হয়।

অষ্টম ॥ রাজা মোহাম্মদ দারাউজ্জামান খান বাংলা ১২০৯ সাল (ইং ১৮০২) থেকে পিতার স্থলে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১২১৯ সালে (ইং ১৮১২) সনদ লাভ করেন। সনজ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১২৬২ সালের ১৭ই ফাল্গুন (ইং ১৮৫৫) রাজধানীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি পুত্র মোহাম্মদ জহুরুজ্জামান খান ও পত্নী রাম বখশনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। রাজধানীতে বাজারের নিকটবর্তী মসজিদের সামনে তাকে কবর দেয়া হয়।

১২৭১ সালের ২৮শে মাঘ বৃহস্পতিবার (ইং ১৮৬৪) শিউড়ি শহরে বসে নগর রাজবংশের এই পারিবারিক পুস্তক শেখ রহিম বখশ, মোক্তার কর্তৃক নকল করা হলো এবং সকাল ৯ ঘটিকায় কার্য সমাপ্ত হলো, [শেখ রহিম বখশ মোক্তার আমার মুনশি।]

ছ পরিশিষ্ট

সাঁওতাল কিংবদন্তী

(অবিকল অনুবাদ)

১। পৃথিবীর উৎপত্তি

আদিকালে সমস্তই সমুদ্র ছিলো এবং দু'টি পাতিহাঁস ছিলো—একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী। তারা পানির ওপর ঘুরে বেড়াতো। তখন মারাং বুরু (হিন্দুদের শিবের মতো একজন দেবতা) বলেন, 'হাঁস দু'টি আমি কোথায় রাখি?' তিনি বলেন, 'সমুদ্রে একটি পদ্ম আছে।' তারপর তিনি বলেন, কে এই মাটি তুলে আনবে? একটি কাঁকড়া আছে; যাও, তাকে ডেকে আনো।' তাদের ডাকে কাঁকড়া এলো এবং মারাং বুরুর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন?'—'আমি শুধু জানতে চাই, তুমি এই মাটি তুলে আনতে পারবে?'—হ্যাঁ, আপনি আদেশ করলে আমি পারবো।' তারপর কাঁকড়া নখের সাহায্যে মাটি তোলার চেষ্টা করলো; কিন্তু উপরে ওঠার সময় সব পানিতে ধুয়ে গেলো। তারপর মারাং বুরু বললেন, 'কাঁকড়া কখনোই মাটি তুলতে পারবে না। আর কে আছ?'—'আর কেঁচো মহারাজ ছাড়া কেউ নেই'— 'যাও, তাকে ডেকে আনো।' কেঁচো মহারাজ এসে বললো', 'হে মহাপ্রভু ও মারাং বুরু আমাকে কি জন্য ডেকেছেন?'—'কিছু না, আমি শুধু জানতে চাই' তুমি এখানে মাটি তুলতে পারবে কিনা।'—'পারবো, তবে একা বোধ হয় সম্ভব হবে না।' মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কে আছে।'—'একটি কচ্ছপ ছাড়া আর কেউ নেই। সে যদি আমাকে মাথায় নেয়, তাহলে আমি মাটি তুলতে পারি',—'তাহলে কচ্ছপকে ডাকো।'

কচ্ছপ এসে বললো, 'হে মহাপ্রভু ও মারাং বুরু আমাকে ডেকেছেন কেন?'—'কিছু না, আমি শুধু জানতে চাই, তুমি মাথায় করে মাটি বহন করতে পারবে?' 'হ্যাঁ আপনি আদেশ দিলে পারবো; তবে আমার চার পা (পৃথিবীর) চার কোণে বেঁধে দিতে হবে; তাহলে আমি বহন করতে পারবো।' তারপর কচ্ছপের চার পা বেঁধে দেয়া হলো এবং কেঁচো মহারাজ মাটি তুলে পদ্ম পাতার ওপর রাখলো।

তারপর মহাপ্রভু মারাং বুরুকে বললেন, 'যাও দেখে এসো, কেমন হয়েছে'। মারাং বুরু নেমে এলেন, দেখলেন এবং পায়ের ছাপ দিয়ে পরীক্ষা করলেন; কিন্তু দেখলেন মাটি নরম ও ভাসমান। তিনি মহাপ্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মাটি নরম ও ভাসমান।' মহাপ্রভু বললেন, 'তাহলে তুমি গিয়ে ঘাসের বীজ লাগাও, শেকড় হলে শক্ত হবে।'

২। প্রথম মানব দম্পতি

তারপর সেখানে বেনা ঘাস হলো। পুরুষ ও স্ত্রী পাতিহাঁস সেই বেনার উপরে বসলো এবং ডিম পাড়লো। তা দেয়ার পর ফুটে গেলে ডিম থেকে দু'জন পুরুষ (ভাই ও বোন) বেরিয়ে এলো।

এই ঘটনার পর মহাপ্রভু মারাং বুরুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো?'

মারাং বুরু জবাব দিলেন, 'দু'জন মানুষ জন্মেছে।'—'আচ্ছা, জন্মে থাকলে তাদের ঐখানেই রেখে দাও।' (পুনরায়) মহাপ্রভু মারাং বুরুকে বললেন, 'যাও দেখে এসো তারা কেমন আছে।, মারাং বুরু গিয়ে দেখে এসে খবর দিলেন, 'হে মহাপ্রভু, আমি গিয়ে তাদের দেখে এসেছি। তারা বড়ো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাদের পরনে কোনো কাপড় নেই।'

৩। কাপড় সরবরাহ

তারপর মহাপ্রভু বললেন, 'ওহে মারাং বুরু, তাদের দু'খানা কাপড় দিয়ে এসো— একখানা দশহাত, আর একখানা বারো হাত।' মারাং বুরু কাপড় নিয়ে গেলে তারা জিজ্ঞেস করলো, 'ওহে দাদু, তুমি কোথায় এসেছো?' —'নাতি হে, আমি এখানে তোমাদের দেখতে এসেছি।'—'আমরা ভালো আছি।'—বেশ বেশ; নাতি, এই কাপড় পরো।' এই বলে তিনি বালককে দশ হাতি এবং বালিকাকে বারো-হাতি কাপড়খানা দিলেন। বালকের কাপড়খানা কৌপিন মাত্র হলো এবং বালিকার কাপড়খানায় কোনোমতে কোমরের আবরণ হলো।

৪। সোমরস প্রস্তুত

মহাপ্রভু আরও বলেন, 'ওহে মারাং বুরু, তুমি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করো।' মারা বুরু সেখানে গিয়ে বললেন, 'ওহে নাতি-নাতনি' শোনো, তোমাদের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'—'বলো দাদু, কি কথা।'—'কথা হচ্ছে, আমি তোমাদের দুই পাত্র সোমরসের জাও দিচ্ছি; এই জাও হাণ্ডার (মাটির হাঁড়ি) মধ্যে রেখে দাও।'—'আচ্ছা, আমরা রেখে দেবো।' তারপর তারা হাণ্ডা তৈরি করলো এবং চারদিন পর মারাং বুরু আবার তাদের দেখতে এলেন ঃ 'ওহে নাতি-নাতনি, আমি যেমনভাবে বলেছিলাম, সেভাবে হাণ্ডা তৈরি করেছো তো?'—'হ্যাঁ দাদু, আমরা তৈরি করেছি।'—'নিয়ে এসো তো দেখি কেমন হয়েছে।' দেখার পর তিনি বললেন, 'নাতি-নাতনি, এবার পেট ভরে খাও। তবে আগে পানি ঢেলে দাও।' তারা হাণ্ডায় পানি ঢেলে দিলো। তারপর মারাং বুরু বললেন, 'পানি দিয়েছো তো? আচ্ছা, এবার পাতা দিয়ে পেয়ালা বানাও।'—'এই তো দাদু পেয়ালা বানালাম। 'আচ্ছা, এবার নিয়ে এসো।' তারা হাণ্ডা নিয়ে এলো এবং বললো, 'দাদু, তুমি খাও।'—'না, আর একটা কাজ বাকি আছে।' 'কি বাকি থাকলো?' 'প্রথমে তোমাদের অঞ্জলি দিয়ে এই মারাং বুরুকে (অর্থাৎ আমাকে) পূজা করতে হবে।'

৫। সন্তান সৃষ্টি

তারপর তারা মারাং বুরুর উপাসনা করলো এবং তিনি বললেন, 'এবার তোমরা খাও।' তারা বললো, 'তুমিও খাও, দাদু।' 'না হে নাতি-নাতনি, 'তোমরাই খাও।' মারাং বুরু পুনরায় বললেন, 'তোমরা খাও; আমি বাড়ি ফিরে যাবো।' তারপর তারা দু'জন সোমরস পান করে মাতাল হয়ে গেলো। মারাং বুরু ফিরে এসে দেখলেন যে, তারা ঘোর মাতাল হয়ে গেছে। একজন এখানে এবং আরেকজন ওখানে বেঘোরে পড়ে আছে। মারাং বুরু এ অবস্থা দেখে তাদের টেনে এনে এক জায়গায় করলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে শয়ন করলো।

পরদিন সকালে মারাং বুরু এসে তাদের এক জায়গায় শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'কি হে নাতি-নাতনি, এখনো যে ওঠোনি, ব্যাপার কি?' 'আহ্ দাদু, এই কিন্তু খুব খারাপ; কাল তুমি আমাদের খুব মাতাল করে দিয়েছিলে। হায় হায়, কি লজ্জা দাদু; কিন্তু লজ্জার কাজই হয়ে গেছে। এখন উপায়?'

এভাবে সেখানে বাস করতে করতে তাদের সাতটি ছেলে ও সাতটি মেয়ে হলো। কিছুদিন পর তারা মারজা তুদুকো কর্তৃক বিতাড়িত হলো।

৬। বিস্তৃতি

'কাঁটা ঝোপের নিচে তারা আমায় লুকিয়ে রাখে,
লম্বা ঘাসের নিচে তারা আমায় লুকিয়ে রাখে।'

তারপর বেশিদিন সেখানে থাকতে না পেরে ছেলেমেয়ে নিয়ে তারা চায়ে চাম্পার পাদদেশে চলে গেলো এবং সেখানেই বাস করতে লাগলো। সেখানে তাদের বিপুল বংশবৃদ্ধি হলো। চায়ে চাম্পা দুর্গের দু'টি তোরণ ছিলো—আহিন তোরণ ও বাহিনী তোরণ।

তারপর পিলচু-হানাম ও পিলচু-ক্রধি (মূল দম্পতি) তাদের সন্তানদের বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করলো। যে পুত্র প্রথম জন্মগ্রহণ করেছিলো, তার বংশধররা হলো নিজ হসদো-হাদ এবং দ্বিতীয় পুত্রের বংশধররা হলো নিজ মুরমু-হাদ। এভাবে তৃতীয় গোত্র হলো নিজ সারেন-হাদ; চতুর্থ গোত্র হলো নিজতাতি-ঝারি-হাসদো-হাদ; পঞ্চম গোত্র হলো নিজ মারন্দি-হাদ; ষষ্ঠ গোত্র হলো নিজ কেসকু-হাদ এবং সপ্তম গোত্র হলো নিজ তুদু-হাদ।

তারপর তারা চায়ে চাম্পা ত্যাগ করে দুগদারাহাদে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সেখানে থেকে কেউ গেলো সিং-দেশে; কেউ গেলো সিকার দেশে; কেউ গেলো টুণ্ডি দেশে এবং অন্যরা গেলো কাটারা দেশে। এই সকল জায়গা থেকে অনেকে আবার নতুন নতুন দেশে গেলো এবং এভাবে তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। সে সময় থেকে এযাবৎ দুনিয়ার সর্বত্র মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়েছে।

[ব্যাপটিস্ট মিশনারি মি. ফিলিপস দক্ষিণাঞ্চলের সাঁওতালদের কাছ থেকে এই কিংবদন্তী সংগ্রহ করে আমাকে দেন। মধ্য-অঞ্চলের সাঁওতালদের কিংবদন্তীও মূলত এক; কেবলমাত্র নামের বানানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়।]

জ পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত সাঁওতালী ব্যাকরণ

রেভারেন্ড জে. ফিলিপসের 'ইনট্রোডাকশন টু দি সানটাল ল্যাংগোয়েজ' এবং অন্যান্য মিশনারি ও আমার নিজের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে রচিত।

১। উচ্চারণ

সাঁওতালরা কথা বলার সময় প্রায় প্রত্যেকটি শব্দের শেষে এবং কোনো কোনো শব্দের মাঝখানে হঠাৎ বিরতি দেয়। এই বিরতির সময় সাধারণত একেকটি হরফের উচ্চারণ রহিত হয়ে যায়। যথা—'দাগ' (পানি), কিন্তু উচ্চারণের সময় 'দাঃ' 'দাগ-আই' (বৃষ্টি হবে), উচ্চারণের সময় 'দাগ্-ঘাই'। উচ্চারণের এই ধ্বনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা কঠিন। তবে অনেকে বাংলা ভাষার সম্বোধন বা বিস্ময়সূচক (!) এবং বির্সগ (ঃ) চিহ্ন দ্বারা এই ধ্বনির বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। বিসর্গ চিহ্নের উচ্চারণের সঙ্গে সাঁওতালী উচ্চারণের ধ্বনিগত সাদৃশ্য বেশি।

২। বর্ণমালা

সাঁওতালী বর্ণমালা বাংলা বর্ণমালার অনুরূপ। তবে সাঁওতালী ভাষায় একটি অতিরিক্ত হরফ আছে এবং তার উচ্চারণ 'ড়ি'; এই হরফটি স্বরবর্ণের অন্তর্ভুক্ত। এই হরফের কাছাকাছি বাংলা হরফ হচ্ছে 'ঋ'। সাঁওতালী ভাষায় আরেকটি হরফ আছে যার উচ্চারণ 'লি'। বাংলা ভাষায় সমাস ধ্বনিযুক্ত শব্দ 'ঌ' আছে বটে; কিন্তু তার ব্যবহার নেই।

সাঁওতালী ভাষার প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরবর্ণ 'অ' অন্তর্নিহিত আছে; এমন কি শব্দের শেষ হরফ ব্যঞ্জনবর্ণ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বহাল থাকে। যথা—হর, হর্ নয় (কচ্ছপ); বক, বক্ নয়, (হৃদয়)।

৩। সর্বনাম

(ক) রূপান্তরযোগ্য সর্বনাম। এই সর্বনাম মূল ধাতুর সঙ্গে যোগ হয় এবং ইহা দুই প্রকারের; যথা—(১) দ্বিবচন ও বহুবচনের রূপান্তরে যেগুলো মূল ধাতুর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে মিশে যায়; যেমন 'কুল' (একটি বাঘ); দ্বিবচনে 'কুলকিন'; বহুবচনে 'কুলকো'। এই কুলকিন ও কুলকো পরে কারক-সমাপ্তির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(২) কারক-সমাপ্তি; বিশেষ্য পদের রূপান্তর থেকে দেখা যাবে যে, এগুলোর সংখ্যা অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে ইহা মূল ধাতুর পরে যুক্ত হয়, মূলের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে না।

(খ) ব্যক্তিগত সর্বনাম :

এক বচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১ম। ইং (আই-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) : আমি।	আলা : আমরা দুইজন অর্থাৎ তুমি ও আমি আলিং : আমরা দুইজন-সে ও আমি	আবে, আবান : আমরা
২য়। অম : তুমি	আবেন : তোমরা দুইজন।	আপে : তোমরা অনেকে।
৩য়। হুনি : সে (স্ত্রী বা পুরুষ)	হুনকিন : তাহারা দুইজন।	হুনকো : তাহারা।
ওনা : ইহা।	ওনাকিন : ইহা দুইটি	ওনকো : ইহারা।

সাধারণ সর্বনামের আগে 'ত' যোগ করে, অথবা সম্মিলিত শব্দের সঙ্গে নিয়মিত কারক যোগ করে কর্তৃকারক গঠন হয়; যথা—

	একবচন	দ্বিবচন
১মা	তং বা আই-রিনিঃ আমার।	তালিং বা আই-রেন-কিনঃ আমাদের দুইজনের।
২য়া	তাম, আকিন রিনিঃ তোমার।	তাবেন, আকিন-রেন-কিনঃ তোমাদের দুইজনের।
৩য়া	তাই, আকে-রিনি : তাহারা।	তাকিন, আকে-রেন-কিনঃ তাহাদের দুইজনের।

বহুবচন

১মা। তালে, তাবেন, বা আই-রেন-কো : আমাদের।

২য়া। তাপে, আকিন-রেনকো : তোমাদের।

৩য়া। তাকো, আকো-রেন-কো : তাহাদের।

(গ) নির্দেশক সর্বনাম :

হুনি, উনি, হ্যনি, হানা, হোনা, উনাঃ উহা।

নুই, নুয়া, নিয়া : ইহা ইত্যাদি।

(ঘ) পরিমাণগত সর্বনাম :

মিহ্-এক।	তিনা-কিছু।
মি-মি—প্রত্যেক।	নুনা-এতো।
ইতা-অন্য।	নাসে-নাসে—কিছু কিছু।

আর, আর-হো—আরও ততোধিক　　আধন-অর্ধেক, কিছু পরিমাপ।
চেত—কি?　　আমানা—বিস্তৃত, বহু, অনেক।
চেত-হো—যাহা কিছু।　　জোতো—সমস্ত।
চেত-লেকো—কেমন?　　তিন-তিনা—কত?

সংখ্যা—

১	মিহ্	২০ মিহ্-ইসি	১০০ মিহ্-সায়ে
২	বারেয়া	৪০ বার-ইসি	২০০ বার-সায়ে
৩	পিয়া	৬০ পে-ইসি	৩০০ পে-সায়ে
৪	পনিয়া	৮০ পন-ইসি	৪০০ পন-সায়ে
৫	মানে	১০০ মানে-ইসি	৫০০ মানে-সায়ে
৬	তুরুই	১২০ তুই-ইসি	৬০০ তুরুই-সায়ে
৭	ইয়াই	১৪০ ইয়াই-ইসি	৭০০ ইয়াই-সায়ে
৮	ইরাল	১৬০ ইরাল-ইসি	৮০০ ইরাল-সায়ে
৯	আরে	১৮০ আরে-ইসি	৯০০ আরে-সায়ে
১০	গেল	২০০ গেল-ইসি	১০০০ গেল-সায়ে।

লক্ষণীয় যে ২০০ পর্যন্ত হিসেবে কুড়ি-হিসেবে; একক শব্দ ১০-এর সঙ্গে যোগ করে ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা পাওয়া যায়; যেমন, গেল-মিহ্, ১১; গেল-পিয়া, ১৩ ইত্যাদি।

(ঙ) সময়ের সর্বনাম :

নিট, এখন।　　মিহ্-রোংগা, এক মাস।
তেহেং, আজ।　　মিহ্-সেরমা, এক বছর।
হালা, গতকাল।　　নেস, এই বছর।
মাহান্দার, গতপরশু।　　কালোম, আগামী বছর।
ওনমাহান্দার, তিন দিন আগে।　　সাতোম, দুই বছর পর।
গাপা, আগামীকাল।　　ফের-সাতোম, তিন বছর পর।
মিয়াং, আগামী পরশু।　　দিন-কালোম, গত বছর।
এন্দেরাই, তিন দিন পর।　　হাল-কালোম, গত বছরের আগের বছর।
আংগা, সকাল।　　মাহাং-কালোম, তিন বছর আগে।
সেতাহ্, ভোর।　　তিস, কখন।
রাসকেরেদা, সকাল ৯টা।　　এনাং, তখন (অতীতকাল)।
তিকিন, দুপুর　　ধিনাং, তখন (ভবিষ্যৎ কাল)।
তারাসিং, বিকেল ৩টা।　　মানাং আগে বা পূর্বে।
আইউপ, সন্ধ্যা।

(চ) স্থানের সর্বনাম :

নান্তে, এখানে (নিকটে)। বেধাই, চারদিকে।

আন্তে, ওখানে (কিছু দূরে)। নো-পারোম, এই দিকে।

হান্তে বা হানারে, সেখানে (অনেক দূরে)। আন-পারোম, ঐ দিকে।

জাহাংরে, কোথায়। ওকাহোন, কোথায় বা কোন দিকে।

সামাং, সামনে। উড়ুংরে বাইরে ইত্যাদি।

পূর্ণ বিবরণের জন্য রেভারেন্ড ফিলিপসের পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; (কলিকাতা, ১৮৫৩)।

৪। মূলধাতু

(ক) বিশেষ্য পদের এক রূপ, তিন বচন—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন এবং আটটি কারক আছে। যথা— কুল, একটি ভাগ।

একবচন

কুল কুল।

কুল-রিনিহ্, রেনকো, রিয়া, বেনকিন। কুল-খোন, খোনাহ্, খেনখোন।

কুল-লাতে, হাতেতে। কুল-রে তালারে।

কুল-খেন, খেহ্, সরাতে, কেদ। এহো-কুল।

দ্বিবচন-কুলকিন; বহুবচন—কুলকো।

অর্থাৎ একবচনের রূপ অপরিবর্তিত থেকেই রূপান্তর ঘটে। অনুরূপ আরও বহু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সাঁওতাল ভাষায় ধাতুরূপ মূল ধাতুর আগে যোগ না হয়ে সাধারণত পরে যোগ হয়। এই ভাষায় বস্তুনিরপেক্ষ ভাব প্রকাশের জন্য কোনো বিশেষ্য পদ নেই; ক্রিয়াপদের অতিরিক্ত ব্যবহার করে এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হয়। যেমন—'ব্রিটিশ আইন ন্যায়সঙ্গত' না বলে সাঁওতালরা বলবে 'ব্রিটিশ যা-তৈরি করেছে, তা ন্যায়সংগত।'

(খ) ক্রিয়া :

মি. ফিলিপস উল্লেখ করেছেন যে, সাঁওতালী ক্রিয়াপদে চারটি বাচ্য, পাঁচটি ধাতুরূপ ও নয়টি কাল আছে।

সাঁওতালী ক্রিয়াপদের তিনটি বচন আছে—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন এবং দু'টি লিঙ্গ আছে—সাধারণ (অর্থাৎ পুং বা স্ত্রী) ও ক্লীব লিঙ্গ। বাক্যের সকল পদের পুরুষ, বচন ও লিঙ্গ একই ধরনের হয়ে থাকে।

অন্যান্য অধিকাংশ ভাষার ন্যায় সাঁওতালী ভাষাতেও 'হাওয়া' ক্রিয়াপদটি অনিয়মিত; অর্থাৎ একাধিক রকমের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়; ফলে কোনোটিরই পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণরূপ পাওয়া যায় না। বর্তমান কালের ক্ষেত্রে 'মেনা' ব্যবহৃত হয়, যেমন—

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	মেন-আইং-ঙ্গা, আমি হই।	মেন-আলিং-ইয়া।	মেন-আলে-আ।
২য়া	মেন-আমা, তুমি হও।	মেন-আবেন-আ।	মেন-আপে-আ।
৩য়া।	মেন-আলা, সে হয় (স্ত্রী বা পুং)। মেন-আহ-আ, ইহা হয়। মেন-আকিন-আ।		মেন—আকি-আ। মেন-আহে-আ।
১মা।	মেন-আইং-খান, যদি আমি হই।	মেন-আলিং-খান।	মেন-আলে-খান।
২য়।	মেন-আম-খান, যদি তুমি হও।	মেন-আবেন-খান।	মেন-আপে খান।
৩য়।	মেন-আই-খান, যদি সে হয়।	মেন-আকিন-খান।	মেন-আকো-খান।

কর্তৃপদের বচন ও পুরুষের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আকারে—

১ম। মেন-আহ-তিংঙ্গা ইহা আমার।
২য় মেন-আইং-তামা আমি তোমার।
৩য় মেন-আকিন-তাইয়া ঐ দুইটি তাহার।
} একবচন।

১ম। মেন-আই-তা.লিং-ইয়া ইহা আমাদের দুই জনের
২য়। মেন-আহ-তাবেন-আ ইহা তোমাদের দুইজনের
৩য়। মেন-আলে-তাকিন-আ ইহা তাহাদের দুইজনের
} দ্বিবচন।

১ম। মেন-আকো-তালে-আ ঐগুলি আমাদের
২য়। মেন-আলিং-তাপে-ইয়া আমরা দুইজন তোমাদের
৩য়। মেন-আবেন-তাকো-আ তোমরা দুইজন তাহাদের
} বহুবচন

মূল ক্রিয়াপদের অন্যান্য কালের রূপ 'তাহেন' (থাকা) শব্দ থেকে পাওয়া যায়। যেমন—

ভবিষ্যৎকাল : আমি থাকিব

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১ম।	তাহেন-আইং	তাহেন-আলিং	তাহেন-আলে।
২য়।	তাহেন-আম	তাহেন-আবেন	তাহেন-আপে
৩য়।	তাহেন-আই	তাহেন-আকিন	তাহেন-আকো

বর্তমান কাল : আমি থাকি

১ম।	তাহেন-কান-আই	তাহেন-কান-আলিং	তাহেন-কান-আলে
২য়।	তাহেন-কান-আম	তাহেন-কান-আবেন	তাহেন-কান-আপে
৩য়।	তাহেন-কান-আই	তাহেন-কান-আকিন	তাহেন-কান-আকো

অতীত কাল : আমি ছিলাম

১ম।	তাহেন-এন-আইং	তাবেন-এন-আলিং	তাহেন-এন-আলো
২য়।	তাহেন-এন-আম	তাহেন-এন-আবেন	তাহেন-এন-আপে
৩য়।	তাহেন-এন-আই	তাহেন-এন-আকিন	তাহেন-এন-একো

আরেকটি উদাহরণ দিলেই সম্ভবত যথেষ্ট হবে। অকর্মক ক্রিয়া 'তাহেন'-এর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তা, বচন ও পুরুষের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেছে। এবার সকর্মক ক্রিয়া 'ডাল'-এর (মারা) ক্ষেত্রে বচন, পুরুষ ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যাবে। লক্ষণীয় যে, ক্রিয়ার মূল ধাতুটি প্রথমে আসে, তারপরে কর্ম, তারপরে কর্তা আসে। কর্তা পদটি সর্বত্র একই ধরনের থাকে এবং কোনো রকম ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হয় না।

ভাববাচ্যে ক্রিয়ার কর্তৃকারক

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১ম।	আইং, আমি	আলিং, আমরা দুইজন	আলে বা আবান, আমরা
২য়।	অম, তুমি	আবেন, তোমরা দুইজন	আপে, তোমরা
৩য়।	আই, সে	আকিন, তাহারা দুইজন	আকো, তাহারা

ভবিষ্যৎকাল : সর্কমক ক্রিয়া

একবচন

১ম। ডাল-এং-জা-আই, সে আমাকে মারিবে।

২য়। ডালে মে-আইং, আমি তোমাকে মারিব।

৩য়। ডাল-এ-আম, তুমি তাহাকে মারিবে।

দ্বিবচন

১ম। ডাল-আলিংগা-আকিন, তাহারা দুইজন আমাদের দুইজনকে মারিবে।

২য়। ডাল-আবেনা-আলিং, আমরা দুইজন তাহাদের দুইজনকে মারিব।

৩য়। ডাল-আকিনা-আবেন, তোমরা দুইজন তাহাদের দুইজনকে মারিবে।

বহুবচন

১ম। ডাল-আলেয়া-আকো, তাহারা আমাদের মারিবে।

২য়। ডাল-আপেয়া-আলে, আমরা তোমাদের মারিব।

৩য়। ডাল-আকোয়া আপে, তোমরা তাহাদের মারিবে।

বর্তমানকাল

	একবচন	দ্বিবচন
১ম।	ডাল-এড-ইং-জা, আমাকে মারে।	ডাল-এহ-লিংগিয়া।
২য়।	ডাল-এহ-মিয়া, তোমাকে মারে।	ডাল-এহ-বেনা।
৩য়।	ডাল-এড-ইয়া, ইহাকে মারে।	ডাল-এহ-কিনা।

বহুবচন

১ম। ডাল-এহ্-লিয়া, আমাদের মারে।

২য়। ডাল-এহ্-পিয়া, তোমাদের মারে।

৩য়। ডাল-এহ কোয়া, তাহাদের মারে।

অতীত কাল

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১ম।	ডাল-আকাদ ইং-ভ্জা	ডাল আকাত লিংগিয়া	ডাল-আকাদ-লিয়া
	আমাকে মারিয়াছে।	আমাদের দুইজনকে মারিয়াছে	আমাদের মারিয়াছে

সাঁওতালী ভাষার সাধারণ প্রকৃতি এবং অন্যান্য ভাষার মধ্যে তার স্থান সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এটুকুই সম্ভবত যথেষ্ট। মি. ফিলিপসের পুস্তকে বাংলা হরফের সাহায্যে এই ভাষার বিস্তারিত পরিচয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রেভারেন্ড মি. পাব্রলে এই ভাষা সম্পর্কে বহু বছর যাবৎ তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তিনি একখানি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। এই দুই জনের কাছেই আমি আরেকবার আমার ঋণ স্বীকার করছি।

খ পরিশিষ্ট

সাঁওতালদের দশটি উৎসব

১। জোহোরাই—ডিসেম্বর মাসে ধান কাটার পর এই উৎসব হয় এবং প্রত্যেক গ্রামে পাঁচ দিন যাবৎ চলে। তবে প্রত্যেক গ্রামের জন্য আলাদা আলাদা পাঁচ দিন করে স্থির করে প্রায় এক মাস যাবৎ এই উৎসব পালন করা হয়। জোহোরাই-এর অনুষ্ঠান সরল-সহজ। মাটির ওপর একটি ডিম রেখে গ্রামের সমস্ত গরু তার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যে গরুটি প্রথম ডিমটি শুঁকে দেখে, তার শিং-এ সম্মান ও যত্ন সহকারে তেল মাখানো হয়।।

২। মাক্‌মাত—জোহোরাই-এর কয়েকদিন পরে অনুষ্ঠিত হয় এবং দুই দিন যাবৎ চলে। তীর-ধনুক চালনা, তরবারির নৃত্য প্রভৃতির মারফত এ উৎসব পালন করা হয়।

৩। যাত্রা—ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে অনুষ্ঠিত হয় এবং দুইদিন যাবৎ চলে। প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামের কাছে দু'টি করে মোটা খুঁটি পোঁতা হয় এবং প্রত্যেক খুঁটির নাগরদোলায় আটজন লোক চেয়ারে বসে ঘুরপাক খায়। বিলেতের মেলায় এ জাতীয় নাগরদোলা দেখা যায়।

৪। বাহা (ফুল)—মার্চ মাসের দিকে অনুষ্ঠিত হয় এবং দু'দিন যাবৎ চলে। প্রত্যেক বাড়িতে নাইকির (পুরোহিত) পা ধুয়ে দেয়া হয় এবং তিনি তার বিনিময়ে ফুল বিতরণ করেন। গ্রামের বাইরে শাল বাগানে উৎসব হয়। মারাং বুরু (সাঁওতালদের প্রধান দেবতা) নামে চারটি মুরগি; জহির-এবার (সাঁওতালদের আদি মাতা) নামে একটি রঙিন মুরগি; গোসাই-এবার (জহির-এবার মতো শালবনে বসতকারী একজন দেবী) নামে একটি কালো মুরগি এবং মাঝি হারামের (গ্রামের মৃত প্রধান) নামে ছাগল বা মুরগি উৎসর্গ করা হয়।

৫। পোলা—অর্থাৎ পিঠ ছিদ্র করে দড়ি পরে ঝুলন্ত অবস্থায় ঘুরপাক খাওয়া। সরকার এখন এসব বন্ধ করে দিয়েছেন; কিন্তু উত্তরাঞ্চলের সাঁওতালরা এপ্রিল বা মে মাসে এখনো (১৮৬৫) পালন করে থাকে। হিন্দুদের চড়ক পূজার মতো যুবকদের পিঠ ছিদ্র করে দড়ি পরিয়ে দেয়া হয় এবং দড়ির অন্য প্রান্ত উঁচু খুঁটিতে বেঁধে দেয়া হয়। এভাবে তারা খুঁটির চারদিকে ঘুরপাক খায়। ঘুরপাকের আগে ও পরের দিন যুবকরা উপোস করে এবং মাঝখানের রাত্রিকাল কাঁটার ওপর ঘুমায়।

৬। ইরো-সিম—(ধান বোনার মুরগি) ধান বোনার সময় প্রত্যেক বাড়িতে মুরগি উৎসর্গ করা হয়।

৭। হরিয়ার-সিম—(সবুজ মুরগি)। ধানের চারা যখন বেশ ঘন ও সবুজ হয়ে ওঠে, সেই সময় নাইকি (পুরোহিত) মুরগি উৎসর্গ করেন।

৮। ছাতা—আগস্ট মাসের দিকে অনুষ্ঠিত হয় এবং পাঁচদিন যাবৎ চলে। নাইকি (পুরোহিত) একটি ছাগল উৎসর্গ করেন এবং গ্রামের লোকেরা একটি উঁচু খুঁটির মাথায় বাঁধা একটি বাঁশের ছাতার চার দিকে বৃত্তাকারে নাচে।

৯। ইরি-গুণ্ডলি—(দুই রকমের ফসল)। নাইকি (পুরোহিত) জহির আনে (শালবন) গিয়ে দুধের সঙ্গে দুই রকমের ফসল (বা শস্যদানা) উৎসর্গ করেন এবং গরিব লোকদের খাওয়ার জন্য ডাকেন।

১৩। হোরো— (ধান)। ধান পেকে উঠলে এই উৎসব হয়। প্রথম পাকা ধান কেটে নিয়ে একটি শূকরসহ পরগনা বোংগার (জেলা-দেবতা) নামে উৎসর্গ করা হয় এবং গ্রামের পুরুষরা শালবনে মিলিত হয়ে তা সানন্দে ভোজন করে।

প্রত্যেকটি উৎসবেই প্রচুর পরিমাণ ধেনো-মদ প্রস্তুত ও পান করা হয়।

এ. পরিশিষ্ট

সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে কতিপয় সরকারি কাগজপত্র

১। বেসামরিক অফিসারদের প্রতি সাধারণ নির্দেশ। বঙ্গীয় সরকারের ১৭৮৬ নং পত্র; ৩০শে জুলাই, ১৮৫৫।

জনাব, এই চিঠি পাওয়ার আগেই আপনি সম্ভবত জানতে পারবেন যে, মেজর জেনারেল লয়েড সাঁওতালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমগ্র সেনাবাহিনীর সেনানায়ক নিযুক্ত হয়েছেন।

২। সরকার জেনারেল লয়েডকে সর্বপ্রথম রাজমহল যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাকে জানানো হয়েছে, বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের বাঞ্ছনীয়তার বিষয় বিবেচনা করে সপারিষদ প্রেসিডেন্ট অভিযান পরিচালনার সকল দায়িত্ব তার ওপর অর্পণের সিদ্ধান্ত করেছেন এবং বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ ও বন্দি করে বিদ্রোহ দমনের জন্য তাকে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। এই আদেশ সরকারকে জানানোর সময় সপারিষদ প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করেছেন, মেজর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং অভিযান বিষয়ে তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা ক্রিয়াশীল করে তোলার ব্যাপারে তাকে সকল প্রকার সংবাদ ও সাহায্য প্রদানের জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিভিন্ন বিভাগের বেসামরিক অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

৪। পরবর্তী একখানি চিঠিতে সপারিষদ প্রেসিডেন্ট ব্যাখ্যা করে বলেছেন, জেনারেল লয়েডকে প্রদত্ত উপরে উদ্ধৃত নির্দেশ এমন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হয়নি যে, সামরিক বাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মতামত ছাড়াই আমাদের নিজস্ব প্রজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করবে; নির্দেশে শুধু এই কথাই বলা হয়েছে—বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ ও বন্দি করা এবং বিদ্রোহ দমন করার জন্য কি ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তা একমাত্র সামরিক কর্মকর্তাগণই স্থির করবেন। তিনি আরও বলেছেন, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এখনো তাদের এক্তিয়ারভুক্ত বেসামরিক পন্থায় কাজ করতে পারেন এবং একমাত্র যে পরিবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সৈন্য সমাবেশের ব্যাপারে প্রত্যেকটি বেসামরিক অফিসারের যে ক্ষমতা আছে, তা একজন অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারের কাজে হস্তান্তর হয়ে যাবে এবং সেনাবাহিনীর ব্যাপারে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব এই সামরিক অফিসারের ওপর অর্পিত হবে। সপারিষদ প্রেসিডেন্ট তার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, আকস্মিক

জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সেনাবাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন; তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশের অবস্থা বিদ্রোহীদের চলাচল সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে সামরিক অফিসারদের এবং বিশেষত জেলার ভারপ্রাপ্ত সেনাপতিকে অবহিত রাখবেন এবং বিদ্রোহ দমনের সাধারণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোনো বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে সে সম্পর্কে তার কাছে সুপারিশ পেশ করবেন।

৫। জেনারেল লয়েডের নিয়োগের পর সপারিষদ প্রেসিডেন্ট বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় নিযুক্ত সেনাবাহিনীর বিশেষ সেনাপতি হিসেবে ব্রিগেডিয়ারের পদমর্যাদা দিয়ে কর্নেল বার্ডকে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় বলে স্থির করেছেন। এ অফিসারকে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সর্বত্র বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ ও বন্দি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাকে জানানো হয়েছে যে, মঙ্গলপুরে মি. লোচ এবং শিউড়িতে আপনি তাকে সকল প্রকার সংবাদ ও সাহায্য দান করবেন এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে তাকে মি. লোচ ও আপনার সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

৬। উপরোক্ত নির্দেশগুলোর সঙ্গে লেফটেন্যান্ট গভর্নর কেবলমাত্র এটুকুই যোগ করতে চান যে, সেনাবাহিনীর কাজকে সফল করে তোলার জন্য আপনি নিজে এবং আপনার অধীনস্থ সমস্ত বেসামরিক অফিসার সম্ভাব্য সকলভাবে সাহায্য করবেন বলে তিনি গভীর আশা পোষণ করেন। সেনাবাহিনীর জন্য পারদর্শী ও নির্ভরযোগ্য পথ প্রদর্শক সংগ্রহ করা এবং যানবাহন ও রসদ সরবরাহের ওপরই আপনি বিশেষ নজর রাখবেন। কয়েকদিন আগে পার্শ্ববর্তী সমস্ত জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক হাতি সংগ্রহ করে বীরভূম ও ভাগলপুরে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই কিছুসংখ্যক হাতি কলকাতা থেকে সরাসরি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কোনো জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করা হবে বলে স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিসার ও সৈনিকদের জন্য যাতে থাকবার ভালো জায়গার ব্যবস্থা হয়, সে বিষয়ে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং সেপাইদের শোয়ার জন্য যথা শিগ্‌গির চারপায়া বা অনুরূপ কোনো উঁচু জিনিসের ব্যবস্থা করেন।

৭। আপনার এলাকায় যদি চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য না হয়ে থাকে এবং হওয়াই সম্ভব, তাহলে আপনি প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন সেনাদলের অধিনায়কদের কয়েকটি সাধারণ ঔষধ, বিশেষত কুইনাইন সরবরাহ করবেন এবং প্রত্যেকটি ঔষধ কি মাত্রায় খেতে হবে তা জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

৮। লেফটেন্যান্ট গভর্নর আশা করেন যে, কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনি যতো ঘন ঘন সম্ভব রিপোর্ট পাঠাবেন।

৯। এই আদেশের বিবরণ আপনি সমস্ত উপদ্রুত জেলায় নিযুক্ত আপনার অধীনস্থ অফিসারদের জানিয়ে দেবেন।

২। ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি কমিশনারের নির্দেশ; ১৫ই আগস্ট, ১৮৫৫।

জনাব—

২। আপনি সাঁওতাল জনসাধারণের মধ্যে এই সঙ্গে পাঠানো ফরমানটি সম্ভাব্য সকলভাবে প্রচার করবেন এবং আত্মসমর্পণের জন্য আপনার কাছে আগত প্রত্যেকটি লোকের নাম ও তফসিলে নির্ধারিত বিবরণ একখানি বহিতে লিপিবদ্ধ করেন।

২। যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এই সঙ্গে পাঠানো মুচলেকায় দস্তখত করিয়ে নেবেন এবং প্রত্যেককে নির্ধারিত ফরমে একখানি সার্টিফিকেট দেবেন।

৩। ক্ষমা প্রদর্শনের ফরমান

যেহেতু যে সকল সাঁওতাল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে দেশে লুটতরাজ করছে ও সেনাবাহিনীর বিরোধিতা করছে, তাদের মধ্যে এমন লোক আছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, যারা এ জাতীয় কাজের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করেছে এবং ক্ষমালাভ করে পুনরায় শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করছে; সেহেতু এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কু-লোকের পরামর্শে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও প্রজার কল্যাণের জন্য সর্বদা আগ্রহশীল থাকায় সরকার সাঁওতালদের ক্ষমা করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন এবং যারা দশদিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করবে, তাদের সকলকে ক্ষমা করা হবে। তবে যারা বিদ্রোহের উস্কানি ও প্ররোচনা দিয়েছে, অথবা বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে এবং যারা কোনো নরহত্যায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের অব্যবহিতপরই সাঁওতালদের প্রত্যেকটি সঙ্গত অভিযোগ সম্পর্কে পুরোপুরি তদন্ত করা হবে। তবে এই ফরমান জারি হওয়ার পর যে সকল বিদ্রোহী সরকারের বিরোধিতা করতে থাকবে, তাদের কঠোরতম শাস্তি দেয়ার জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে লিখিত বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেটের পত্র : ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫।

গত পনেরো দিনের মধ্যে বিদ্রোহীরা উপরবান্ধা ও নাংগুলিয়া থানার ত্রিশটিরও বেশি গ্রাম লুটতরাজ করেছে ও জ্বালিয়ে দিয়েছে। নগরের চার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত লোরোজোর থেকে শুরু করে দেওঘরের কাছাকাছি পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তাদের দখলে রয়েছে। ডাক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এবং জনসাধারণ গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। বিদ্রোহীরা এখন দু'টি বড়ো বড়ো দলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। একদল ভাগলপুর জেলার উপরবান্ধা থানার দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত রক্ষডাংগালে ছাউনি ফেলেছে এবং অন্য

দল নাংগুলিয়া থানার সীমানায় শিউড়ি থেকে ছয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত তিলাবুনিতে সমবেত হয়েছে। তাদের সংখ্যা অনুমান গড়পড়তা ১২,০০০ থেকে ১৪,০০০ হবে এবং প্রত্যহ এ সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

২। এই মাসের ১৬ তারিখ বিকেলবেলা মুচিয়া কোনজোলা, রাম মাঝি ও সুন্দ্রা মাঝির নেতৃত্বে রক্ষডাংগাল ছাউনির প্রায় ৩,০০০ সাঁওতাল উপরবান্ধায় এসে সমবেত হয় এবং পরদিন থানা ও গ্রাম লুটতরাজ করে ও জ্বালিয়ে দেয়। দারোগা ও বরকন্দাজগণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাহারায় হাজির ছিলো; কিন্তু অতো অধিকসংখ্যক লোককে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা বৃথা মনে করা তারা পিছু হটে যায় এবং দারোগা কৌশলে শাহানা ও আফজালপুর হয়ে পালাতে সক্ষম হন। গত ২২ তারিখে মাত্র তিনি একবস্ত্রে এখানে এসে পৌঁছেছেন। হামলার কয়েকদিন আগেই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, সাঁওতালরা থানা আক্রমণ করবে; তাই তিনি থানার সমস্ত নথিপত্র দেওঘর পাঠিয়ে দেন এবং সেখানকার সেনাদলের অধিনায়কের কাছে সাহায্যে আবেদন জানান; কিন্তু ঘন জঙ্গলপূর্ণ দুরূপাল্লার পথ বলে অধিনায়ক সৈন্য পাঠাতে গররাজি হন। মি. ওয়ার্ডকে এ ঘটনা জানানোর পর তিনি আমাকে বলেন, বর্ষাকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের হটিয়ে দিয়ে এলাকার দখল নেয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে তখন শাহানা থানার জামতেরা, উপরবান্ধা ও আফজালপুরে গিয়ে ছাউনি ফেলার জন্য রানীগঞ্জ থেকে পাঠিয়ে দেয়ার আশু দরকার ছিলো। আমি এইমাত্র খবর পেলাম যে, সেনাবাহিনী তাদের গন্তব্যস্থলে হাজির হয়েছে এবং শাহানা থানার নিরাপত্তার জন্য তাদের উপস্থিতিই যথেষ্ট হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শাহানা থানার কোনো জায়গায় এখনো কোনো রকম হামলা হয়নি। তবে চারদিক থেকে বহু সাঁওতাল এসে এখন বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। উপরবান্ধায় সামরিক ছাউনি না পড়া পর্যন্ত বর্তমান বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পরিসমাপ্তি হবে না। সেনাবাহিনী আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশদের থানায় পাঠিয়ে দেবো ও ডাক চালু করার ব্যবস্থা করবো। বর্তমানে ডাক চালু করার কোনোমতেই সম্ভব নয়; কারণ রাম মাঝি প্রায় দু'শ' লোক নিয়ে হলদিগড় পাহাড়ের কাছে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং ঐ পথ দিয়ে যারা যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের মারধর করে সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। এই সঙ্কটকালে দেওঘরে একজন বেসামরিক অফিসার না থাকা খুবই দুঃখজনক; এরূপ একজন অফিসারের এখন খুবই প্রয়োজন ছিলো। আগের চিঠিতে আমি অবশ্য এ বিষয়টি আপনার নজরে এনেছি।

৩। পাঁচ থেকে সাত হাজার সাঁওতালের একটি দল সিরু মাঝির নেতৃত্বে তিলাবুনিতে গড় ও পুকুর কেটে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। তারা এখন দুর্গাপূজা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং এই উদ্দেশ্যে নাংগুলিয়া থানার একটি গ্রাম লুট করার সময় তারা দু'জন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। গতকাল আমাদের গোয়েন্দারা খবর এনেছে যে, রক্ষডাংগালের সাঁওতালরা এসে পৌঁছলেই তারা একযোগে শিউড়ি আক্রমণ করবে; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তারা আক্রমণ করবে বলে আমার মনে হয় না।

সাঁওতালরা আমাদের কাছে শাল গাছের একটি শাখা পাঠিয়েছে। তাদের ভাষায় এই শাখার নাম 'ধারা' বা সহকারী চিঠি। শাখাটিতে তিনটি পাতা আছে এবং এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে—তিনদিন পর তারা এসে হাজির হবে। দেওঘরের এক ডাক-রানারকে পথিমধ্যে আটক করে তার সাহায্যে তারা এই শাখা পাঠিয়েছে। সেনানায়ক কর্নেল শিউড়ির উত্তরে ও পশ্চিমে পাহারা বসিয়েছেন বটে; কিন্তু সাঁওতালরা হামলা করলে এই পাহারা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। ইতোমধ্যে আমি খবর পেলাম যে, শেঠ জিলান ও তার বরকন্দাজদের নগরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে; কারণ সেখানে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে এবং বহু লোক ইতোমধ্যেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, স্পেশাল কমিশনার যখন এখানে এসেছিলেন, তখন শেঠ জিলান ও তার বরকন্দাজদের তার অধীনে নিয়োগ করা হয়েছিলো।

৫। বীরভূমের কালেক্টরের কাছে লিখিত রানীগঞ্জের সিভিল অফিসারের পত্র ১৩ই নভেম্বর, ১৮৫৫।

জনাব, বিভিন্ন উপদ্রুত জেলায় সামরিক আইন জারি হওয়ায় আমার আর কিছুই করণীয় নেই। বিদ্রোহ সম্পর্কে আমার আমলের কোনো বিষয়ে মীমাংসার প্রয়োজন হলে হুগলীতে আমার কাছে পত্র দিয়েই আমি আপনার খেদমত করতে সক্ষম হবো।

ট পরিশিষ্ট

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে সংযুক্ত জেলার (বীরভূম ও বিষ্ণুপুর) রাজস্ব ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ব্যয়

রাজস্ব, ১৭৮৯

বীরভূমের ভূমি রাজস্ব	... ...	৬,১২,৩২১ চলতি টাকা।
বিষ্ণুপুরের ভূমিরাজস্ব	... ...	৩,৮৬,৭০৭ চলতি টাকা।
বিবিধ রাজস্ব	... ...	১৫,০০০ চলতি টাকা।
	মোট	১০,১৩,০২৮ চলতি টাকা।

অর্থাৎ ১,০১,৩০২ পাউণ্ড ১৬ শিলিং।

ব্যয় ১৭৮৯

রাজস্ব আদায় ও পাঠানোর সাধারণ ব্যয়	...	৩৩,০২০ সিক্কা টাকা।
কালেক্টরের ব্যক্তিগত কমিশন	...	১০,৯০০ সিক্কা টাকা।
দেওয়ানি প্রশাসন	...	৬,৭৭২ সিক্কা টাকা।
ফৌজদারি প্রশাসন, ৪০০ টাকা বাঘ মারার পুরস্কার, ৪০০ টাকা কয়েদিদের আহার ও ৩৬ টাকা দান বাবদ খরচসহ	...	৩,০০০
	মোট	৫২,৬৯২ সিক্কা টাকা।

অর্থাৎ প্রায় ৫৪০০ পাউন্ড

জমা-খরচ ১৭৮৯

আয় ...	...	১০,১৩,০২৮
ব্যয় ...	...	৫২,৬৯২
		৯,৬০,৩৩৬

সরকারের নিট মুনাফা : অর্থাৎ ৯৫,৯০২ পাউন্ড ১৬ শিলিং।

১ পরিশিষ্ট

জেলার বর্তমান রাজস্ব ও প্রশাসন ব্যয়

(কেবলমাত্র বীরভূমের হিসাব; বিষ্ণুপুর এখন অন্য জেলার অন্তর্ভুক্ত)

আয়, ১৮৬৪-৬৫			ব্যয়, ১৮৬৪-৬৫	
ভূমি রাজস্ব	...	৭,৪৪,৯৬৫	স্ট্যাম্প ফেরত	২,০০০
জরিমানা	...	৪,৫০০	আয়কর ফেরত	৫০০
ফিস	...	৬০০	বাক্স বোঝাই করে টাকা	
আবগারি	...	৪৫,৯২৯	পাঠানোর খরচ; কাঠের বাক্স,	
আফিম বিক্রয়	...	৭,০১৮	ক্যানভাসের আবরণ, প্যাকিং করা	
আয়কর	...	৩২,৪১২	প্রভৃতি খরচসহ	১,৫০০
স্ট্যাম্প বিক্রয়	...	৭১,৬৮৫	বন্যজন্তু নিধনের ব্যয়	১০০
স্ট্যাম্পের রসিদ	...	৪০৬	অফিসারদের ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি	৫০০
স্ট্যাম্প আইন লঙ্ঘনের জরিমানা		৩,৩০০	কালেক্টরেট খরচ ...	৩৫,৫০৮
চৌকিদারি চাকরান			আবগারী খাতে ব্যয়	২,৭৭৬
জমির খাজনা	...	২,৫০০		
	মোট	৯,১৩,৩১৫	আয়কর খাতে ব্যয়	২,৭০৬
শিক্ষা বিভাগ	...	৩,১০০	স্ট্যাম্প বিভাগের ব্যয়	২,৬০০
ডাক বিভাগ	...	৭,২০০	জজ কোর্টের ব্যয়	৭১,০০০
	সর্বমোট	৯,২৩,৬১৫		
অর্থাৎ ৯২,৩৬১ পাঃ ১০ শিলিং			ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ব্যয়	৩০,২০০
খরচ বাদ	... ...	২,৪৮,৬৯১	জেলখানার ব্যয় ...	৭,০০০
বা ... ২৪,৮৬৯ পাঃ ২ শিঃ			সিভিল সার্জনের বেতন	৪,২০০
নিট মুনাফা ...		৬,৭৪,৯২৪ পাঃ	সিভিল সার্জনের	
			চিকিৎসালয়ের খরচ	১২০

অর্থাৎ	৬৭,৩৪৯২ পাঃ ৮ শিঃ	পেনশন	৫,৬৩৪
		রাজনৈতিক পেনশন	৩৪৭
		পুলিশ বিভাগ	৬২,০০০
		শিক্ষা বিভাগ	১০,০০০
		ডাক বিভাগ	১০,০০০
			মোট ২,৪৮,৬৯১
			অর্থাৎ ২৪,৮৬৯ পাঃ ২ শিঃ

ড পরিশিষ্ট

১৭৯২ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা টাকশালের পরীক্ষা অনুসারে সিক্কা টাকার সঙ্গে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার ধাতুগত মূল্যমানের তুলনামূলক তালিকা

টাকার বিবরণ					সিক্কা টাকার তুলনায় ধাতুগত মূল্য		
১।	মুর্শিদাবাদি সিক্কা,	প্রতি	সিক্কার	ওজন ... ১০০	টা	আ	পা
২।	পাটনাই সিক্কা	...	...	....	১০০	০	০
৩।	ঢাকাই সিক্কা	...	...	....	১০০	০	০
৪।	ফোলি সনাত	...	...	....	১০০	০	০
৫।	দিল্লির মোহাম্মদশাহী	...	...	....	১০০	০	০
৬।	সুরাটি টাকা, বড়ো	...	...	....	৯৯	৮	০
৭।	বেনারসি সিক্কা	...	...	....	৯৯	৮	০
৮।	বিষ্ণু আর্কট	...	...	....	৯	৮	০
৯।	সাবি সনাত	...	...	....	৯৭	১৪	৬
১০।	ডাকি সনাত	...	...	....	৯৭	৮	৬
১১।	ফর্শি আর্কট	...	...	....	৯৭	৮	০
১২।	ফরাসি আর্কট	...	...	[illegible]	৯৭	৮	০
১৩।	পাঠানিয়া আর্কট	...	...	....	৯৭	০	০
১৪।	আওরঙ্গজেবি আর্কট	...	...	....	৯৬	৯	৬
১৫।	ত্তর্সাউল	...	...	....	৯৬	৯	৬
১৬।	মদ্রাজী আর্কট, নতুন	...	...	....	৯৬	৯	৬
১৭।	মসলিপট্টম আর্কট	...	...	....	৯৬	৪	৯
১৮।	সরদার আর্কট	...	...	....	৯৬	০	০

১৯।	পাটনাই সনাত, পুরোনো	... ...	৯৬	০	০
২০।	বেনারসি টাকা, পুরোনো	... ...	৯৬	০	০
২১।	মাদ্রাজি আর্কট, পুরোনো	... ...	৯৫	১৪	৬
২২।	ফরাক্কাবাদী টাকা	... ...	৯৫	১৪	৬
২৩।	জাহানজী আর্কট	... ...	৯৫	১১	৩
২৪।	চুন্টা আর্কট	... ...	৯৫	৬	৬
২৫।	কলকাতা আর্কট	... ...	৯৫	১১	৩
২৬।	মুর্শিদাবাদি আর্কট	... ...	৯৫	৬	৬
২৭।	পুরোনো আর্কট	... ...	৯৫	৬	৬
২৮।	ওলন্দাজ আর্কট	... ...	৯৫	০	০
২৯।	সুরাট আর্কট	... ...	৯৪	০	০
৩০।	বেনারসী ত্রিসোলী	... ...	৯২	৬	৬
৩১।	উজিরী টাকা	... ...	৯৩	০	০
৩২।	নারায়ণী আধুলী	... ...	৬৩	০	০

চ পরিশিষ্ট

১৭৬৩ সালে ভারতের ছয়টি বন্দরে প্রচলিত মুদ্রা ও ওজনের তালিকা

মাদ্রাজ

(সোনারুপার ওজন)

			আউন্স	ড্রাম	গ্রেন
১ প্যাগোডা =	...	...	০	২	$৪\frac{১}{১৬}$
$৯\frac{১}{১৬}$ প্যাগোডা =	...	...	১	০	০
৮ প্যাগোডা, ১ ডলার ওজন	...	...	০	১৭	১৪
১০০ ডলার	...	...	৮৮	১	১৭
১০০ ভেনিশিয়ান ডুকাট	...	...	১১	০	৫
১০০ গুবার, মাঝারি হারে	...	...	১০	১৭	১২
১ টাকা	...	...	০	৭	১১
১০০ টাকা	...	...	৩৭	৫	২৫

একটি মাদ্রাজি প্যাগোডার ওজন ২ ড্রাম $৪\frac{৪}{৩}$ গ্রেন; অর্থাৎ ব্রিটিশ ওজনের ২০ ক্যারেট $\frac{২৪}{৫}$ গ্রেন; দেশী খাদ $৮\frac{৫}{৮}$ চীনা $৮৬\frac{১}{৪}$।

একটি আলমগীর প্যাগোডার ওজন ১ ড্রাম ২২ গ্রেন; অর্থাৎ ব্রিটিশ ওজনে ২৩ ক্যারেট $২\frac{৪}{৫}$ গ্রেন; দেশী খাদ $৯\frac{৭}{৮}$ চীনা $৯৮\frac{৩}{৪}$

৮০ ক্যাশে ১ ফানাম।

৩৬ ফানামে ১ প্যাগোডা-পয়েন্স।

২ ড্রাম ৪ গ্রেনে ৮৬২৫ ফাইন ম্যাট।

১০০ মাদ্রাজি টাকার ওজন ৩৬ আউন্স ৫ ড্রাম ২০ গ্রেন এবং ব্রিটিশ মানের $১৪\frac{১}{২}$ ড্রামের চেয়ে উত্তম।

১০০ বোম্বাই টাকা ওজনে ব্রিটিশ মানের $১০\frac{১}{২}$ ড্রামের চেয়ে উত্তম।

সুরাট

(সোনারুপার ওজন)

১ চাইলে-১ রত্তা

		আঃ	ড্রাঃ	গ্রেঃ
৩ রত্তায় ১ ভল	...	০	০	৫ $\frac{২৬}{৩২}$
৩২ ভলে ১ তোলা	...	০	৭	১৮ $\frac{২}{১১}$
৮২ $\frac{১}{২}$ ভলে ২ তোলা ও ১৮ $\frac{১}{২}$ ভল, বা	...	১	০	০
৯ $\frac{১}{৪}$ ভল = ১ ভেনিশিয়ান ওজন	...	০	২	৫ $\frac{৫}{১৪}$
১০০ ভল = ২৮ তোলা ২৯ ভল	...	১১	১৪	২২
৭৩ ভল = ১ ডলার ওজন	...	০	১৭	১৮
১০০ ভল ওজন = ২২৮ তোলা ৪ ভল	...	৮৮	১৫	০
৩১ তোলা = প্রায়	...	১২	০	০
প্রবাল ওজনের সের = ১৮ বড়ো পয়সা বা ২৭ সাধারণ পয়সার ওজন—	...	১২	৫	২০
কস্তরী ওজনের সের	...	১১	০	০
সুরাটি সের = ৩০ পয়সা, মাঝারি হারের ওজনে	...	১৩	১২	০
		টাকা	আনা	পয়সা
১ স্পেনীয় ডলার, প্রমাণ ওজন ৭৩ ভল	...	২	৩	০
১০০ স্পেনীয় ডলার, প্রমাণ ওজন ৭৩ ভল	...	২১৯	১২	৯
১০০ আউন্স ওজনের মেক্সিকো ডলার	...	২৪৭	০	০

৪ পয়সায় ১ আনা।

১৬ আনা, বা ৬৪ পয়সায় ১ টাকা (রুপা)।

১৩ $\frac{১}{২}$ রুপার টাকায় ১ সোনার টাকা।

বোম্বাই

(মুদ্রা)

		টাকা	আনা	পয়সা
১ ভেনিশিয়ান =	... ...	৩	১৪	০
১ গুবার =	... ...	৩	১২	৬
১ সোনার মুর বা টাকা	... ...	১৩	৮	০

১০০ রি-তে ১ কোয়ার্টার।

৪০০ রি-তে ১ টাকা।

গোয়া

(মুদ্রা)

৩৮ লিডার রে	১ টাংগা (রুপার)।
৫ টাঙ্গো	১ পার্দাও বা জেরাফিন।

মালাক্কা

(সোনার ওজন)

	আঃ	ড্রাঃ	গ্রেঃ
১৬ মিয়ামে ১ বোকাল-	১	৯	১৮$\frac{৭}{১৭}$
২০ বোকালে ১ কাটি = ...	২৯	১৬	০

(মুদ্রা)

৪ ডয়েট = ...	১ স্টিভার।
৬ স্টিভার = ...	১ স্কিলিং।
৮ স্কিলিং = ...	১ রিক্স ডলার।
১ জুকাটুন = ...	১৩ স্কিলিং।
১ ইংলিশ ক্রাউন = ...	১০ সিকিইলং।
১ বোম্বাই বা সুরাটি টাকা = ...	৫ স্কিলিং।

১ মাদ্রাজি টাকা (বোম্বাই টাকা সমান মূল্যমানের হওয়া সত্ত্বেও) = ... ৪ স্কিলিং

১ আর্কট টাকা (সুরাটি টাকার চেয়ে শতকরা একভাগ বেশি মূল্যমানের হওয়া সত্ত্বেও) = ... ৪ স্কিলিং।

{কারণ এই টাকা বোম্বাই সুরাটী টাকার মতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো না।

কালিকট ও তেলিচেরি

(মুদ্রা)

১৬ তার বা বিসে	১ ফানাম বা গালি।
৫ ফানামে	১ টাকা।

প্রমাণ ওজনের ১ টি স্পেনীয় ডলারের সঠিক দাম ২$\frac{১}{৪}$ টাকা; কিন্তু বাজারে মাত্র ১০ ফানাম ৪ তার থেকে ১০$\frac{১}{২}$ ফানামে বিনিময় হয়।